সিগমা ফোর্স

দ্য বোন ল্যাবিরিন্থ

জেমস রলিন্স

রূপান্তরঃ আদনান আহমেদ রিজন

ক্রোয়েশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের গুহায়, শত শত বছর ধরে লুকানো ভূগর্ভস্থ চ্যাপেলে, আবিষ্কৃত হলো এক নিয়ানডারথাল মানুষের কঙ্কাল। সেই গুহার দেয়ালেই আবার আঁকা আছে কিছু অদ্ভুত দৃশ্য- প্রাগৈতিহাসিক জীব-জন্তুর সাথে লড়াই করছে বিশালাকায় দানব। এসব দৃশ্যের ব্যাখ্যা কী?

কিছু বুঝে ওঠার আগেই হামলা করা হলো অভিযাত্রী দলের উপর। অন্যদিকে, আটলান্টার এক রিসার্চ সেন্টারেও আক্রমণ করেছে দর্বৃত্তরা। ঘটনা দুটোর মাঝে সম্পর্ক কোথায়?

ছেঁড়া সুতো জোড়া দিতে, সুদূর পঞ্চাশ হাজার বছর আগেকার ইতিহাসে ডুব দিতে হবে কমান্ডার গ্রে পিয়ার্স আর তার সিগমা ফোর্সকে। আবারও ঘাঁটতে হবে মানবজাতির বিবর্তন ইতিহাস, খুঁজে বের করতে হবে চাঁদ আর পৃথিবীর সেই রহস্যময় সংযোগ।

তারপরও কিন্তু রক্ষা নেই... আসছে এক যুদ্ধ। প্রাগৈতিহাসিক বনভূমি আর আধুনিক ল্যাবরেটরিকে এক সুতোয় গাঁথবে সেই যুদ্ধ। আবারও নতুনরূপে আবির্ভূত হতে চলেছে পঞ্চাশ হাজার বছর আগে মঞ্চস্থ হওয়া এক নাটক, যার প্রধান কলাকুশলী লুকিয়ে আছে আমাদের ডিএনএ-তে।

ধ্বংসপ্রায় গুহা থেকে সুপ্রাচীন উপাসনালয়, আটলান্টার রিসার্চ সেন্টার থেকে ইকুয়েডরের আন্দেজ পর্বত... সিগমা ফোর্সকে এবার ছুটতে হচ্ছে এক আশ্চর্যজনক সত্যের পেছনে, যার শেকড় পেঁচানো আছে হারিয়ে যাওয়া সভ্যতা আটলান্টিস আর চাঁদে প্রথম পা রাখা মানুষের সাথে।

ISBN 978 984 92439 8 4
9 789849 243984
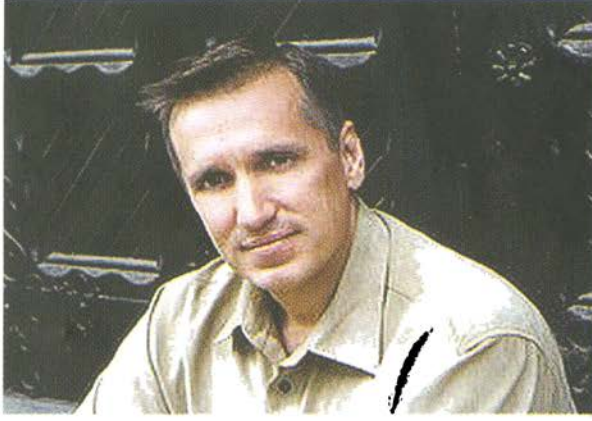
জেমস রোলিন্স

বর্তমান সময়ের একজন বিশ্ববিখ্যাত জনপ্রিয় লেখক। মূলত অ্যাডভেঞ্চার ও থ্রিলারধর্মী বই লেখার জন্য তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। লেখালেখি শুরু করার আগে তিনি পেশায় পশু চিকিৎসক ছিলেন। প্রায় ১০ বছর চিকিৎসক হিসেবে কাজ করার পর লেখালেখির জন্য সেখান থেকে অবসর নেন।

অ্যাডভেঞ্চার বই লেখার পাশাপাশি বাস্তব জীবনেও তিনি বেশ অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী। রোলিন্স একজন সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত স্কুবা ডাইভার; বিভিন্ন উপন্যাসে পানির নিচের বর্ণনা তিনি নেহাত কল্পনা থেকে উপস্থাপন করেন না। এব্যাপারে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। এছাড়াও শিক্ষানবিশ হিসেবে বিভিন্ন গুহায় অভিযান চালিয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অভিযান করে তিনি তাঁর উপন্যাসের জন্য বাস্তবধর্মী স্থান নির্বাচন করে থাকেন। যার ফলে রোলিন্সের উপন্যাসগুলোতে বাড়তি মাত্রা যোগ হয়।

তাঁর লেখা *সিগমা ফোর্স* সিরিজ পুরো বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ৪০টির বেশি ভাষায় তাঁর বই অনূদিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বাস করছেন।

দ্য বোন ল্যাবিরিন্থ

জেমস রলিন্স

রূপান্তরঃ আদনান আহমেদ রিজন

ADEE

উৎসর্গঃ

ওয়ার্পড স্পেসার দলের সবাইকে,

একেবারে শুরু থেকে যাদের পাশে পেয়েছি এবং এখনও পাচ্ছি।

ভুমিকা

প্রকাশ হলো আমার চতুর্থ এবং সিগমা ফোর্স সিরিজের তৃতীয় অনুবাদগ্রন্থ। পরম করুণাময়ের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।

জেমস রলিন্সের লেখার সাথে নতুন করে পরিচয় করানোর কিছু নেই। সিগমা ফোর্স সিরিজের একাদশ বই 'দ্য বোন ল্যাবিরিন্থ'। বরাবরের মতোই ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চারের এক রুদ্ধশ্বাস যাত্রা। এই বইতে লেখক আমাদের নিয়ে গিয়েছেন সেই দুই লক্ষ বছর আগেকার পৃথিবীতে, যখন প্রাগৈতিহাসিক পরিবেশে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াত আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষ। পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ডের সাথে, যার কারণে আজ আমরা এত উন্নত। দেখিয়েছেন মানবজাতির বুদ্ধিমত্তার ইতিহাস। দেখিয়েছেন বিভিন্ন প্রাচীন গোত্রের সাথে আধুনিক মানুষের জিনগত মেলবন্ধন।

ধন্যবাদের তালিকাটা আমার সবসময়ই বিশাআআআল হয়। কৃতজ্ঞতা নক্সা গ্রুপের সবার প্রতি। অনুপ্রেরণা দেয়ার জন্য ধন্যবাদের দাবীদার মা-বাবা, বন্ধু-বান্ধবসহ সব কাছের মানুষগুলো। ধন্যবাদ ফেসবুকের সব বন্ধু-শুভাকাঙ্ক্ষীদের। আর সেই সাথে আস্থা রাখার জন্য ধন্যবাদ আদী প্রকাশনের প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা বইটি হাতে তুলে নেয়া সেই সব পাঠকদের প্রতি। দোয়া করবেন। আপনাদের উৎসাহ-অনুপ্রেরণাই আমাকে প্রতিনিয়ত বলিয়ান করে।

ইতিহাস এবং বিজ্ঞানসংক্রান্ত বিষয়গুলো যথাসম্ভব সাবলীল রাখতে চেষ্টা করেছি, কতটুকু পেরেছি তা বিচারের দায়িত্ব পাঠকের হাতে। গল্পের ধারাবর্ণনার প্রয়োজনে কিছু যন্ত্রপাতি এবং বিষয়ের নাম ইংরেজিতে রাখতে হয়েছে, আশা করি এই ব্যাপারটা কোনও সমস্যা করবে না।

অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। যে কোনও ধরনের গঠনমূলক সমালোচনা সাদরে গ্রহণযোগ্য।

আদনান আহমেদ রিজন
সেপ্টেম্বর, ২০১৭; ঢাকা

মানচিত্র

Colombia
Quito
Ecuador
Guayaquil
Cuenca
Peru

South America
Andes
Amazon Basin
Brazil
Andes
Bolivia
Argentina
Andes
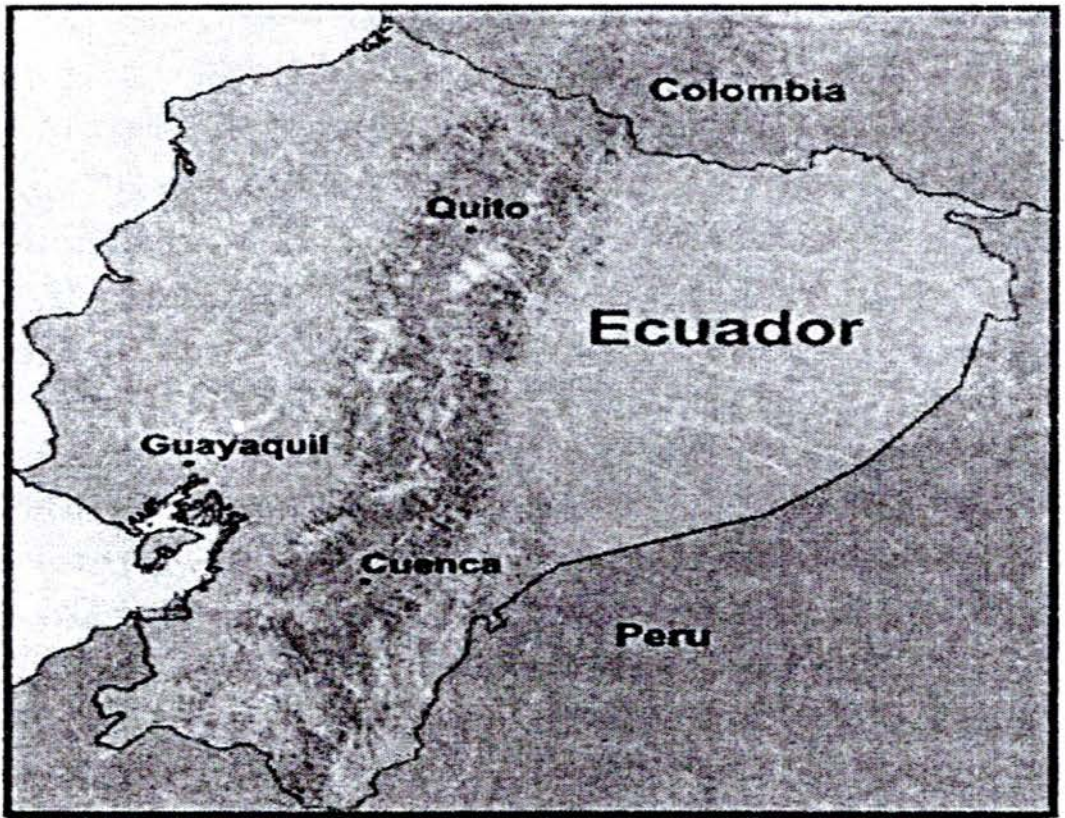
ইতিহাসের পাতা থেকে

দুই ঐতিহাসিক চরিত্র এই উপন্যাসে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। দু'জন যাজক, জন্ম ভিন্ন শতাব্দীতে হলেও ভাগ্য যাদের জুড়ে রেখেছিল একই সুতোর দুই প্রান্তে।

সতেরো শতকে ফাদার অ্যাথেনাসিয়াস কার্কারকে জেসুইট অর্ডারের লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিরূপে অভিহিত করা হত। ভিঞ্চির মতোই অনেক কাজের কাজি ছিলেন তিনি। চিকিৎসাবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, প্রাচীন মিশর সম্পর্কিত জ্ঞান, প্রকৌশল ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ জ্ঞান ছিল তার। যুগের পর যুগ ধরে, ডেকার্ট থেকে নিউটন, জুল ভার্ন থেকে অ্যাডগার অ্যালান পো পর্যন্ত মহামানবদের পথিকৃত হিসেবে পথ দেখিয়েছেন এই যাজক।

ঠিক এমনই আরেকজন ছিলেন।

ফাদার কার্লোস ক্রেসপির জন্ম পরবর্তী শতাব্দীতে, আঠারো'শ একানব্বই সালে। কার্কারের পদচিহ্ন অনুসরণ করে তিনিও নিজেকে নিয়োজিত করেন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়। যেগুলোর মধ্যে উদ্ভিদবিদ্যা, নৃবিদ্যা, ইতিহাস, সঙ্গীত ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইকুয়েডরের ছোট্ট একটা মিশনারীতে পঞ্চাশ বছর কাজ করেন তিনি। বলা হয়ে থাকে, ওই সময় সোনার তৈরি প্রাচীন আর্টিফ্যাক্টের এক বিশাল সংগ্রহ তার দখলে এসেছিল। স্থানীয় শুয়ার গোত্রের শামানরা জিনিসগুলো তাকে এনে দেয়।

শামানদের মতে- দক্ষিণ আমেরিকার বিশাল এক গুহা থেকে এসেছে ওগুলো। শুধু তাই নয়, গুহায় নাকি একটা সুপ্রাচীন লাইব্রেরীও ছিল। হায়ারোগ্লিফ খোদাই করা অগণিত পাথরের ব্লক আর ধাতব পাত রক্ষিত ওখানে।

কেউ কেউ জিনিসগুলোকে ভুয়া বললেও, বেশিরভাগ ঐতিহাসিক আর্টিফ্যাক্টগুলোর প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কিত ফাদার কার্লোসের দাবীকে সত্য বলে মানেন। উনিশশো বাষট্টি সালে জিনিসগুলো সংরক্ষণ করে রাখা জাদুঘরটা ভয়ঙ্কর অগ্নিকান্ডের শিকার হয়। ধ্বংস হয়ে যায় বেশিরভাগ নিদর্শন। আগুনের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া বাকি আর্টিফ্যাক্টগুলো তালাবদ্ধ করে রাখে ইকুয়েডর সরকার।

ফাদার কার্লোসের দাবীর সত্যতা প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। কেউ জানে না, আসলেই কি ওরকম কোনও গুহার অস্তিত্ব আছে? নাকি পুরোটাই তার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা?

উনিশশো ছিয়াত্তর সালে বৈজ্ঞানিক অভিযানে যাওয়া এক ব্রিটিশ দল ভূলক্রমে একটা গুহায় ঢুকে পড়ে। ওখানে একটা ভূগর্ভস্থ লাইব্রেরী খুঁজে পায় তারা। মজার ব্যাপার হচ্ছে, দলটা ব্রিটিশ হলেও নেতৃত্ব ছিল একজন আমেরিকানের হাতে। তিনি আর কেউ নন, চাঁদে পা রাখা প্রথম মানুষ নিল আর্মস্ট্রং।

কি ছিল ওই গুহায়, যা দেখে গণমাধ্যমের সামনে মুখে তালা এঁটে রেখেছিলেন দুঃসাহসী এই অভিযাত্রী?

উত্তরটা জড়িয়ে আছে সুপ্রাচীন এক রহস্যের সাথে, মানবজাতির অস্তিত্বের পথে যা রীতিমতো হুমকিস্বরূপ।

বৈজ্ঞানিক নথি থেকে

মানবজাতির অস্তিত্বের সাথে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 'আমরা কেন এত বুদ্ধিমান?'

মানুষের ক্রমবর্ধমান বুদ্ধিমত্তার রহস্য এখনও বিজ্ঞানীরা খুঁজে বের করতে পারেননি। এটা ঠিক যে, দুই লক্ষ বছর আগের পূর্বপুরুষ আর বর্তমান মানুষের মস্তিষ্কের আকার আকৃতিতে বেশ পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু পঞ্চাশ হাজার বছর আগে হঠাৎ করে কেন বিস্ফোরিত হলো এই বুদ্ধিমত্তা?

নৃবিজ্ঞানীরা এই ঘটনাটাকে 'গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড' নামে অভিহিত করেছেন। জীবাশ্ম অনুসন্ধান থেকে জানা গেছে- ওই সময় হঠাৎ করেই চিত্রকলা, সঙ্গীত, অস্ত্রবিদ্যায় অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করে আমাদের পুর্বপুরুষরা। তবে তাদের মস্তিষ্কে কিন্তু এই পরিবর্তনের কারণ সংজ্ঞায়িত করার মতো কোন ধরনের আকৃতিগত পরিবর্তন দেখা যায়নি। তাহলে কেন এই আকস্মিক উন্নতি?

গবেষকরা বিভিন্ন সময়ে কারণটাকে আবহাওয়ার পার্থক্য, জীনগত মিউটেশন কিংবা খাবার আর পুষ্টির প্রাচুর্যের আড়ালে লুকিয়েছেন।

ভয়ের কথা হচ্ছে, গত দশ হাজার বছর ধরে আবারও পরিবর্তীত হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্কের আকৃতি। ছোট হয়ে গিয়েছে আগের তুলনায় শতকরা পনেরো ভাগ। এই নতুন পরিবর্তনের কারণ আর উদ্দেশ্য কী? ভবিষ্যতে কী চমক অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য?

'গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড' -এর রহস্য সমাধান করতে পারলেই হয়ত জানা যাবে উত্তরগুলো। কিন্তু ওই ব্যাপারে তো এখনও পর্যন্ত আঁধারেই রয়ে গেছেন গবেষকরা।

বইয়ের পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো উল্টাতে উল্টাতে একটা প্রশ্ন পাঠকের মনে আসবেই- আবারও কি 'গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড' -এর দিকে এগোচ্ছে মানবজাতি?

যদি তাই হয়, তবে কী ঘটবে আমাদের ভাগ্যে? বুদ্ধিমত্তার বিস্ফোরণে এগিয়ে যাব সামনে? নাকি ফিরে যাব আবারও সেই অন্ধকার যুগে?

'বুদ্ধিমত্তা বিবর্তনের কোনও আশীর্বাদ নয়, এটা একটা দুর্ঘটনা।' -আইজ্যাক আসিমভ।

'পরিবর্তনের মাত্রাই হচ্ছে বুদ্ধিমত্তার মানদণ্ড।'- অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।

প্রারম্ভঃ
খ্রিস্টপূর্ব ৩৮০০০ সাল, শরৎকাল
দক্ষিণ আল্পস পর্বতমালা

'দৌড়াও!'

প্রাণপণে মেয়েকে সাথে নিয়ে ছুটছে কে'রাক। পেছন দিকের গাছে গাছে ভর করে ধাওয়া করেছে লকলকে আগুন। বাবা-মেয়েকে গত কয়েকদিন যাবত এভাবেই পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। তবে আগুনই তাদের ভয়ের একমাত্র কারণ নয়।

ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল কে'রাক। উদ্দেশ্য- ধাওয়াকারীরা কতটুকু পেছনে আছে, তা দেখা। কিন্তু পেছন দিকে সচল জিনিস বলতে আগুনের ফুলকি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না।

অথচ নেকড়ের গর্জন থেমে নেই। খুব কাছে চলে এসেছে ইতিমধ্যে, হয়তো পৌঁছে গেছে পেছনের উপত্যকায়। প্রভুদের সাথে পশুগুলোও খুঁজতে বেরিয়েছে ওদের দু'জনকে।

দিগন্তে পটে বসেছে সূর্য। লালচে আভা গোটা আকাশ জুড়ে। শান্ত স্নিগ্ধ আলোর উজ্জ্বলতা যেন লোভ দেখাচ্ছে, 'চলে এসো...ওই সামনেই অপেক্ষা করছে মুক্তি।'

আগুনের গ্রাসে চলে যাওয়া নিজের বাড়ির কথা মনে করল কে'রাক। গাছগাছালির ছায়ায় ঘেরা জায়গাটাতে আর কখনোই ফিরে যেতে পারবে না ওরা। বিশেষ করে তার মেয়ে ওঙ্কা।

সামনের দিকে চিৎকার শুনে সম্বিত ফিরল কে'রাকের। শ্যাওলায় পিছলে পড়েছে ওঙ্কা। কাঁদছে ডুকরে ডুকরে।

এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে মেয়েটাকে টেনে তুলল কে'রাক। পা ফস্কানোর মেয়ে নয় ওঙ্কা। কিন্তু গত তিনদিন ধরে এক নাগাড়ে ছুটে চলা যেন শুষে নিয়েছে ওর সব শক্তি। কে'রাকের নিজের অবস্থাও খুব একটা সুবিধার না।

চোখের পানিতে ভিজে যাওয়া ওঙ্কার গাল দুটো মুছিয়ে দিল কে'রাক। মৃত মায়ের মুখের আদল পেয়েছে মেয়েটা। পেশায় একজন ওঝা ছিল তার স্ত্রী। গোটা গোত্রের চিকিৎসা করে বেড়ালেও নিজে ফাঁকি দিতে পারেনি মৃত্যুকে। বাচ্চা জন্ম দেয়ার পরপরই মারা গেছে।

মেয়ের আগুনরঙা চুলগুলোতে হাত বুলাল কে'রাক।

ঠিক ওর মায়ের মতো...

তবে আলাদা আরও কিছু চিহ্ন আছে ওঙ্কার শরীরে। নয় বছর বয়সী মেয়েটার চিকন নাকের আকৃতি কে'রাকের গোত্রের কারও সাথে মেলে না। পাতলা ভ্রূ-জোড়া প্রায় সোজা। আকাশের মতো নীলচে চোখের মণি। মিশ্র বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটাচ্ছে এই অঙ্গগুলো।

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এমন বাচ্চাগুলেকে বলা হয় 'ওমেন'। পাহাড়ে পরবর্তীতে আসা হ্যাংলা-পাতলা গড়নের মানুষগুলোও যে পুরনো অধিবাসীদের সাথে মিলেমিশে থাকতে পারে তারই প্রমাণ দিচ্ছে ওরা। দুই জাতির মিলনের ফলে জন্মানো এই বাচ্চাগুলোই বড় হয়ে এক সময় আত্মপ্রকাশ করে শামান, ওঝা কিংবা দুর্ধর্ষ শিকারীরূপে।

তিন দিন আগে, আহত অবস্থায় পার্শ্ববর্তী এলাকার এক লোক গ্রামে এসে হাজির হয়। মরার আগে কোনওরকমে সবাইকে জানায়, পাহাড়ে এক শিকারী জাতির আবির্ভাব ঘটেছে। ওঙ্কার মতো মিশ্র বৈশিষ্টধারী বাচ্চাদের খুঁজছে ওরা। বাধা দিতে গেলেই নির্বিচারে খুন করছে সাধারণ মানুষকে।

খবরটা শোনার সাথে সাথে কে'রাক বুঝতে পারে, ওঙ্কার জন্য বিপদে পড়তে চলেছে তার পুরো গোত্র। তাই মেয়েকে নিয়ে পালায় সে। কিন্তু খুব সম্ভবত, কোনও এক বিশ্বাসঘাতক শিকারী লোকগুলোর কাছে তার পালানোর খবর পৌঁছে দিয়েছে।

কিছুতেই তোমাকে ওদের হাতে পড়তে দেব না আমি, মেয়ের দিকে তাকিয়ে ভাবল কে'রাক।

আবারও শুরু হলো পালানো। কিন্তু পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে ওঙ্কা। পিছলে পড়ে ছড়ে গিয়েছে হাঁটু। বেশ ব্যাথা করছে হয়তো।

অবস্থা বেগতিক দেখে মেয়েকে কাঁধে তুলে চলতে শুরু করল কে'রাক। সামনের ঢালের প্রান্তে, গাছগাছালির ফাঁকে সরু খাঁড়ি দেখা যাচ্ছে। তাদের গন্তব্যও ওদিকেই।

বামদিকে ডাল নড়ার শব্দ পেয়ে জায়গায় জমে গেল কে'রাক। সন্তর্পনে মেয়েকে মাটিতে নামিয়ে ধারালো বর্শা তুলে নিল হাতে।

ঝোপঝাড়ের ফাঁক গলে একটা চিকন অবয়ব বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। গায়ে হরিণের চামড়ার পোশাক। সরাসরি লোকটার চোখের দিকে তাকাল কে'রাক। বুঝতে পারল- সে ও ওঙ্কার মতো বিশেষ দৈহিক বৈশিষ্ট সম্পন্ন। পোশাক পরিচ্ছদ আর শরীরের দুবলা-পাতলা আকৃতি বলে দিচ্ছে, লোকটা পরবর্তীতে পাহাড়ে আসা গোত্রের সদস্য।

আবারও পেছন থেকে ভেসে এল নেকড়ের ডাক। এবার আরও কাছে।

গর্জনের আওয়াজ শুনে, হাত তুলে বিজাতীয় ভাষায় হড়বড় করে কিছু একটা বলতে শুরু করেছে আগন্তুক। কিন্তু কে'রাক তার কথার মাথা-মুন্ডু কিছু বুঝতে না

পারলেও হাতের ইশারার চিহ্ন ঠিকই বুঝেছে। খাঁড়ির দিকে এগোতে নির্দেশ দিয়েছে সে।

মেয়েকে কোলে নিয়ে সরু পথটা অনুসরণ করল কে'রাক। ঢালের শেষ মাথায় পৌঁছে দেখতে পেল, আরও কয়েকজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। দশ-বারোটা বাচ্চার একটা দল। কয়েকজন ওঙ্কার চাইতে বয়সে বড় হলেও, বেশিরভাগই ছোট।

কিন্তু সবার মাঝেই একটা মিল আছে।

তারা সবাই ওঙ্কার মতো মিশ্র বৈশিষ্ট্যের।

হাঁটু গেড়ে কে'রাকের সামনে বসল চিকন লোকটা। হাত উঁচু করে স্পর্শ করল ওঙ্কার ভ্রু আর গালের হাড়। মেয়েটাকে নিজেদের আপনজন বলে চিনতে পেরেছে।

ওঙ্কাও হাত বাড়িয়ে তার কপাল স্পর্শ করল। অদ্ভুত একটা নকশা আঁকা ওখানে।
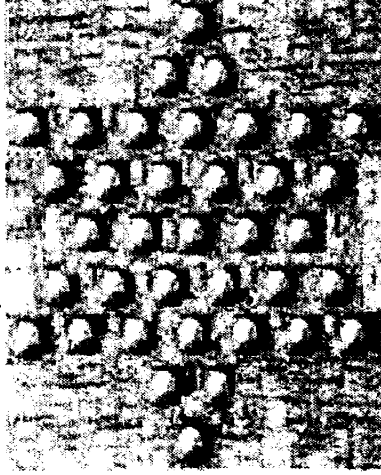
গুটি গুটি বলগুলোতে আঙুল বুলাতে লাগল ওঙ্কা, যেন বুঝতে পারছে চিহ্নের অর্থ। বাকি বাচ্চাগুলোর ঠোঁটেও মুচকি হাসি খেলা করছে।

এক মুহূর্ত পর সোজা হয়ে দাঁড়াল দুবলা-পাতলা। ইঙ্গিত করল নিজের বুকের দিকে। 'তেরন।'

কে'রাক বুঝতে পারল, এটা ওর নাম। তবে লোকটা কিন্তু চুপ করে নেই। সামনের দিকে ইশারা করে আবারও বিজাতীয় ভাষায় কিছু একটা বলতে শুরু করেছে। আগের বারের মতোই কথাগুলোর একটা বিন্দু মাথায় ঢুকছে না কে'রাকের।

এমন সময় বাচ্চাদের পেছন থেকে এক বৃদ্ধ এগিয়ে এল। কথা বলে উঠল পাহাড়ের প্রচলিত ভাষায়। 'তেরন বলছে, তোমার মেয়ে আমাদের সাথে আসতে পারে। শিকারীদের নজর এড়িয়ে সামনের দিকে যাত্রা করব আমরা।'

'কিন্তু এদিকে তো তুষারপাত হচ্ছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল কে'রাক।

মাথা নাড়ল বুড়ো। 'আর বেশিদিন হবে না। আশা করি ততদিনে এই এলাকার বাইরে পৌঁছে যেতে পারব।'

পেছন থেকে নেকড়ের হিংস্র গর্জন ভেসে এল আবারও।

বুড়োর গলায় উৎকণ্ঠার ছাপ। 'ওরা চলে আসার আগেই রওনা হতে হবে।'

ওঙ্কাকে তেরনের দিকে এগিয়ে দিল কে'রাক। 'ওকে সাথে নিচ্ছেন তো আপনারা?'

মেয়েটার এক হাত মুঠো করে ধরল তেরন।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল বুড়ো। 'ওকে রক্ষা করব আমরা। কিন্তু শিকারীরা প্রায় চলে এসেছে। রওনা হওয়ার জন্য আমাদের কিছুটা সময় দরকার।' বলে কে'রাকের হাতের বর্শার দিকে ইশারা করল সে।

বুড়োর ইঙ্গিত ধরতে পেরেছে কে'রাক। শক্ত হাতে বর্শাটা তুলে ধরল সে। 'শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ওদের আটকে রাখব আমি। আপনারা তৈরি হোন।'

কথাটার অর্থ বুঝতে পেরেছে ছোট্ট ওঙ্কা। সরাসরি বাবার চোখের দিকে তাকাল সে। 'বাবা...'

'এরাই এখন থেকে তোমার আপনজন,' কথাগুলো বলার সময় কে'রাক বুঝতে পারল দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে তার বুকের ভেতরটা। 'তোমাকে নিরাপদে রাখবে এরা। যেখানেই যাও, ভালো থেকো।'

তেরনের হাত ছেড়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরল ওঙ্কা।

শেষবারের মতো মেয়েকে আদর করল কে'রাক, তারপর তুলে দিল তেরনের কোলে। সবাইকে বিদায় জানিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়াল। জানে, আর কখনও মেয়ের মুখ দেখতে পাবে না।

বুকে পাথর চেপে পা চালাতে লাগল কে'রাক। পেছন থেকে কানে ভেসে আছে ওঙ্কার কান্নাজড়িত কণ্ঠ।

ভাল থেকো, সোনামনি...

চোখ মুছে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল সে। ইতিমধ্যে সূর্য ডুবে গেলেও পুরোপুরি অন্ধকার হয়নি। মেয়েকে বিদায় দেয়ার পর থেকে আর কানে আসেনি নেকড়ের গর্জন। তবে নিশ্চিন্ত হওয়ার কিছু নেই। জানে, ঠিকই তার গায়ের গন্ধ অনুসরণ করে এগিয়ে আসছে হিংস্র প্রানিগুলো।

সরু পথের একপাশে, ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল কে'রাক। আবছা অন্ধকারে সামনে নড়াচড়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক মুহূর্ত পরই দৃষ্টিসীমায় উদয় হলো গর্জনরত নেকড়ে। একটা নয়, বেশ কয়েকটা।

আরও কাছে এগিয়ে আসতেই কে'রাক বুঝতে পারল, ভুল ভেবেছে সে। প্রানিগুলো নেকড়ে নয়। তার চাইতে আরও বেশি ভয়ঙ্কর। বিশালাকায় মাথার দু'পাশে ছড়িয়ে আছে ঘন কেশর। শিকারি জীবনের পরিচয় দিচ্ছে সারা গায়ে অজস্র কাটাকুটির দাগ। ঠোঁটের প্রান্ত ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে ধারালো, হলদেটে শ্বদন্ত।

এক লাফে যেন গলায় এসে আটকে গেল কে'রাকের হৃৎপিণ্ড। দম আটকে অপেক্ষা করতে লাগল প্রানিগুলোর মনিবদের দেখবে বলে।

অবশেষে আঁধার কেটে দৃশ্যপটে হাজির হলো শিকারিরা। প্রথমবারের মতো কে'রাকের নজরে ধরা পড়ল তাদের মুখাবয়ব। সাথে সাথে ভয়ে শিউরে উঠল সে।

না, এটা হতে পারে না...

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কে'রাক। সজোরে হাতের বর্শা আঁকড়ে ধরে তাকাল পেছনের ফেলে আসা অন্ধকারের দিকে।

পালাও ওঙ্কা...পালাও...

১৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দ, বসন্তকাল।
রোম, প্যাপাল স্টেটস

কলেজিও রোমানো জাদুঘরের হলওয়ে ধরে এগোচ্ছে নিকোলাস স্টেনো, সামনে থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে তরুণ বার্তাবাহককে। আগাগোড়া কাপড়ে আবৃত লোকটার জুতো কাদার ছাপ ফেলছে পুরো মেঝেতে।

রোমান সম্রাট প্রথম লিওপোল্ড-এর কাছ থেকে এসেছে এই জার্মান দূত। জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ফাদার অ্যাথেনাসিয়াস কার্কারকে একটা বিশেষ জিনিস পাঠিয়েছেন সম্রাট।

সামনে এগোনোর সাথে সাথে জাদুঘরের সৌন্দর্যে মোহিত হচ্ছে আগন্তুক। মাথার উপর জ্যোতির্বিদ্যার সাক্ষর রাখা সুউচ্চ ডোম, মিশরীয় স্মৃতিস্তম্ভ, প্রানিদের দেহাবশেষ সমৃদ্ধ অ্যাম্বারের বোল্ডার ইত্যাদি দেখে বিস্ময়ে চোখ কপালে উঠে যাচ্ছে তার।

'সাবধানে,' সতর্ক করল নিকোলাস।

প্রায় এক বছর এখানে কাটিয়েছে নিকোলাস। এরইমাঝে ফাদার কার্কারের সাজানো জাদুঘরের প্রতিটা কোনা, প্রতিটা পুরনো পাণ্ডুলিপির অবস্থান তার নখদর্পণে। টাস্কেনির গ্র্যান্ড ডিউকের আদেশে, সবকিছু পর্যবেক্ষণের জন্য এখানে আসে নিকোলাস। যাতে ফিরে গিয়ে ফ্লোরেন্সে অবস্থিত ডিউকের নিজ প্রাসাদে এরকম একটা জাদুঘর স্থাপন করতে পারে।

একটা লম্বা ওক কাঠের দরজার সামনে থেমে মৃদু হাতে চাপড় দিল সে।

'এসো,' জবাব এল ভেতর থেকে।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল নিকোলাস। 'বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, রেভারেন্ড ফাদার।'

তার পেছন পেছন ভেতরে ঢুকেছে জার্মান দূতও। ডেস্কের ওপারে বসে থাকা মানুষটার উদ্দেশ্যে হাঁটু গেড়ে বসে সম্মান দেখাল সে।

পালকের কলম হাতে পার্চমেন্টে কিছু একটা লিখছিলেন ফাদার কার্কার। জবাবে একটা দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ ভেসে এল বইয়ের স্তূপের আড়ালে প্রায় ঢাকা পরে যাওয়া মুখটা থেকে। 'আবারও আমার সংগ্রহের পরিমাণ কমাতে চলে এসেছ, নিকোলাস? জানিয়ে রাখি, আমার কাছে কিন্তু সবগুলো বইয়েরই তালিকা করা আছে।'

কথাটা শুনে মুচকি হাসল নিকোলাস। 'মান্ডাস সাবটেরেনিয়াস-এ আপনার করা বেশিরভাগ মতবাদ ভুল প্রমাণ করার সাথে সাথেই বইটা ফেরত দেব আমি।'

'তাই নাকি? আমি তো জানতাম, ভূগর্ভস্থ পাথর আর খনিজ সম্পর্কিত নিজের কাজটার উপর কলমের শেষ আঁচড় দিচ্ছ তুমি।'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল নিকোলাস। 'হ্যাঁ। তবে সেটা প্রকাশ করার আগে আপনার মতো বিজ্ঞ একজনকে দিয়ে যাচাই করিয়ে নেয়ার লোভ সামলাই কী করে বলুন।'

গত বছর নিকোলাসের এখানে আসার পর থেকে বিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে রাতের পর রাত চায়ের কাপে ঝড় তুলেছেন দু'জন। পাথর আর হাড় সম্পর্কে নিকোলাসের মতো ফাদার কার্কারের আগ্রহও অপরিসীম। তাই হয়ত বয়সে প্রায় সাঁইত্রিশ বছরের বড় হওয়া সত্ত্বেও নিজের সমমনা কারো সাথে আলাপচারিতায় ডুবে যেতে দ্বিধা করেননি তিনি।

এমনকি প্রথম দেখা হওয়ার দিনই, বছর দুয়েক আগে নিকোলাসের প্রকাশিত একটা প্রতিবেদনের ব্যাপারে তর্ক জুড়ে দিয়েছিলেন তারা। বিষয়টার প্রতিপাদ্য ছিল- পাথরের ভেতর জমাট বাঁধা গ্লসোপেট্রি আসলে প্রাগৈতিহাসিক হাঙরের দাঁত ছাড়া আর কিছুই না। একই ধরনের চিন্তাধারার কারণেই বয়সের বাধা পেরিয়ে সহকর্মীতে, সর্বোপরি বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে তাদের সম্পর্ক।

হাঁটু গেড়ে বসে থাকা দূতের দিকে স্থির হলো ফাদার কার্কারের দৃষ্টি। 'তোমার সাথের এই আগন্তুককে তো চিনতে পারলাম না, নিকোলাস।'

'প্রথম লিওপোল্ডের তরফ থেকে পাঠানো হয়েছে লোকটাকে। সম্রাট গ্র্যান্ড ডিউকের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন, যেন যথাসম্ভব দ্রুত এবং গোপনীয়তার সাথে একে আপনার কাছে হাজির করি।'

হাতের কলমটা নামিয়ে রাখলেন ফাদার। 'ব্যাপারটা মনে বেশ আকর্ষণ জাগাচ্ছে।'

তারা দু'জনেই জানেন, বিজ্ঞান আর প্রকৃতির ব্যাপারে বর্তমান সম্রাটের বেশ আগ্রহ আছে। বসন্ত-রোগে মারা যাওয়া বড় ভাইয়ের কাছ থেকে পাওয়া সিংহাসন গ্রহণের আগে নিয়মিত চার্চে আসতেন তিনি।

বার্তাবাহকের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লেন কার্কার। 'যথেষ্ট আনুষ্ঠানিকতা হয়েছে। উঠে দাঁড়াও এখন। দেখাও কী সেই জিনিস, যার জন্য এত গোপনীয়তা।'

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দূত মাথা উঁচু করতেই দেখা গেল, তার বয়স কোনওমতেই বিশের বেশি হবে না। কোমরে বাঁধা খাপ থেকে সম্রাটের মোহরাঙ্কিত একটা খাম বের করে আনল সে। তারপর এগিয়ে গিয়ে সিল করা কাগজের টুকরোটা ডেস্কের উপর রেখেই পিছিয়ে এল দ্রুতবেগে।

দ্বিধাজড়িত চোখে নিকোলাসের দিকে তাকালেন জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা। জবাবে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে শ্রাগ করল সে।

একটা ছুরি নিয়ে খামটার সিলভঙ্গ করলেন ফাদার। সাথে সাথে ভেতর থেকে ছোট একটা কিছু গড়িয়ে পড়ল ডেস্কে। চোখ কুঁচকে তাকাতেই দেখা গেল, জিনিসটা একটা প্রাগৈতিহাসিক হাড়। জায়গায় জায়গায় পাথরের আবরণ লেগে আছে।

খামে অবশ্য আরেকটা জিনিস আছে। ইতস্তত করে ভাঁজ করা পার্চমেন্টটা মেলে ধরলেন কার্কার। দূর থেকেও নিকোলাস স্পষ্ট বুঝতে পারল, ওটা আসলে পূর্ব ইউরোপের মানচিত্র।

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না,' ফাদার কার্কারের কণ্ঠে অসহিষ্ণুতার ছাপ। 'এই হাড় আর মানচিত্রের ব্যাখ্যা কী?'

এতোক্ষণে মুখ খুলল বার্তাবাহক, কণ্ঠে সামান্য ইতালীয় টান। 'চিঠিটার ব্যাখ্যা করার জন্যই সম্রাট আমাকে নির্বাচিত করেছেন, রেভারেন্ড ফাদার। কথাগুলো আপনি ছাড়া আর কারও সামনে উচ্চারণ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে।'

'বলো।'

'অতীত সম্পর্কে আপনার আগ্রহের কথা সম্রাট জানেন। মানচিত্রে চিহ্নিত জায়গাটায় পাওয়া জিনিসগুলোর ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করেছেন তিনি।'

'কী পাওয়া গেছে ওখানে?' এবারের প্রশ্নটা নিকোলাস মুখ থেকে বেরোল। 'এরকম আরও হাড়?'

'হাড় ছাড়াও আরও অনেক কিছু।'

'কিন্তু হাড়গুলো কীসের?' জানতে চাইলেন ফাদার। 'কার কবর থেকে এসেছে ওগুলো?'

কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে উত্তরটা দিল বার্তাবাহক। জবাবে স্তম্ভিত ফাদার কার্কার আর নিকোলাস কিছু বলার আগেই কোমর থেকে খুলে নিল ছুরি, একটানে এক কান থেকে অপর কান পর্যন্ত চিরে ফেলল নিজের গলা।

মেঝে স্পর্শ করল বাতাসের অভাবে খাবি খেতে থাকা লোকটার হাঁটু, এক মুহূর্ত পর লুটিয়ে পড়ল পুরোপুরি। গা রি-রি করা ঘড়-ঘড় আওয়াজ বেরিয়ে আসছে চেরা গলা দিয়ে। রক্তের একটা ছোটখাট পুকুর তৈরি হয়েছে মুহূর্তের ব্যবধানে।

চোখের সামনে পুরো ব্যাপারটা যেন স্লো মোশনে ঘটতে দেখেছে নিকোলাস। আঁতকে উঠে সামনে বাড়ল সে। কোলে তুলে নিল মুমূর্ষ লোকটার মাথা। এই মাত্র নিষ্ঠুর একটা আদেশের প্রতিপালন করেছে বার্তাবাহক। গোপন কথাটা যেন তার মাধ্যমে কখনও ছড়িয়ে না পড়ে, তাই শেষ করে দিয়েছে নিজেকে।

ততক্ষণে ডেস্ক ছেড়ে উঠে এসেছেন ফাদার কার্কারও। হাঁটু গেড়ে বসে লোকটার শীতল হয়ে আসা এক হাত তুলে নিলেন নিজের হাতে। তবে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা প্রশ্নটা নিকোলাসের উদ্দেশ্যে করা। 'এ কীভাবে সম্ভব?'

জবাব না দিয়ে ঢোক গিলল নিকোলাস। উত্তরটা জানা নেই তার। মাথার ভেতর ঝড় তুলেছে আত্মহত্যা করার আগে দূতের বলা বাক্যটা।

হাড়গুলো...মানবজাতির আদি পিতা অ্যাডাম আর আদি মাতা ইভের।

প্রথম অংশ

Σ

রক্ত ও ছায়া

অধ্যায় এক
২৯ এপ্রিল, সকাল ১০:৩২
কার্লোভাক কাউন্টি, ক্রোয়েশিয়া

এখানে আসা মোটেও উচিত হয়নি আমাদের।

এবড়োখেবড়ো ট্রেইল ধরে এগোতে এগোতে থমকে দাঁড়াল রোল্যান্ড নোভাক, ঘামে ভিজে উঠেছে পুরো মুখ। সকালের রোদ থেকে চোখ দুটোকে সুরক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে এক হাত কপালের উপর তুলে ধরল তারপর। দূর দিগন্তে কালো মেঘের ভিড় দেখা যাচ্ছে।

ছেলেবেলায় শোনা ক্রোয়েশিয়ান উপকথা অনুসারে- এই ক্লেক পাহাড়ের চুড়ায় ঝড়ের রাতে ডাইনি আর পরীরা সমবেত হয়। পাশ্ববর্তী অগুলিন শহর থেকেও নাকি শোনা যায় তাদের সম্মিলিত চিৎকার।

এরকম আরও ভয়াল কুসংস্কার জায়গাটাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দুর্গম বানিয়ে রেখেছে। তবে বিগত কয়েক দশকের পরিস্থিতি বেশ উন্নত। দলে দলে রোমাঞ্চপ্রেমী পর্বতারোহীদের পায়ের তলায় পিষ্ট হচ্ছে ক্লেক পাহাড়ের ঘাস-পাথর। কিন্তু তাদের সাথে রোল্যান্ড এবং তার দলের বাকিদের উদ্দেশ্যের ঢের তফাৎ।

'পৌঁছে গেছি প্রায়,' আশ্বস্ত করলেন অ্যালেক্স রাইটসন। 'আশা করি ঝড় আসার আগেই কাজ সেরে ফিরতে পারব।'

চারজনের দলটাকে তিনিই নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি হলেও ব্রিটিশ ভূ-তাত্ত্বিকের শরীরের বাঁধন এখনও বেশ মজবুত। এই ঠান্ডা আবহাওয়াতেও পরনে খাকি শর্টস। মাইনিং হেলমেটের নিচ থেকে উঁকি দিচ্ছে ফিনফিনে তুষারশুভ্র চুলের সারি।

'এই নিয়ে কথাটা তিনবার বলা হলো,' রোল্যান্ডের কানের কাছে মুখ এনে বিড়বিড় করে বলল লিনা ক্রেন্ডাল। বিগত কয়েক ঘন্টার চড়াই-উৎরায়ে দুই গালে লালচে আভা ধরলেও মেয়েটাকে দেখতে খুব একটা ক্লান্ত মনে হচ্ছে না। বিশের কোঠায় থাকা বয়সই হয়ত এই চাঞ্চল্যের কারণ। আর পায়ের আঁটসাঁট বুটজোড়া বলে দিচ্ছে, এরকম পাহাড়ে হামেশাই চড়তে হয় তাকে।

মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকাল লিনা। 'ভাগ্য ভাল, ঝড়ের আগেই পৌছাতে পেরেছি। একবার শুরু হলে এই ঝড়বৃষ্টি এলাকাটাকে কত কাল যাবৎ পানির নিচে দাবিয়ে রাখবে কে জানে।'

আবারও শুরু হলো পথচলা, এবার আরও দ্রুতবেগে। তাপনিরোধী জ্যাকেটের চেইন খুলে কাঁধের ব্যাগপ্যাকের ফিতাটা টেনে ঠিকঠাক করে নিল লিনা। জিনিসটার গায়ে এমোরি ইউনিভার্সিটির লোগো ছাপা। মেয়েটার সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা নেই রোল্যান্ডের। যেটুকু জানে তার সারমর্ম হচ্ছে- জার্মানির লিপজিগে অবস্থিত, ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট অফ এভল্যুশনারি অ্যানথ্রপোলজি-তে প্রজননবিদ হিসেবে রিসার্চ করছে ও। আর তারই মতো এখানে আসার কারণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞান।

চলার ফাঁকে ফাঁকে দলের অন্য সদস্য- ফ্রেঞ্চ জীবাশ্মবিদ ড. ডেইন আরনড- ফিসফিসিয়ে কথা বলছেন রাইটসনের সাথে। এমনিতেই আস্তে, তারপর আবার লোকটার কথার ফ্রেঞ্চ টানের জন্য আরও বোঝা যাচ্ছে না কিছু। তবে দুই বিজ্ঞানীর অঙ্গভঙ্গি দেখে রোল্যান্ড আন্দাজ করল, সম্ভবত তাদের গন্তব্যের ব্যাপারেই কথা উঠেছে।

জোর করে নিজেকে চুপ রাখার চেষ্টা করছে রোল্যান্ড। ক্রোয়েশিয়ার রাজধানী জাগরেবে বড় হয়েছে সে। তাই বলে গুজব তার কানে না পৌছে থামেনি। কথিত আছে, গোটা পাহাড়টাই আসলে ক্লেক নামের এক দানবের শরীর। দেবতা ভোলোস-এর সাথে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার শাস্তিস্বরূপ পাথর বানিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে। কিন্তু দানব মৃত্যুর আগে ঘোষণা করে গেছে, প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে ফের জেগে উঠবে।

কথাটা মনে হতেই ফের শিউরে উঠল রোল্যান্ডের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন। এই এলাকাটা অত্যন্ত ভূমিকম্প ঝুঁকিপ্রবণ। হয়ত এই কারণেই তৈরি হয়েছে গর্জে ওঠা দানবের উপকথা। গত মাসেও রিখটার স্কেলের হিসেবে, পাঁচ দশমিক দুই মাত্রার এক ভূমিকম্প কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে গোটা অঞ্চল।

রোল্যান্ড ধারণা করছে, তাদের গন্তব্যের সাথে ওই কম্পনের কোনও যোগসূত্র আছে। তার ধারণাটাকে আরও মজবুত করল এবড়োখেবড়ো ট্রেইলের মাথায় লন্ডভন্ড কতগুলো পাইন গাছের সারি। সম্ভবত, পাথরের বিশাল কোনও টুকরো ধ্বসে পড়ে গাছগুলোর এমন অবস্থা।

ছিটিয়ে থাকা পাথরের বোল্ডার আর ভাঙা গাছের কান্ডের টুকরোর মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে মুখ খুললেন রাইটসন। 'গত মাসের ভূমিকম্পের পর, এক পাখি বিশারদ এখানে ধোঁয়া উঠতে দেখার রিপোর্ট করে। সম্ভবত ভূগর্ভস্থ কোনও গুহা থেকে আসছিল ওই ধোঁয়া।'

'আর আপনার মতে, ভূমিকম্পের ফলেই উন্মুক্ত হয়েছে ওই গুহামুখ?' জিজ্ঞেস করল লিনা।

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন বুড়ো ভূতাত্ত্বিক। 'এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। গোটা এলাকাটাই এক ধরনের চুনাপাথরে গঠিত। শত শত বছর ধরে ঝড়-বৃষ্টি জায়গাটাকে পনিরের মতো ঝুড়ঝুড়ে বানিয়ে রেখেছে। মাটির নিচে ভূগর্ভস্থ নদী, খাদ, গুহা ইত্যাদির কোনও কমতি নেই এখানে।'

'তবে মনে হচ্ছে...,' আর চুপ থাকতে পারল না রোল্যান্ড, 'আপনারা যা পেয়েছেন, ওটা সাধারণ কোনও প্রাচীন গুহার চাইতে বেশি কিছু।'

মুচকি হাসলেন রাইটসন। 'আগেই বলে দিয়ে চমকটা নষ্ট করার মানে হয় না। কী বলেন, ড. আরনড?'

জবাবে নাক দিয়ে ঘোঁত জাতীয় আওয়াজ করলেন ফ্রেঞ্চ জীবাশ্মবিদ। লোকটা স্বভাবে রাইটসনের পুরোপুরি উল্টো, চুপচাপ নিরামিষ প্রজাতির। বয়সে বত্রিশ বছরের রোল্যান্ডের চাইতে খুব একটা বড় না হলেও, গোমড়া মুখের অভিব্যক্তি আরও বয়স্ক করে তুলেছে তাকে। রোল্যান্ড খুব ভাল করেই জানে, কোনও কোনও বিজ্ঞানী নিজেদের আবিষ্কার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে রাখতে পছন্দ করেন। হয়ত তার আর লিনার আগমনই তার এই বিক্ষিপ্ততার কারণ।

'এই তো, পৌঁছে গেছি!' একটা গর্তের সামনে এসে হাঁক ছাড়লেন রাইটসন। গর্তটার ভেতর থেকে মইয়ের মাথা উঁকি দিয়ে আছে।

সূর্যের বিপরীতে থাকায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত আরেকজনকে এতক্ষণ দেখতে পায়নি রোল্যান্ড। লোকটার পরনে সাধারণ পোষাক হলেও, কাঁধে ঝোলানো রাইফেল আর চালচলনে বোঝা যাচ্ছে- মিলিটারি ব্যাকগ্রাউন্ড না থেকেই পারে না তার। এমনকি মাথার চুলগুলোও নিখুঁত করে চাঁছা।

আরনডের সাথে ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলতে শুরু করল রাইফেলধারী।

ভাষাটা না বুঝলেও রোল্যান্ড কথকদের অঙ্গভঙ্গি দেখে আন্দাজ করল, তাদের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। কথার ফাঁকে একবার আকাশের দিকে ইঙ্গিত করল টেকো লোকটা, খারাপ আবহাওয়ার ব্যাপারে কিছু একটা বলছে।

এক মুহূর্ত পর আলাপ থামিয়ে, একপাশে রাখা জেনারেটরের দিকে এগোল অস্ত্রধারী। তার টেনে চালু করে দিল যন্ত্রটা।

'ইনি কমান্ড্যান্ট হেনরি জেরার্ড,' পরিচয় করিয়ে দিলেন রাইটসন। 'ফ্রেঞ্চ পাহাড়ি এলিট ফোর্স শেসার্স আলপিনস-এর হয়ে কাজ করেন। তারাই জায়গাটাকে পাহাড়া দিয়ে রেখেছে।'

অনুসন্ধানি দৃষ্টিতে চারপাশে চোখ বুলাল রোল্যান্ড। কিন্তু আর কোনও সৈন্য নজরে পড়ল না।

‘পাখি বিশারদ গুহামুখটা আবিষ্কারের পর...,’ বলে চলেছেন বুড়ো ভূ-তাত্ত্বিক। ‘...একটা অভিযাত্রী ক্লাবের সাথে যোগাযোগ করে। ভাগ্য ভাল, ক্লাবের লোকগুলো জায়গাটার মাহাত্ম্য বুঝতে পেরে সাথে সাথে খবর দেয় চাউভেট আর লাসকক্স-এর মতো ঐতিহাসিক গুহা দেখভালকারী এই এলিট দলটাকে।

রোল্যান্ড বুঝতে পেরেছে, ওই জায়গা দুটোর নাম উল্লেখ করে এই আবিষ্কারের গুরুত্বের দিকে জোর দিলেন ভদ্রলোক। প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রের জন্য বিখ্যাত গুহা দুটো। প্রশ্ন হচ্ছে, এখানেও কি এমন কিছু লুকানো আছে?

লিনাও ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। ‘নিচে গুহাচিত্র খুঁজে পেয়েছেন নাকি আপনারা?’

জবাব একপাশের ভ্রু কুঁচকালেন রাইটসন। ‘তার চাইতেও বিশেষ কিছু।’ বলার ফাঁকে রোল্যান্ডের দিকে স্থির হলো তার দৃষ্টি। ‘ওই বিশেষ ব্যাপারটার জন্যই ভ্যাটিকানের সাথে যোগাযোগ করি আমরা। ফলশ্রুতিতে জাগরেব-এর ক্রোয়েশিয়ান ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি থেকে পাঠানো হয়েছে ফাদার নোভাক-কে।’

নিজের নাম শুনে এগিয়ে গিয়ে গুহামুখে উঁকি দিল রোল্যান্ড। এবং সেই সাথে প্রথমবারের মতো তার উদ্দেশ্যে কথা বলে উঠলেন ড. আরনড। ‘চলুন, ফাদার নোভাক। নিচে নেমে দেখা যাক আমাদের অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার।’

সকাল ১১:১৫

রাইটসন আর আরনডের পেছন পেছন মই বেয়ে নামছে লিনা। মইটার সমান্তরালে একটা বৈদ্যুতিক তার ঝুলছে, উপরের জেনারেটর থেকে শক্তি নিয়ে আলোকিত করেছে ভূগর্ভস্থ জায়গাটাকে। বাকিদের মতো তার মাথাতেও ফ্ল্যাশলাইটওয়ালা মাইনিং হেলমেট। উত্তেজনার পাশাপাশি ক্লাস্ট্রোফোবিয়ায় ধুকপুক করছে বুক।

দিনের বেশিরভাগ সময় লিনাকে জেনেটিক ল্যাবেই কাটাতে হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কিংবা কম্পিউটার মনিটরে চোখ সাঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হয় প্রাচীন কোড। তবে সুযোগ পেলেই লিপজিগের নদীর পার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা পার্কে ছুটে যায় ও, নিজের ভেতর অনুভব করে প্রকৃতির উচ্ছলতা। এখন এই বদ্ধ জায়গায় এসে পার্কটার কথা খুব মনে পড়ছে। সেই সাথে মনে পড়ছে তার জমজ বোন মারিয়ার কথাও। সে ও তার মতো একই পেশায় আছে। বর্তমানে তাদের যৌথ প্রজেক্টটা নিয়ে কাজ করছে মেয়েটা। হয়ত ভাঙছে প্রাগৈতিহাসিক হাড় কিংবা দাঁতে লুকিয়ে থাকা কোনও জেনেটিক কোড।

রাইটসনদের স্বীকার্য অনুযায়ী, এই গুহায় যদি আসলেই ওরকম কোনও জীবাশ্ম বা আর্টিফ্যাক্ট থাকে তাহলে এখানে নিজের ভূমিকা আন্দাজ করতে পারছে লিনা।

তার কাজ হবে, জিনিসগুলোর নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। তার প্রতিষ্ঠান- ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট, এই ধরনের প্রাচীন জৈব বস্তু থেকে ডিএনএ আহরণ এবং চিহ্নিতকরণের কাজে বেশ প্রসিদ্ধ।

উপর থেকে মৃদু কাতরোক্তি ভেসে এল। পা ফসকে গিয়েছিল ফাদার নোভাকের। অবশ্য সামলে নিয়েছেন সাথে সাথে। লিনা বুঝতে পারছে না, এরকম ঐতিহাসিক একটা আবিষ্কারের সাথে এই তরুণ যাজকের সম্পর্ক কোথায়। জাগরেব থেকে এখানে আসার পথে আলাপচারিতায় জানা গেছে, লোকটা ক্রোয়েশিয়ান ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটিতে মধ্যযুগীয় ইতিহাস বিষয়ে ক্লাস নেয়।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে মইয়ের শেষ ধাপে পৌঁছে গেল লিনা। রাইটসন তাকে মেঝেতে নামতে সাহায্য করলেন। ততক্ষণে সামনের টানেল ধরে চলতে শুরু করেছেন ড. আরনড। এক মুহূর্ত পর রোল্যান্ড নেমে আসতেই শুরু হলো পথ চলা।

ছাদটা বেশ নিচু। সোজা হয়ে হাঁটতে গেলে পদে পদে মাথার হেলমেটে ঠোক্কর খেতে হবে। বাইরের চাইতে শীতল পরিবেশ এখানে, তবে বেশ আর্দ্র। পথটাকে দু'পাশ থেকে চেপে রেখেছে স্যাঁতসেঁতে চুনাপাথরের দেয়াল।

কিছুদুর এগোনোর পর অবশেষে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ফুরসত মিলল। কিন্তু টানেলের শেষ মাথায় এসে বিস্ময়ে জমে গেল লিনা।

স্ট্যালাকটাইট আর স্ট্যালাগমাইটের দঙ্গলে পূর্ণ একটা গুহা মুখ-ব্যাদান করে আছে সামনে। জায়গায় জায়গায় জমেছে অর্ধ-স্বচ্ছ খনিজ। সিলিং থেকে নেমে আসা মোচাকৃতি দন্ডগুলো যেন কোনও প্রাগৈতিহাসিক প্রানির শিং।

'উপর থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়া পানির কারণে তৈরি এসব স্তম্ভ,' বলে উঠলেন রাইটসন। 'কয়েক শতাব্দিতে এক-আধ সেন্টিমিটার হারে বাড়ে।'

'অসাধারণ!' বিড়িবিড় করে বলল লিনা, কণ্ঠে নিখাদ মুগ্ধতা।

'সাবধানে আসুন,' সতর্ক করলেন আরনড। 'হাঁটার জন্য রাখা স্টিলের ফ্রেমটা ছাড়া অন্য কোথাও পা দেবেন না। পায়ের নিচে যা আছে, তা মাথার উপরের জিনিসগুলোর চাইতেও হাজার গুণ বেশি মূল্যবান।'

টানেলের শেষের গুহামুখ থেকে, সামনের দিকের মেঝেতে একটা লম্বা স্টিলের ফ্রেম পোঁতা আছে। জিনিসটাতে মইয়ের মতো ধাপে ধাপে ধাতব পাত আটকানো। আগে আগে পথ দেখিয়ে এগোতে লাগলেন আরনড। উপর থেকে বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে আসা মৃদু আলোয় দেখা গেল, মেঝের স্ফটিক ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে বিভিন্ন প্রানির দেহাবশেষ।

'প্রাগৈতিহাসিক জীবনের একটা পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি সংরক্ষিত আছে এখানে,' ড. আরনদের কণ্ঠে উচ্ছ্বাসের ছাপ। পরমুহূর্তেই একটা হাড়ের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'এই যে, এটা কোয়লোডন্টা অ্যান্টিকুইটাটিস-এর অবিকৃত পেছনের পা।'

'সহজ ভাষায় বলা যায়- পশমাবৃত গন্ডার,' যোগ করল লিনা।

সমীহের দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকালেন ফ্রেঞ্চ জীবাশ্মবিদ। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।'

একটা ভাঙা স্ট্যালাগমাইট দন্ড থেকে বেরিয়ে আসা খুলির দিকে ইশারা করল লিনা। 'আমার ভুল না হলে এটা হচ্ছে আর্সাস স্পেলিয়াস।'

মাথা নাড়লেন ড. আরনড। 'সেই কুখ্যাত গুহাবাসী ভালুক।'

মুচকি হাসল লিনা। অবশেষে পছন্দের বিষয়ে ফিরতে পেরে খোলস ছাড়ছে মুখে কুলুপ আঁটা লোকটা।

'অবস্থান দেখে মনে হচ্ছে,' বলে চলেছেন জীবাশ্মবিদ, 'এটা এককালে টোটেম হিসেবে ব্যবহার করা হত। দেখুন, সামনের দিকের মেঝেতে কালির ছোপ। আগুন জ্বালান হত ওখানে। আর সেই আলোতে দেয়ালে প্রতিফলিত হত খুলিটার ছায়া।'

মনে মনে দৃশ্যটা কল্পনা করল লিনা।

বলগা হরিণ, বাইসন, ম্যামথ, গোল্ডেন ঈগলসহ সামনে এগোনোর ফাঁকে ফাঁকে একে একে বেশ কিছু হাড়গোড় শনাক্ত করল দু'জন। অবশেষে গুহা পেরিয়ে তুলনামূলক ছোট একটা চেম্বারে এসে উপস্থিত হলো সবাই। তবে ছোট হলেও একটা দোতলা বাস অনায়াসে এঁটে যাবে ভেতরের ফাঁকে।

'এবার আসল খেলা শুরু,' ঘোষণা করলেন রাইটসন, দলের নেতৃত্ব এখন তার হাতে। কিন্তু লিনার আর কোনও পথপ্রদর্শকের দরকার নেই। মুগ্ধ দৃষ্টিতে গুহার দেয়ালে চোখ রেখে এগোচ্ছে ও। দেয়ার নিচের অর্ধেক অংশে বিশাল বিশাল সব গুহাচিত্র আঁকা। কিছু আঁকা হয়েছে কয়লা দিয়ে, কিছু একেবারে পাথরে খোদাই করা, কতগুলোতে আবার লেপে দেয়া হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক আমলের রঙ।

তবে এরকম গুহাচিত্র লিনার কাছে নতুন কিছু না। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, এই ছবিগুলো সাধারণ নয়। কাঠামোগুলো এমনভাবে আঁকা হয়েছে, মনে হচ্ছে গতিময় অবস্থায় আটকে আছে সব। সামনে পেছনে দোদুল্যমান ঘোড়ার কেশর। বাইসনের পা-গুলো থেকে আভা ছড়াচ্ছে, যেন দৌড়াচ্ছে প্রানিটা। লেজ উঁচু করে ছুটছে হরিণের দল, বাঁচতে চাইছে অনাহূত শিকারির কবল থেকে। একপাশে পেছনের দু'পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে কুখ্যাত গুহাবাসী ভালুক, নজর বুলাচ্ছে পুরো ঘটনাস্থলের দিকে।

'আশ্চর্য!' নিজের অজান্তেই বলে উঠল লিনা। 'মারিয়াও যদি দেখতে পেত এসব!'

'লাসকক্স-এর প্রসিদ্ধ গুহাচিত্রকেও লজ্জায় ফেলে দেবে এগুলো, তাই না?' বললেন রাইটসন। 'কিন্তু এখানেই শেষ নয়।'

'মানে?' জিজ্ঞেস করল ফাদার নোভাক।

চেম্বারের কেন্দ্রের দিকে ইশারা করলেন বুড়ো ভূতাত্ত্বিক। দুই মিটার প্রশস্ত একটা পোড়া দাগ, এককালে এখানে জ্বালানো অগ্নিকুণ্ডের সাক্ষী দিচ্ছে। তবে বর্তমানে অগ্নিকুণ্ডের জায়গা দখল করেছে তেকোনা একটা লাইটিং প্যানেল।

জিনিসটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন তিনি। 'দয়া করে আপনাদের হেলমেটের আলোগুলো নিভিয়ে দিন।'

তাই করল সবাই। সাথে সাথে নিশ্ছিদ্র আঁধার গিলে নিল সবকিছু।

'এবার...' সার্কাসের রিংমাস্টারের মতো সুর করে চেঁচিয়ে উঠলেন বুড়ো রাইটসন। 'ঘুরে আসা যাক চল্লিশ হাজার বছর আগেকার পৃথিবী থেকে।' তারপর টিপে দিলেন একটা সুইচ।

তেকোনা লাইটিং প্যানেল থেকে মৃদু আলো বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। প্রাচীন অগ্নিকুণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করছে জিনিসটা, ভাবল লিনা। পরমুহূর্তেই ফাদার নোভাকের গলা দিয়ে বেরিয়ে আসা বিস্ময়সূচক আওয়াজ শুনে তাকাল লোকটার দৃষ্টি যেদিকে নিবদ্ধ আছে সেদিকে।

মেঝে ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা কতগুলো অর্ধস্বচ্ছ স্ট্যালাগমাইটে প্রতিফলিত হয়ে আলো আছড়ে পড়ছে ছবি আঁকা দেয়ালে। সেই অপার্থিব আলোয় মঞ্চস্থ হচ্ছে এক প্রাগৈতিহাসিক নাটক। জীবন ফিরে পেয়েছে দেয়ালে আঁকা ছবিগুলো। অতিপ্রাকৃত আভা ফুটিয়ে তুলেছে এক অদ্ভুত ছায়াঘেরা সেনাদলকে।

অবয়বগুলোর আকৃতি অনেকটা মানুষের মতোই, তবে কারও কারও মাথায় শিঙের অস্তিত্ব রয়েছে। বাতাসে বর্শা বাগিয়ে রেখেছে কালো কালো হাত। আক্ষরিক অর্থেই এখন দৌড়াচ্ছে বাইসনের দল। আগে-পিছে পালাক্রমে দুলছে ছুটতে থাকা ঘোড়ার কেশর। একটা ধারালো বর্শা বিদীর্ণ করেছে রাগী ভঙ্গিতে দাঁড়ানো ভালুকটার দেহ। কুখ্যাত প্রানিটার দৃষ্টিতে খেলা করছে নিখাদ মৃত্যুভয়। ছবিগুলো ওভাবে আঁকার মাহাত্ম্য এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে লিনা।

'যথেষ্ট হয়েছে,' ড. আরনডের কথায় সুইচ টিপে লাইটিং প্যানেল বন্ধ করে দিলেন রাইটসন। আবারও স্বাভাবিক আলো ফিরে এল গুহায়।

বড় করে নিঃশ্বাস নিল লিনা। 'অ...অসাধারণ!' বিস্ময় গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোতে চাইছে না। 'কিন্তু এসবের মানে কী? কোনও প্রাচীন গোত্রের শিকারের দৃশ্য এটা?'

উত্তর দিল না কেউ। তবে কয়েক মুহূর্ত পর মুখ খুলল ফাদার রোল্যান্ড নোভাক। 'মনে হচ্ছে, এটা এক ধরনের সতর্কবার্তা।'

সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল লিনা। বর্শাধারী লোকগুলোর কাজকর্ম আদতেও শিকার বলে মনে হচ্ছিল না তার কাছে। ঘটনাটা আরও নৃশংস কিছুর দিকে ইঙ্গিত করছে, খুব মারাত্মক কিছু।

'এটা আপনার চিন্তার বিষয় না, ফাদার নোভাক,' মুখ খুললেন ড. আরনড। 'অন্য একটা কাজের জন্য আপনাকে এখানে আনা হয়েছে।' বলে চেম্বারের শেষ মাথার দিকে এগোলেন তিনি। আরেকটা টানেল রয়েছে ওদিকে।

সামনের দিকে আর আলোর ব্যবস্থা নেই। এখন থেকে হেলমেট ল্যাম্পই ভরসা। লিনা তার ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালতেই দেখতে পেল, একটা ভাঙা দেয়াল পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে সরু টানেল। পথ দেখিয়ে আগে বাড়লেন ফ্রেঞ্চ জীবাশ্মবিদ।

'পথটা তো ইটের তৈরি,' বলে উঠল রোল্যান্ড।

'এটা আর যাই হোক, গুহাবাসী লোকেদের কাজ হতে পারে না,' লিনাও ধরতে পেরেছে ব্যাপারটা। 'তবে যথেষ্ট পুরনো বলতে হবে।'

বাকিদের ছাড়িয়ে সামনে এগোলেন রাইটসন। টানেলের শেষ প্রান্তে, দেয়ালের নিচের দিকে বেশ ছোট একটা ছিদ্র, তবে একজন মানুষ অনায়াসে ঢুকতে পারবে। 'এটার উল্টোদিকে টানেলটা আরও পঞ্চাশ গজ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে একটা গোলকধাঁধায় গিয়ে মিশেছে। আমার মতে, ওটাই এই গুহার আসল প্রবেশপথ। অনেক আগে কেউ ঢালাই করে বন্ধ করে দিয়েছিল রাস্তাটা। আর তারপর বাকি কাজটুকু ভূমিকম্প সেরে ফেলে।'

ঝুঁকে পড়ে ছিদ্রটার দিকে তাকাল লিনা। 'এক ভূমিকম্প বন্ধ করেছিল, আরেকটা এসে খুলে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ,' সায় দিলেন রাইটসন। 'আদ্যিকাল থেকেই লুকানো জিনিসের মাটি ফুঁড়ে বেরোনোর একটা প্রবণতা আছে।'

কৌতুকে কান দিল না রোল্যান্ড। 'দেয়ালের ওপাশে কী আছে?'

'সেই রহস্য, যার কারণে আপনারা দু'জন আজ এখানে।' উত্তরটা আমুদে ভূ-তাত্ত্বিকের মুখ থেকে এল।

সবার আগে গর্তে ঢুকল লিনা। হেলমেটের আলোয় দুই ফুট প্রশস্ত ফোকরটা সহজেই পার হয়ে গেল সে। উল্টোদিকে একটা সরু চেম্বার দেখা যাচ্ছে। চারদিকে দেয়ালঘেরা একটা চ্যাপেলে গিয়ে শেষ হয়েছে রহস্যময় চেম্বারটা।

পেছন পেছন পৌঁছে গেছে ফাদার নোভাকও। 'স্থাপনাটা চিনতে পেরেছি। মধ্যযুগীয় গঠনশৈলীর ছাপ দেখা যাচ্ছে।'

তবে যাজকের কথায় মন নেই লিনার। চ্যাপেলের একপাশের দেয়ালে আটকে গেছে তার দৃষ্টি। পাথর খোদাই করে নির্মিত কুলুঙ্গিতে একটা কঙ্কাল শুয়ে আছে।

হাড় জিরজিরে হাত দুটো আড়াআড়ি ভাবে বুকের উপর রাখা। মেরুদন্ডের চারপাশে পাঁজর, গলার হাড়, কোমড়ের হাড় সারি করে সাজানো।

'গুহামুখটা বন্ধ করে দেয়া কারও কঙ্কাল হতে পারে না এটা?' জিজ্ঞেস করল রোল্যান্ড।

প্রশ্নটার জবাব দিল না লিনা। 'বুকের হাড়ের গড়ন দেখে বোঝা যাচ্ছে, এটা কোনও পুরুষের,' বলতে বলতে কুলুঙ্গিটার আরেকটু কাছে ঘেঁষল মেয়েটা। 'খুলিটা দেখুন। ভ্রুজোড়া বেশ পুরু। আমার ধারণা ভুল না হলে, এই প্রজাতির নাম হোমো নিয়ানডারথালেনসিস।'

'নিয়ানডারথাল?'

মাথা নেড়ে সায় দিল লিনা।

ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাল ফাদার রোল্যান্ড নোভাক। 'ক্রোয়েশিয়ায় আগেও নিয়ানডারথাল দেহাবশেষ খুঁজে পাওয়ার খবর শোনা গিয়েছে।'

'হ্যাঁ,' সম্মতি জানাল মেয়েটা। 'ভিন্দিজা গুহায়।'

তাকে এখানে ডেকে আনার কারণ এবার লিনার কাছে পরিষ্কার। ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউটই ভিন্দিজা গুহায় পাওয়া দেহাবশেষগুলোর ডিএনএ পরীক্ষা করেছিল। ইতিহাসের প্রথম নিয়ানডারথাল জিন-বিন্যাস তখনই তৈরি করা হয়।

'তবে আমি তো জানতাম, নিয়ানডারথাল প্রজাতির লোকেদের গুহাচিত্রের প্রতি আগ্রহ ছিল না,' প্রধান গুহার দিকে ইশারা করল নোভাক।

'ব্যাপারটা নিয়ে বিতর্ক আছে,' জবাব দিল তরুণী প্রজননবিদ। 'স্পেনের এল ক্যাস্টিলো গুহায় পাওয়া হাতের ছাপ, গুহাচিত্রগুলোর বিশ্লেষণ করে মুটামুটি আন্দাজ করা গেছে- ওগুলো নিয়ানডারথালদের সৃষ্টি।'

'এজন্যই আপনার সাহায্য চেয়েছি আমরা, ড. ক্রেন্ডাল,' পেছন থেকে বললেন ড. আরনড। 'আমরা নিশ্চিত হতে চাই, এখানকার গুহাবাসীরা প্রকৃত অর্থেই নিয়ানডারথাল কি না। যদি তাই হয়ে থাকে... তবে কি সেই কারণ, যার ফলে নিজেদের বৈশিষ্ট থেকে সরে গিয়ে গুহাচিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠেছিল লোকগুলো।'

চ্যাপেলের পেছনে আলো ফেলল লিনা। হাতের ছাপের সাহায্যে, তারার আকৃতির একটা বিশাল চিত্র আঁকা আছে ওখানে। ছাপগুলো ফ্ল্যাশলাইটের আলোতে গাঢ় বাদামী দেখাচ্ছে, সম্ভবত শুকনো রক্ত।

সেলফোন বের করে জায়গাটার কিছু ছবি তুলে নিল সে। তারপর আবার নজর ফেরাল দেয়ালটার দিকে। আগে দেখা ছবিগুলোর ব্যাপারে ফাদার নোভাকের মন্তব্যটা মনে পড়ল তার।
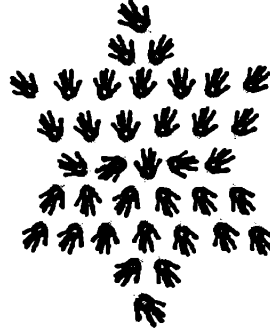
মনে হচ্ছে, এটা এক ধরনের সতর্কবার্তা।

'পরবর্তী রহস্য আমাদের তরুণ যাজক ফাদার নোভাকের জন্য,' ঘোষণা করলেন রাইটসন।

সকাল ১১:৫২

নিজের নাম শুনে নড়েচড়ে দাঁড়াল রোল্যান্ড। আবার কীসের রহস্য? মধ্যযুগীয় চ্যাপেলে একটা নিয়ানডারথাল কঙ্কালই কি বেশ বড় চমক নয়?

'শেষ একটা কথা,' বলে ভাঙা দেয়ালের আরেকটা ফুটোর দিকে ইঙ্গিত করলেন বুড়ো ভূ-তাত্ত্বিক। তার মতে, রাস্তাটা গুহার পুরনো প্রবেশপথের সাথে মিলেছে।

ফোকর পেরিয়ে উল্টোদিকের টানেলে এসে দাঁড়াল রোল্যান্ড। বিশেষ কিছু নেই এখানে। তবে ভারি একটা কিছু টেনে নেয়ার দাগ মেঝে হয়ে মিলিয়ে গেছে ক্যালসাইটের স্তরে।

এগিয়ে এলেন রাইটসন। 'মনে হয়, এদিক দিয়ে কিছু একটা টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারপরই ঢালাই করে বন্ধ করে দেয়া হয় পুরনো গুহামুখ।'

'আপনারা চান, আমি এই রহস্যের সমাধান করি?' জিজ্ঞেস করল তরুণ যাজক।

'জানি না, পারবেন কি না। তবে এখানে আরেকটা জিনিস আছে, যা আপনার মনে আগ্রহ জাগাতে পারে।'

আবারও দেয়ালটার সামনে ফিরে এল দুজন। কবরের ফলক আকারের একটা ধাতব প্লেট আটকানো আছে ওখানে। জিনিসটার দিকে ইশারা করলেন রাইটসন। 'দেখুন, পড়তে পারেন কি না।'

এগিয়ে গেল রোল্যান্ড। কালের আঁচড়ে কিছু লেখা মুছে গেলেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এগুলো ল্যাটিন ভাষা। একেবারে শেষে লেখকের নামটাও পড়তে পারল সে। 'রেভারেন্ড ফাদার অ্যাথেনাসিয়াস কার্কার।'

রাইটসনের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল তরুণ যাজক। 'আমি...আমি চিনি তাকে। এই মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তত্ত্বালোচনা করেছি আমি।'

নড করলেন বুড়ো ভূতাত্ত্বিক। ‘এজন্যই ভ্যাটিকান থেকে আপনাকে পাঠানো হয়েছে। আর লেখাটার বাকি অংশ?’

মাথা নাড়ল রোল্যান্ড। ‘ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না। তবে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি পেলে জিনিসটাকে পরিষ্কার করতে পারব আমি। আপাতত এই কয়েকটা শব্দই শুধু পড়তে পারছিঃ ঈশ্বরের অভিশাপ নেমে আসবে এই পথে অনধিকার প্রবেশকারীদের উপর।’

আরেকটা সাবধান বাণী...

‘ওহ হো... সতর্কবার্তাটা পেতে খুব দেরি হয়ে গেল,’ বিড়বিড় করলেন রাইটসন।

উপর থেকে বজ্রপাতের আওয়াজ ভেসে এল। অবশেষে ঝড় হামলে পড়েছে পাহাড়ে।

‘যাবার সময় হয়ে গেছে, বন্ধুরা!’ বলে আগে বাড়লেন বুড়ো ভু-তাত্ত্বিক। প্রধান চেম্বারে পৌঁছে ইঙ্গিত করলেন সামনের দিকে। মুখে কিছু একটা বলতে শুরু করেছিলেন, তবে বজ্রপাতের আওয়াজ তার মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিল। এবার আরও জোরে...

বিকট শব্দের সাথে সাথে নিভে গেল গুহার আলো। এখন জ্বলছে শুধু হেলমেটের ফ্ল্যাশলাইটগুলো। হতভম্ব ভাব ঝেড়ে ফেলে সামনে এগোনোর প্রয়াস পেতেই, উপর থেকে আসা একটা চিৎকার জায়গায় জমিয়ে দিল সবাইকে।

তবে ক্রোয়েশিয়ান উপকথার সেই ডাইনীদের কান্না নয় এটা, জলজ্যান্ত মানুষের।

পরমুহূর্তেই শোনা গেল গুলিবর্ষণের আওয়াজ।

রোল্যান্ডের হাত আঁকড়ে ধরলেন ড. আরনড। ‘হামলা করা হয়েছে আমাদের উপর!’

অধ্যায় দুই
২৯ এপ্রিল, সকাল ৬:০৮
লরেন্সভিল, জর্জিয়া

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেছে তার, ভয় পেয়েছে ভীষণ।

ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়। চোখের সামনে খেলা করছে একটা মুখ...

মা!

জানালার সামনে এসে দাঁড়াল তড়িঘড়ি করে, আলতো হাতে চাপড় মারতে লাগল স্বচ্ছ কাঁচে। অনেক কষ্টে দমিয়ে রাখতে হচ্ছে হতাশায় চেঁচিয়ে ওঠার ইচ্ছাটাকে।

অবশেষে মাথার উপর আলো জ্বলে উঠল। জানালার সামনে এগিয়ে এল একটা মুখ। তবে তার সেই কাঙ্ক্ষিত চেহারা নয় এটা।

বুড়ো আঙুল দিয়ে থুতনিতে স্পর্শ করতে লাগল সে, একবার...বারবার...

একটাই অর্থ এই ইশারারঃ মা... মা... মা...

সকাল ৬:২২

হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে কোনওমতে নিজেকে সামলে নিল মারিয়া ক্রেন্ডাল। কোথায় আছে, মনে করতে এক মুহূর্ত সময় লাগল তার। বুঝতে পারল, বিগত আরও অনেক রাতের মতো কাজের ফাঁকে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। ডেস্কে রাখা কম্পিউটার মনিটরে একের পর এক ভাসছে জেনেটিক তথ্য-উপাত্ত।

ধুশশালা...এখনও কাজ চলছে।

সামলে উঠে ঘুম ভাঙার কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মারিয়া। এক মুহূর্ত পরই বুঝে গেল, দরজায় নক করছে কেউ।

'কে?' শুকনো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে।

'ড. ক্রেন্ডাল,' বাইরে থেকে আওয়াজ এল। 'বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। কিন্তু আপনাকে না ডেকেও কোনও উপায় ছিল না। বাকো বেশ ঝামেলা করছে।'

কণ্ঠের মালিককে চিনতে পেরেছে মারিয়া। প্রানিগুলোর দেখাশোনায় দায়িত্বরত, এমোরি ইউনিভার্সিটির এক শিক্ষানবিশ ছাত্র।

'ঠিক আছে, জ্যাক। আসছি আমি।' বলে উঠে দাঁড়াল মারিয়া। টেবিলে রাখা ডায়েট কোকের ক্যানে একটা চুমুক দিয়ে ভিজিয়ে নিল গলাটাকে। তারপর দরজার খুলে বেরিয়ে এল হলওয়েতে।

দাঁড়িয়ে থাকা জ্যাক রুসো পিছু নিল তার।

'কী হয়েছে, জ্যাক?'

'জানি না,' জবাব দিল ছেলেটা। 'আমি কয়েকটা খাঁচা পরিষ্কার করছিলাম। এমন সময় চেঁচামেচি শুরু করে বাকো।'

কথা বলতে বলতে গন্তব্যে পৌঁছে গেছে ওরা। ফ্যাসিলিটির বাকি অংশ থেকে আলাদা করা জায়গাটা খেলার ঘর, শোয়ার ঘর, পড়ার ঘর ইত্যাদি কয়েকটা অংশে বিভক্ত। এসব সুবিধার পাশাপাশি নিয়মিত জাতীয় স্তন্যপায়ী গবেষণাকেন্দ্রের বাইরের ছোট বনটাতে ঘুরতে যেতে দেয়া হয় বাকো-কে।

ডারপা-র অর্থায়নে চলা তার প্রজেক্টের ধারাও স্টেশনের অন্যান্য কাজ থেকে আলাদা, বেশ স্বাধীন। ব্রেইন রিসার্চ থ্রু অ্যাডভান্সিং ইনোভেটিভ নিউরো টেকনোলজি, সংক্ষেপে 'ব্রাইন' নামে পরিচিত হোয়াইট হাউজের নতুন একটা উদ্যোগ।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে একাধারে প্রজননবিদ্যা এবং আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞানে পিএইচডি করা মারিয়া ক্রেন্ডালকে তার বোন লিনা ক্রেন্ডালের সাথে এই প্রজেক্টে কাজ করার জন্য বিশেষভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি জার্মানির ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউটও এই প্রজেক্টের পৃষ্ঠপোষকতায় আছে। তাদের আমন্ত্রণেই একটা অভিযানে ক্রোয়েশিয়ায় যেতে হয়েছে লিনাকে।

বাকো-র সাম্রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য দরজায় নিজের আইডি কার্ড ঢোকাল মারিয়া। বেশ তাড়াহুড়ো করছে সে। পেছন পেছনে এগোচ্ছে জ্যাক। ছেলেটা ওর চাইতে এক মাথা সমান উঁচু। পরনে এমোরি ইউনিভার্সিটির লোগো ছাপা, এক সাইজ বড় ঢুলঢুলে কভারঅল। মাথার পেছনে ঝুঁটি করে বাঁধা চুলের সাথে মিলিয়ে রাখা ছাগল দাঁড়িতে হাত বুলাচ্ছে ও, মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

'কোনও সমস্যা নেই,' ছেলেটাকে আশ্বস্ত করল মারিয়া। 'তুমি বরং গিয়ে ট্যাঙ্গোকে নিয়ে এসো। এতে কাজ হতে পারে।'

'ঠিক আছে,' সায় জানিয়ে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল জ্যাক।

তিন ইঞ্চি পুরু কাঁচের জানালার দিকে তাকাল মারিয়া। ওপাশে মোটামুটি আকারের একটা ঘর দেখা যাচ্ছে। মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে বাচ্চাদের খেলনা ব্লকের মতো কতগুলো বর্ণমালা ছাপা ব্লক। পার্থক্য শুধু, এগুলো আকারে একটু বড়। দেয়ালের আটকানো হোয়াইটবোর্ডের জায়গায় জায়গায় আঁকিবুঁকির ছাপ। পুরো ঘরে আসবাব বলতে শুধু একটা টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার।

বিশেষ এক ছাত্রের ক্লাসরুম এটা।

সেই ছাত্রও এখন দাঁড়িয়ে আছে জানালা বরাবর। বিড়বিড় করতে করতে হাত নেড়ে ইশারা করছে তার দিকে।

'বাকো,' নাম ধরে ডেকে উঠল মারিয়া। 'সব ঠিক আছে। এই তো আমি।' বলতে বলতে প্রধান দরজা খুলে, খাঁচার জাল পেরিয়ে ক্লাসরুমের ভেতরে ঢুকে গেল সে।

সাথে সাথে দৌড়ে এল বাকো। লম্বা, পশমী হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল মারিয়ার কোমর। ভাবভঙ্গি দেখেই আন্দাজ করা যাচ্ছে, বেশ উত্তেজিত হয়ে আছে প্রানিটা।

বাকো একটা তিন বছর বয়সী পশ্চিমা নিম্নভূমির গরিলা। অপ্রাপ্তবয়স্ক জন্তুটার ওজন একশো পঞ্চাশ পাউন্ড, লম্বায় চার ফুট। বড় বড় কুতকুতে চোখজোড়া অপলক চেয়ে আছে মারিয়ার দিকে। চিন্তায় কুঁচকে গেছে জোড়া ভ্রু। মৃদু কাঁপতে থাকা ঠোঁটের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে সাদা দাঁতের পাটি।

জন্মের পর থেকেই প্রানিটাকে দেখে আসছে মারিয়া। প্রতিটা আচার-আচরণ, নড়াচড়া তার নখ-দর্পণে। মাথায় হাত বুলিয়ে বাকোকে শান্ত করার প্রয়াস পেল সে। আলতো হাতে স্পর্শ করল তালুর একেবারে মাঝখানে, নিচু হয়ে থাকা অংশটাতে। ওর বয়সী গরিলার ক্ষেত্রে একটু বেমানান ব্যাপারটা। এমনকি চোয়ালের হাড় দুটোও স্বাভাবিকের তুলনায় কম বিকশিত।

'কী হয়েছে আমার বাচ্চাটার?' আদুরে গলায় জানতে চাইল মারিয়া।

জবাবে দুই হাত উঁচু করে ধরল বাকো, তালু বুকের দিকে রেখে আঙুলগুলো টেনে নিল পেছনদিকে।

[ভয়]

ইশারা আর মুখ, দুই ভাষাতেই আবারও প্রশ্ন করল মারিয়া। 'কীসের ভয়?'

এবার এক হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে থুতনি স্পর্শ করল বাকো।

[মা]

মারিয়া খুব ভাল করেই জানে, গরিলাটা তাকে নিজের মা বলে ভাবে। অবশ্য ধারণাটা সঠিকই বলা যায়। জন্ম না দিলেও নিজের বাচ্চার মতো করেই প্রানিটাকে লালনপালন করে সে। আরও একটা ব্যাপার আছে। বাকো কোনও বুনো গরিলা নয়। একটা মাদি গরিলার কাছ থেকে ভ্রূণ সংগ্রহ করে জিন বিন্যাসের পর, রিসার্চ ল্যাবেই জন্ম দেয়া হয়েছে ওকে।

'আমি তো ঠিক আছি,' জবাব দিল মারিয়া।

তুমুল বেগে মাথা নাড়তে লাগল বাকো। আবারও ইশারায় মায়ের কথা বলার পাশাপাশি নতুন আরেকটা ইঙ্গিত দেখাল। ডান হাতে নিজের থুতনি আঁকড়ে ধরে বাম হাতের তর্জনী দিয়ে দেখাল মারিয়াকে।

[মায়ের বোন]

এবার বুঝতে পেরেছে সে। গরিলাটা তার বোন লিনার ব্যাপারে ভয় পাচ্ছে।

মারিয়ার পাশাপাশি লিনাকেও মা বলে ডাকে বাকো। প্রথম প্রথম সবাই ভাবত, প্রানিটা হয়তো জমজ বোন দু'জনকে একই মানুষ হিসেবে জানে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বোঝা যায়, দুই জনের পার্থক্য বেশ ভালো ভাবেই বোঝে সে।

বারবার চিহ্নটার পুনরাবৃত্তি করতে থাকল গরিলাটা।

[ভয়] [ভয়] [ভয়]...

'চিন্তা করো না, বাকো। লিনা ঠিক আছে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফিরে আসবে এখানে।' বলতে বলতে ইশারায় তাকে আশ্বস্ত করল মারিয়া।

কিন্তু তারপরও ভয়ের ইশারা করতে লাগল বাকো।

এবার ভিন্ন পথে এগোনোর সিদ্ধান্ত নিল প্রজননবিদ। 'কেন ভয় পাচ্ছো তুমি, বলো আমাকে।'

সকাল ৬:৩৮

খোলা হাতের তালুর দিকে তাকাল বাকো। বারবার খুলছে আর বন্ধ করছে হাতের মুঠো। বুঝতে পারছে না কীভাবে প্রকাশ করবে মনের ভাব। অবশেষে নির্দিষ্ট চিহ্নটা মনে পড়ল তার। আঙুলের মাথা দিয়ে স্পর্শ করল নিজের ভ্রু, হাতের তালুটা মেলে ধরল মারিয়ার দিকে।

[জানি না]

তারপর আড়াআড়ি ভাবে বাম হাত বুকের উপর তুলে ধরে, ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে নিজের মুখের দিকে দুই বার ইঙ্গিত করল।

[বিপদ]

মুখ কুঁচকে ঘরের বাকি অংশের দিকে তাকাতেই মারিয়া দেখতে পেল- গরিলাটার বিছানার চাদর, কম্বল সব এলোমেলো করে ছড়ানো ছিটানো। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তর্জনীর সাহায্যে কপাল স্পর্শ করল সে, তারপর ঝাঁকি মেরে সরিয়ে দিল হাতটা।

[এটা একটা স্বপ্ন, বাকো।]

মুখ দিয়ে হুফ জাতীয় আওয়াজ করল গরিলা।

[স্বপ্ন দেখেছ তুমি]

না-বোধক ভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে পাল্টা ইশারা করল প্রানিটা।

[স্বপ্ন নয়]

সকাল ৬:৪০

বাকোর ভাব-ভঙ্গী মারিয়ার কাছে ভালো ঠেকছে না। গরিলাটা নিশ্চিত, লিনা কোনও বিপদে পড়েছে। ব্যাপারটা আরেকটা চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছে তার মাথায়।

আমারও কী চিন্তিত হওয়া উচিত?

কথিত আছে, জমজদের ক্ষেত্রে একজনের অনুভূতি আরেকজন আন্দাজ করতে পারে। প্রভুভক্ত প্রানিদের ক্ষেত্রেও কথাটা খাটে। মনিবদের আসার খবর পেয়ে নাকি আগেই দরজার কাছে পৌঁছে যায় কোনও কোনও কুকুর। কিন্তু বিজ্ঞানী হিসেবে এসব গুজবে বিশ্বাস করে না মারিয়া।

তবুও... লিনাকে একবার ফোন করে দেখা যাক।

অন্তত ফোনে তার কণ্ঠ শুনিয়ে শান্ত করা যাবে বাকো-কে।

শান্তি পাব আমিও...

নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকাল মারিয়া। আন্দাজ করার চেষ্টা করছে, ক্রোয়েশিয়ায় এখন ক'টা বাজে। ফোনে অথবা ভিডিও কনফারেন্সে প্রায় প্রতিদিনই বোনের সাথে কথা হয় তার। কাজের কথা সেরে ভাগাভাগি করে নেয় একে অপরের সুখ-দুঃখ।

চোখ বন্ধ করে নিউ ইয়র্কের অলবানিতে, তাদের ছোটবেলার বাসার কথা মনে করল মারিয়া।

শব্দ করে খুলে গেল শোবার ঘরের দরজাটা। 'আমার সোনামণি দু'টো কোথায়?'

কণ্ঠটা শুনে কম্বলের তলায় আরও শক্ত করে লিনাকে জড়িয়ে ধরল ছোট্ট মারিয়া। নয় বছর বয়স হওয়ায় আলাদা বিছানা পেয়েছে সে। কিন্তু মা বাড়ি ফেরার সময় এভাবেই, এক বিছানায় একসাথে দলা পাকিয়ে থাকে দুই বোন। বাবার কোনও স্মৃতিই তাদের মনে নেই। মাঝে মাঝে পারিবারিক অ্যালবাম নামিয়ে লোকটার ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে দু'জন। কেন তাদেরকে ছেড়ে চলে গেল লোকটা? মনে মনে আকাশ পাতাল গল্পের মাধ্যমে নিজেরাই সাজিয়ে নেয় উত্তর। সেই গল্পে কখনও বাবা থাকে নায়ক, কখনও বা দুষ্টু লোক।

'কম্বলের নিচ থেকে আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি...' আবারও ভেসে আসে মায়ের কণ্ঠ।

খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে ছোট্ট লিনা। মারিয়াও তাল মেলায় বোনের সাথে।

তারপরই এক টানে সরিয়ে নেয়া হয় কম্বলটা। মায়ের হাত থেকে ভেসে আসে সুগন্ধি সাবানের সুঘ্রাণ। কাজ সেরে বাড়ি ফিরেই আগে হাত ধুয়ে নেন তিনি। চান না, ময়লা হাতের ছোঁয়া লাগুক মেয়েদের গায়ে।

'এই তো, আমার সোনামণিরা,' বিছানায় গা এলিয়ে দিতে দিতে বলে ওঠেন মা। সংসার চালানোর জন্য এক নাগাড়ে দুটো চাকরি করতে হয় তাকে। তারপর ক্লান্ত শরীরে জড়িয়ে ধরেন দুই মেয়েকে।

দিনের বেশিরভাগ সময় একাই থাকতে হয় দুই বোনকে। বেবিসিটারের খরচ সামলানো মায়ের সাধ্যের বাইরে। তাই স্কুল থেকে সোজা বাসায় ফিরে আসে ওরা। দরজা লাগিয়ে মেতে ওঠে খুনসুটিতে কিংবা গেমস খেলায়। তারপর শুধু রাতে কপালে মায়ের চুমু নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার অপেক্ষা।

ঠক...ঠক...ঠক...

জানালায় টোকা পড়ার শব্দে বাস্তবে ফিরে এল মারিয়া। কাঁচের অন্য দিক থেকে জ্যাক ওর উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছে।

'ভেতরে এসো।'

আবারও স্মৃতির পাতায় হারিয়ে গেল প্রজননবিদ। কলেজে পড়ার সময় একটা ফোন আসে তার নামে। জানানো হয়, দোকানে ডাকাতি করার সময় বাঁধা দেয়ায় মা-কে খুন করে রেখে গেছে দুর্বৃত্তরা।

তারপর থেকে, দুই বোন একা।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মারিয়ার মুখ দিয়ে।

যেখানেই থাক... তোমাকে ভাল থাকতে হবে, লিনা।

জ্যাককে এগিয়ে আসতে দেখেই উত্তেজিত হয়ে পড়ল বাকো। সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গিয়েছে পেছনের দুই পায়ে ভর করে। তবে গরিলাটার এই উচ্ছ্বাসের কারণ ছেলেটা নয়, বরং তার হাতের ফিতায় বাঁধা অন্য একটা প্রাণী।

তবে জ্যাকের সামনে সামনে আরেকজন ঘরে ঢুকেছে, ফিল্ড স্টেশনের টেকো মাথা ডিরেক্টর ড. ট্রাস্ক।

খাঁচার সামনে এগিয়ে এসে হাতের ফিতাটা ছেড়ে দিল জ্যাক। সাথে সাথে বাকোকে দেখে মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে শুরু করেছে ফিতায় বাঁধা কুইন্সল্যান্ড হেইলার জাতের কুকুরছানা ট্যাঙ্গো। বন্ধু গরিলাটার মতো সে নিজেও বয়সে প্রায় বাচ্চা। ধূসর রঙের পশমে মোড়া সারা শরীর।

'শুনলাম গরিলাটাকে নিয়ে নাকি কী একটা সমস্যা হয়েছে,' বলে উঠলেন ড. ট্রাস্ক।

'তেমন কিছু না,' বলে উচ্ছ্বসিত বাকোর দিকে ইঙ্গিত করল মারিয়া।

কথাটাতে বিন্দুমাত্র পাত্তা দিলেন না ডিরেক্টর। 'প্রানিটা সম্বন্ধে বোর্ডের সিদ্ধান্ত তো আপনি জানেনেই। নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সময় সম্ভবত হয়ে এসেছে।'

'জানি,' মাথা নাড়ল জিনবিদ। 'মুক্তভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ না দিয়ে ওকে খাঁচায় আটকে রাখা।'

'গরিলাটার পাশাপাশি ফ্যাসিলিটির কর্মীদের সুরক্ষার ব্যাপারও এখানে জড়িত,' বলে জ্যাকের দিকে ইশারা করলেন ট্রাস্ক। 'জানালা ভেঙে যদি পালিয়ে যেত ওটা?'

'এখনও অতটা শক্তি ধরে না ও...'

মারিয়ার মুখের কথা কেড়ে নিলেন ডিরেক্টর। 'সম্ভবত। কিন্তু দেরি হয়ে যাওয়ার চাইতে আমি বরং আগেভাগে ব্যবস্থা গ্রহণে বিশ্বাসী।'

হাল ছাড়ার মেয়ে মারিয়া নয়। 'বোর্ডের কাছে রিপোর্ট করেছি আমি। গরিলারা বেশ বুদ্ধিমান। তারা অতীত আর বর্তমানের সাথে তুলনা করে বুঝতে পারে কোনটা করা উচিত, কোনটা উচিত নয়। এই ধরনের প্রানিদের এক জায়গায় অবরুদ্ধ করে রাখলে বুদ্ধির বিকাশে বেশ ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে।'

'বোর্ড সেই রিপোর্ট পর্যালোচনা করেই নিজেদের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য পঁয়তাল্লিশ দিন সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে আপনাকে।'

মারিয়া খুব ভালো করেই জানে, বোর্ড আসলে ট্রাস্কের হাতের পুতুল ছাড়া কিছুই না। জবাবে কিছু বলার আগেই ঘুরে দাঁড়ালেন ডিরেক্টর।

লোকটাকে চলে যেতে দিল সে। জানে, পেশাগত ঈর্ষার বশবর্তী হয়েই তার প্রতি এই রাগটা দেখান তিনি।

হু-হু করে টাকা ঢালা হচ্ছে মারিয়ার এই প্রজেক্টের পেছনে। আর এই অত্যাধিক গুরুত্বের কারণেই বাকি সব প্রজেক্টের সুতোয় টান পড়েছে। এতে করে পিছিয়ে পড়েছে প্রতিস্থাপনবিদ্যা সংক্রান্ত ট্রাস্কের নিজের গবেষণা। নিষ্ঠুর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নমুনা হিসেবে শিম্পাঞ্জি ব্যবহার করেন তিনি।

বাকোর দিকে ফিরে তাকাল মারিয়া। কুকুরছানাটাকে কোলে নিয়ে খেলছে সে। ইতিমধ্যে বেশ ভালো বন্ধুতে পরিণত হয়েছে এই দুই মূর্তি। প্রাণী দুটো থেকে চোখ সরিয়ে, ঘরের চারপাশে নজর বুলিয়ে আনল মেয়েটা।

এই ঘরটা কি কোনও অংশে একটা খাঁচার চাইতে কম?

কথাটা মনে হতেই ট্রাস্কের প্রতি আবারও রাগ অনুভব করল মারিয়া। তিনি চান, বাকোকে নিজের পরীক্ষায় ব্যবহার করতে। যথাসম্ভব চেষ্টা করে লোকটাকে দমিয়ে রেখেছে সে। ব্যায়াম, খেলাধুলা, শিক্ষাদানের মাঝে ব্যস্ত রাখছে প্রানিটাকে।

তারপরও, কাজটা কি ঠিক হচ্ছে?

নিউজিল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, সুইডেনসহ বেশ কিছু দেশ শিম্পাঞ্জি এবং এদের কাছাকাছি গোত্রের প্রানিদের গবেষণায় ব্যবহারের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা স্থাপন করেছে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই আইন নেই।

তাকে চিন্তিত দেখে এগিয়ে এল বাকো। জড়িয়ে ধরে ইশারায় একটা বাক্য দেখাল।

জবাবে না হেসে পারল না মারিয়া। 'আমিও তোমাকে ভালবাসি।'

ট্যাঙ্গোর দিকে ফিরে একই ইশারার পুনরাবৃত্তি করল গরিলাটা।

'হ্যাঁ, আমি তোমাকে আর ট্যাঙ্গোকে, দুজনকেই ভালবাসি।'

সন্তুষ্ট হয়ে কুকুরছানাটার সাথে খেলায় ফিরে গেল বাকো। প্রানিটার ভয় কেটে যেতে দেখে ভাল লাগছে মারিয়ার। তবে একটা কাজ এখনও বাকি।

লিনাকে ফোন করতে হবে।

অধ্যায় তিন
২৯ এপ্রিল, দুপুর ১২:৪৫
কার্লোভাক কাউন্টি, ক্রোয়েশিয়া

উপুড় হয়ে মেঝেতে শুয়ে আছে লিনা। অবশ্য পুরোপুরি মেঝে না বলে ওটাকে একটা ফাটল বললেই বেশি মানায়। ফাদার রোল্যাড নোভাকও তার সাথে আছে। নিচু গর্তটায় শুয়ে থাকার দরুন মূল চেম্বার থেকে ওদের দেখার কিংবা ওরা ওখানকার কাউকে দেখতে পাওয়ার সুযোগ নেই।

ক্ষণে ক্ষণে বজ্রপাতের আওয়াজ কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে। কালিগোলা আঁধারে ডুবে আছে চারপাশ। বদ্ধ দেয়াল প্রতিধ্বনিত হচ্ছে পানির কলকল শব্দ। লিনা বুঝতে পারল, বৃষ্টির পানি ক্রমাগত নেমে আসছে পাহাড়ের নিচের এই গুহায়।

‘কী হচ্ছে ওখানে?’ জিজ্ঞেস করল প্রজননবিদ। ভয়ের ধাতব স্বাদে আড়ষ্ট হয়ে আছে মুখের ভেতরটা।

প্রশ্নটা উদ্দেশ্যবিহীন হলেও রোল্যান্ড জবাবে মুখ খুলল। ‘খুব সম্ভবত, ড. রাইটসন আর আরনডকে নিয়ে চলে গেছে হামলাকারীরা।’

লিনা প্রার্থনা করল, দুর্বৃত্তরা যেন লোক দুটোকে বাঁচিয়ে রাখে।

উপর থেকে গুলিবর্ষণের পরপরই একটা বুলহর্ণের আওয়াজ কানে আসে। বুড়ো ভূতাত্ত্বিক আর ফ্রেঞ্চ জীবাশ্মবিদকে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

বাঁচতে চাইলে বেরিয়ে আসুন...

ইংরেজির পর ফ্রেঞ্চ ভাষায় পুনরাবৃত্তি করা হয় বাক্যটা।

ওই ঘোষণা কানে আসার পর সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেননি রাইটসন। ‘হামলাকারীরা শুধু আমাদের দু’জনকে চাইছে,’ বলে রোল্যান্ড আর লিনার দিকে ইঙ্গিত করেন তিনি। ‘তবে আপনাদের এখানে আসার খবর হয়ত ওরা এখনও পায়নি। তাছাড়া এমনিতেও আরও একদিন পর আসার কথা ছিল আপনাদের। ঝড়ের কারণে সময়সূচী এগিয়ে আনা হয়। আমরা যাচ্ছি। আপনারা বরং এখানেই লুকিয়ে থাকুন।’

প্রতিবাদ করেনি দুই বহিরাগত আগন্তুক। চুপচাপ লুকিয়ে পড়েছে মেঝের এই ফাটলটাতে।

‘কেউ আসছে,’ ফিসফিস করে বলল রোল্যান্ড।

যাজকের কথায় মাথাটা আরেকটু নিচু করে মূল গুহা থেকে আসা টানেলের দিকে তাকাল লিনা। মৃদু আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে ওদিক থেকে। এক মুহূর্ত পর আগাগোড়া কালো পোশাকে মোড়া কয়েকজন সৈন্যকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। হাঁটার জন্য স্থাপন করা স্টিলের ফ্রেমের দিকে তাদের কোনও নজর নেই। পায়ের নিচে অমূল্য সব প্রাগৈতিহাসিক ফসিল গুঁড়িয়ে দিতে দিতে আসছ নিষ্ঠুর লোকগুলো। আর কোনওদিকে না তাকিয়ে সরাসরি চ্যাপেলের ভেতর ঢুকে গেল সবাই।

'কী করছে ওরা!' আবারও বিড়বিড়িয়ে বলল তরুণ যাজক।

উত্তরটা আন্দাজ করতে পেরে রাগে রি-রি করে উঠেছে লিনার সারা শরীর। বিজ্ঞানীদের আবিস্কারের খবরটা কোনওভাবে বাইরে ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। আর্কিওলজিক্যাল সাইটে হামলা চালিয়ে মূল্যবান নিদর্শন লুটপাট করা নতুন কিছু নয়।

কিছুক্ষণ পর চ্যাপেল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল লোকগুলোকে। তবে এবার পেছনের দু'জনের হাতে একটা কফিন আকৃতির প্লাস্টিকের বাক্স। প্রথম দেখাতেই লিনা বুঝতে পারল, চ্যাপেলে থাকা নিয়ানডারথাল কঙ্কালটাই ঠাঁই পেয়েছে বাক্সের ভেতর। এরকম একটা ঐতিহাসিক জিনিসের দাম কালো বাজারে নেহাৎ কম হবে না। কিন্তু অবাক করা বিষয় হচ্ছে, গুহায় থাকা অন্যান্য ফসিলগুলো ওরা এভাবে পায়ের নিচে ফেলে নষ্ট করছে কেন? ওগুলোও বেশ মূল্যবান।

একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ ছেদ ঘটাল তার চিন্তায়। ধোঁয়া আর ধুলো আচ্ছন্ন করে ফেলেছে গোটা টানেল।

চ্যাপেলটা গুঁড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা!

কিন্তু কেন?

লোকগুলো টানেল ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই আবারও আঁধারে ঢেকে গেল চারদিক। রোল্যান্ড উঠে বসার প্রয়াস পেতেই, লিনা হাত ধরে টেনে আটকাল তাকে। 'আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত আমাদের।'

'মনে হয় না ওরা আবার ফিরে আসবে,' জবাব দিল যাজক। 'তবে আপনার কথায় যুক্তি আছে। আরও কিছুক্ষণ এখানে থাকতে হবে আমাদের। আমি আসলে দেখতে চাইছিলাম, বিস্ফোরণের পর উদ্ধার করার মতো কিছু বাকি আছে কি না।'

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল দু'জন। তারপর হামলাকারীদের ফিরে আসার কোনও আভাস না পেয়ে উঠে দাঁড়াল ফাটল ছেড়ে।

'ধরুন ওখানে কিছু খুঁজে পেলেন। তারপর?' জানতে চাইল লিনা।

'মধ্যযুগীয় চ্যাপেলটার ঐতিহাসিক রহস্য সমাধান করার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ড. রাইটসন। তার এবং ড. আরনডের আত্মত্যাগ বৃথা যেতে দিতে পারি না আমি।'

লিনার মনে হতাশা ভর করল। দুই বিজ্ঞানীর গুহা ধরে এগিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা ভেসে উঠেছে চোখের সামনে। তাকেও একটা রহস্য ভেদ করার জন্য আনা হয়েছিল। তরুণ যাজকের রহস্যটা ঐতিহাসিক হলেও তারটা বিজ্ঞানের কাতারে পড়ে।

দুপুর ১:১৬

রোমান ক্যাথলিক চার্চের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে, ফাদার অ্যাথেনাসিয়াস কার্কারের স্মৃতিবিজড়িত চ্যাপেলটার প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করছে রোল্যান্ড। লাইট জ্বেলে সামনে এগোতে এগোতে হাজারটা প্রশ্ন হামলা করেছে মনে।

কেন গুহাটাকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন রেভারেন্ড ফাদার?

কেন লুকানো ছিল জায়গাটা?

কেন আবিষ্কারের পরপরই আবারও হামলা করা হলো এখানে?

আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- লোকগুলো কী সরিয়ে নিয়ে গেল এখান থেকে?

উত্তরের খোঁজে ভাঙা পাথরের টুকরোগুলো হাতড়ে দেখতে শুরু করল কৌতূহলী যাজক। মুহূর্তের ব্যবধানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ঐতিহাসিক মধ্যযুগীয় স্থাপনা।

'মনে হচ্ছে, নিজেদের এখানে আসার চিহ্ন মুছে ফেলতে চেয়েছিল হামলাকারীরা,' বলে উঠল লিনা। একহাতে চাপা দিয়েছে মুখ, কথা বললেও চাইছে যত কম সম্ভব আওয়াজ করতে।

'আপনি তো আগেই ছবি তুলে রেখেছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, ফাদার। তুলেছিলাম।' জবাব দিল প্রজননবিদ।

'বেশ ভাল কথা। আর দয়া করে আমাকে নাম ধরে ডাকবেন। আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন এখন ফুরিয়েছে।'

মাথা নেড়ে সায় দিল লিনা। 'এখান থেকে কিছু উদ্ধার করা যাবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'এতখানি আশাহত হবেন না।' বলে সামনে বাড়ল রোল্যান্ড। আশা করা যায়- লোকগুলো নিজেদের কাজের বাইরে কোনও কিছু নিয়ে মাথা ঘামায়নি। বিস্ফোরণের

ফলে চ্যাপেলের উল্টোদিকের দেয়াল থেকে কিছু ইট খসে পড়েছে। আরেকটা কুলুঙ্গি মতো দেখা যাচ্ছে ওখানে।

হাঁ হয়ে গেল যাজকের মুখ। এদিকেও হাতের ছাপে তৈরি আরেকটা গুহাচিত্র আঁকা আছে। 'এটাও আগেরটার মতোই!'

না-বোধক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লিনা।

'মানে?'

পকেট থেকে সেলফোন বের করে দেয়ালটার দিকে ইঙ্গিত করল প্রজননবিদ। 'এই হাতের ছাপ আগেরগুলোর চাইতে তুলনামূলক ছোট। আর বেশ কিছুটা বাঁকা। মনে হচ্ছে, হাতের মালিকের আঙুল কোনও কারণে ভেঙে গিয়েছিল। তারপর খানিকটা বাঁকা হয়ে সেরে উঠেছে। আকৃতি দেখে বোঝা যাচ্ছে, ছাপগুলো কোনও মহিলার।'

লিনা ছাপগুলোর ছবি তুলতে তুলতে পিছিয়ে এসে চ্যাপেলের ভাঙা টুকরোগুলোর দিকে তাকাল রোল্যান্ড। 'সম্ভবত, ওই পুরুষটা এই মহিলার সঙ্গী ছিল।'

'হতে পারে,' বলে নতুন আবিষ্কৃত কুলুঙ্গিটার দিকে ইঙ্গিত করল লিনা। 'জানার উপায় কী! এখানে তো আর কোনও কঙ্কাল নেই।'

অন্তত এখন নেই...

হাঁটু গেড়ে বসল রোল্যান্ড। চ্যাপেল থেকে শুরু হয়ে সাবেক প্রবেশপথ পর্যন্ত গিয়ে থেমেছে একটা রেখা। মেঝেতে কিছু ঘষটে নেয়ার দাগ ওটা।

সম্ভবত, আজকের হামলার আগেও এখান থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে কিছু একটা...

ভাঙা পাথর হাতড়াতে শুরু করল তরুণ যাজক।

'কী খুঁজছেন?' জিজ্ঞেস করল লিনা।

উত্তর দেয়ার আগেই স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল রোল্যান্ডের মুখ দিয়ে। হাতে তুলে নিয়েছে পাথরের একটা টুকরো। জিনিসটায় একটা ধাতব প্লেট আটকানো।

'এটা!' জবাব দিল সে। হামলার আগে আবিষ্কৃত হয়েছিল ফলকটা, রেভারেন্ড ফাদার অ্যাথেনাসিয়াস কার্কারের নাম লেখা।

'হয়ত এই গুহার রহস্য সমাধানের উপায় খোদাই করা এখানে,' ব্যাখ্যা করল রোল্যান্ড। 'আশা করি, বের হওয়ার পর উপযুক্ত জিনিসপত্রের সাহায্যে লেখাগুলো উদ্ধার করতে...'

যাজকের মুখ থেকে কথার বাকি অংশটুকু কেড়ে নিয়েছে আরেকটা বিস্ফোরণের আওয়াজ। ভয় পেয়ে তার হাত আঁকড়ে ধরল লিনা। 'আবার কী?'

জবাব না দিয়ে মূল গুহার দিকে তাকাল রোল্যান্ড। ধোঁয়া আর ধুলোর মেঘ ধেয়ে আসছে ওদিক থেকে।

'না!' কাতরে উঠল লিনা। ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরেছে।

চ্যাপেলটা উড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত দেয়নি হামলাকারীরা। অপরাধের প্রমাণ ঢাকতে গুহায় ঢোকার পথটাও বন্ধ করে দিচ্ছে এখন।

'এখন কী করব?' জিজ্ঞেস করল প্রজননবিদ, কণ্ঠে নিখাদ ভয়।

জবাবে রোল্যান্ড মুখ খোলার আগেই কেঁপে উঠল পুরো গুহা। ছাদ থেকে ধ্বসে পড়তে লাগল পাথরের টুকরো।

তরুণ যাজক মনে করতে পারল, গত মাসের ভূমিকম্প ক্রেক পাহাড়ের ভিত অব্দি নাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই সাথে ছোট ছোট আরও কিছু কম্পনের ফলে ফাটল তৈরি হয়েছে ভূগর্ভস্থ গুহাগুলোতে। ঝড়বৃষ্টিতে আরও নাজুক রূপ ধারণ করেছে পরিস্থিতি। এখনকার বিস্ফোরণগুলোর কথা না হয় বাদই দেয়া গেল।

বেশ বিপদে পড়ে গেছে আটকা পরা দুই তরুণ-তরুণী।

'সব ঠিক আছে,' লিনাকে সান্ত্বনা দেয়ার প্রয়াস পেল রোল্যান্ড।

'ওদিকে দেখুন!' বলে এতক্ষণ ওদের লুকিয়ে থাকা ফাটলের দিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটা। বলকে বলকে পানি বেরিয়ে আসছে ফোকর থেকে।

প্রচুর ঝর্ণা, নদী ইত্যাদি আছে এই অঞ্চলে। বিস্ফোরণ আর ভূমিকম্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাহাড়ের ভিত। উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রবাহ।

আশাহত দৃষ্টিতে রোল্যান্ডের দিকে তাকিয়ে রইল লিনা। ভাবছে, লোকটা হয়ত বাঁচার কোনও উপায় বের করতে পারবে।

কিন্তু তার নিজের অবস্থাও মেয়েটার চাইতে কোনও অংশে সুবিধার নয়।

অধ্যায় চার
২৯ এপ্রিল, দুপুর ১:৩৮
প্যারিস, ফ্রান্স

অনাকাঙ্ক্ষিত সময়ে বাজতে শুরু করেছে ফোনটা।

হোটেলের বাথরুমে, ধোঁয়া ওঠতে থাকা বাথটাবের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কমান্ডার গ্রে পিয়ার্স। পুরোপুরি নগ্ন। স্যুইটের জানালা দিয়ে তাকালেই চোখে পড়বে প্যারিসের মনোরম চ্যাম্প এলিজে অ্যাভিনিউ। কিন্তু গ্রে-র সামনে থাকা দৃশ্যটা তার চাইতেও অনেক গুণ বেশি মনোমুগ্ধকর।

ল্যাভেন্ডারের সুগন্ধযুক্ত পানি ভরা বাথটাব থেকে উঁকি দিচ্ছে মেদহীন, সুগঠিত একটা পা। পায়ের মালিক অবশ্য ডুবে আছে সাবানের ফেনায়। মাথাটা জাগাতেই ছন্দ উঠল পানিতে। ঢেউ খেলানো লম্বা চুলের পিছু পিছু বেরিয়ে এসেছে এমারেল্ডের মতো সবুজ একজোড়া চোখ।

রাজ্যের বিরক্তি সেই চোখ দুটোতে।

'বাজতে দাও,' বলে পা-টাকে আবারও পানিতে ডুবিয়ে নিল সে।

গ্রে ও সেটাই চাইছিল। কিন্তু বাজতে থাকা বিশেষ রিংটোন অনুযায়ী, কলটা করেছেন সিগমা ডিরেক্টর পেইন্টার ক্রো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কমান্ডার। 'জরুরী কিছু না হলে তার ফোন করার কথা না।'

'ধুর...' বিরক্তি খেলা করছে বাথটাবে ডুবে থাকা কণ্ঠটাতে। হাল ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি পানির নিচে চলে গেল সে, ভেসে উঠল পরমহূর্তেই। ঈষদুষ্ণ পানিতে সিক্ত হয়ে আরও আবেদনময় হয়ে উঠেছে প্রশস্ত চোয়ালের হাড় আর তার নিচের ঘাড়-গলা।

'আমি দুঃখিত, শেইচান।' ঘুরে বেডরুমের দিকে এগোল গ্রে। ফোনটা ধরতেই হবে।

গত তিনদিন ধরে প্যারিসে ছুটি কাটাচ্ছে দু'জন। অবশ্য তিন সপ্তাহ আলাদা থাকার পর, এখন বাইরে ঘোরাফেরার চাইতে হোটেলে বসে একে অপরের সান্নিধ্য পাওয়াই তাদের মূল লক্ষ্য।

হংকং থেকে সোজা প্যারিসে চলে এসেছে শেইচান। ওখানে অসহায় নারীদের জন্য একটা আশ্রয় নির্মাণ কাজের দেখভাল করছিল সে। অপরদিকে গ্রে এসেছে ওয়াশিংটন থেকে। দিন কয়েকের ছুটি কাটানো বেশ জরুরি হয়ে পড়েছিল তার জন্য।

সিগমার কাজের বাইরে, অ্যালঝেইমার রোগী বাবার দেখাশোনা করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছিল গ্রে। অবশেষে কিছুটা সুস্থির হয়েছেন উনি। তাই সময়টা কাজে লাগাতে বেরিয়ে পড়েছে সিগমা কমান্ডার। তাই বলে, বাবাকে একেবারে ভুলে যায়নি। তার অনুপস্থিতিতে সারাদিন একজন নার্স উনার দেখাশোনা করবে। সেই সাথে ছোট ভাই কেনি তো রয়েছেই।

দুরু দুরু বুকে কলটা রিসিভ করল গ্রে। তার বাবার ব্যাপারে কোনও খবর এসেছে বলে ভাবছে।

'কমান্ডার পিয়ার্স,' অপর প্রান্তে ডিরেক্টর ক্রো-র গলা শোনা গেল। 'ছুটির সময় বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। তবে ব্যাপারটা বেশ জরুরি।'

'কী হয়েছে?' অমঙ্গলের আশঙ্কায় শক্ত হয়ে এসেছে গ্রে-র শরীর।

'মিনিট বিশেক আগে জেনারেল মেটকাফের একটা ফোন পাই আমি...'

স্বস্তিতে বিছানায় গা এলিয়ে দিল গ্রে। তার মানে, অন্তত বাবার কিছু হয়নি। 'হ্যাঁ, বলুন।'

'ক্রোয়েশিয়ায় দায়িত্বরত তাদের একটা আর্মি ইউনিটের কাছ থেকে বিপজ্জনক সংকেত পেয়েছে ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স।'

'ক্রোয়েশিয়া?'

'হ্যাঁ,' সায় দিলেন পেইন্টার। 'একটা অভিযাত্রী দলের নিরাপত্তার দায়িত্ব দিয়ে পাহাড়ে পাঠানো হয়েছিল ফ্রেঞ্চ একটা ইউনিটকে। ধারণা করা হচ্ছে, হামলার শিকার হয়েছে দলটা। বিফলে গেছে যোগাযোগের সব রকম প্রচেষ্টা।'

গ্রে বুঝতে পারছে না, এসবের সাথে সিগমার সম্পর্ক কোথায়। তবে মেটকাফ যদি পেইন্টারকে ফোন করে থাকেন, তাহলে কিছু একটা ব্যাপার অবশ্যই আছে এখানে। জেনারেল গ্রেগোরি মেটকাফ হলেন ডিফেন্স অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্টস এজেন্সি, অর্থাৎ ডারপা-র হেড। তার অধীনেই কাজ করতে হয় পেইন্টারকে। সিগমা ফোর্স ডারপারই একটা অঙ্গসংগঠন, যার সদস্যরা মাঠ-পর্যায়ে কাজ করার পাশাপাশি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে দক্ষ। জাতীয় এবং বৈশ্বিক নিরাপত্তার হুমকি-স্বরূপ, এমন অনেক বিপজ্জনক মিশন নিয়ে কাজ করে ওরা।

'বুঝতে পারছি না,' জবাব দিল গ্রে। 'এটা তো ফ্রেঞ্চ মিলিটারির দায়িত্ব। সিগমা এসবের সাথে কেন জড়াচ্ছে?'

'কারণ, গোটা বাপারটাতে ডারপা-র একটা ভূমিকা আছে। আন্তর্জাতিক একটা গবেষক দলকে নিরাপত্তা দিচ্ছিল ওই ফ্রেঞ্চ আর্মি ইউনিট। সেই দলেরই এক সদস্য- ড. লিনা ক্রেন্ডাল আবার ডারপা-র একটা প্রজেক্টে কাজ করছে। এজন্যই জেনারেল মেটকাফ ফোন করেছিলেন আমাকে। তিনি চান, সিগমা অনুসন্ধানে নামুক।'

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল গ্রে-র মুখ দিয়ে। মনে মনে বলল, 'আর বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধতে আমাকে ছাড়া আর কাউকে চোখে পড়েনি।'

'ক্যাট তোমার জন্য একটা প্রাইভেট জেটের ব্যবস্থা করেছে,' বলে চলেছেন পেইন্টার। 'ঘটনাস্থলে পৌছাতে ঘন্টা দুয়েকের বেশি সময় লাগবে না।'

ক্যাট মানে ক্যাপ্টেন ক্যাথরিন ব্রায়ান্ট। সিগমার প্রধান অভিযান বিশ্লেষক। পেইন্টারের ডান হাত। স্বামী মঙ্কের পাশাপাশি মেয়েটা গ্রে-রও একজন ভালো বন্ধু।

'আর শেইচান?' জিজ্ঞেস করল কমান্ডার।

'সে-ও তোমার সাথে যাচ্ছে।'

বাথরুমের দরজায় নড়াচড়ার আভাস পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল গ্রে। গায়ে তোয়ালে জড়িয়ে শেইচান এসে দাঁড়িয়েছে ওখানে।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল সে। গ্রে-র কথায় আন্দাজ করে নিয়েছে, ছুটি কাটানোর দিন শেষ।

মেয়েটার কল্পনাশক্তি দেখে মুচকি হাসল সিগমা কমান্ডার। ভাড়াটে আততায়ী হিসেবে কাজ করতে করতে বেশ অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে এই কাজে। এখনও ওর ব্যাপারে ধোঁয়াশা পুরোপুরি কাটেনি। কয়েকটা দেশের জারি করা মৃত্যুর পরোয়ানা মাথায় নিয়ে ঘুরতে হচ্ছে শেইচানকে।

'মাঠে নামার সময় হয়ে গেছে,' সতর্ক করল গ্রে।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল শেইচান। 'এমনিতেও প্যারিসের উপর বিরক্তি এসে গেছে আমার।' বলতে বলতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। তোয়ালে সরে গিয়ে উন্মুক্ত করে দিয়েছে উদোম পিঠ।

'এই দৃশ্য দেখতে অবশ্য কখনোই বিরক্ত হব না আমি,' মনে মনে বলল সিগমা কমান্ডার।

পেইন্টারের কথা এখনও শেষ হয়নি। 'এমোরি ইউনিভার্সিটিতে কাজ করছিল ড. ক্রেন্ডাল। অনুসন্ধান চালানোর জন্য তার বোনের কাছে, আটলান্টাতেও একটা দল পাঠাচ্ছি আমি।'

'বোন?'

'আসলে জমজ বোন,' জবাব দিলেন সিগমা ডিরেক্টর। 'সেই সাথে সহকর্মীও। একসাথে একই প্রজেক্টে কাজ করত দুই বোন।'

'কী নিয়ে কাজ করছিল ওরা?'

'ব্যাপারটা গোপনীয়। এমনকি জেনারেল মেটকাফও এখনও পর্যন্ত পুরোটা জানতে পারেননি। তবে প্রজেক্টটার সাথে মানুষের বুদ্ধিমত্তার রহস্য জড়িত।'

অবাক হলো গ্রে। তবে এখন এটা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। সময় হলে সব জানা যাবে। পরমুহূর্তে ঘুরিয়ে নিল কথা। 'কাকে পাঠাচ্ছেন ওখানে?'

'সেটাই ভাবছি,' পেইন্টারের গলায় চিন্তার ছাপ। 'সাইন ল্যাংগুয়েজ অর্থাৎ ইশারার ভাষায় দক্ষ, এমন কাউকে পাঠানো জরুরি।'

ভ্রু কুঁচকাল সিগমা কমান্ডার। এসবের মাঝে আবার ইশারার ভাষার দরকার পড়ল কেন? কে জানে, আবারও কোন বিপদে পা দিতে চলেছে সিগমা।

সকাল ৭:৫৫
ওয়াশিংটন ডি.সি.

'ভেবেছিলাম, মহিলা গর্ভবতী,' মঙ্ক কক্কালিসকে সাথে নিয়ে লিফট থেকে বেরোতে বেরোতে বলে উঠল জো কোয়ালস্কি। মনে মনে কল্পনা করছে নতুন সিকিউরিটি গার্ডের চেহারাটা।

'পেটটা ঢোলের মতো ফুলে থাকতে দেখলেও...' জবাব দিল মঙ্ক। 'একজন ভদ্রমহিলাকে প্রশ্নটা করা তোমার ঠিক হয়নি।'

'কে জানে... এমন কিম্ভুতকিমাকার ইউনিফর্ম আর হোঁৎকা মোটা বেল্ট জীবনে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

'হা হা হা...' বন্ধুর কৌতুকে হেসে ফেলল মঙ্ক। 'ভাগ্য ভালো, মহিলা তোমাকে গুলি করে বসেনি।'

জবাবে পাল্টা হাসল কোয়ালস্কিও।

ইতিমধ্যে স্মিথসোনিয়াল ক্যাসলের ভূগর্ভস্থ সিগমা কমান্ডে ঢুকে পড়েছে দুই বন্ধু। সকালের জগিং সেরে ন্যাশনাল মল ধরে ফিরছিল ওরা, তখনই জরুরী ফোন আসে হেডকোয়ার্টার থেকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাজির হতে বলা হয় দু'জনকে। তারই ফলশ্রুতিতে ওরা এখন এখানে। পরনে টুপিওয়ালা গেঞ্জি আর সোয়েটপ্যান্ট।

'চলে এসেছ তোমরা,' ওদের ঢুকতে দেখে এগিয়ে এল গাঢ় নীল পোশাক পরা ক্যাট। 'ভালই হয়েছে। ডিরেক্টরের অফিসে যাচ্ছিলাম আমি। তোমরাও চলো।'

'তা, এত জরুরী তলব কেন?' জিজ্ঞেস করল মঙ্ক। হলওয়ে ধরে হাঁটার ফাঁকে এক হাতে আঁকড়ে ধরেছে বউয়ের আঙুল।

বন্ধু আর তার স্ত্রীর ভালবাসার আভাস পাচ্ছে কোয়ালস্কি, সেই সাথে মনে আশার জোয়ার।

'এই ব্যাটা যদি এমন কাউকে পটাতে পারে তাহলে...'

কোয়ালস্কির থেকে এক মাথা খাটো মঙ্ক। সিগমার মেডিকেল ফরেনসিক এক্সপার্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে সাবেক এই গ্রিন বেরেট। টেকো মাথা, সারা গায়ে সংগ্রামী জীবনের চিহ্ন রাখা অসংখ্য কাটাকুটি দাগ। বেশিরভাগ লোকই তার এই কর্কশ চেহারার আড়ালে লুকানো বুদ্ধিমান মগজের ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারে না।

ডিরেক্টর পেইন্টার ক্রো একসময় কোয়ালস্কিকে বলেছিলেন, সিগমা হচ্ছে বুদ্ধি আর শারীরিক ক্ষমতার সংমিশ্রণ। কথাটা মঙ্কের সাথে খাপে খাপ মিলে যায়।

একটা স্টিলের দরজায় ফুটে ওঠা নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চোখ পড়ল কোয়ালস্কির। সেই দশাসই দেহ, মোটা গর্দান, ভাঙা নাক...

তো শালা আমি এখানে কী করছি!

সিগমায় আসার আগে নেভিতে ছিল কোয়ালস্কি। এখানে তার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বলতে শুধু 'জিনিসপত্র উড়ানো'। মানে বিস্ফোরণ ঘটানো আর কি... সিগমার বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ পদে তাকে বহাল করেছেন পেইন্টার ক্রো। জ্ঞানের ব্যাপারে নিজের খামতিটুকু পেশীশক্তির সাহায্যে পুষিয়ে দেয় সে।

'তোমাদেরকে এখানে ডাকার কারণ ডিরেক্টর নিজেই বলবেন,' ক্যাটের কথায় সম্বিত ফিরল বিশালদেহী কোয়ালস্কির।

ক্যাপ্টেনের পিছু পিছু পেইন্টারের অফিসে ঢুকে গেল দুই বন্ধু। ডেস্কে রাখা ফাইলপত্রের মাঝে ডুবে আছেন ডিরেক্টর। ফোনে কথা বলতে বলতে এক হাতে তাদের থামতে ইশারা করলেন তিনি। পেছনের দেয়ালে দ্যুতি ছড়াচ্ছে তিনটা বড় মনিটর। বিভিন্ন ধরনের মানচিত্র, গ্রাফ আর একটা পাহাড়ের দৃশ্য ফুটে আছে পর্দায়। মাটির নিচে থাকা এই সিগমা হেডকোয়ার্টারে ডিরেক্টরের চোখ, কান হিসেবে কাজ করে মনিটর তিনটা।

কথা বলা শেষ করে কান থেকে ব্লুটুথ হেডফোন খুলে রাখলেন পেইন্টার। 'অসময়ে ডাকার জন্য দুঃখিত। কিন্তু কাজ পড়ে গেছে একটা।'

পরবর্তী কয়েক মিনিটে ক্রোয়েশিয়ার পাহাড়ে ফ্রেঞ্চ ইউনিটের উপর হামলা এবং বর্তমান পরিস্থিতির উপর তাদেরকে সবকিছু জানালেন তিনি। মনিটরে ভেসে উঠল অভিযাত্রী দলের সদস্যদের ছবি- এক ব্রিটিশ ভূ-তত্ত্ববিদ, এক ফ্রেঞ্চ জীবাশ্মবিদ, ভ্যাটিকান থেকে আসা এক ইতিহাসবিদ... সর্বশেষ ছবিটা ল্যাব কোট পরা এক মেয়ের। ক্যামেরার দিকে সুদৃশ্য দাঁতগুলো দেখিয়ে হাসছে সে। তামাটে গায়ের ত্বক, লম্বা সোনালী চুল মাথার পেছনে টেনে বাঁধা।

ছবিটা দেখে শিষ বাজাল কোয়ালস্কি।

পাত্তা দিলেন না পেইন্টার। 'ড. লিনা ক্রেন্ডাল, প্রজননবিদ। এমোরি ইউনিভার্সিটির হয়ে কাজ করে। বর্তমানে ডারপা-র একটা প্রজেক্টের সাথে আছে।'

'কী নিয়ে কাজ করছে ওরা?' জিজ্ঞেস করল মঙ্ক।

কোয়ালস্কির এসব কথায় কান নেই। তন্ময় হয়ে মেয়েটার রূপসুধা পান করছে সে।

'এজন্যই ডেকেছি তোমাদের,' জবাব দিলেন পেইন্টার। 'ক্যাট সব ব্যবস্থা করছে। আটলান্টায় গিয়ে এই ড. ক্রেন্ডালের বোনের সাথে কথ বলবে তোমরা। জানার চেষ্টা করবে, ক্রোয়েশিয়ার পাহাড়ি আর্কিওলজিক্যাল সাইটের সাথে এমোরি ইউনিভার্সিটির ওই প্রজেক্টের সম্পর্ক কোথায়। ধাঁধাটার বেশ কিছু টুকরো এখনও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, মেলানো তো পরের ব্যাপার।'

'ক্রোয়েশিয়ার ব্যাপারে অগ্রগতি কী?' প্রশ্ন করল মঙ্ক।

'ওখানে অনুসন্ধানের জন্য রওনা হচ্ছে গ্রে, সাথে শেইচানও আছে।' বলে মঙ্কের কাঁধে হাত রাখলেন ডিরেক্টর। 'ওষুধপত্র এবং প্রজননবিদ্যায় বিশেষ জ্ঞানের কারণে, তোমার চেয়ে সিগমায় যোগ্য আর কেউ নেই, যাকে আটলান্টায় পাঠাব। মারিয়া ক্রেন্ডালের সাথে কথা বলে তাদের রিসার্চের ব্যাপারে সবকিছু জানতে হবে তোমাকে। এ কাজে ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনের এক অফিসারের সাহায্য পাবে তুমি।'

এবার কোয়ালস্কির দিকে ফিরলেন পেইন্টার। 'আর তুমি...'

চোখ কুঁচকাল বিশালদেহী বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ। গোটা ব্যাপারটাতে নিজেকে একজন বডিগার্ডের বাইরে কিছু ভাবতে পারছে না।

'ড. ক্রেন্ডালের টেস্ট সাবজেক্টের সাথে যথাসম্ভব সুসম্পর্ক রাখার চেষ্টা করবে। আমাদের কাজের স্বার্থে এটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।'

'আমি কেন?' কোয়ালস্কির গলায় দ্বিধা।

'কারন ইশারায় ভাষায় তুমি বেশ দক্ষ।'

অবাক হলো বিশালদেহী লোকটা। ভাবতে পারছে না, তার পারিবারিক ইতিহাস এত গভীরভাবে ঘেঁটেছেন ডিরেক্টর। বিশ্বযুদ্ধের সময় পোল্যান্ড থেকে এসে, ব্রংক্স শহরের দক্ষিণ অংশে আস্তানা গাড়ে তার পূর্বপুরুষ।

একটা খাবারের দোকান চালাতেন কোয়ালস্কির বাবা। তবে মদের প্রতি চরম আসক্তি ছিল লোকটার। ফলে সাপ্তাহিক আয়ের বেশিরভাগই চলে যেত রঙিন পানীয়ের পেছনে। অ্যানি নামে বোবা-কালা একটা বোন ছিল কোয়ালস্কির। গাড়ি এক্সিডেন্টে মায়ের মৃত্যুর পর বাচ্চাটার লালন-পালনে মাতাল বাবার কোনও বিকার ছিল না। রোগে ভুগে এগারো বছর বয়সে মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত ভাইয়ের কাছেই

বড় হয় অ্যানি। তাই তার সাথে যোগাযোগের জন্য ইশারার ভাষা আয়ত্ত্ব করতে হয়েছিল কোয়ালস্কিকে।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পকেটে হাত ঢোকাল সিগমার বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ। কথাগুলো মনে পড়তেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ধূমপানের নেশা। 'অনেক দিন ধরে চর্চা নেই আমার।'

'আমি তো বরং উল্টো কথা শুনেছি,' জবাব দিলেন পেইন্টার। 'জর্জটাউন হাসপাতালে নাকি প্রায়ই বোবা-কালা শিশুদের ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ কর তুমি।'

এক পাশের ভ্রু উঁচু করে বন্ধুর দিকে তাকাল মঙ্ক, এই কথাটা তার জানা ছিল না।

মনে মনে সর্বজ্ঞানী সিগমা ডিরেক্টরকে অভিশাপ দিচ্ছে কোয়ালস্কি। 'তা কী করতে হবে আমাকে?'

মাথা নাড়লেন পেইন্টার। 'সেটা না হয় গেলেই দেখতে পাবে। তবে ড. ক্রেন্ডালের পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তোমার ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।'

'ক্রোয়েশিয়ার অন্য বোনের কী হলো?' জানতে চাইল মঙ্ক। 'রিসার্চ দলটার আর কোনও খবর পাওয়া গেছে?'

'না,' শীতল হয়ে এল পেইন্টারের কণ্ঠ। 'নতুনভাবে শুধু গোটা এলাকায় ছোট ছোট কিছু ভূমিকম্পের খবর এসেছে। আশা করি গ্রে একটা কিছু বের করতে পারবে।'

বন্ধুর অমঙ্গলের আশঙ্কায় ছেয়ে গেল মঙ্কের মন।

'দেখা যাক...'

অধ্যায় পাঁচ
২৯ এপ্রিল, দুপুর ২:১৫
কার্লোভাক কাউন্টি, ক্রোয়েশিয়া

কাঁপতে কাঁপতে একটা পাথরের টুকরোর উপর উঠে দাঁড়াল লিনা। হেলমেটে ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় গুহায় জমে ওঠা পানির স্তরটাকে কালচে দেখাচ্ছে।

এখান থেকে বেরোতে হবে আমাদের...

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভূগর্ভস্থ গুহাটায় লুকানো প্রাগৈতিহাসিক ফসিলগুলোর সব চিহ্ন মাত্র বিশ মিনিটে গিলে নিয়েছে পানি। এখন শুধু মাথার উপরের স্ট্যালাগটাইট দন্ডগুলোই বাকি। নিচ থেকে পানি ভেদ করেও অবশ্য উঁকি দিচ্ছে কয়েকটার মাথা। সেগুলোর স্থায়িত্বও আর বড়জোর কয়েক মিনিট। গুহাচিত্রগুলোও এই পুরোপুরি ডুবল বলে।

হতাশ হয়ে সেলফোনটা ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখল রোল্যান্ড। গুহার ভেতর নেটওয়ার্কের বালাই নেই। 'প্রথম গুহাটাতে চলে যাওয়া উচিত আমাদের, যেখান দিয়ে নেমেছিলাম,' বলল সে। 'হয়ত ভূমিকম্পগুলো হামলাকারীদের বন্ধ করা কোনও অংশ আবার খুলে দিয়েছে।'

কথাটা খুব একটা আশাব্যঞ্জক না শোনালেও সায় দিল লিনা। চুপচাপ বসে থাকার চাইতে কিছু করা ভাল। কাঁধের ব্যাগটা ভালভাবে আটকে নিয়ে পানিতে নেমে গেল মেয়েটা। সাথে সাথে হিম ঠান্ডা জুতা ভেদ করে কামড় বসাল পায়ে।

'সাবধানে,' রোল্যান্ডকে সতর্ক করার প্রয়াস পেল লিনা। 'বেশ পিচ্ছিল।'

পেছন থেকে কাতরে উঠল যাজক। 'পিচ্ছিল! ঠান্ডা থেকে বাঁচতে পারলে না হয় সেদিকে নজর দেয়া যাবে।'

জবাবে হাসল প্রজননবিদ। বুঝতে পারছে, এই অবস্থাতেও লোকটা তাকে খুশি রাখার চেষ্টা করছে। হাঁটতে হাঁটতে টানেল পেরিয়ে পাশের অপেক্ষাকৃত ছোট গুহায় প্রায় চলে এসেছে দু'জন। এমন সময় আবারও কম্পন উঠল পানিতে।

'আরেকটা ভূমিকম্প,' সতর্ক করল রোল্যান্ড।

হাঁটার গতি আরও বাড়িয়ে দিল ওরা। কিন্তু থমকে যেতে হলো এক মুহূর্ত পরই।

'এখানেও অর্ধেক গুহা ডুবে গেছে পানিতে,' লিনা বলল।

'পুরোপুরি তো যায়নি।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

সময়ের সাথে সাথে আতঙ্ক আঁকড়ে ধরছে লিনার মন। বদ্ধ জায়গা কোনও সমস্যা ছিল না, কিন্তু মাথার উপর ক্রমাগত নড়তে থাকা পাহাড়ের জন্য আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে পরিস্থিতি। ফাঁক ফোকরের খোঁজে মাথার উপরের পাথরগুলোর দিকে আলো তাক করল দু'জন। কিন্তু না, উদ্ধার পাবার মতো কোনও উপায় নেই। ফাঁক বলতে চুল পরিমাণ যা আছে, তা দিয়েও ঝিরঝির করে পানির ধারা ঝরছে।

বিড়বিড় করে কিছু একটা বলতে শুরু করেছে তরুণ যাজক। তবে কথাগুলো লিনা কাছে প্রার্থনার বদলে অভিশাপ বলেই মনে হচ্ছে।

'ঠিক আছে,' বলে উঠল সে। 'ঝড় থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখি। নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আমাদের খোঁজে আসবে। চেঁচামেচি করে তখন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করব।'

কথাগুলো রোল্যান্ডকে খুব একটা শান্ত করতে পারল না। হিম শীতল পানি ইতিমধ্যে হাঁটুর কাছাকাছি চলে এসেছে। ডুবে না মরলেও খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডায় জমে মরতেই হবে।

'ঠিক আছে। তাহলে বরং অপেক্ষাই...'

একপাশের দেয়ালের বাঁক থেকে আসা মৃদু কাতরানোর আওয়াজ কেড়ে নিল যাজকের কথার বাকি অংশটুকু। এক মুহূর্ত পর, কালচে একটা ছায়া হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। আঁতকে উঠে লিনাকে পেছনে ঠেকে দিল রোল্যান্ড, বিপদের আশঙ্কা করছে।

উঠে দাঁড়াল লোকটা, হাত দিয়ে ওদের ফ্ল্যাশলাইট থেকে আড়াল করছে নিজের চোখ। 'ফাদার নোভাক...ড. ক্রেন্ডাল...' ফ্রেঞ্চ টানে কথা বলে উঠল অবশেষে। 'কী হয়েছে?'

ভালো করে তাকাতেই লোকটাকে চিনতে পারল লিনা। গুহার নামার আগে দেখেছে এই চেহারা, তবে এখন রক্তে ভিজে আছে মুখের অর্ধেক। ফ্রেঞ্চ মিলিটারি ইউনিটের সেই দলনেতা।

রোল্যান্ডও ধরতে পেরেছে ব্যাপারটা। 'কমান্ড্যান্ট জেরার্ড!'

স্বস্তির ছাপ খেলে গেল রক্তভেজা মুখটাতে। পাথরের তাক থেকে একটা রাইফেল টেনে বের করে আনলেন তিনি। 'ক...ক্ক...কী হয়েছে এখানে!'

এগিয়ে গিয়ে জেরার্ডের ক্ষতটা পরীক্ষা করল লিনা। কপালের উপর চামড়া কেটে অল্প অল্প রক্ত বেরোচ্ছে। ধারণা করল, বিস্ফোরণের সময় হয়েছে ক্ষতটা।

'আপনি এখানে এলেন কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল প্রজননবিদ।

ঘাড় উঁচু করে গুহার বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রবেশমুখটা দেখলেন জেরার্ড। তারপর মুখ খুললেন আস্তে আস্তে। বিহ্বল ভাবটা এখনও কাটেনি। 'হামলা হওয়ার সাথে সাথে

নিচে নেমে আসি আমি। আমাদের উপর নির্দেশ ছিল যে কোনও মূল্যে আপনাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।'

মাথা নেড়ে সায় দিল লিনা।

'তবে বেশ দ্রুত শত্রুরাও নিচে নেমে আসে। লোকগুলোকে দেখতে পেয়ে পাথরের বোল্ডারের আড়ালে লুকিয়ে পড়ি আমি। ড. রাইটসন আর আরনডকে নিয়ে বেরিয়ে যায় ওরা। হামলাকারীরা পরিমাণে অনেক বেশি হওয়ায় পাল্টা আক্রমণ করার সুযোগ পাইনি। তাছাড়া আমি গুলি করলে দুই ডক্টরের কারও গায়ে লেগে যাবার সম্ভাবনা ছিল। ওদের সাথে আপনারা দু'জন বেরোননি দেখে আমিও আর লুকানো জায়গা থেকে বের হইনি। ভেবেছিলাম, লোকগুলো চলে গেলে আপনাদের খুঁজতে যাব। তারপর কোনওভাবে খবর পাঠাব বাইরে।'

'আমরাও তাই ভেবেছিলাম,' মন্তব্য করল প্রজননবিদ।

আবারও উপর দিকে তাকালেন জেরার্ড। 'লোকগুলো চলে যাওয়ার পর লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে আসছিলাম... তারপর...আর কিছু মনে নেই।'

'গুহামুখটা ধ্বসিয়ে দেয় ওরা,' ব্যাখ্যা করল লিনা। 'সম্ভবত তখনই মাথায় আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারিয়েছিলেন।'

মাথা নেড়ে সায় দিলেন আর্মি কমান্ড্যান্ট। 'হতে পারে।'

'পানি বাড়ছে,' সতর্ক করার প্রয়াস পেল রোল্যান্ড। 'যতটুকু সম্ভব, উঁচু স্থানে চলে যেতে হবে আমাদের।'

সামনে এগিয়ে বেল্ট থেকে একটা ফ্ল্যাশলাইট খুলে এনে জ্বাললেন জেরার্ড। ওদিকের নিচু টানেলটা প্রায় ডুবে গেছে।

লিনা যোগ দিল তার সাথে। 'ফাদার নোভাক ঠিকই বলেছেন।'

মাথা নাড়লেন কমান্ড্যান্ট। 'উদ্ধারকারী দলের পৌঁছাতে বেশ দেরি হবে।'

'তাহলে কী করব আমরা?' রোল্যান্ডের গলায় উৎকণ্ঠা।

পিছিয়ে এসে নিজের লুকিয়ে থাকা তাকটার দিকে ইঙ্গিত করলেন জেরার্ড। ওটা আসলে আরেকটা টানেলের প্রবেশমুখ, পানি জমা মেঝে থেকে প্রায় চার ফুট উচ্চতায় হাঁ করে আছে।

কিন্তু এর গন্তব্য কোথায়?

পকেট থেকে হাতে আঁকা একটা মানচিত্র বের করে আনলেন জেরার্ড। লিনা উঁকি দিয়ে বুঝতে পারল, জিনিসটাতে গুহাগুলোর গতিপথের ব্যাপারে বিস্তারিত উল্লেখ আছে।

'আমরা এখানে আছি,' এক জায়গায় আঙুল রাখলেন আর্মি কমান্ড্যান্ট। 'রাইটসনের নিরীক্ষা অনুযায়ী, এই টানেলগুলো পাহাড়ের ভেতরে গিয়ে মিশেছে,

একেবারে ডুলা'র গহ্বর পর্যন্ত।' বলে তরুণ যাজকের দিকে তাকালেন তিনি। দ্বিধা-মিশ্রিত দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল রোল্যান্ড।

'মানে?' অবাক হয়েছে লিনা।

'অগুলিন হয়েই তো এখানে এসেছেন আপনি, তাই না?'

'হ্যাঁ,' মাথা নেড়ে সায় দিল প্রজননবিদ। মনে মনে কল্পনা করছে পাথুরে দুর্গ আর পুরনো বাড়িঘর সমৃদ্ধ শহরের দৃশ্য।

'ক্রোয়েশিয়ার সবচাইতে বড় গোলকধাঁধার উপর বসে আছে অগুলিন। বিশ কিলোমিটারের চাইতেও লম্বা প্যাঁচানো টানেল, ভূ-গর্ভস্থ লেক ইত্যাদি লুকানো আছে ওখানে। আর শহরের একেবারে মাঝখানে তার খোলামুখ।'

'শহরের মাঝখানে!'

'হ্যাঁ,' ব্যাখ্যা করল রোল্যান্ড। 'পাশ্ববর্তী পাহাড়ের পাদদেশে বইতে থাকা ডোবরা নদীটা সঙ্কীর্ণ হয়ে, গহ্বর দিয়ে গোলকধাঁধায় ঢুকে পরিণত হয়েছে পাতাল নদীতে। ওই জায়গাটাকেই বলা হয় ডুলার গহ্বর। কথিত আছে- বুড়ো, নিষ্ঠুর স্বামীর হাত থেকে বাঁচার জন্য ডুলা নামের এক মেয়ে আত্মহত্যা করে ওখানে। সেই থেকেই এমন অদ্ভূত নাম।'

জেরার্ডের দিকে ফিরল লিনা। 'আপনার ধারণা, এই টানেল ওই গুহা হয়ে ডুলার গহ্বরে গিয়ে উন্মুক্ত হয়েছে?'

'আমি না,' জবাব দিলেন তিনি। 'রাইটসন বিশ্বাস করত এটা। কিন্তু কখনো খতিয়ে দেখা হয়নি।'

'মোট দূরত্ব কতখানি?'

উত্তরটা রোল্যান্ডের মুখ থেকে বেরোল। 'মোটামুটি সাত কিলোমিটারের মতো।'

'আমার ব্যাগে দড়ি, ক্লাইম্বিং গিয়ার, আর ফ্ল্যাশলাইটের অতিরিক্ত ব্যাটারি আছে,' প্রস্তাব করলেন ফ্রেঞ্চ কমান্ড্যান্ট।

মনে ক্রমাগত দানা বাঁধতে থাকা ভয়টাকে চাপা দেয়ার বৃথা চেষ্টা করল লিনা। 'পুরো গুহাই যদি পানিতে ভেসে গিয়ে থাকে?'

শ্রাগ করলেন জেরার্ড। 'জানি না। এদিকের পরিস্থিতিও তো সুবিধার নয়।'

মেয়েটার দিকে ফিরে তাকাল রোল্যান্ড। 'কী করবেন বলুন। আপনি এখানে থাকতে চাইলে জোর করব না। আমিও থেকে যাব তাহলে।'

টানেলে আলো ফেলল লিনা। কে জানে, কোন বিপদ ওঁত পেতে আসছে সামনে। তবে জেরার্ডের কথাই ঠিক। নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য বসে না থেকে এগিয়ে যাওয়াই ভালো।

'চলুন তাহলে।'

বিকেল ৪:০৪

ঝড়ের প্রকোপে শুকনো পাতার মতো কাঁপছে হেলিকপ্টারটা। কাঁধের কাছে হাতলটা শক্ত করে ধরল গ্রে। জানালার ওপাশে বৃষ্টি যেন পানির নিরেট আবরণ সৃষ্টি করেছে। দেখা যাচ্ছে না বলতে গেলে তেমন কিছু। সূর্যাস্তের এখনও কয়েক ঘন্টা বাকি, তবে দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় প্রায় অন্ধকার হয়ে আছে চারপাশ।

কন্ট্রোল স্টিকটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে পাইলট। প্রতি পলে বাতাস চাপড় বসাচ্ছে যান্ত্রিক ফড়িং-এর ধাতব গায়ে। অবশেষে সামনের উপত্যকায় মিটমিট করতে থাকা আলোর দেখা পাওয়া গেল।

'অগুলিন!' রেডিওতে ভেসে আসা পাইলটের কণ্ঠে উচ্ছ্বাস। 'আপাতত এখানেই থামতে হবে আমাদের। সামনের পাহাড়ের অবস্থা আরও ভয়াবহ।'

শেইচানের দিকে তাকাল গ্রে, জবাবে শ্রাগ করল মেয়েটা।

আধ ঘন্টা আগে ক্রোয়েশিয়ার জাগরেবে পৌঁছায় ওরা। ওখান থেকেই এই হেলিকপ্টারে সওয়ার হতে হয়েছে। হারিয়ে যাওয়া ফ্রেঞ্চ ইউনিটের সর্বশেষ পাঠানো কো-অর্ডিনেট মাত্র পনেরো মিনিটের পথ হলেও, ঝড়ের কারণে ত্রিশ মিনিটে এখনও অগুলিন পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

সামনের দিকে চোখ ফেরাল গ্রে। সময় গড়ানোর সাথে সাথে রিসার্চ দলটার উদ্ধার পাওয়ার আশা পাল্লা দিয়ে কমছে। 'অবতরণ করুন।'

মাথা নেড়ে সায় দিল পাইলট। এই কথাটারই অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ। আস্তে আস্তে কাছে চলে আসছে তার গন্তব্য। 'শহরের একপ্রান্তের মাঠে নামতে চলেছি আমরা। একটা গাড়ি আপনাদেরকে হোটেলে নেয়ার জন্য উপস্থিত থাকবে। ঝড় কমলে না হয় আবার বেরোনো যাবে।'

কথাটায় পাত্তা দিল না গ্রে। 'সাইটে পায়ে হেঁটে পৌঁছাতে কতক্ষণ লাগবে?'

কথাটা শুনে বেশ অবাক হয়েছে পাইলট। 'গাড়ি করে জেলস্কো গ্রামে যেতে পারেন আপনারা। ওখান থেকে চল্লিশ মিনিট পাহাড় বাইতে হবে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, হিসাবটা ভালো আবহাওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পাহাড়ি পথে এই অবস্থায় সব ট্রেইল মুছে গেছে। হারিয়ে যেতে খুব একটা সময় লাগবে না আপনাদের।'

কথাটার সত্যতা প্রমাণের জন্যই যেন প্রবল বাতাসের ঝাপটায় দুলে উঠল হেলিকপ্টার। কথা থামিয়ে যান্ত্রিক ফড়িংটা নিয়ন্ত্রণে মন দিল পাইলট।

পকেট থেকে ফোন বের করে মিশন সম্পর্কিত তথ্যগুলো পর্দায় নিয়ে এল গ্রে। জাগরেবে আসার পথে সবকিছু একাধিকবার পড়ে নিয়েছে সে। এই মুহূর্তে কার সাহায্য দরকার, তা খুব ভালো করেই জানে।

শেইচানকে স্ক্রিনে ফুটে ওঠা একটা ছবি দেখাল সিগমা কমান্ডার। কাঁচাপাকা চুলওয়ালা মধ্যবয়স্ক লোকটার পরনে ক্লাইম্বিং হার্নেস। 'ফ্রেডরিক হরভাট, স্থানীয় পাহাড়ে চড়া ক্লাবের দলপতি। তার দলই সর্বপ্রথম গুহাটাতে ঢুকে খবর দেয় ফ্রেঞ্চ আর্মিকে।'

'শহরেই থাকেন তিনি?'

'হ্যাঁ। এই অঞ্চলের পাহাড়গুলোকে তার চাইতে বেশি আর কেউ চেনে না। তাকে যদি গাইড হিসেবে পাওয়া যায়...'

সোজা হয়ে বসল শেইচান। 'তাহলে সকাল পর্যন্ত বসে থাকতে হবে না আমাদের।'

মাথা নেড়ে সায় দিল গ্রে। 'লোকটার ঠিকানাও আছে এখানে।'

ততক্ষণে একটা মাঠে হেলিকপ্টার নামিয়ে এনেছে পাইলট। পার্শ্ববর্তী রাস্তা থেকে একটা সেডান গাড়ি এগিয়ে আসতে দেখা গেল। এটাই তাদের বাহন। সাথে সাথে ব্যাকসিটে উঠে বসল দুই সিগমা এজেন্ট।

তরুণ ড্রাইভারের নাম ড্যাগ। হাসিমুখে গাড়ি ছাড়তেই গ্রে ফ্রেডরিকের ঠিকানাটা বাড়িয়ে দিল তার দিকে।

'আহ, ফ্রেডরিক... আমি চিনি তাকে,' ড্রাইভারের মুখের হাসি আরও খানিকটা বিস্তৃত হলো।

'ভদ্রলোককে ফোন করেছি আমি,' মন্তব্য করল সিগমা কমান্ডার। 'কেউ রিসিভ করেনি।'

'সম্ভবত হোটেল ফ্র্যাঙ্কোপ্যানের সরাইখানায় আছেন তিনি। ঝড়ের সময় অনেকেই ওখানে ব্র্যান্ডি খেতে যায়।'

কাছাকাছি কোথাও বাজ পড়ায় বিকট আওয়াজে কেঁপে উঠল গাড়িটা। আরও কয়েকবার ফোন করার পর হাল ছেড়ে দিল গ্রে। 'সরাইখানাতেই যাওয়া যাক,' ড্যাগের উদ্দেশ্যে কথাটা বলে সে নজর ফেরাল শেইচানের দিকে। 'লোকটাকে ওখানে না পাওয়া গেলেও হয়ত হোটেলে অন্য কোনও গাইডের খবর পাব।'

ঝড়ো হাওয়া কেটে এগোচ্ছে সেডান। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল গ্রে। সরু পথ, গাছগাছালিতে ছাওয়া ছোট ছোট পার্ক, লাল টালির ঘর-বাড়ি... শান্ত শহরটা যেন রূপকথার পাতা থেকে উঠে এসেছে। অবশেষে পুরনো, পাথুরে একটা দুর্গের সামনে এসে দাঁড়াল গাড়িটা।

'ফ্র্যাঙ্কোপ্যান দুর্গ,' ঘোষণা করল ড্যাগ। 'বর্তমানে অবশ্য হোটেল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সরাইখানাটাও ভবনের ভেতর। চলুন, ফ্রেডরিককে খুঁজে বের করা যাক।'

ড্রাইভারের পিছু নিয়ে ভেতরে ঢুকল গ্রে আর শেইচান। পুরনো কাঠের আসবাব সমৃদ্ধ চুনকাম করা লবিটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রিসিপশনিস্টকে দেখে হাত নাড়ল ড্যাগ।

'হ্যালো, ব্রিজিটা!'

আলতো করে মাথা নাড়ল মহিলা। চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি।

'মনে হচ্ছে, ছোট্ট শহরটার সব বাসিন্দাই একে অপরকে চেনে,' মন্তব্য করল গ্রে।

'এবং যারা বাইরে থেকে আসে, তাদেরকেও,' যোগ করল শেইচান।

অস্বাভাবিক ব্যাপারটা গ্রে-ও ধরতে পেরেছে। 'কী হয়েছে এখানে?' ভিড়ের ফাঁক দিয়ে বার কাউন্টারের দিকে এগোতে এগোতে বিড়বিড় করল সে। উপস্থিত সবাই কেমন যেন সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওদের দিকে।

মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'ঠিকই বলেছ। কিছু একটা গন্ডগোল আছে।'

'যারাই ফ্রেঞ্চ ইউনিটটাকে আক্রমণ করে থাকুক-' ব্যাখ্যা করল সিগমা কমান্ডার। '-এই শহর হয়েই যেতে হয়েছে ওদের। হতে পারে, এই হোটেলেই থেকেছে। লোকজনের এই ব্যাপারে কিছু জানা থাকতে পারে।'

চোখ কুঁচকে গ্রে-র দিকে তাকাল শেইচান। 'এমনও তো হতে পারে, এখনও এখানেই আছে ওরা?'

কথাটা শেষ হতে না হতেই গুলিবর্ষণের আওয়াজ ভেসে এল।

সম্ভবত তাই...

বিকেল ৪:২৪

গর্তে পা দিয়ে পিছলে পড়ছিল রোল্যান্ড, কমান্ড্যান্ট জেরার্ড হাত ধরে তাকে থামালেন।

'আর কতদূর?' একপাশের দেয়াল ধরে ধরে এগোচ্ছে লিনা, দুই ঘন্টা যাবত হাঁটার ফলে মুখে একইসাথে ক্লান্তি আর ভয়ের ছাপ।

পকেট থেকে মানচিত্র বের করে চোখ বুলালেন জেরার্ড। অনেক আগেই ব্রিটিশ ভূ-তাত্ত্বিকের চিহ্নিত করা সীমানা পেরিয়ে এসেছেন। এই অংশের কোন চিহ্ন কাগজটাতে আঁকা নেই। পথ হারানো রোধ করতে, কম্পাসের সাহায্যে দিক নির্ণয় করে এগোনোর পথটা পেন্সিলের সাহায্যে মানচিত্রে তুলে রাখছেন ফ্রেঞ্চ সৈনিক।

'সম্ভবত খুব বেশি দূরে না,' জবাব দিল রোল্যান্ড। তবে কথাটা কতখানি সত্যি, এ ব্যাপারে তার নিজের জ্ঞানও শূন্যের কোঠায়।

একটা শব্দ কানে আসতেই পিঠ সোজা করে দাঁড়াল লিনা। 'শুনুন...'

ভালো করে কান পাততেই বাকি দুজনও আওয়াজটা শুনতে পেল।

'নদী,' উত্তরটা জেরার্ডের মুখ থেকে এল।

এখনও পর্যন্ত কোনও পানির স্রোতের মুখে পড়তে হয়নি ওদের। আসার পথে টানেলের কোনও অংশে ছোট ছোট জলা অবশ্য ছিল, তবে সেগুলোর কোনওটাই আজকের ঝড়-বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট নয়।

বিড়বিড় করে প্রার্থনা করলেন জেরার্ড, নদীটা যেন পার হওয়ার মতো সরু হয়। তারপর আবার এগোনোর আদেশ দিলেন।

আবার শুরু হলো পথচলা। সামনে এগোনোর সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে উঁচু হচ্ছে টানেলের ছাদ। জায়গায় জায়গায় স্ট্যালাকটাইটের দন্ড বেরিয়ে এসেছে মেঝে ফুঁড়ে। সেই সাথে ক্রমেই বাড়ছে পানি প্রবাহের আওয়াজ।

'রোল্যান্ড!' যাজকের হাত আঁকড়ে ধরে দৃষ্টি আকর্ষণ করল প্রজননবিদ। 'দেখুন...আরেকটা গুহাচিত্র!'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রোল্যান্ড। বাইসন, ভালুক, হরিণ ইত্যাদিসহ আসার পথে বেশ কিছু ছোট ছোট ছবি নজরে পড়েছে ওদের। এক জায়গায় একটা চিতাবাঘও ছিল। যার মানে দাঁড়ায়, শুধু বাইরের গুহাটাই নয়, বরং অপেক্ষাকৃত ভেতরদিকেও নিজেদের বিস্তারের সাক্ষর রেখে গেছে গুহাবাসীরা।

এক পা সামনে বাড়ল লিনা। 'কিন্তু এটা কোনও পশুর ছবি না।'

ফ্ল্যাশলাইটের আলোয়, প্রায় দুই তলা বাড়ির সমান উঁচু একটা মহিলার ছবি ফুটে উঠল চোখের সামনে। লালচে রঙে আঁকা গোল গোল চোখ দুটো যেন তাদের দিকে তাকিয়ে অগ্নিদৃষ্টি হানছে। মহিলার কপালে ষড়ভূজাকৃতি তারার প্রতিকৃতি আঁকা, অনেকটা আগের গুহায় দেখা হাতের ছাপে তৈরি ছবিগুলোর মতো।

'কী মনে হয়?' প্রজননবিদের কণ্ঠে নিখাদ বিস্ময়। 'ছবিটা কী চ্যাপেল থেকে আগে সরিয়ে নেয়া মহিলাটার হতে পারে?

শত বছর আগে ফাদার অ্যাথেনাসিয়াস কার্কার যেটা সরিয়েছিলেন এই গুহা থেকে...

'অবশ্য এখানে দেখা ছবিগুলোর মধ্যে এটাই একমাত্র মানুষের,' যোগ করল সে।

আগের গুহায় ভৌতিক আলোয় দেখা যুদ্ধরত অবয়বগুলো বাদে...

বিশাল ছবিটার হাঁটুর অংশ থেকে আরেকটা টানেলের মুখ দেখা যাচ্ছে। সামনে এগোতেই বোঝা গেল, এটা আসলে পার্শ্ববর্তী টানেলে ঢোকার একটা বাঁকানো রাস্তা।

'বাদ দিন,' বলে উঠলেন জেরার্ড। 'এখন এত সব ভাবার দরকার নেই। সময় ফুরিয়ে আসছে।'

বাড়তে থাকা পানির গর্জন যেন তার কথাটাকে সমর্থন যোগাচ্ছে।

তবে কথাটায় কান দেয়নি লিনা। মৃত্যুভয়ের কাছে হার মেনেছে কৌতুহল। হামাগুড়ি দিয়ে পাশের টানেলে ঢুকে পড়ল সে। রোল্যান্ডও তার পিছু নিয়েছে।

পরবর্তী গুহাটার আয়তন বেশ ছোট। আগা-গোড়া মিলিয়ে পাঁচ মিটারের বেশি হবে না। তবে গুহাচিত্রের পরিবর্তে দেয়ালে সার বেঁধে কতগুলো কুলুঙ্গি বানানো। খোপ খোপ গর্তগুলো দেয়ালের ভেতরদিকে ঢুকে গেছে।

দৃশ্যটা দেখে কপালে উঠে গেল রোল্যান্ডের চোখ দুটো। একটা কুলুঙ্গিও খালি নেই, প্রাগৈতিহাসিক আমলের প্রানির মূর্তিতে বোঝাই সবগুলো। শিয়াল, ভালুক, সিংহ, বাইসন, হরিণ...কী নেই! মাঝের একটা গর্ত থেকে উঁকি দিয়ে আছে লোমশ ম্যামথ। উপরদিকের কুলুঙ্গিগুলোতে স্থান পেয়েছে হরেক রকম পাখি। শত শত বছর ধরে জমা ক্যালসাইটের স্বচ্ছ আবরণের নিচে সংরক্ষিত হয়ে আছে সব।

হাঁ করে থাকা চিতার মূর্তির দিকে ইশারা করল লিনা। 'এগুলো সম্ভবত স্থানীয় লোকেদের টোটেম হিসেবে ব্যবহৃত হত। মূর্তিগুলো যদি আসলেই নিয়ানডারথালদের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে এযাবৎকাল পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে সব ধ্যান-ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হবে।'

সায় জানিয়ে সবচেয়ে বড় ছিদ্রটার দিকে তাকাল রোল্যান্ড। কলুঙ্গিটার দুই পাশে লালচে দুটো হাতের ছাপ তার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে। সম্ভবত শুকনো রক্ত।

লিনা যোগ দিল তার সাথে। 'বাম পাশের ছাপটার আঙুল ভাঙা, পুরনো চ্যাপেলের পেছনে যেমনটা দেখেছিলাম,' বলে ডান দিকের ছাপের দিকে ইশারা করল সে। 'আর এটা... বাজি ধরে বলতে পারি, নিয়ানডারথাল পুরুষের কবরের উপর ছিল।'

ভ্রু কুঁচকে মেয়েটার দিকে তাকাল যাজক। 'আবারও এই দু'জন!'

'মনে হচ্ছে, স্থানীয়দের কাছে এরা বিশেষ সম্মানিত কেউ ছিল- দলের প্রধান, আর নয়ত শামান।'

সবার নিচে থাকা কুলুঙ্গিটার দিকে আলো তাক করল রোল্যান্ড। বাকিগুলোর মতো এটার ভেতর কোনও মুর্তি নেই, বরং মোড়কে আবৃত কিছু একটা রাখা আছে।

সাবধানে জীর্ণ কাপড়ে মোড়া জিনিসটা উঠিলে আনল তরুণ যাজক। তেলতেলে স্পর্শ লাগল হাতে। 'এটা অন্তত প্রাগৈতিহাসিক আমলের জিনিস নয়।'

কাছে ঘেঁষে এল লিনা। 'কী এটা?'

উপরের কাপড়টা ছিঁড়ে ফেলতেই, ভেতর থেকে চামড়ায় মোড়া একটা বই বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। জিনিসটার প্রচ্ছদের উপর অদ্ভূত একটা চিহ্ন খোদাই করা।
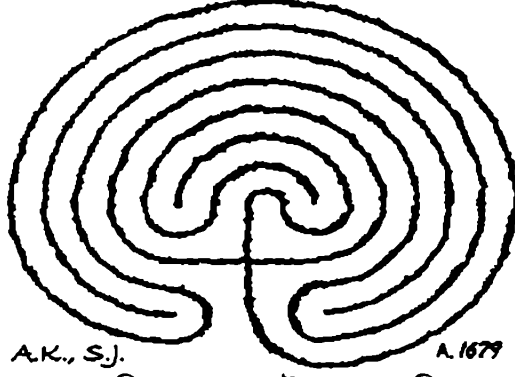
ছবিটা বেশ অবাক করেছে লিনাকে। 'এটা তো মস্তিষ্কের লম্বচ্ছেদ বলে মনে হচ্ছে।'

হাসল রোল্যান্ড। পেশার খাতিরে কাঠামোটা মস্তিষ্ক রূপে ধরা দিয়েছে ওর চোখে। 'আমার মনে হয়, এটা একটা গোলকধাঁধা,' বলল তরুণ যাজক। মানুষ আঁকাআঁকি শুরু করার সময় থেকেই এরকম কাঠামো বানানোর হিড়িক শুরু হয়।

'কিন্তু এর মানে কী?'

'বুঝতে পারছি না। তবে ছবিটার নিচে সাইনগুলো দেখুন।'

জোরে জোরে লেখাগুলো পড়তে লাগল লিনা। 'এ.কে...তারপর এস.জে.।'

হঠাৎই লেখাগুলোর অর্থ পরিষ্কার হয়ে গেল রোল্যান্ডের চোখে। 'এ.কে, মানে অ্যাথেনাসিয়াস কার্কার। আর এস.জে. মানে হচ্ছে সোসাইটি অফ জিসাস।'

সারা জীবন আদর্শ হিসেবে মানা একজনের স্মৃতি হাতে ধরে আছে, ভাবতেই থর-থর করে কেঁপে উঠল রোল্যান্ড। কাঁপা কাঁপা হাতে প্রথম পৃষ্ঠা খুলতেই, ভেতর থেকে ঠং করে ধাতব কিছু একটা গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

ঝুঁকে জিনিসটা তুলে নিল লিনা। 'একটা চাবি।'

আলোর সামনে ধরতেই দেখা গেল, কারুকাজ করা চাবিটার মাথায় ধনুকাকৃতিতে সাজানো মানুষের খুলির নিচে বসে আছে দেবদূতের মতো এক প্রতিকৃতি।
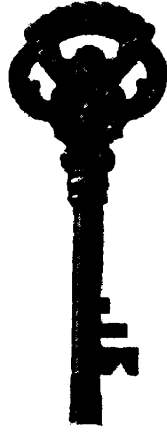
জিনিসটা দেখার সাথে সাথে কেন যেন গুহা থেকে চুরি হওয়া হাড়গুলোর কথা মনে পড়ল রোল্যান্ডের।

এসবের মানে কী?

উত্তরের খোঁজে বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে শুরু করল সে। তবে চামড়ার তৈরি প্রচ্ছদের মতো ধকল সইতে পারেনি কাগুজে পৃষ্ঠাগুলো। কালের বিবর্তনে থকথকে মণ্ডে পরিণত হয়েছে সব। ভেতরের লেখাগুলো পড়ার বিন্দুমাত্র জো নেই।

এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে দু'জনের কান্ডকারখানা দেখছিলেন জেরার্ড। এবার আর চুপ থাকতে পারলেন না। 'আমাদের এখন রওনা হওয়া উচিত।'

শেষবারের মতো বই রাখা কুলুঙ্গিটাতে হাত বুলাল লিনা। পেল না নতুন কিছু। 'ক্যালসাইটের ভাঙা স্তর হাতে লাগছে। মনে হয়, এখানেও কিছু একটা রাখা ছিল। পরে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।'

টোটেমগুলোর দিকে চোখ বুলাল রোল্যান্ড। আন্দাজ করার চেষ্টা করছে, কত শত বছর আগে এখানে রাখা হয়েছিল জিনিসগুলো। 'সম্ভবত ফাদার কার্কারই গর্তটা থেকে সরিয়ে ফেলেন কিছু, তারপর নিজের চিহ্ন সম্বলিত বইটা রেখে যান এখানে। হয়ত জিনিসটা কোথায় নেয়া হয়েছে, সেই ব্যাপারে সংকেত দেয়ার প্রচেষ্টা এটা।'

মাথা নাড়ল লিনা। 'কোনও বিশেষজ্ঞের সাহায্য পেলে হয়ত আমরা বইটা থেকে কিছু উদ্ধার করতে পারব।'

রোল্যান্ডের মনে অবশ্য ঘোর সন্দেহ আছে, আদৌ এই মন্ড থেকে কিছু পাওয়া যাবে কি না। মুখে বলল, 'তার জন্য আমাদের আগে এখান থেকে বেরোতে হবে।'

বাইরের টানেলে বেরিয়ে এল সবাই। পানির আওয়াজ আগের চাইতে আরও অনেক বেড়ে গিয়েছে।

আবারও শুরু হলো পথ চলা।

বিকেল ৪:৪৮

বারের দিক থেকে এসেছে গুলির আওয়াজ।

হলওয়ে ধরে ছোটাছুটি শুরু করেছে লোকজন। গ্রে আর শেইচানকে অতিক্রম করে দৌড়াচ্ছে মূল প্রবেশপথের দিকে। ড্যাগের হাত ধরে লবির দিকে ঠেলা মারল সিগমা কমান্ডার। 'পুলিশকে খবর দাও।'

সাথে সাথে নিজেও মিশে গেছে দেয়ালের সাথে। হাতে বেরিয়ে এসেছে গুলি ভরা সিগ সওয়ার পিস্তল। উল্টোদিকের দেয়ালে সেঁটে আছে শেইচান। এক হাতে সিগ সাওয়ার, অন্য হাতে একটা ধারালো চাকু। নিচু হয়ে বারের দিকে এগোতে লাগল দুই সিগমা এজেন্ট।

দরজার কাছাকাছি পৌঁছাতেই ড্যাগকে ফিরে আসতে দেখা গেল। গ্রে-দের হাতে অস্ত্র দেখে জমে গেছে জায়গায়।

ছেলেটাকেও দেয়ালের সাথে মিশে থাকতে ইশারা করল গ্রে। ততক্ষণে বারের দরজার সামনে পৌঁছে গেছে শেইচান। এক হাতে ফ্রেম ধরে ভেতরে উঁকি দেয়ার প্রয়াস পেল মেয়েটা।

গুলির আওয়াজ থেমে গেলেও ঘরটাতে ক্রোয়েশিয়ান ভাষায় চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। তার মানে দাঁড়ায়, লোকজনদের বন্দি করা হয়েছে।

কী হচ্ছে এসব!

উত্তরটা ড্যাগের মুখ থেকে এল। 'লোকের কাছে শুনলাম, কয়েকজন অস্ত্রধারী ডাকাত হামলা করেছে হোটেলে। একজনের পায়ে গুলিও করেছে। দাবি জানাচ্ছে, ফ্রেডরিক যেন নিজে থেকে তাদের কাছে ধরা দেয়।'

শেইচানের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল গ্রে। তার মানে, পাহাড়ে চড়া লোকটার কাছে তারা একা আসেনি। পাহাড়ে হামলার সাথে নিশ্চয়ই এসবের কোনও সম্পর্ক আছে। কেউ নিশ্চিত হতে চাইছে, খবরটা শহরে পৌঁছেছে কি না।

'ফ্রেডরিক কোথায়? জিজ্ঞেস করল গ্রে।

জবাবে বারের দিকে ইশারা করল তরুণ ড্রাইভার।

'তার মানে, এখনও এখানেই আছে লোকটা।'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ড্যাগ। 'পেছনদিকের বাথরুমে। তবে খবরটা শুধু হাতেগোনা কয়েকজন জানে।'

'বাথরুম থেকে বাইরে বেরোনোর কিংবা ভেতরে ঢোকার কোনও পথ আছে? কোনও জানালা?'

'জানালা...হ্যাঁ, আছে। তবে বেশ ছোট।'

ফাঁদে পড়ে গেছে লোকটা...

গ্রে বুঝতে পারল, ফ্রেডরিকের লুকিয়ে থাকার কথা ফাঁস হতে বেশিক্ষণ লাগবে না। চোখের দৃষ্টিতে শেইচানকে সেদিকে এগোনোর ইঙ্গিত করল সে। ইশারাটা ধরতে পেরেছে মেয়েটা, মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে টেনে ধরল ড্যাগের জামার কলার।

'চলো, তুমি আমাকে পথ দেখাবে।' বলে ছেলেটাকে নিয়ে হলওয়ে ধরে উধাও হয়ে গেল সাবেক আততায়ী।

দরজার ফোঁকরে চোখ রাখল গ্রে। ভেতরে চারজন হামলাকারী দেখা যাচ্ছে। ভারী কোনও অস্ত্র নেই। সবার হাতেই পিস্তল। বুথের সামনে দাঁড়ানো দু'জন। একজন অস্ত্র তাক করে ধমকাচ্ছে মেঝেতে শুয়ে থাকা এক লোককে। তার গুলি খাওয়া পা থেকে রক্ত বেরিয়ে ছোটখাট একটা পুকুর তৈরি করেছে। পিস্তল হাতে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে আরেকজন।

গ্রে দেখতে পেল, বুথে অস্ত্রের মুখে থাকা একজন বাথরুমের দিকে হাত তুলে ইশারা করছে। ফাঁস হতে চলেছে ফ্রেডরিকের লুকিয়ে থাকার জায়গা।

সময় শেষ...

এমন সময় গুলির আওয়াজ ভেসে এল হোটেলের পেছনদিক থেকে। সংকেত পাঠিয়েছে শেইচান। তবে সাথে সাথে বাথরুমের দিকে ঘুরে গেছে সব হামলাকারীদের চোখ। ধীরে সুস্থে নিশানা স্থির করল গ্রে। পরপর দুটো গুলি পাঠাল বুথের উদ্দেশ্যে।

নিখুঁত লক্ষ্যভেদ। দুটোই একেবারে মাথায়। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল বুথের সামনে দাঁড়ানো দুই অস্ত্রধারী।

গ্রে কিন্তু মজা দেখার জন্য থেমে নেই। হাত বাঁকিয়ে তৃতীয়জনের পায়ে গুলি করল সে। মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়ল হতভাগা লোকটা। হাঁটু গুড়িয়ে গেছে সাথে সাথে।

ঘটনার আকস্মিকতায় বেশ ভয় পেয়েছে চতুর্থ অস্ত্রধারী। পাশার দান উল্টে গেছে। কোনওরকমে হাঁচড়েপাচড়ে একমাত্র আড়ালের দিকে ছুট লাগাল সে। জানের মায়া বড় মায়া। মুহূর্তের ব্যবধানে ঢুকে পড়ল মহিলাদের জন্য নির্ধারিত বাথরুমে। পাশেরটাতেই লুকিয়ে আছে ফ্রেডরিক।

অস্ত্র উঁচিয়ে সেদিকে এগোল গ্রে। তবে এক সেকেন্ড পর পেছন দিক থেকে কাচ ভাঙার আওয়াজের সাথে ভেসে এল গুলির আওয়াজ।

শেইচান।

পেছনের জানালা দিয়ে চির জীবনের মতো লোকটার হামলা করার সাধ মিটিয়ে দিয়েছে সে।

হাঁফ ছেড়ে ঘরের একমাত্র জীবিত অস্ত্রধারীর দিকে ফিরল গ্রে। পায়ের ব্যথায় কাতরাতে থাকা হামলাকারী বুঝতে পেরেছে, তার পক্ষে একা একা কিছু করা সম্ভব না। তাই সরাসরি নিজের মাথায় পিস্তল তাক করল সে। টিপে দিল ট্রিগার।

বুম...

বজ্রপাতের মতো গ্রে-র কানে আঘাত করল আওয়াজটা।

ধুশ শালা...

বাথরুমের দরজা ফাঁক করতেই দেখা গেল, জবুথবু হয়ে এককোনে বসে আছে ফ্রেডরিক। সাথে সাথে জানালা গলে উঁকি দিল ড্যাগ। 'ফ্রেডরিক... ইনি মি. গ্রে। ভয়ের কিছু নেই।'

আতঙ্কগ্রস্ত লোকটাকে শান্ত করার প্রয়াস পেল সিগমা কমান্ডার। প্রয়োগ করল বিমানে আসতে আসতে শেখা কয়েকটা ক্রোয়েশিয়ান শব্দ। 'যোভাম সে গ্রে...আমি গ্রে।' হাতের পিস্তলটা ততক্ষণে ঠাঁই করে নিয়েছে বেল্টে।

জানালা থেকে ড্যাগকে সরিয়ে দিয়ে উঁকি মারল শেইচান। 'এদিকে সব পরিষ্কার।'

খানিকটা ধাতস্থ মনে হচ্ছে ফ্রেডরিককে। 'ক...ক্ক...কী হয়েছে এখানে!'

দরজার দিকে ইশারা করল গ্রে। 'চলুন, অন্য কোথাও বসে এ ব্যাপারে আলোচনা করা যাক। ওই চারজনের সাথে আরও কেউ আছে কি না, কে জানে।'

ধীর পায়ে ফ্রেডরিককে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সিগমা কমান্ডার। ততক্ষণে তাদের সাথে যোগ দিয়েছে শেইচান আর ড্যাগ। দেরি না করে সেডানটার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল সবাই।

তরুণ ড্রাইভারকে গাড়ি ছাড়তে বলার আগেই কাঁপতে শুরু করেছে গ্রে-র স্যাটেলাইট ফোন। ক্যাট কল করেছে। ফোনটা সিসিভ করে কানে ঠেকাল সে।

'গ্রে, এই মাত্র ড. লিসা ক্রেন্ডালের ফোন থেকে একটা সিগন্যাল পেয়েছি। নেটওয়ার্ক যথেষ্ট দুর্বল থাকায়, কথা বলা সম্ভব না হলেও ওদের জিপিএস লোকেশনটা চিহ্নিত করা গেছে।'

'কোথায় আছে ওরা?'

'তোমার ফোনে লোকেশনটা পাঠাচ্ছি আমি।' বলে কল কেটে দিল সিগমার সেকেন্ড ইন কমান্ড।

সাথে সাথে গ্রে-র ফোনে ক্রোয়েশিয়ার একটা মানচিত্র ভেসে উঠল। এই গোটা গ্রামটা ঘোড়ার খুরের আকৃতির। অর্ধবৃত্তাকার কাঠামোর মাঝখানে একটা গভীর খাদ। ডোবরা নদী এখানে এসে হারিয়েছে ভূগর্ভে। জিপিএস লোকেশনের বিন্দুটা ঠিক ওখানেই মিটমিট করছে।

তবে চিন্তার কথা হলো, বিন্দুটার অবস্থান দেখে মনে হচ্ছে-ওটা মাটির নিচে।

অধ্যায় ছয়
২৯ এপ্রিল, সকাল ১১:০৩
লরেন্সভিল, জর্জিয়া

কল কেন ধরছ না!

ফোনটা কান থেকে নামিয়ে, ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল মারিয়া। গত দুই ঘন্টা যাবত বোনের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সে। দুশ্চিন্তা বাড়া ছাড়া কাজের কাজ বলতে গেলে কিছুই হয়নি।

ডারপা-র লিয়াজোঁ কর্মকর্তার সাথে কথা বলে জানা গেছে, ক্রোয়েশিয়ার সাইটে নাকি কী একটা সমস্যা হয়েছে। তবে বিস্তারিত তেমন কিছু জানাতে না পেরে, লিনার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়ে যেতে বলেছে লোকটা। আরও বলেছে, ওয়াশিংটন থেকে একটা তদন্তকারী দল আসছে তার সাথে কথা বলার জন্য। তাদের কাছ থেকে হয়ত পরবর্তী খবরাখবর জানা যাবে।

ফোনের দিকে তাকিয়ে সময় দেখল মারিয়া।

যে কোনও মুহূর্তে পৌঁছে যাবে তদন্তকারী দল।

বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিল মেয়েটা, চাইছে যতটা সম্ভব শান্ত থাকতে। কিন্তু সকালে বাকোর আচরণের ব্যাপারটা মাথা থেকে বের করা যাচ্ছে না। গরিলাটার দেখানো চিহ্নগুলো বারবার ভেসে উঠছে মনের পর্দায়।

ভয়...ভয়...ভয়...

'আমিও ভয় পাচ্ছি,' বদ্ধ ঘরে ফিসফিস করে কথাটা বেরিয়ে এল মারিয়ার মুখ দিয়ে। লিনা তার থেকে বয়সে মাত্র কয়েক মিনিটের বড়। কিন্তু এই কয়েক মিনিটই যেন দু'জনের মধ্যে যোজন যোজন ফারাক গড়ে দিয়েছিল, বড় হিসেবে দায়িত্ববোধ তৈরি করে দিয়েছিল লিনার মনে। মা বাইরে থাকাকালীন সে-ই খাবারদাবার গরম করত। দেখত, ছোট বোন ঠিক মতো হোমওয়ার্ক করেছে কি না।

আরও একবার বোনের নাম্বারে ডায়াল করল মারিয়া, কিন্তু ফলাফল শূন্য।

এমন সময় দরজার ওপাশ থেকে মৃদু আওয়াজ ভেসে এল। দরজা খুলতেই দেখা গেল, দু'জন আগন্তুকের সাথে দাঁড়িয়ে আছেন ডিরেক্টর লিওনার্ড ট্রাস্ক। সাথে অবশ্য পরিচিত এক মহিলাও আছে- অ্যামি ভু, ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনের হয়ে কাজ করে সে, সেই সাথে হোয়াইট হাউজের ব্রাইন প্রজেক্টের একজন ম্যানেজার হিসেবে

আছে। লিনা আর মারিয়ার রিসার্চের খরচ যোগানোর পেছনে তার ভূমিকা রয়েছে। পুরুষশাষিত কর্মক্ষেত্রে একসাথে কাজ করতে করতে বেশ ভালো একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে।

ট্রাস্ককে পেরিয়ে এসে মারিয়ার সাথে গলা মেলাল অ্যামি। মিষ্টি পারফিউমের সুগন্ধ ভেসে আসছে মহিলার শরীর থেকে। কান স্পর্শ করেছে ছেলেদের মতো ছোট করে ছাঁটা কালো চুল। মুচকি হেসে প্রত্যুত্তর জানাল সে ও।

সাথে থাকা আগন্তুক দু'জনের দিকে ইঙ্গিত করল অ্যামি। বারের দরজায় দাঁড়ানো গাট্টাগোট্টা নিরাপত্তারক্ষীর মতো দেখাচ্ছে তাদের। সুসজ্জিত স্যুটের নিচে কিলবিলে পেশীর অস্তিত্ব বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। ন্যাড়া মাথা আর রুক্ষ ভাবভঙ্গী দেখে মারিয়া আন্দাজ করল, লোকদুটো সম্ভবত মিলিটারি। মুচকি হেসে নড করল অপেক্ষাকৃত খাটো জন।

পরিচয় করিয়ে দিল অ্যামি। 'ডারপা থেকে এসেছেন এরা। মঙ্ক কক্কালিস, আর ইনি জোসেফ কোয়ালস্কি।'

'জো,' ভেতরে ঢোকার ফাঁকে ভুল শুধরে দিল লম্বা লোকটা। দরজার চৌকাঠে আটকানোর ভয়ে খানিকটা নিচু হয়ে ঘরে ঢুকতে হচ্ছে তাকে। মুখে রাজ্যের বিরক্তি।

পেছন পেছন ট্রাস্কও ঢুকতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু হাত তুলে তাকে বাধা দিল অ্যামি। 'ব্যাপারটা জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকিস্বরূপ। আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন, ডিরেক্টর।' বলে লোকটার মুখের উপর আটকে দিল দরজা।

দরজা বন্ধ হবার সাথে সাথে আবারও মুখ খুলল অ্যামি। 'লিনার ব্যাপারে হয়ত বেশ খানিকটা শুনেছ। বিস্তারিত অনুসন্ধান চলছে। তবে এখনও তেমন কিছু জানা যায়নি।'

'কতটুকু জান তুমি?'

'সাইটে দুর্বৃত্তরা হামলা করেছিল। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ফ্রেঞ্চ মিলিটারি ইউনিটের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ, এটুকুই।'

শক্ত হয়ে এল মারিয়ার শরীর। প্রতিটা কথা যেন বজ্রের মতো আঘাত হানছে বুকে। 'আর লিনা?'

'ভয় পেয়ো না। ঝড়ের কারণে যোগাযোগে অসুবিধা হচ্ছে। সেই সাথে কিছু ছোট ছোট ভূমিকম্পও আছে। ডারপা তদন্ত শুরু করেছে।' বলে মঙ্ক নামের লোকটার দিকে তাকাল অ্যামি।

মৃদু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল আগন্তুক। 'এয়ারপোর্ট থেকে এখানে আসার পথে একটা খবর পেয়েছি। লিনার সেলফোনটা ট্র্যাক করা সম্ভব হয়েছে। হামলাস্থল থেকে এখন বেশ খানিকটা দূরে আছে আপনার বোন।'

মারিয়ার এক হাত নিজের মুঠোয় তুলে নিল অ্যামি। 'তার মানে, লিনা হয়ত পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসছে।'

অনেক চেষ্টা করেও চোখের পানি আটকাতে পারল না মারিয়া। স্বস্তির পাশাপাশি ভয়ের আবেশও ছড়িয়ে পড়ছে মনে। 'কিন্তু আপনারা জানেন না, ওর সাথে কেউ আছে কি না। অপহৃত কিংবা আহতও হতে পারে।'

'তা ঠিক,' মাথা নাড়ল মঙ্ক। 'কিন্তু ওখানে পাঠানো লোকটাকে খুব ভালো ভাবে চিনি আমি। দায়িত্বে অবহেলা করার মানুষ না ও। ঠিকই খুঁজে আনবে আপনার বোনকে।'

মারিয়া প্রার্থনা করল, কথাটা যেন সত্যি হয়।

মঙ্কের কথা এখনও শেষ হয়নি। 'হামলার পেছনের কারণ অনুসন্ধান করার জন্যই আমরা এসেছি। সবার আগে জানতে হবে, কেন আক্রমণ করা হয়েছে রিসার্চ দলটাকে। কী নিয়ে কাজ করছিলেন আপনারা?'

'যা যা জানি, তা আপনাদের বলতে আপত্তি নেই আমার,' জবাব দিল মারিয়া। 'কিন্তু বুঝতে পারছি না, আমাদের গবেষণার সাথে এই হামলার সম্পর্ক কোথায়!'

'হতে পারে কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু সবদিকেই নজর রাখতে হবে আমাদের।'

'কী জানতে চান আপনারা?' জোর দিল মারিয়া।

'আপনাদের রিসার্চ সম্পর্কে আমাকে ব্রিফ করা হয়েছে,' উত্তর দিল মঙ্ক। 'তবে আমি সরাসরি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাইছিলাম।'

মাথা নেড়ে সায় দিল জিনবিদ। বুঝতে পেরেছে।

'শুনেছি আপনারা মানুষের বুদ্ধিমত্তার উৎস নিয়ে কাজ করছিলেন। দয়া করে এই ব্যাপারে আপনাদের মতবাদটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।'

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মারিয়ার মুখ দিয়ে। বলতে কোনও বাধা নেই। তবে বৈজ্ঞানিক ব্যাপার-স্যাপার এই মিলিটারির লোকগুলোর মাথায় কতখানি ঢুকবে, সেটা বুঝতে পারছে না। 'মানব ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায়- গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড নিয়ে কাজ করছি আমি আর আমার বোন। ব্যাপারটা একটু জটিল, আমি সহজ করে বোঝাচ্ছি। প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর আগে, সভ্যতার ক্ষেত্রে এক বিপুল বিস্ফোরণ লক্ষ্য করা যায়।'

মাথা নেড়ে সায় দিল মঙ্ক। 'মানুব-বুদ্ধিমত্তার জগতে বিগ ব্যাং।'

সরু চোখে লোকটার দিকে তাকাল মারিয়া। আন্দাজ করতে পারছে, কঠিন হাবভাবের আড়ালে লুকিয়ে থাকা মেধাবী মগজটার অভিব্যক্তি।

ঠিক আছে তবে...দেখা যাক, ওই টেকো মাথার জ্ঞানের দৌড় কতখানি।

'আধুনিক মানুষের আবির্ভাব হয় আজ থেকে প্রায় দুই লক্ষ বছর আগে। তারপর আদিম পূর্বপুরুষদের ধাপে ধাপে পরিবর্তনের মাধ্যমে আজকের মানুষে পরিণত

হয়েছি আমরা। শিকাগো ইউনিভার্সিটির তিনজন প্রজননবিদের গবেষণা অনুযায়ী, আমাদের বুদ্ধিমত্তার এই বিবর্তনের পেছনে মস্তিষ্কের মাত্র সতেরোটা জিনের মিউটেশন দায়ী। এই হাতে গোনা কয়েকটা মিউটেশনের ফলেই সাধিত হয় এক আকস্মিক পরিবর্তন। বিবর্তিত হতে শুরু করে লক্ষ-কোটি জিন। আর এ সবই ঘটে সীমিত একটা সময়ের ভেতর।'

চোখ কুঁচকাল মঙ্ক। 'তার মানে, এই সতেরোটা জিনের বিবর্তনই বুদ্ধির দিক দিয়ে শিম্পাঞ্জি আর বাঁদর গোত্রীয় প্রানিদের থেকে পৃথক বানিয়েছে আমাদের?'

নড করল মারিয়া। 'সেই সাথে দিয়েছে বিভিন্ন মানবিক গুণাবলি- সচেতনতা, সতর্কতা, বিবেক...' কথা শুনতে থাকা কৌতূহলী মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে বেশ মজা পাচ্ছে সে। পছন্দের বিষয় নিয়ে কথা বলতে পেরে কেটে যাচ্ছে বোনের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা। 'গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড থেকেই সবকিছুর উৎপত্তি। আগের দেড় লক্ষ বছর থেকে খুব আলাদা ছিল পরবর্তী পঞ্চাশ হাজার বছর। হ্যাঁ, মানছি লিপের আগেই পাথরের অস্ত্রপাতির ব্যবহার শিখেছিল মানুষ। কিন্তু তখন চিত্রকলা, সাজসজ্জা এমনকি মৃতদেহ সৎকার নিয়েও মাথা ঘামায়নি আমাদের পূর্বপুরুষ।'

'আর তারপর?' জানতে চাইল মঙ্ক।

'মহা বিস্ফোরণ। পাথরের ভোঁতা অস্ত্রের স্থান দখল করে হাড়ের তৈরি ধারালো অস্ত্রশস্ত্র। নতুন নতুন প্রশিক্ষণ পদ্ধতি আবিস্কৃত হয়, রঙ তৈরি করতে শেখে মানুষ, গুহাচিত্র এঁকে সাজাতে শুরু করে থাকার জায়গাগুলোকে, ধাতু গলিয়ে অঙ্গসজ্জার জন্য গয়না বানায়। উন্নত খাবার, যন্ত্রপাতি... মোদ্দাকথা, সত্যিকার আধুনিক মানুষের আবির্ভাব হয় লিপের পর।'

নাম বলার পর প্রথমবারে মতো মুখ খুলল কোয়ালস্কি। 'এসবের কারণ কী?'

'কারণটা এখনও রহস্যই রয়ে গেছে,' জবাব দিল মারিয়া। 'এসব নিয়েই কাজ করছিলাম আমি আর লিনা। ফসিলের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে জানা গেছে, লিপের আগে এবং পরে কিন্তু মানুষের মস্তিষ্কের আকারে খুব একটা পরিবর্তন আসেনি। কেউ কেউ বলে খাদ্যাভাসের উন্নতি, কারো মতে আবহাওয়ার পরিবর্তন... কেউ আবার মনে করে, আফ্রিকা থেকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়াতেই বিস্তৃত হয় মানব বুদ্ধিমত্তা।'

'আর আপনার বক্তব্য?'

দেয়ালে ঝোলানো সার্টিফিকেটের দিকে ইশারা করল মারিয়া। 'একজন প্রজনন বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমার মত- যদি লিপের আগে এবং পরে আমাদের পূর্বপুরুষদের মস্তিষ্কের আকৃতি একই থাকে, তাহলে রহস্যের সমাধানটা অবশ্যই জিনের ভেতরই লুকানো। তাছাড়া শিকাগোর ওই গবেষকদের কাজের ফলাফল ঘাঁটলে আন্দাজ করা

যায়- পঞ্চাশ হাজার বছর আগে এমন কিছু একটা ঘটেছিল, যার ফলে এক ধরনের উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ে মানুষের জেনেটিক স্তরে, ঘটায় গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড।'

মাথা চুলকাচ্ছে কোয়ালস্কি। 'যেমন?'

উত্তরটা মঙ্কের মুখ থেকে বেরোল। 'নতুন ধরণের প্রজাতি গঠন।'

মাথা নেড়ে সায় দিল মারিয়া। 'ওই একই সময়ে হোমো সেপিয়েন্স, অর্থাৎ আধুনিক মানুষের সাথে সংকর ঘটে নিয়ানডারথাল প্রজাতির। হেটেরোসিস টার্ম সম্পর্কে ধারণা আছে আপনাদের?'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল কোয়ালস্কি, এসব ব্যাপারে ওর জ্ঞান প্রায় শূন্যের কোঠায়। তবে মাথা নাড়ল মঙ্ক। মারিয়া বুঝতে পারল- যে যতটা আন্দাজ করেছিল, লোকটার জ্ঞান তার চাইতে অনেক বেশি।

'সহজ ভাষায় বলতে গেলে- সংকর,' ব্যাখ্যা করল সে। 'দুটো ভিন্ন প্রজাতির মিশ্রনের ফলে তৈরি বংশধর যদি পিতা বা মাতার চাইতে উন্নত বৈশিষ্ট প্রকাশ করে, সেটাকেই বলা হয় হেটেরোসিস।'

'আর আপনার মতবাদ অনুযায়ী,' মঙ্ক বলা শুরু করল, 'পূর্ববর্তী মানুষ এবং নিয়ানডারথালদের মিলনের ফলেই বুদ্ধিমান মানুষের জন্ম, তাই তো?'

'হ্যাঁ। লিনা আর আমি এই ব্যাপারেই গবেষণা করছিলাম। বর্তমান মানুষের দুই থেকে তিন শতাংশ জিন নিয়ানডারথালদের কাছ থেকে পাওয়া। তবে বেশ কিছু আফ্রিকান জনগোষ্ঠী কখনও নিয়ানডারথালদের সংস্পর্শে আসেনি। পক্ষান্তরে, আমাদের সবার শরীরে থাকা ওই জিনগুলো কিন্তু একই প্রকৃতির নয়। ছেঁড়া সুতোগুলো এক করা হলে দাঁড়ায়- তৎকালীন মানুষের মোট জিনের প্রায় বিশ শতাংশ ছিল সংকর জিন, যা মানবজাতির গতিপথ পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট। জিনবিদদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে- ইউরোপে স্থানান্তরিত হওয়া আমাদের পূর্বপুরুষদের শারীরিক পরিবর্তন, যেমন বেশি পরিমাণে চুল, সাদা চামড়া ইত্যাদিও নিয়ানডারথাল জিনের প্রভাবে সৃষ্টি। তবে এ ব্যাপারে একটা কিন্তু থেকে যায়।'

'কী সেটা?' জানতে চাইল মঙ্ক।

'যেসব আফ্রিকান জনগোষ্ঠী কখনও নিয়ানডারথালদের সংস্পর্শে আসেনি, তারাও কিন্তু গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ডের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। গোটা পৃথিবী তথা ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকার সবখানেই পরিবর্তনটা লক্ষ্য করা গিয়েছিল।'

'এটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করছেন আপনারা?'

'লিপের সময় জিনগত পরিবর্তনের ফলে উন্নত এক জাতির উদ্ভব হয়েছিল। চিত্রকলা, আচার-অনুষ্ঠান, অস্ত্রশস্ত্র... সব ক্ষেত্রে সাধারণ লোকেদের চাইতে অত্যাধিক বুদ্ধি আর জ্ঞানের অধিকারি ছিল তারা। স্থানান্তর পদ্ধতির বিশ্লেষণ থেকে

জানা যায়, এই প্রক্রিয়াটা একমুখী ছিল না। আফ্রিকার বাইরে ছড়িয়ে পড়া নিয়ানডারথাল জিনধারী এসব প্রতিভাও এক সময় আফ্রিকাতে ফিরে আসে।'

'আমি কী বুঝেছি সেটা এবার সংক্ষেপে বলছি,' জবাব দিল মঙ্ক। 'আপনাদের মতবাদ অনুযায়ী, সাধারণ মানুষ আর নিয়ানডারথালদের ওই সংকরায়ণ বিরল প্রতিভাধর আধুনিক মানুষের জন্ম দেয়। তারপর স্থানান্তরের মাধ্যমে তাদের সেই জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে গোটা বিশ্বে। আধুনিকতার ক্ষেত্রে ঘটায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন- গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড।'

'ঠিক তাই। আর এটা শুধু একমাত্র আমাদের দুই বোনের ধারণা নয়। দু'হাজার তেরো সালে প্রকাশিত, অক্সফোর্ডের নিক বস্ট্রম নামের এক দার্শনিকের গবেষণা থেকে জানা যায়- উন্নত বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন মাত্র কয়েকজন মানুষই গোটা পৃথিবীর বর্তমান ধ্যান-ধারণা পাল্টে দিতে সক্ষম। কথাগুলো তিনি ভবিষ্যতের পরিবর্তনের ব্যাপারে ধারণা দেয়ার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রাচীন বিশ্বে ঘটনাটা একবার ঘটে গিয়েছে, পঞ্চাশ হাজার বছর আগে, গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ডের সময়।

'উন্নত বৈশিষ্ট্য?' প্রশ্ন করল মঙ্ক। 'আপনার সেই সংকর প্রজাতির মতো?'

'হ্যাঁ। আধুনিক মানুষ বা হোমো সেপিয়েন্স এবং হোমো নিয়ানডারথালেনসিস এর মিলনের ফলে উদ্ভূত হওয়া সেই নতুন প্রজাতি। শতকরা পনেরো-বিশ শতাংশ নিয়ানডারথাল বৈশিষ্টধারী সেই জিনগুলো সবসময় একই রকম থাকে না। কমতে কমতে বর্তমান মানুষের মতো দুই থেকে তিন শতাংশে পরিণত হয়। যার ফলে এখন বিশ্বে অতীব ক্ষমতাধর নয়, বরং সাধারণ মানুষ হিসেবেই পরিচিতি পাচ্ছি আমরা।' বলে উপস্থিত সবার মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে আনল মারিয়া। 'কিন্তু কেমন হবে যদি আমরা ঘড়ির কাঁটা উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিতে পারি? আবারও তৈরি করতে পারি সেই সংকর প্রজাতি?'

কথাটা শুনে চিন্তায় পড়ে গেল মঙ্ক। 'তাহলে আপনারা দুই বোন সেই লক্ষ্যেই কাজ করছেন?'

'শুধু কাজ করছি না, ইতিমধ্যে সফলও হয়েছি,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল মারিয়া। 'দেখতে চান সেই সংকর গোত্রের সদস্যকে?'

সকাল ১১:৩৫

এ কেমন বিনোদন!

কাঁচের ওপাশে থাকা ঘরটা কোয়ালস্কির কাছে একটা ক্লাসরুমের আদলে তৈরি বলে মনে হচ্ছে। তবে ঘরের জিনিসপত্রগুলো দেখেই ধারণা করা যায়, ছাত্রটা

কোনও সাধারণ ছাত্র না। সিলিং থেকে জায়গায় জায়গায় দড়ি ঝোলানো। এক কোণে ঝুলছে ইয়া বড় এক টায়ার। মেঝেতে ছড়ানো ছিটানো খেলনা ব্লক।

আর জানালাটার কাঁচে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই বিশেষ ছাত্র।

'ওর নাম বাকো,' পরিচয় করিয়ে দিল মারিয়া।

'এটা তো একটা গরিলা!' কোয়ালস্কির কণ্ঠে নিখাদ বিস্ময়। প্রানিটাকে দেখে মনে মনে একটু বিরক্তি অনুভব করছে। মনে পড়ে গেছে গরিলা নিয়ে আগের একটা দুঃসহ স্মৃতি।

'পশ্চিমা নিম্নভূমির গরিলা,' যোগ করল মারিয়া। 'অপ্রাপ্তবয়স্ক, তিন বছর বয়স।'

বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে প্রশ্ন করল মঙ্ক, 'এটাই আপনার সংকর?'

জবাবটা অ্যামির মুখ থেকে এল, 'মানুষের ডিএনএ নিয়ে কাজ করার অনুমতি পাইনি আমরা।'

'মানবিক দিকটাও তো ভাবতে হবে,' যোগ করল মারিয়া। 'তাই গরিলার উপরই যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হলো। সর্বপ্রথমে আধুনিক জিন এডিটিং প্রযুক্তির মাধ্যমে, ফসিল থেকে প্রাগৈতিহাসিক নিয়ানডারথাল জিন উদ্ধার করা হয়। তারপর একটা মা গরিলার কাছ থেকে পাওয়া ডিম্বাণুর সাথে মিলন ঘটিয়ে ভ্রূণ উৎপন্ন করি। সব শেষে আরেকটা গরিলার গর্ভে বেড়ে উঠতে দিই ভ্রূণটাকে।'

কথাগুলো শুনে কোয়ালস্কির মুখে ফুটে ওঠা বিস্ময় ঢাকতে আবারও মুখ খুলল প্রজননবিদ। 'এরকম ঘটনা নতুন কিছু না। দুই হাজার তিন সালে চাইনিজ বিজ্ঞানীরা সফলভাবে খরগোশের ডিম্বাণুর সাথে মানুষের কোষের মিলন ঘটাতে সক্ষম হন। পরবর্তী বছরগুলোতে জিন প্রযুক্তিতে উল্লেখযোগ্য অনেক আবিষ্কার হয়েছে। আমেরিকান বিজ্ঞানীরা ইঁদুরের সাথে মানুষের সংযোগ ঘটিয়ে এমন ইঁদুরছানা তৈরি করেন, যাদের শরীরে বইছিল মানুষের রক্ত। এছাড়াও বিড়াল, ভেড়া, গরু ইত্যাদি বিভিন্ন প্রানির দেহে মানুষের কোষে তৈরি অঙ্গাণুর কার্যকারিতা পরীক্ষা করে সফলতা পাওয়া গিয়েছে।'

অ্যামিও তার সাথে গলা মেলাল। 'ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির সাপেক্ষে এগুলোকে শুধুমাত্র শুরুর ধাপ বলা যায়।'

'তো গবেষণার স্বার্থে আপনাদের গরিলা বেছে নেয়ার কারণ কী?' জিজ্ঞেস করল মঙ্ক। 'আমি তো জানতাম জেনেটিক দিক দিয়ে গরিলার চাইতে শিম্পাঞ্জি মানুষের বেশি নিকটাত্মীয়।'

'উত্তরটা একইসাথে হ্যাঁ এবং না,' জবাব দিল মারিয়া। 'এ কথা সত্যি, মানুষের সাথে শিম্পাঞ্জির জিনগত মিল শতকরা আটানব্বই ভাগ, যেখানে গরিলার মিল হচ্ছে ছিয়ানব্বই ভাগ। কিন্তু যোগাযোগ, শ্রবণ এবং মস্তিষ্কজনিত উন্নয়নের ক্ষেত্রে গরিলাই এগিয়ে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে- শিম্পাঞ্জিরা মাত্র একশো ইশারাগত

ভাষা শিখতে পারে, পক্ষান্তরে গরিলাদের ক্ষেত্রে এটা প্রায় এক হাজারের কাছাকাছি।'

'ইশারার উপর এত জোর দিচ্ছেন কেন?' বিরক্ত কণ্ঠে জানতে চাইল কোয়ালস্কি। বুঝতে পারছে, এজন্যই পেইন্টার তাকে মঙ্কের সাথে পাঠিয়েছেন।

জবাবে মারিয়াকে মুচকি হাসতে দেখে রাগ আরও বেড়ে গেল কোয়ালস্কির। আগে ছবিতে দেখা তার বোনের কার্বন কপি বলা যায় মেয়েটাকে। পার্থক্য শুধু, লিনার চুল বড়। আর ওর সাদাটে রঙের চুলগুলো কান পর্যন্ত ছোট করে ছাঁটা। সাই সাথে ডানপাশের ঘাড়ে ডিএনএ আঁকা একটা ট্যাটু।

'যোগাযোগের জন্য,' অবশেষে উত্তর দিল মারিয়া। 'আর বুদ্ধিমত্তা বিকাশের ক্ষেত্রে ভাব আদান প্রদানের গুরুত্ব অনেক বেশি। আসুন দেখাচ্ছি আপনাদের।'

মেয়েটার পিছু নিয়ে ইলেকট্রনিক লক করা দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই কোয়ালস্কি আবিষ্কার করল, একটা বিশালায় খাঁচার ভেতর দাঁড়িয়ে আছে ওরা। স্বয়ংক্রিয় দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই সামনের আরেকটা দরজা খুলে ধরল মারিয়া। বেশ ভালো নিরাপত্তা ব্যবস্থা, মনে মনে ভাবল বিশালদেহী সিগমা এজেন্ট। ক্লাসরুমটার আবহাওয়া স্বাভাবিকের তুলনায় বেশ গরম। একটু আর্দ্রও।

সামনে বাড়ল মারিয়া। 'বাকো, দেখো কারা এসেছে। এসো, পরিচিত হও।'

পেছনের দুই পায়ে ভর করে দাঁড়াল বাচ্চা গরিলা। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না, সামনে এগোনো ঠিক হবে কি না। চিন্তিত চোখে প্রানিটার সারা গায়ে চোখ বুলাল কোয়ালস্কি। নাহ, আগাগোড়া স্বাভাবিক। বিশেষত্বের কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

'সব ঠিক আছে,' মারিয়া অভয় দিচ্ছে গরিলাটাকে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে এগিয়ে এল চারফুটি কাল অবয়ব। এক হাতে মাটিতে শরীরের ভর চাপিয়ে অন্য হাতে জড়িয়ে ধরল মেয়েটার কোমর।

'এই তো, ভালো ছেলে,' বলে দলের বাকি সদস্যদের দিকে তাকাল জিনবিদ।

হাঁটু গেড়ে বসে গরিলাটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল অ্যামি। 'হেই, বাকো...আমাকে চিনতে পারছ? একসাথে কত সুড়সুড়ি সুড়সুড়ি খেলা খেলেছি আমরা।'

'সর্বশেষ তোমার এখানে আসার পর ছয় মাস পেরিয়ে গেছে,' মারিয়া বলল। 'ওর সম্ভবত মনে নেই।'

কিন্তু তার ধারণা ভুল প্রমাণ করে এগিয়ে এল বাকো। পাঁজরের দুই পাশে দু'হাত নিয়ে আঙুলগুলো নাড়াতে শুরু করল। বিশেষ একটা ইশারা এটা।

[সুড়সুড়ি]

প্রানিটার কান্ড দেখে হেসে ফেলল অ্যামি। 'এই তো!'

এগিয়ে এসে মারিয়ার মতো অ্যামিকেও জড়িয়ে ধরল বাকো।

এবার মঙ্কের পালা। হাঁটু গেড়ে বসে হাত বাড়িয়ে দিল টাক-মাথা সিগমা এজেন্ট। 'বাকো কি আমার কাছে আসবে?'

দ্বিধা-জড়িত দৃষ্টিতে প্রানিটা মারিয়ার দিকে তাকাতে হাত তুলে ইশারা করল সে। 'যাও। ইনি ভালো মানুষ।'

[ভালো]

'মা'-এর আশ্বাস পেয়ে সামনে বাড়ল বাকো। নতুন আগন্তুকের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে বারবার। এগিয়ে এসে এক পাশের ভ্রু স্পর্শ করে হাত সরিয়ে নিল সাথে সাথে।

[হ্যালো]

তারপর হাত দুটোকে কাপের আকৃতিতে চেপে ধরল নিজের বুকের উপর। আঙুলগুলো বাতাসে কিছু আঁকিবুঁকি করছে।

[আমি বাকো]

তবে মঙ্ক এসবের আগা মাথা কিছুই বুঝতে পারেনি। বন্ধুর কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা দেখে এগিয়ে এল কোয়ালস্কি। এতক্ষণ ওসব বৈজ্ঞানিক ব্যাপারস্যাপার মাথায় না খেললেও এগুলো ভালোই বোঝে বিশালদেহী সিগমা এজেন্ট। 'ও তোমাকে ওর নাম বলছে।'

তারপর নিজেও কয়েকটা চিহ্ন কাটল বাতাসে। [ওর নাম মঙ্ক]

মাথা নাড়তে নাড়তে সামনে এগোল বাচ্চা গরিলা। ইশারাগুলো বুঝতে পেরেছে। তবে ততক্ষণে মঙ্কের একটা অস্বাভাবিকতা কেড়ে নিয়েছে তার নজর।

'এটা একটা প্রস্থেটিক,' প্রানিটাকে তার হাত লক্ষ্য করে এগোতে দেখে ব্যাখ্যা করল মঙ্ক।

'তাই নাকি!' মারিয়ার গলায় বিস্ময়ের সুর। 'আমি তো খেয়ালই করিনি।'

কোয়ালস্কি অবশ্য অবাক হয়নি। জিন আর গরিলা নিয়ে ভাষণ দিতেই এতক্ষণ ব্যস্ত ছিল মেয়েটা। মঙ্কের প্রস্থেটিক হাতটাকে ডারপা-র এক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার বলা যায়। সরাসরি ওর মস্তিষ্কের নির্দেশে কাজ করে টাইটেনিয়ামের তৈরি অদ্ভুত এই যন্ত্র।

বিস্ময়ের শেষ ধাক্কা তখনও বাকি। প্রানিটাকে হাতের দিকে আকৃষ্ট হতে দেখে আরেকটা কান্ড করল মঙ্ক। কব্জির জোড়া থেকে জিনিসটা খুলে তুলে দিল বাকোর হাতে।

হাতটা উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল গরিলা। কবজি থেকে খুলে ফেললেও মঙ্ক অবশ্য এখনও ধাতব আঙুলগুলো নড়াচড়া করতে সক্ষম। চিন্তার মাধ্যমে চলার পাশাপাশি জিনিসটাতে ওয়্যারলেস প্রযুক্তিরও সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে ইঞ্জিনিয়াররা।

'অসাধারণ!' মারিয়ার কণ্ঠে নিখাদ মুগ্ধতা। 'শুনেছিলাম ডারপা-র বিজ্ঞানীরা নাকি চিন্তার মাধ্যমে চলতে পারে এমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে কাজ করছে। তবে ইতিমধ্যে যে এগুলোর সফল ব্যবহারও শুরু হয়ে গেছে, তা জানা ছিল না।'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল মঙ্ক। 'বাদ দিন। আমাকে ওদের পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত নমুনা হিসেবে ভাবতে পারেন।'

হাত বাড়িয়ে বাকোর ফিরিয়ে দেয়া প্রস্থেটিকটা গ্রহণ করল টেকোমাথা সিগমা এজেন্ট। 'ধন্যবাদ, ছোট্ট বন্ধু।'

এবার দলের একমাত্র বাকি সদস্য, কোয়ালস্কির দিকে তাকাল গরিলা।

হাত দুটো উপরে তুলে দেখাল সে। 'আমারগুলো আসল। একেবারে আদি ও অকৃত্রিম।'

হেসে ফেলল মারিয়া। বাকোর দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল কোয়ালস্কির দিকে। 'ইশারার ভাষাটা কিন্তু আপনি বেশ ভালো বোঝেন। জেনে খুশি হলাম।'

জবাবে দুটো আঙুল বাতাসে ঘুরিয়ে, অন্য হাতের তালুর উল্টোদিকে নামিয়ে আনল কোয়ালস্কি।

[অবশ্যই]

তবে বাকোর বক্তব্য ভিন্ন। বিশালদেহী আগন্তুকের দিকে তাক করে আঙুল মোচড়াতে শুরু করল প্রানিটা। যার অর্থ- [পছন্দ হয়নি]

জবাবে কটমট করে তার দিকে তাকাল কোয়ালস্কি।

আমারও...

সকাল ১১:৪৮

বাকো বুঝতে পারছে, এই লোকটা ওকে পছন্দ করেনি। তারও যে লোকটাকে খুব পছন্দ হয়েছে এমনটা না।

এমন সময় এগিয়ে এল তার 'মা'।

[ইনিও ভালো মানুষ]

বাকো বুঝতে পারছে না কীভাবে কথাটার প্রতিবাদ করবে। মনের ভাব ভালো ভাবে প্রকাশ করতে না পেরে হাত দুটো আড়াআড়িভাবে মুখের সামনে এসে ধরল সে। কথা বলবে না।

লোকটা তাকে পছন্দ করেনি, তাই সে-ও পছন্দ করবে না। সহজ হিসাব। মনের ভেতর চাপা কষ্টটা ধীরে ধীরে রাগে পরিণত হচ্ছে।

আরেকটা কারণ অবশ্য আছে। লোকটার হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলার ভঙ্গিটার তারিফ করেছে ওর মা। কেন করবে? মা শুধু বাকোর কথা বলার তারিফ করবে।

দরজার দিকে ইশারা করছে মা এখন। 'নিজের ঘরে যাও, বাকো।'

রাগী ভঙ্গিতে বিড়বিড় করতে লাগল সে।

আবারও গলা চড়াচ্ছে মা, এবার ইশারার মাধ্যমে।

[যাও]

মন খারাপ করে ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে এল বাকো। বের হবার আগে অবশ্য লোকটার উদ্দেশ্যে একটা কথা বলতে ভোলেনি, তবে সেটাও মনে মনে।

'ভাগো এখান থেকে।'

সকাল ১১:৪৯

'ও ক্লান্ত,' ব্যাখ্যা করল মারিয়া।

'ঠিক আছে,' হাসতে হাসতে জবাব দিল মঙ্ক। 'কোয়ালস্কিকে দেখে অনেক মানুষেরই এমন অবস্থা হয়। আর ওটা তো একটা গরিলা।

প্রতিবাদে কিছু না বললেও চোখ মটকাল তার বিশালদেহী বন্ধু।

কথা ঘুরানোর চেষ্টা করল মারিয়া। 'গত রাতে আসলে বাকোর ভালো ঘুম হয়নি। লিনাকে নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখছিল।'

এক পা এগিয়ে এল অ্যামি। 'তাই নাকি?'

মহিলার কণ্ঠে ফুটে ওঠা উদ্বেগ কমানোর প্রয়াস পেল প্রজননবিদ। 'ব্যাপারটা কাকতালীয়।' চায় না আবারও বোনকে নিয়ে মনের ভেতর দুশ্চিন্তা শুরু হোক।

'ইউরোপে কী করছিল আপনার বোন?' প্রশ্নটা এবার মঙ্কের মুখ থেকে এসেছে।

'জার্মানির লিপজিগে অবস্থিত ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউটের একটা ফেলোশিপ পেয়েছিলাম আমরা। পুরনো ফসিল থেকে ডিএনএ আহরণের মাধ্যমে, নিয়ানডারথাল প্রজাতির জিনগত মডেল তৈরি করার একটা প্রজেক্টে কাজ করার জন্য দু'জনের যে কোনও একজনকে আহ্বান জানানো হয়।'

'আপনার বদলে লিনা কেন গেল?'

'জিনবিদ্যায় আমাদের দু'জনেরই আগ্রহ আছে। তবে আমার রিসার্চের জন্য, ডিএনএ-র তুলনামূলক বড়-সড় অংশ নিয়ে কাজ করাটা জরুরি। আর লিনা ছোট ছোট কাজ যেমন জিন এডিট, জোড়া দেয়া ইত্যাদির দিকে জোর দেয়। তাই ফেলোশিপটা আমার চাইতে ওর বেশি দরকার ছিল।' বলতে বলতে মনটা খারাপ হয়ে গেল মারিয়ার। কে জানে, এখন কোন বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে তার বোন।

কথা অবশ্য শেষ হয়নি। 'রিসার্চের স্বার্থেই ওখানে যাওয়াটা বেশ গুরুত্বপুর্ণ ছিল। এ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া নিয়ানডারথাল ফসিলের সংখ্যা হাতে গোনা। কেন ওই প্রজাতি আমাদের চাইতে ভিন্ন, এটা জানার পাশাপাশি গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ডের কারণ অনুসন্ধানই ছিল আমাদের মূল্য উদ্দেশ্য।'

'ওখানে কাদের সাথে কাজ করছিল লিনা?' জিজ্ঞেস করল মঙ্ক।

'বেশ কয়েকজন। নামগুলো উপরতলায় আমার কম্পিউটারে আছে। নিজ নিজ ক্ষেত্রে দক্ষ সবাই, আমাদের জিন গঠনে অবদান রাখা জাতিগুলো সম্পর্কে গবেষণা করছিলেন প্রত্যেকেই।'

মৃদু কেশে গলা পরিষ্কার করল কোয়ালস্কি। 'তাহলে শুধুমাত্র নিয়ানডারথাল ছাড়া অন্য কারও জিনও আমাদের মাঝে আছে?'

মাথা নেড়ে সায় দিল মারিয়া। 'হ্যাঁ। ডেনিসোভান নামে আরেকটা প্রজাতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিয়ানডারথালদের মতো তারাও আমাদের জিনে নিজেদের সাক্ষর রেখে গেছে।'

নাক কুঁচকাল কোয়ালস্কি। 'কী এলাহী কান্ড-কারখানা রে বাবা!'

মারিয়া বলে চলেছে, 'আধুনিক মানুষকে টিকে থাকতে সাহায্য করে ওইসব ডেনিসোভানদের কাছ থেকে আসা জিনগুলো। উদাহরণস্বরূপ, ইপাস-১ জিনের কথা ধরুন। শরীরে অক্সিজেন কমে গেলে আরও বেশি করে হিমোগ্লোবিন উৎপাদন করতে শুরু করে ওগুলো। তিব্বতের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা ব্যাপক। ভৌগলিক কারণে ওখানকার পরিবেশে অক্সিজেনের মাত্রা বেশ কম।'

'এখানেই শেষ?' বিশালদেহী সিগমা এজেন্টের কণ্ঠে চাপা বিরক্তি। 'নাকি আরও কোনও গোত্র এই গণধর্ষণে সামিল ছিল?'

উত্তরটা এল অ্যামির মুখ থেকে। 'নিয়ানডারথাল আর ডেনিসোভানদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ থেকে জানা গেছে, আমাদের সাথে তৃতীয় একটা গোত্রও জিনগতভাবে জড়িত। তবে তাদের পরিচয় শনাক্তকরণে বিজ্ঞানীরা এখনও পর্যন্ত আঁধারেই রয়ে গেছেন।'

'যতই হেলাফেলা করুন না কেন,' মারিয়া বলল। 'ওই মিশ্রণ না ঘটলে কিন্তু আজকের আমরা তৈরিই হতাম না। এই যে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে মানবজাতির জয়গাথা, তা কিন্তু ওদের মিলনের ফলেই। বর্তমান সময় পর্যন্ত ওসব জিনই টিকিয়ে রেখেছে আমাদের।'

'আর এজন্যই বাকোকে নিয়ে গবেষণা করতে পারছেন আপনি,' যোগ করল মঙ্ক। 'অনুসন্ধান করতে পারছেন প্রাগৈতিহাসিক গোত্রগুলোর ইতিহাস।'

'ঠিক তাই। আর বাকোর ব্যাপারে বলতে গেলে, এই ছোটবেলাতেই ওর মাঝে বেশ কিছু বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছি আমরা। প্রানিটা অন্যান্য সমবয়সী গরিলাদের চাইতে

তিনগুণ দ্রুতগতিতে নতুন নতুন জিনিস শিখছে। ওর মগজের গঠনও অন্যদের তুলনায় আলাদা। এমআরআই পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে, কর্টেক্সে বেশি ভাঁজ থাকার পাশাপাশি বাকোর সেরেব্রামেও ধূসর পদার্থের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি।'

'রিপোর্টগুলো দেখতে চাই আমি,' মন্তব্য করল মঙ্ক।

'ওগুলো উপরতলায় রাখা কম্পিউটারে আছে...'

একটা মৃদু গড়গড় আওয়াজ মারিয়ার মুখ থেকে বাকি কথাগুলো কেড়ে নিয়েছে। ঘাড় ঘুরিয়ে পাশের ঘরের দিকে তাকাতেই দেখা গেল- চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে বাকো, দুই হাতের তালুর মাধ্যমে বুকে একটা বৃত্ত তৈরি করেছে।

[আমি দুঃখিত]

হাত ধরে টেনে মারিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করল অ্যামি। 'আমি এদের উপরে নিয়ে গিয়ে রিপোর্টগুলো দেখাচ্ছি। তুমি বরং এদিকে নজর দাও।' বলে বাকোর দিকে ইশারা করল সে।

'আমারও ওয়াশিংটনের সাথে যোগাযোগ করা দরকার,' যোগ করল মঙ্ক। 'আশা করছি, ক্রোয়েশিয়া থেকে হয়ত নতুন কোনও খবর পাব।'

মাথা নেড়ে সায় দিল মারিয়া। 'ঠিক আছে।'

যাবার অনুমতি পেয়ে কোয়ালস্কির দিকে ইঙ্গিত করল টাক-মাথা সিগমা এজেন্ট। 'আমার বন্ধু বরং এখানেই থাক। বাকোর মন খারাপের পেছনে ওর হাত ছিল, সমস্যার সমাধানেও না হয় সাহায্য করতে পারবে।'

কথাটা শুনে ভ্রু কুঁচকে বন্ধুর দিকে তাকাল কোয়ালস্কি। 'আমি আবার কী করলাম!'

পাত্তা দিল না মঙ্ক। 'কাজ শেষ হয়ে গেলে ফোন করব।'

নড করল মারিয়া। বুঝতে পেরেছে, বিশালদেহী লোকটার আসলে বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে আগ্রহ কম। তাই মঙ্ক তাকে এখানে রেখে যাচ্ছে। মাথা থেকে চিন্তাটা সরিয়ে বাকোর মন ভালো করার দিকে মনোযোগ দিল সে। তবে গরিলাটার দিকে এগোনোর আগে আরেকটা কাজ করল।

লিনার নাম্বারটা ফোনে তোলাই ছিল। আলতো হাতে চেপে দিল রিডায়াল বাটন। আশা করছিল, এবারও কল কেটে যাবার বিপ শব্দ শুনতে পাবে। কিন্তু তার ধারণা ভুল প্রমান করে দিয়ে, ও-প্রান্ত থাকে খড়খড় আওয়াজের সাথে মৃদু একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'..রিয়া, শুন..ত..তে প..পাচ্ছ?'

সাথে সাথে আবারও কলটা কেটে গিয়ে পর্দায় লেখা ভেসে উঠতে দেখা গেল, 'যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।'

ফোনটা আঁকড়ে ধরে কাতরে উঠল মারিয়া।

'লিনা!'

অধ্যায় সাত
২৯ এপ্রিল, সন্ধ্যা ৬:০৪
কার্লোভাক কাউন্টি, ক্রোয়েশিয়া

না...না...না...

কেটে গেছে কলটা। দম আটকে আবারও চেষ্টা করতে শুরু করল লিনা। কিন্তু ফলাফল শূন্য। রোল্যান্ডও তার ফোন দিয়ে কয়েকবার চেষ্টা করে দেখল। এবারও কাজের কাজ কিছু হলো না।

একটা ভূগর্ভস্থ লেকের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে তিন মুর্তি। সামনের গুহার প্রায় পুরোটাই পানির দখলে। লেকটা পেরিয়ে উপর দিকে, ডানপাশের টানেল বেয়ে ক্রমাগত নেমে আসছে স্রোতস্বিনী নদী। পানিতে বিশাল পাক সৃষ্টি করে এগিয়েছে বামে।

'ডোবরা নদী,' মন্তব্য করল রোল্যান্ড। 'অগুলিনের ভেতর দিয়ে এসে ডুলার গহ্বরের মাধ্যমে ঢুকেছে গুহায়।'

'ফাদার নোভাক ঠিকই বলছেন,' সায় দিলেন জেরার্ড। 'আপনার ফোন নেটওয়ার্ক পেয়েছে, তার মানে খাদের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি আমরা।'

'কাছাকাছি...আবার বেশ দূরেও,' বলে সেলফোনটা উঁচুতে তুলে ধরল লিনা। চেষ্টা করছে, আবারও নেটওয়ার্ক ধরতে পারে কি না।

'যদি সাঁতরে স্রোত পেরিয়ে ওপাড়ে পৌঁছাতে পারি...' রোল্যান্ডের কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

তবে সবাই জানে, ব্যাপারটা অসম্ভব। লেকে ঝাঁপ দেয়ার সাথে সাথে ওই বিপজ্জনক ঘূর্ণিপাকের টানে ডুবে যেতে হবে। পানি থেকে কতক্ষণ পর মুক্তি পাবে সেটা নিয়ে সন্দেহ আছে... কিন্তু তখন দেহে যে প্রাণটা আর থাকবে না, এটা নিশ্চিত।

পেছন দিকে ইঙ্গিত করলেন জেরার্ড। 'পিছাতে হবে আমাদের।'

'কোথায়?' জানতে চাইল রোল্যান্ড। 'পেছনের গুহাগুলোও এতক্ষণে পানিতে টইটম্বুর হয়ে গেছে।'

'কোথাও না কোথাও উঁচু জায়গা নিশ্চয়ই আছে,' জোর দিলেন ফ্রেঞ্চ কমান্ড্যান্ট। 'তাছাড়া আমাদের তো অনন্তকাল থাকার দরকার নেই। শুধুমাত্র ঝড়ের সময়টুকু কাটাতে পারলেই চলবে।'

কেউ আর তর্কে গেল না। জানে, সামনে এগোনোর পথ নেই।

শেষবারের মতো ফোনটা কানে ঠেকাল লিনা। ফলাফল একই।

সন্ধ্যা ৬:১১

অগভীর খাদের সামনে দাঁড়িয়ে ফ্রাঙ্কোপ্যান দুর্গের পাথুরে প্রাচীরটা দেখছে গ্রে। ক্রমাগত বৃষ্টির ছিটে এসে আঘাত করছে খোলা মুখে।

দুর্গের ঝুলন্ত বারান্দা থেকে দড়ি বেয়ে সিগমা কমাণ্ডারের পাশে এসে দাঁড়াল ফ্রেডরিক। সাথে সাথেই ঝপাস... হার্নেসে আটকানো একটা রাবারের জোডিয়াক বোট লোকটার পিছু নিয়ে পানিতে নেমে এসেছে। দড়ি থেকে বোটটা খোলার প্রয়াস পেল গ্রে। 'আমি করছি। আগেও এসব সামলানোর অভিজ্ঞতা আছে আমার।'

আলতো হাতে তার কাঁধ চাপড়ে দিল ফ্রেডরিক। মুখে মুচকি হাসি। 'কিন্তু এই সর্বভূক গুহার ব্যাপারে তো আর অভিজ্ঞতা নেই। আমাকে দিন। বলতে গেলে বিগত প্রায় দুই দশক ডুলার গহ্বরের আশেপাশেই কাটিয়েছি আমি। এখানকার প্রতিটা বাঁক, প্রতিটা পাথর চিনি নিজের হাতের তালুর মতো করে। বন্ধুদের খুঁজে বের করতে চাইলে আমাকে ছাড়া আপনার চলবে না।'

সমীহের চোখে আত্মবিশ্বাসী লোকটার দিকে তাকাল গ্রে। স্থানীয় লোক হিসেবে তার উপর ভরসা করা যায়। কিন্তু এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় লোকটার দক্ষতা কতটুকু কাজে দেবে, সেটাই দেখার বিষয়।

সব ঠিকঠাক করা হয়ে গেল বোটের ইশারা করল ফ্রেডরিক। 'উঠে বসুন। স্রোতের অবস্থা এর চাইতে আর ভালো হবে না।'

শেষবারের মতো ঝুলন্ত বারান্দার দিকে চোখ ফেরাল গ্রে। রেলিং-এর উপর দিয়ে ঝুঁকে তাকিয়ে আছে শেইচান। তরুণ ড্রাইভার ড্যাগও তার সাথে। তাকে এভাবে ফেলে যাওয়া মেয়েটার পছন্দ হয়নি। কিন্তু আর কোনও উপায়ও নেই। যে বা যারা সরাইখানায় ফ্রেডরিকের উপর হামলা করেছিল, তারা যে আবারও ফিরে আসবে না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তাই পেছনে নজর রাখার জন্য কারো থাকা দরকার।

মেয়েটার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল সিগমা কমান্ডার। তবে জবাবে পেল শুধু মুখ ঝামটা। বোঝাই যাচ্ছে, এখনও রেগে আছে প্রাক্তন আততায়ী।

ঘাড় ঘুরিয়ে বোটে উঠে বসল গ্রে। দড়িতে বাধা অবস্থায়ও পানির তোড়ে ধেইধেই করে নাচছে জোডিয়াক। ফ্রেডরিক আগেই পেছনে নিজের জায়গা দখল

করে রেখেছে। 'শক্ত করে ধরুন,' চেঁচিয়ে উঠে কেবল টেনে ইঞ্জিনটা স্টার্ট করল সে।

খকখক করে কাশতে কাশতে প্রাণ ফিরে পেল আউটবোর্ড মোটর। তবে নদীর তুমুল গর্জনের কাছে সেই আওয়াজ বলতে গেলে কিছুই না।

দড়ি ছেড়ে দিতেই লাফিয়ে সামনে বাড়ল বোট। পানির নাচন-কুর্দন দেখে মনে হচ্ছে, পিঠের উপর অবাঞ্ছিত অতিথি পেয়ে মোটেও খুশি হয়নি। মুহূর্তেই স্রোতের বেদম টানে জোডিয়াকটা খাদ পেরিয়ে ঢুকে পড়ল অন্ধকার গুহায়।

উত্তেজনায় ততক্ষণে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠেছে ফ্রেডরিক, 'এই চললাম!'

সন্ধ্যা ৬:১৫

চুপচাপ দাঁড়িয়ে বোটটাকে টানেলে হারিয়ে যেতে দেখছে শেইচান। লোহার রেলিং-এ শক্ত হয়ে এঁটে বসেছে হাতের আঙুলগুলো।

আমারও যাওয়া উচিত ছিল...

তবে রাগের আরেকটা কারণ আছে তার। নিখোঁজ প্রজননবিদের ফোনের জিপিএস লোকেশন সিগমা ট্র্যাক করতে পেরেছে। তার মানে এই না যে, মেয়েটা জীবিত। হতে পারে, হামলায় মারা গেছে সে। স্রোতের টানে তার লাশ কিংবা শুধুমাত্র ফোনটা ভেসে ভেসে চলে এসেছে খাদের তলায়। এই ক্ষুদ্র সম্ভাবনার উপর ভর করে গ্রে-র মতো এজেন্টকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়ার কোনও মানে হয় না।

দশ মিনিট পরে অবশ্য সিগমা হেডকোয়ার্টার থেকে খবর আসে, বোনের কাছে ফোন করেছিল নিখোঁজ মেয়েটা। এতে অবশ্য তার জীবিত থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে। কিন্তু তবুও, মামুলি একটা মেয়ের জন্য গ্রে আর পর্বতারোহী লোকটার জীবন নিয়ে এভাবে ছেলেখেলা করার কি কোনও দরকার ছিল!

কথাটা কানেই তোলেনি গ্রে।

পেছন থেকে পায়ের আওয়াজে সম্বিত ফিরল শেইচানের। ড্যাগকে হোটেলের অবস্থা দেখে আসতে বলা হয়েছিল। ফিরে এসেছে ছেলেটা।

'ওদিকের খবর কী?' জিজ্ঞেস করল সে। পার্কের দিক থেকে পুলিশের গাড়ির সাইরেনের আওয়াজ ভেসে আসছে।

'আগের মতোই। গন্ডগোলের সুরাহা হয়নি। কেউ জানে না...'

একটা প্রবল বিস্ফোরণের আওয়াজ যেন ধমক মেরে থামিয়ে দিল ছেলেটাকে। পশ্চিম দিকে তাকাতেই শেইচান লক্ষ্য করল, লেলিহান আগুনের শিখা উঠে যাচ্ছে আকাশে। ওদের হেলিকপ্টারটা ওদিকেই একটা মাঠে পার্ক করা ছিল।

ড্যাগও ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। 'কেউ আপনার হেলিকপ্টার উড়িয়ে দিয়েছে!'

সাথে সাথে সাইরেন বাজাতে বাজিয়ে ঘটনাস্থলের দিকে ছুট লাগিয়েছে পুলিশের গাড়ি। নতুন আকর্ষণ পেয়ে পার্ক থেকে সেদিকে রওনা দিল লোকজন।

শোল্ডার হোলস্টার থেকে সিগ সওয়ারটা খুলে হাতে নিল শেইচান। বাতাসে বিপদের গন্ধ ভাসছে।

ড্যাগের চোখে বিস্ময়। 'কী করছেন?'

পাত্তা না দিয়ে খাদের দিকে তাকাল মেয়েটা। বুঝতে পেরেছে- হেলিকপ্টারটা উড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য শুধু আগন্তুকদের এখানে আটকে ফেলা না, বরং সেই সাথে স্থানীয় নিরাপত্তা বিভাগের দৃষ্টিটাও সেদিকে সরিয়ে দেয়া। যাতে খাদে বা গুহায় কী হচ্ছে না হচ্ছে, সেদিকে কেউ খেয়াল না করে।

এমন সময় নদী ধরে কয়েকটা ছোট ছোট আলো ছুটে আসতে দেখা গেল। জেট স্কির হেডলাইট ওগুলো...এক, দুই...তিনটা। ফ্রেডরিকের জোডিয়াকের মতোই টানেলে ঘোরাফেরার জন্য ব্যবহৃত হয় জলযানগুলো। কিন্তু তফাৎ হচ্ছে, এখন বাহনগুলোর সওয়ারী কোনও পর্যটক নয়।

প্রতিটা স্কি-তে দু'জন করে লোক। প্রত্যেকের মাথায় হেলমেট। পিঠে রাইফেল ঝুলছে।

আগের আক্রমণগুলো ব্যর্থ হলেও হাল ছাড়েনি শত্রুপক্ষ। ক্রমেই গুহামুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বাহনগুলো। চলন্ত টার্গেটে গুলি লাগানো সহজ কাজ না। দম আটকে নিশানা করল শেইচান।

ট্রিগারে আঙুলের আলতো ছোঁয়ায় একটা জেট স্কি-র দিকে পরপর তিনটা গুলি পাঠালো সাবেক আততায়ী। প্রথমটা সরাসরি আঘাত হেনেছে পেছনের অস্ত্রধারীর পিঠে। সাথে সাথে কাত হয়ে পানিতে পড়ে গেল লোকটা। দ্বিতীয় গুলিটা অবশ্য স্কি-র সামনের অংশে লেগেছে। যেমনটা আশা করেছিল, হকচকিয়ে গেছে ড্রাইভার। পরের গুলিটা সরাসরি তার কাঁধে। স্রোত গিলে নিল একেও। ততক্ষণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিচের স্টিলের ডকে আছড়ে পড়েছে লাগামছাড়া জেট স্কি।

একটা গেল...

কিন্তু এখনও দুটো বাকি!

বিপদ বুঝতে পেরেছে বাকি দুই স্কি-র ড্রাইভার। গতি আরও বাড়িয়ে দিল তারা, এঁকেবেঁকে ছুটছে গন্তব্যের দিকে। মাথা ঠান্ডা করে বাহন দুটোর উদ্দেশ্যে পুরো ম্যাগাজিন খালি করল শেইচান। তবে এবার আর কাজ হয়নি। গুহামুখে হারিয়ে গিয়েছে দুই জেট স্কি।

নিস্ফল আক্রোশে রেলিং আঁকড়ে ধরল সাবেক আততায়ী। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে লক্ষ্যহীন চিৎকার।

'সাবধান, গ্রে...'

সন্ধ্যা ৬:২১

বোটের সামনের অংশে নিচু হয়ে বসে আছে গ্রে। দুটো কাজ হচ্ছে এতে- সিলিং থেকে নেমে আসা স্ট্যালাকটাইটের দন্ডে ঠোকর খাওয়া থেকে বাঁচছে মাথা, সেই সাথে পেছনে বসা ফ্রেডরিকেরও সামনে দেখতে সুবিধা হচ্ছে। বেশ সাবধানে জোডিয়াক নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে পর্বতারোহী দলের নেতাকে। স্ট্যালাকটাইটের একটু জোর খোঁচা লাগলেই ফুটো হয়ে যাবে রাবারের বোট।

'আলোটা সামনে তাক করুন,' চেঁচাল ফ্রেডরিক। পানির গর্জনে কিছু শোনাই দায়।

চুপচাপ আদেশ পালন করল গ্রে।

প্রধান টানেল থেকে তীক্ষ্ম বাঁক নিয়ে বিভিন্ন শাখা টানেলে ঢুকে গেছে ভূগর্ভস্থ নদী। জোড়ালো স্রোত এসব সংযোগস্থলে। সাথে যোগ হয়েছে পানিতে ভেসে আসা গাছের গুঁড়িসহ বিভিন্ন আবর্জনা। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে ক্রমে নিচু হয়ে আসছে গুহার ছাদ।

বোটের নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য প্রাণপণে স্রোতের সাথে যুঝতে হচ্ছে ফ্রেডরিককে। পাকের মধ্যে পড়ে গেলে ইঞ্জিন ব্যাক গিয়ারে দিয়ে পিছিয়ে আসতে হচ্ছে সাথে সাথে। 'সাবধান!'

চিৎকার শুনে আচমকা বিপদটা উপলব্ধি করল গ্রে। সামনে তীক্ষ্ম একটা বাঁক নিয়ে বামদিকে এগিয়েছে নদী। সাদা ফেনায় ভরে গেছে জায়গাটা। মনে হচ্ছে যেন, পাকটা ওদের গিলে খাবার জন্য একেবারে ছুরি-চামচ নিয়ে তৈরি।

ইঞ্জিনের আওয়াজে পরিবর্তন টের পেল সিগমা কমান্ডার। পিছিয়ে আসার পরিবর্তে পূর্ণশক্তি দিয়েছে ফ্রেডরিক। লোকটার পরিকল্পনা আঁচ করতে পেরেছে সে। এই বাঁক পেরোতে হলে গতি দরকার।

পানির উপর দিয়ে যেন উড়ে চলেছে বোট। অতিরিক্ত গতির কারণে, পাকের সামনে পৌঁছে কাত হয়ে গেল একপাশে। চোখের পলকে পেরিয়ে গেল বিপজ্জনক বাঁকটা। স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল গ্রে-র মুখ দিয়ে।

'মজা শেষ,' বলে সামনের দিকে ইঙ্গিত করল ফ্রেডরিক।

সরু টানেল পেরিয়ে নদীটা ওখানে বিরাট একটা লেকে গিয়ে মিশেছে। পর্বতারোহীর গলায় বাঁকা সুর টের পেল সিগমা কমাণ্ডার। 'কিন্তু আসল খেলা এখনও বাকি।'

'কেন?'

এক শব্দে উত্তর এল, 'চ্যারিবডিস।'

চোখ কুঁচকে সামনে আলো ফেলল গ্রে। হোমারের 'ওডিসি' মহাকাব্য অনুযায়ী, সাগরে অসতর্ক নাবিকদের জাহাজ গিলে নেয়া বিশাল এক ঘূর্ণিস্রোতের নাম ছিল চ্যারিবডিস। কিন্তু গুহায় এর কাজ কী?

ব্যাপারটা একেবারেই ভালো ঠেকছে না...

সন্ধ্যা ৬:২৪

পথ চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল রোল্যান্ড। 'দাঁড়ান!'

পা ধুয়ে দিচ্ছে পানি। উঁচু জায়গা খোঁজার উদ্দেশ্যে পিছু হটছে তিন মূর্তি।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল লিনা। মাথায় থাকা হেডলাইট ল্যাম্পের মিটমিটে আলো জানান দিচ্ছে, ব্যাটারি প্রায় শেষ। 'কী হলো?'

'শুনুন।'

সামনে থেকে তাগাদা দিলেন জেরার্ড। 'সময় নেই কিন্তু...'

'আরে শুনুন না!' জোর দিল তরুণ যাজক। দুর্ব্যবহারের জন্য পরে ক্ষমা চেয়ে নেয়া যাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে সবার মনোযোগ লেকের দিকে ফেরানো উচিত।

কয়েক সেকেন্ড পর লিনাও ব্যাপারটা ধরতে পারল। 'ইঞ্জিনের আওয়াজ না?'

পিছিয়ে এলেন জেরার্ড। পানির গর্জন ছাপিয়ে মৃদু গুঞ্জনটা তার কানেও প্রবেশ করেছে। 'হ্যাঁ! ইঞ্জিনের আওয়াজ। পিছান...পিছান সবাই।'

বলে দেয়ার দরকার নেই। ইতিমধ্যে উল্টোদিকে হাঁটা শুরু করেছে রোল্যান্ড। বিড়বিড়িয়ে প্রার্থনা করছে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে।

লেকের অপর প্রান্ত থেকে ছোট্ট একটা আলো এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে।

হেডলাইট! একটা বোট!

'দাঁড়ান,' পরমুহূর্তেই শোনা গেল উদ্ধারকারীদের চিৎকার। 'আমরা আসছি।'

এক সেকেন্ড পর দৃশ্যপটে হাজির হলো আরও দুটো হেডলাইট।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রোল্যান্ড। মনে হচ্ছে, ওদেরকে উদ্ধার করার জন্য গোটা একটা দলকে পাঠানো হয়েছে।

সন্ধ্যা ৬:২৭

পেছনে ইঞ্জিনের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল গ্রে। টানেল পেরিয়ে এগিয়ে আসছে এক জোড়া জেট স্কি।

ধুশ শালা...

উজ্জ্বল হেডলাইটের কারণে বাহন দুটোর আরোহীদের মুখাবয়ব বোঝা যাচ্ছে না ঠিকই, তবে কু-ডাক ডাকতে শুরু করেছে সিগমা কমান্ডারের মন। পরমহূর্তেই তার আশঙ্কা সত্যি করে দিয়ে ছুটে এল এক পশলা গুলি, তবে লক্ষ্য স্থির না থাকায় মুখ গুঁজল পানিতে।

ফ্রেডরিককে নিচু হতে বলেই পিস্তল বের করল গ্রে। পরপর কয়েকটা গুলি অন্ধ করে দিল একপাশের স্কি-র হেডলাইট। ততক্ষণে চোখ সয়ে এসেছে আবছা অন্ধকারে। বুঝতে পারল, প্রতিটা বাহনে দু'জন করে আরোহী। গুলি আসছে ড্রাইভারের পেছনে থাকা অস্ত্রধারীদের রাইফেল থেকে।

লেকের দুই পাশে চলে গেল দুটো জেট স্কি। উদ্দেশ্য পরিষ্কার।

ওরা আমাদের দু'দিক থেকে ঘিরে ধরতে চাইছে...

রাগে কিড়মিড় করছে গ্রে-র দাঁত। একবার যদি স্কি-গুলো দুই পাশ থেকে ওদের সমান্তরালে চলে আসতে পারে, তবেই কাজ সেরেছে। দুই অস্ত্রধারীর বিপক্ষে ওর একটামাত্র পিস্তল কাজে আসবে না।

হেডলাইট জ্বলতে থাকা স্কি-টার দিকে আরও কয়েকটা গুলি পাঠাল গ্রে। তারপর চেঁচিয়ে উঠল ফ্রেডরিকের উদ্দেশ্যে। 'গতি বাড়ান...ওরা যেন আমাদের ধরতে না পারে।'

পর্বতারোহী নিজেও শক্ত ধাতুতে গড়া। মাথা নেড়ে গিয়ার পাল্টালেন তিনি। আরও তীব্র হলো জোডিয়াকের ইঞ্জিনের আওয়াজ।

আলোহীন জেট স্কি-টার দিকে মনোযোগ ফেরাল গ্রে। তবে ট্রিগার টানার আগেই গুলির শব্দ...এবার অবশ্য উল্টোদিক থেকে। লেকের পাড়ে দাঁড়ানো তিনজনের কেউ এই গুলিগুলো করেছে।

এঁকেবেঁকে নতুন বিপদটা এড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল বাহনটা। সেই সাথে গুলি পাঠাচ্ছে গুহার দেয়াল লক্ষ্য করে। গ্রে বুঝতে পারল, এই সাহায্যের রেশ খুব বেশিক্ষণ থাকবে না। যা করার তাকেই করতে হবে। তারপরও, অন্তত একদিক থেকে তো সুরক্ষা পাওয়া যাচ্ছে।

সঙ্গীদের উপর হামলা দেখে হকচকিয়ে গেছে হেডলাইটওয়ালা স্কি-র ড্রাইভার। তবে তাই বলে নিজে থেমে নেই, গতি বাড়িয়ে প্রায় চলে এসেছে জোডিয়াকের কাছাকাছি।

গুলি করার জন্য গ্রে হাত উঁচু করতেই চেঁচিয়ে উঠল ফ্রেডরিক। 'ধরে বসুন!'

সাথে সাথে পাল্টে গেছে ইঞ্জিনের আওয়াজ। সিগমা কমাণ্ডার অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, উল্টোদিকে চলতে শুরু করেছে তাদের বোট। তীরবেগে এগিয়ে আসছে পেছনের জেট স্কি।

'কী করছেন আপনি?'

জবাব দিল না ফ্রেডরিক। ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছে নিষ্ঠুর হাসি।

ততক্ষণে থেমে গেছে লেকের পাড়ের গুলির আওয়াজ। ওখানে যে ই থাকুক না কেন, হয় লুকিয়ে পড়েছে নয়তো মারা গেছে। সামলে নিয়ে আবারও পিছু ধাওয়া শুরু করেছে আলোহীন জেট স্কি।

তবে সঙ্গীদের সাফল্য উদযাপন করার মতো সুযোগ হেডলাইটওয়ালা স্কি-র আরোহীদের ভাগ্যে নেই। এতক্ষণে ফ্রেডরিকের মতলব ধরতে পারল গ্রে। ওদের বাম পাশ ধরে এগিয়ে আসছিল বাহনটা। সেদিকেই ঘূর্ণিস্রোত। শিকারের আনন্দে মত্ত স্কি-র ড্রাইভার টেরই পায়নি, নিজেরাই প্রকৃতির নিষ্ঠুর শিকারে পরিণত হতে চলেছে।

বিপদটা যখন বুঝতে পারল, তখন আর কিছুই করার নেই। ওই প্রবল স্রোতের টান কাটিয়ে ফেরা ছোট্ট স্কি ইঞ্জিনের ক্ষমতার বাইরে। মুহূর্তের ব্যবধানে উন্মত্ত পানি গিলে নিল বাহনটাকে।

তবে এখনও একটা বাকি।

আবারও গুলির আওয়াজ ভেসে এল লেকের পাড় থেকে। গ্রে বুঝতে পারল, লোকটার উদ্দেশ্য হচ্ছে ওকে পর্যাপ্ত সময় পাইয়ে দেয়া।

ধীরে-সুস্থে স্কি ড্রাইভারের মাথা নিশানা করে ট্রিগার টানল সিগমা কমান্ডার। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ। লোকটার হেলমেটের কাঁচে একটা ফাটল ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেল। সাথে সাথে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে লাল রক্ত।

পেছনের অস্ত্রধারীর কিছু করার নেই। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যাচ্ছে তার বাহন। কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে সবকিছু গ্রাস করে নিল ঘূর্ণিস্রোত।

ঝামেলা শেষ। এবার নিশ্চিন্তে উদ্ধার অভিযানটা সফল করা যাক।

'তাড়াতাড়ি চলুন,' ফ্রেডরিককে তাড়া লাগাল গ্রে। 'ওদেরকে তুলে নিয়ে বেরোই এই অভিশপ্ত গুহা থেকে।'

মাথা নেড়ে গিয়ার পাল্টাল দুঃসাহসী পর্বতারোহী।

'চলুন তবে।'

সন্ধ্যা ৬:৩৩

জোডিয়াকের উপর ঝুঁকে বসেছে লিনা। গোলাগুলির রেশ এখনও কাটেনি, মাথাটা ঝিমঝিম করছে। পাশে বসে জেরার্ডের হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে রোল্যান্ড। গুলির আঘাতে ছিটকে ওঠা পাথরের টুকরো আঘাত করেছে লোকটার এক হাতের উপরদিকে।

'আপনার সাহায্য ছাড়া হামলা থেকে বাঁচতে পারতাম না,' জেরার্ডকে বলল উদ্ধারকারীদের একজন। 'বেশ ভালো খেলা দেখিয়েছেন।'

লোকটা নিজের পরিচয় দিয়েছে কমান্ডার গ্রে পিয়ার্স বলে, ডারপা-র মিলিটারি ইউনিটের হয়ে নাকি কাজ করে।

রাইফেলটা কাছে টেনে নিলেন ফ্রেঞ্চ কমান্ড্যান্ট। 'আমার সহকর্মীদের মৃত্যুর বদলা হিসেবে এটা ওদের প্রাপ্য ছিল।'

ফ্রেডরিক নামের এক স্থানীয় লোক বোটটা চালাচ্ছে। তার চোখেমুখে চিন্তার ছাপ। তবে পাঁচজন আরোহী নিয়ে বেশ দ্রুতগতিতেই এগোচ্ছে জোডিয়াক।

লেক পেরিয়ে টানেলে ঢোকার আগ মুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'পানির স্তর বেশ উঁচু হয়ে গিয়েছে। সবাই মাথা নিচু করে রাখুন।'

মাথাটা একেবারে বোটের সাথে মিশিয়ে ফেলল লিনা। তবে এই অবস্থাতেও দৃষ্টি সামনের দিকে। মরার সময়ও মৃত্যুর চেহারা না দেখে মরতে চায় না।

অবশেষে ফেনিল পানি পেরিয়ে টানেলে ঢুকে পড়ল জোডিয়াক। তবে আসল বিপদ এখনও বাকি। দশ গজ সামনে তীক্ষ্ণ বাঁক।

টানেলের দেয়াল ঘেঁষে বোট চালাচ্ছে ফ্রেডরিক। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে উত্তাল বাঁকটা। স্রোতের তীব্রতা দেখে মনের অজান্তেই প্রার্থনা করতে শুরু করল লিনা।

হে ঈশ্বর... হে ঈশ্বর...

শ্বাসরুদ্ধকর একটা মুহূর্ত, পরক্ষণেই বাঁকটা পেরিয়ে গেল জোডিয়াক। স্রোতের টানে বেশ কমে গেছে গতি, তবুও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সবাই। কিন্তু হেডলাইটের আলোয়ে দেখা যাচ্ছে, সামনে পানির স্তর বেশ উঁচু। প্রায় ছাদ ছুঁইছুঁই অবস্থা। বোট আর ছাদের মাঝে এক গজ ফাঁক আছে কি না সন্দেহ। তার উপর আবার জায়গায় জায়গায় উঁকি দিয়ে আছে স্ট্যালাকটাইটের চোখা দন্ড।

'পেরোতে পারব তো?' রোল্যান্ডের কণ্ঠে অবিশ্বাস।

'পারতেই হবে।' জবাব দিল ফ্রেডরিক।

সাথে সাথে খোঁচা লেগে ফুটো হয়ে গেল রাবারের জোডিয়াকের এক অংশ। আঁতকে উঠে ব্যাক গিয়ার দিল ড্রাইভার, তবে ক্ষতি যা হওয়ার ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। পানি উঠতে শুরু করেছে বোটে। সেই সাথে পাল্লা দিয়ে কমছে গতি।

'পানি সেঁচতে হবে!' চেঁচিয়ে আদেশ দিল গ্রে। 'আপনাদের হেলমেট ব্যবহার করুন! তাড়াতাড়ি...'

একটানে মাথা থেকে হেলমেট খুলে আনল লিনা। যত দ্রুত সম্ভব সেঁচতে শুরু করল বোটের পানি। রোল্যান্ড আর জেরার্ডও তাই করেছে। নদীর সাথে হঠাৎ করেই অঘোষিত যুদ্ধ শুরু হয়েছে সবার। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে খকখক

করে কেশে উঠল ইঞ্জিন। স্রোতের বিপরীতে আর সুবিধা করতে পারছে না। ধীরে ধীরে পেছাতে লাগল জোডিয়াক। গ্রে আর ফ্রেডরিককে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করতে দেখল লিনা। ড্রাইভারের চেহারায় উদ্বেগ। জানে, ব্যর্থ হলে ওই ঘূর্ণিপাকে গিয়ে পড়তে হবে সবাইকে।

এমন সময় সামনে থেকে একটা গুঞ্জন শোনা গেল। টানেল ধরে একটা জেট স্কি এগিয়ে আসছে।

'আবারও শত্রুপক্ষ!' কাতরে উঠে অস্ত্র তুলে ধরলেন জেরার্ড। দুর্ভাগ্য পিছু ছাড়ছে না কিছুতেই।

তবে ট্রিগার টেপার ঠিক আগ মুহূর্তে, ধাক্কা মেরে রাইফেলের নলটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিল গ্রে।

'থামুন!'

সন্ধ্যা ৬:৪৬

শরীরের সব শক্তি দিয়ে থ্রটল মুচড়ে ধরেছে শেইচান। তীরবেগে এগোচ্ছে সামনের দিকে।

আরোহীদের গুলি করে ফেলে দেয়ার পর এই স্কিটাও ডকে আছড়ে পড়ে। তবে ভাগ্য ভালো, কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। চাবিটাও আটকে ছিল ইগনিশনে। সাথে সাথে দড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসে শেইচান। বাহনটা নিয়ে রওনা দেয় গ্রে-কে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু টানেলে ঢুকে দেখতে পায় ইতিমধ্যে খেলা শেষ করে ফেলেছে ওরা। এখন ফুটো বোট নিয়ে যুঝছে প্রবল স্রোতের সাথে। এক লোক তো তাকে দেখে প্রায় গুলি করেই বসেছিল। গ্রে চিনতে পেরে থামিয়েছে।

'একটা দড়ি দাও আমাকে,' চেঁচিয়ে উঠল শেইচান।

নোঙর করার দড়ি বোটেই ছিল। সাথে সাথে তার দিকে ওটা ছুঁড়ে দিল ফ্রেডরিক।

সিটের পেছনের হুকে দড়িটা আটকে স্কি ঘুরিয়ে নিল মেয়েটা। ফুল গিয়ার দিয়ে মুচড়ে ধরল থ্রটল। আশা করা যায়, দুই ইঞ্জিনের সম্মিলিত চেষ্টায় কাজ হবে।

তবে কয়েক সেকেন্ড এক জায়গাতেই থমকে রইল দুই জলযান। তারপর অবশেষে নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল।

পরবর্তী এক ঘন্টায় টানেলের মুখে পৌঁছে গেল সবাই। ডকে বোট নোঙর করে পা রাখল শক্ত মাটিতে।

সন্ধ্যা ৭:১২

গোটা দলটাকে নিয়ে পার্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে গ্রে। ফ্রাঙ্কোপ্যান দুর্গের অন্ধকার ছায়া পড়েছে রাস্তায়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এই এলাকা থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। শত্রুপক্ষকে ছোট করে দেখার উপায় নেই। কে জানে, আবার কখন কোনদিক দিয়ে হামলা হয়।

একটা বিএমডব্লিউ গাড়ি এগিয়ে এসে ব্রেক কষল। ড্রাইভিং সিটে ড্যাগ বসে আছে।

'যাওয়ার সময় হয়েছে,' জানালা দিয়ে মাথা বের করল ছেলেটা। 'পুলিশ হোটেল আর গুহায় ঝামেলাকারীদের খোঁজে আছে। রাস্তাঘাট এখনও খোলা, তবে যে কোনও মুহূর্তে বন্ধ করে দিতে পারে।' বলে গাড়ির গায়ে একটা মৃদু চাপড় দিল। 'এটা এক বন্ধুর কাছ থেকে ধার করে আনলাম।'

ড্রাইভিং সিটের দরজাটা টেনে খুলে ফেলল গ্রে। 'তুমি কোথাও যাচ্ছ না।'

সাথে সাথে আবারও সেটা বন্ধ করে দিল ড্যাগ। গর্বভরে বলল, 'এদিকের পথঘাট চেনেন আপনি? আমি চিনি।'

সামনে এগোল ফ্রেডরিক। 'পিচ্চি ঠিকই বলেছে। এলাকাটা ভালো করে চেনে, আপনাদের এমন কাউকে দরকার।'

প্রশ্নবোধক দিকে গ্রে-কে তার দিকে তাকাতে দেখেই ফের মাথা নাড়ল। 'মাফ করবেন। তবে ইতিমধ্যে আপনাদের গাইডগিরি করার শখ মিটে গেছে আমার। তাছাড়া কমান্ড্যান্ট জেরার্ডকে হাসপাতালে নেয়ার কাজটাও আমাকেই করতে হবে।'

গ্রেন্স সৈনিকের দিকে চোখ ফেরাল গ্রে। ওদের সাথে যাবার বদলে এখানে থেকে নিজের লোকেদের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাবেন বলে আগেই জানিয়েছেন তিনি। খুঁজে দেখতে হবে, হামলার পর পাহাড়ে কেউ বেঁচে আছে কি না। সব শুনে তাকে দোষ দিতে পারেনি সিগমা কমান্ডার। তার জায়গায় নিজে থাকলেও সম্ভবত এটাই করত।

কথাবার্তা ঠিকঠাক হয়ে যাবার পর, এসইউভি-র সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে উঠে বসল গ্রে। রোল্যান্ড, লিনা আর শেইচানের জায়গা পেছনে। আপাতত গন্তব্য- জাগরেব।

গাড়ি চলতে শুরু করতেই, সামনে ঝুঁকে গ্রে-র দৃষ্টি আকর্ষণ করল লিনা। কেউ ওদের অবস্থান খুঁজে বের করে ফেলতে পারে ভেবে, সবার ফোনের ব্যাটারি খুলে রাখার আদেশ দিয়েছিল সে।

'আমার বোনকে কি এখন কল করতে পারব?'

মাথা নাড়ল সিগমা কমান্ডার। 'না। শত্রুকে ভাবতে দিন যে, ওদের আক্রমণ সফল হয়েছে। মারা গেছেন আপনি।'

হতাশ ভঙ্গিতে আবারও সিটে হেলান দিল লিনা।

'আপনার বোন আশা করি নিরাপদেই আছে। চিন্তা করবেন না।' মেয়েটাকে আশ্বস্ত করার প্রয়াস পেল গ্রে।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মেয়েটার মুখ দিয়ে। 'তাই যেন হয়।'

অধ্যায় আট
২৯ এপ্রিল, দুপুর ১:৩৩
লরেন্সভিল, জর্জিয়া

বাকোর ক্লাসরুমের ছোট্ট টেবিলটাতে বসে আছে মারিয়া, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হাতের সেলফোনের দিকে। ফোনে লিনার কণ্ঠ শুনতে পাওয়ার সাথে সাথে অ্যামি আর মঙ্ককে জানিয়েছে ব্যাপারটা। ওরা এখনও উপরতলাতেই আছে, কথা বলছে ওয়াশিংটনে। তবে তাকে নতুন কিছু জানায়নি।

ঘরে উপস্থিত আরেকজনের দিকে চোখ ফেরাল মারিয়া। বন্ধুর কলের আশায় নিজের ফোন হাতে অপেক্ষা করছে জো কোয়ালস্কি। সেই সাথে আরেকটা কাজ অবশ্য করছে, খাঁচায় বন্দী বাঘের মতো পায়চারি করছে গোটা ঘরে। বোনের কণ্ঠ শোনার পর হতাশায় ভেঙে পড়ছিল মারিয়া। তবে এই লোকটাই তাকে আশার বাণী শুনিয়েছে। বলেছে, তার আরেক সহকর্মী গ্রে -যাকে লিনাকে উদ্ধার করতে পাঠানো হয়েছে- অবশ্যই ফিরিয়ে আনবে ওকে।

মনে মনে লোকটার তারিফ না করে পারল না প্রজননবিদ। অবশ্য তার চেহারাটা মোটেও তারিফ পাবার যোগ্য না। চারকোনা চোয়ালে, ঘেরা দাগে ভরা উদ্ভট মুখ, ভাঙা নাক, কান দুটো উঁকি দিয়ে আছে দু'পাশে।

ঘরের অন্যপ্রান্ত থেকে আসা মৃদু উফ...উফ আওয়াজে মারিয়ার সম্বিত ফিরল। হোয়াইটবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বাকো। হাতের মার্কারটা দিয়ে বোর্ডে চারটা বর্ণ লিখেছে ও।

LENA

বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মারিয়া। বর্ণমালা ছাপা প্লাস্টিক ব্লকের সাহায্যে ওরা সহজ কিছু শব্দ বাকোকে শিখিয়েছিল। ফ্যাসিলিটির কয়েকজন বাসিন্দার নামও ছিল সেগুলোর ভেতর... কেয়ারটেকার জ্যাক, কুকুরছানা ট্যাঙ্গো, আর অবশ্যই মারিয়া এবং লিনা।

হতভম্ব হয়ে গেছে কোয়ালস্কিও। 'ও...ও লিখতেও পারে!'

'বাকো আঁকাআঁকি করতে ভালবাসে। তবে এরকম পুরো শব্দ লেখার ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি।'

বড় বড় চোখে দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে গরিলাটা। যেন বোঝাতে চাইছে, এটা তার জন্য মামুলি ব্যাপার।

'কী চালাক হয়ে গেছ তুমি!' মারিয়ার কণ্ঠে উচ্ছ্বাস।

ডানহাতের একটা আঙুল নিজের বুকে তুলে ধরল বাকো। তারপর বারবার পুনরাবৃত্তি করতে লাগল একটা ইশারা। [ভালবাসি...ভালবাসি...ভালবাসি...] সব শেষে বোর্ডে লেখা শব্দটার দিকে ইঙ্গিত করল।

জবাবে হাসল মারিয়া। 'আমিও লিনাকে ভালবাসি।'

হয়ত বাকো বোনের ব্যাপারে তার উৎকণ্ঠা আঁচ করতে পেরেছে, আর এখন নিজের এই লুকানো প্রতিভা দেখিয়ে চাচ্ছে যেন ওই উৎকণ্ঠার মাত্রা কিছুটা হলেও কমে। তাহলে বলতে হয়, সফল হয়েছে সে। খুশিতে পানি এসে যাচ্ছে মারিয়ার চোখে।

মার্কারটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে এগিয়ে এল বাকো, জড়িয়ে ধরল 'মা'কে।

'তুমি আসলেই একটা ভালো ছেলে।'

গরিলাটাকে ছাড়িয়ে দিল প্রজননবিদ। 'আমরা বরং বাইরে ঘুরতে যেতে পারি,' বলে কোয়ালস্কির দিকে তাকাল সে। 'এমনিতেও প্রতিদিন দুপুরে ওকে নিয়ে হাঁটতে বেরোই আমি। আজ অবশ্য একটু দেরি হয়ে গেছে।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল বিশালদেহী সিগমা এজেন্ট। 'কোথায়?'

'ফ্যাসিলিটিটা একশো একর জায়গার উপর নির্মিত। শুধু ভবনগুলো নয়, বেশ বড় একটা বনও এর অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত গাছের ফাঁকে একটা নিয়মিত ট্রেইল ধরেই হাটাহাটি করি আমরা।' বলে বাকোর দিকে ইশারা করল মেয়েটা। 'বেড়াতে যেতে ও খুব পছন্দ করে।'

তীব্র একটা অস্বস্তিবোধ ভর করল মারিয়ার মনে। বাইরে গেলে বাকো বেশ উৎফুল্ল থাকে। গাছপালায় ঘেরা জায়গাতেই যেন নিজেকে পুরোমাত্রায় ফিরে পায় বন্দি গরিলা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কোয়ালস্কির দিকে তাকাল সে। 'আপনার না গেলেও চলবে। সময়টুকু চাইলে উপরে আপনার বন্ধুর সাথে কাটাতে পারেন।'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সিগমা এজেন্ট। 'তার চাইতে ভালো, আমিও কিছুটা বাতাস খেয়ে আসি।'

মারিয়া আন্দাজ করল, সম্ভবত ওকে চোখে চোখে রাখার আদেশ পেয়েছে লোকটা। যাই হোক, এখন এসব ভাবার চাইতে বাইরের আলো বাতাসে হাঁটাটা বেশি জরুরী।

টেবিল থেকে সেলফোনটা তুলে নিল প্রজননবিদ, চায় না- বোনের কোনও কল মিস হয়ে যাক। 'বেড়াতে যাওয়ার জন্য তৈরি, বাকো?'

উল্লসিত ভঙ্গিতে আগে বাড়ল গরিলাটা। কোয়ালস্কিও পিছু নিল বিরস বদনে।

তবে তাকে এগোতে দেখে ভাটা পড়ল বাকোর উৎসাহে। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, লোকটাকে নিজের ভ্রমণসঙ্গী হিসেবে মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে তার।

প্রানিটাকে শান্ত করার প্রয়াস পেল মারিয়া। 'আমরা বরং ট্যাঙ্গোকেও সাথে নিই। কি বল?'

কুকুরছানাটার নাম শুনে আবারও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল বাকো। মারিয়ার হাত ধরে টান শুরু করল দরজার দিকে। গরিলাটার কান্ড দেখে মৃদু হেসে দরজা খুলে দিল প্রজননবিদ।

দরজা পেরিয়ে বাধ্য ছেলের মতো দাঁড়িয়ে গেল বাকো। বাইরে যাওয়ার আগে একটা কাজ করা বাধ্যতামূলক। দুটো জিপিএস ট্র্যাকার নিয়ে তার দুই হাতে আটকে দিল মারিয়া। দুই দিকে চুম্বকায়িত অংশ থাকায় সহজেই হাত আঁকড়ে থাকবে ওগুলো।

কাজটা শেষ হতেই আগে বাড়ল গরিলা।

আগে আগে পথ দেখিয়ে ওদের ভবনের এক প্রান্তে নিয়ে এল মারিয়া। 'মা'-এর একেবারে গা ঘেঁষে হাঁটছে বাকো। বিশেষ করে অন্যান্য প্রানিদের নিয়ে পরীক্ষা চলাকালীন ল্যাবগুলোর সামনে এসে আরও সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। যেন দরজা বন্ধ থাকলেও আন্দাজ করতে পারছে ভেতরের পরিস্থিতি। রেসাস বানর, মাঙ্গাবে বানর, কাঠবিড়ালি, শিম্পাঞ্জি... এদের তুলনায় বলতে গেলে বেশ আরামেই আছে বাকো।

প্রানিটাকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল মারিয়া। 'ভয় পেয়ো না, বাকো। সব ঠিক আছে।'

ল্যাব পেরিয়ে কুকুরশালায় পৌঁছাল ক্ষুদ্র দলটা। জ্যাকের ডিউটি আপাতত এখানেই।

'বাকোকে নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছেন নাকি?' মুচকি হেসে প্রশ্ন করল সে।

'ট্যাঙ্গোকেও নেব,' জবাব দিল মারিয়া।

'ঠিক আছে। ওকে নিয়ে আসছি আমি। তবে বাইরে কিন্তু ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে। পথটাও কাদাটে হয়ে আছে।'

'সমস্যা নেই,' বলে কোয়ালস্কির দিকে ফিরল মারিয়া। নজর লোকটার ঝাঁ-চকচকে স্যুটের দিকে। 'তবে আপনাকে মনে হচ্ছে এখানেই অপেক্ষা করতে হবে।'

ব্যর্থ মনোরথে নিজের জুতোর দিকে তাকাল কোয়ালস্কি। 'এগুলো ব্রুনেলো কুসেনালি...একেবারে হাতে সেলাই করা।'

জ্যাকের মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। 'আমার কাছে একজোড়া বাড়তি জুতো আর কভারঅল আছে। সাইজে আপনার একটু ছোট হবে হয়তো, তবে কাজ চলবে।'

শ্রাগ করল সিগমা এজেন্ট। 'ঠিক আছে।'

মুচকি হেসে তাকে নিয়ে পাশের লকার রুমে ঢুকে গেল ছেলেটা।

সকাল ১১:৫৭

প্যান্টটা ভালোভাবে ভাঁজ করে লকারে রেখে দিল কোয়ালস্কি। শার্ট আর স্যুট ইতিমধ্যে একটা হুকে ঝুলছে। খোলাখুলি পর্ব শেষ করে ধারে পাওয়া কভারঅলটা হাতে তুলে নিল বক্সার শর্টস আর মোজা পরা সিগমা এজেন্ট। জ্যাক নামের ছেলেটা লম্বায় প্রায় তার সমান হলেও, প্রস্থের দিক দিয়ে পাটকাঠির মতো টিংটিঙে। তবে কপাল ভালো, ঢিলেঢালা কাপড়চোপড়ে অভ্যস্ত।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জিনিসটা গায়ে চড়িয়ে নিল কোয়ালস্কি। সামনের দিকের জিপার লাগানোর সময় পেট আর বুক একটু সংকুচিত করে নিতে হচ্ছে। কিন্তু সব মিলিয়ে খুবে একটা খারাপ হয়নি।

কাপড় খোলার সময় শোল্ডার হোলস্টারটা একটা বেঞ্চে নামিয়ে রেখেছিল সে। এটা এখন আর কাপড়ের নিচে পরার সুযোগ নেই। খোলামেলাভাবে অস্ত্র ঝোলানোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মারিয়া ব্যাপারটা পছন্দ না-ও করতে পারে। তাই মাথা নেড়ে ফিতেটা স্যুটের সাথে ঝুলিয়ে দিল কোয়ালস্কি। মুখে বিড়বিড় করছে, 'যতই অপছন্দ করি না কেন, গরিলাটাকে গুলি তো আর করা যাবে না।'

তারপর মুচকি হেসে ঝুলন্ত হোলস্টার থেকে খুলে নিল নতুন পাওয়া হেকলার অ্যান্ড কচ .৪৫ ক্যালিবারের পিস্তলটা। ঢুকিয়ে রাখল কভারঅলের পেছনদিকের একটা পকেটে। অস্ত্রের খাপ না হয় বাদ দেয়া গেল, তবে এটা ছাড়া তার পক্ষে থাকা সম্ভব না।

সব শেষে একজোড়া রাবারের বুটে পা গলিয়ে লকার রুম থেকে বেরিয়ে এল কোয়ালস্কি। ততক্ষণে জ্যাক খোঁয়াড় থেকে একটা ধূসর-কালো ফুটকি দেয়া কুকুরছানা বের করে এনেছে।

'ট্যাঙ্গো,' পরিচয় করিয়ে দিল মারিয়া।

বন্ধুকে দেখে উল্লসিত ভঙ্গীতে হাত নাড়তে শুরু করেছে বাকো। ফিতা খুলে কুকুরটাকে তার সাথে যোগ দেয়ার সুযোগ করে দিল জ্যাক।

'তৈরি?' জিজ্ঞেস করল মারিয়া।

মাথা নেড়ে সায় দিল কোয়ালস্কি। 'চলুন তবে।'

লোডিং ডকের দরজা পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সবাই। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। বাতাস ঠান্ডা আর পরিস্কার।

গাছপালার সারির ফাঁকে তৈরি একটা ট্রেইল ধরে হাঁটতে শুরু করেছে মারিয়া। বাকি সবাই তাকে অনুসরণ করছে। সবার পেছনে জ্যাক, হাতে কুকুরটার খোলা ফিতা। এক মুহূর্ত পর, মারিয়ার হাত ছেড়ে দিয়ে ট্যাঙ্গোর সাথে ছোটাছুটিতে মত্ত হয়ে পড়ল বাকো। পঞ্চাশ গজ সামনে আরও ঘন হয়েছে পাইন, ওক আর সিডার গাছের বনটা।

'প্রানিগুলোকে এখানে এভাবে ছেড়ে দেয়াটা কি ঠিক হচ্ছে?' জানতে চাইল কোয়ালস্কি।

জবাবে সামনের দিকে ইশারা করল মারিয়া। 'মানুষের সাথে থাকতেই বেশি পছন্দ করে বাকো। কখনোই পালানোর কোনও ইচ্ছা ওর মাঝে দেখা যায়নি। দেখতে একটু কঠিন মনে হলেও আসলে বেশ লক্ষী ছেলে। সুরক্ষিত ফ্যাসিলিটি, আমাদের আর ট্যাঙ্গোকে ছেড়ে বাইরের বিপদের মুখোমুখি হওয়ার দুঃসাহস ওর নেই।'

প্রানিটার জন্য প্রজননবিদের কণ্ঠে ফুটে ওঠা মায়া আন্দাজ করতে পারছে কোয়ালস্কি। সেই সাথে অবশ্য একটু অনুশোচনার আভাসও আছে। অন্য একটা প্রশ্ন করে প্রসঙ্গটা পাল্টে ফেলল সে।

'তো দুই বোন একইসাথে প্রজননবিদ হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ দেখালেন কেন আপনারা?'

মুচকি হাসল মারিয়া। কণ্ঠে খেলা করছে দুষ্টুমি। 'কেন? আপনার কি মনে হয় শুধু ছেলেরাই এটাকে পেশা হিসেবে নিতে পারে? আসলে এর পেছনে আমাদের জমজ হিসেবে জন্মানোর ব্যাপারটার ভূমিকা আছে। কল্পনা করুন, দেখতে একই রকম একজনের সাথে বেড়ে উঠছেন আপনি। তবে বিচারবুদ্ধি, মননশীলতা ইত্যাদিসহ দু'জনের অভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তুগুলো কিন্তু আলাদা। স্বাভাবিকভাবেই এসবের কারণটা জানতে চাইবেন আপনি। আমাদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ওই কৌতুহলই ধীরে ধীরে মোড় নিয়েছে পেশাগত ক্ষেত্রে।'

'আচ্ছা... আমি বরং ভেবেছিলাম, সেক্সি ল্যাব কোটের প্রতি আকর্ষণই এই পেশায় আসার কারণ,' কোয়ালস্কির গলাতেও দুষ্টুমির সুর।

এবার গলা ছেড়ে হেসে উঠল মেয়েটা। 'সেটা অবশ্য অস্বীকার করব না।'

ততক্ষণে ঘন গাছপালার সীমানায় পৌঁছে গেছে বাকো আর ট্যাঙ্গো। দুই বন্ধুকে দৃষ্টিসীমায় রাখার জন্য তাদের কেয়ারটেকার জ্যাককেও বেশ খানিকটা এগোতে হয়েছে।

মাথায় জমা হওয়া বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ঝেড়ে ফেলার জন্য মাথা নাড়ল কোয়ালস্কি। ক্ষণিকের জন্য মনে হলো- তারও বাকোর মতো ওরকম ঘন লোম থাকলে আর কষ্ট করে আলাদাভাবে কাপড় গায়ে চড়ানো লাগত না।

পথ চলতে চলতে হঠাৎ থমকে গেছে জ্যাক।

প্রমাদ গুনল বিশালদেহী সিগমা এজেন্ট। এক মুহূর্ত পর তার চোখেও ধরা পড়ল ব্যাপারটা। গাছের সারির ফাঁকে ফাঁকে যেন কতগুলো ছায়া নেচে বেড়াচ্ছে। পরক্ষণেই শোনা গেল রাইফেলের গর্জন। সতর্ক ভঙ্গীতে মারিয়াকে নিয়ে মাটিতে লাফিয়ে পড়ল কোয়ালস্কি। সাথে সাথে লম্বা ঘাস আড়াল দিয়েছে তাদের।

শরীর নাড়ানোর আগেই আরেকটা গুলির আওয়াজ শোনা গেল। আগের শটটা উদ্দেশ্যহীন হলেও, এবারের লক্ষ্য জ্যাক। কাঁধে রক্তের ফোয়ারা নিয়ে কাদায় লুটিয়ে পড়ল ছেলেটা।

'উঠবেন না!' মারিয়ার উদ্দেশ্যে কাতরে উঠল কোয়ালস্কি। পকেট থেকে পিস্তল বের করে, নিজে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল কেয়ারটেকারের দিকে। ততক্ষণে ট্যাঙ্গোকে কোলে তুলে নিয়ে পিছিয়ে আসছে বাকো। তাল সামলাতে না পেরে পিছলে পড়ল একেবারে সিগমা এজেন্টের ঘাড়ে। সাথে সাথে তার হাত থেকে ছুটে গিয়ে ঘাসের রাজ্যে মুখ লুকালো পিস্তলটা।

ধুর শালা...

এখন আর অস্ত্র খোঁজার সময় নেই। হাঁচড়েপাচড়ে জ্যাকের কাছে পৌঁছে দেখতে পেল, ব্যথায় কাতরাচ্ছে ছেলেটা। ভয়ার্ত চোখজোড়ার দৃষ্টি আকাশের দিকে, তবে এখনও জ্ঞান হারায়নি।

বন ছেড়ে বেরিয়ে আসছে মাস্ক পরা কতগুলো অবয়ব। ঘাড় ঘুরিয়ে প্রাইমেট সেন্টারের খোলা দরজার দিকে তাকাল কোয়ালস্কি। বেশ দূরে। তাড়াতাড়ি করে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত নিয়ে জ্যাকের মুখে মাখিয়ে দিল সে। 'দম আটকে রেখে মরার ভান করো।'

ছেলেটার জন্য আপাতত আর কিছু করার নেই। পিছু হটে মারিয়ার দিকে এগোতে লাগল কোয়ালস্কি। বাকোও ততক্ষণে 'মা'-এর সাথে যোগ দিয়েছে। সবুজ ঘাসের মাঝে উঁচু হয়ে আছে গরিলাটার কালচে দেহ। যেন কূলহারা সমুদ্রে নাবিককে পথ দেখানো পাথুরে দ্বীপ। আক্রমণকারীদের চোখে পড়তে খুব একটা সময় লাগবে না।

প্রজননবিদের হাত ধরে নিজের দিকে টানল কোয়ালস্কি। 'ছেড়ে দিন ওকে। লম্বা ঘাসে লুকিয়ে থাকার একটা সুযোগ... '

'না!' শোনামাত্র তার প্রস্তাবটা নাকচ করে দিল মারিয়া। 'কিছুতেই ওকে ছেড়ে যেতে পারি না আমি।'

এমন সময় চেঁচিয়ে উঠল একটা কণ্ঠ। 'ড. ক্রেন্ডাল, বাকোকে নিয়ে আমাদের সাথে আসুন। তাহলে বাকি সবাইকে ছেড়ে দেয়া হবে।'

হতাশায় গালি বেরিয়ে এল কোয়ালস্কির মুখ দিয়ে। নিশ্চয়ই ওদের দৈনন্দিন রুটিন সম্পর্কে জানত শুয়োরের বাচ্চাগুলো। সেই হিসেব মতো ফাঁদ পেতেছে এখানে।

সিগমা এজেন্টের দিকে চোখ ফেরাল মারিয়া। ভাবছে, সে হয়ত ওদের এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারবে।

একটা পথ অবশ্য খোলা আছে কোয়ালস্কির সামনে, তাই করল সে। দুই হাত উপরে তুলে সটান উঠে দাঁড়াল। 'গুলি করবেন না!'

বাকোর হাত থেকে একটা জিপিএস ট্র্যাকার খুলে ট্যাঙ্গোর গলায় পরিয়ে দিল মারিয়া, হাতে ইশারা করছে ফ্যাসিলিটির দরজার দিকে। 'ঘরে ফিরে যাও।'

তবে কুকুরছানাটার গায়ে নড়াচড়ার কোনও আভাস নেই।

'মা'-এর আদেশ বুঝতে পেরেছে বাকো। মৃদু ধাক্কা দিয়ে বন্ধুকে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করল সে।

এবার কাজ হয়েছে। দৌড় শুরু করল ট্যাঙ্গো, মুহূর্তেই হারিয়ে গেল লম্বা ঘাসের ফাঁকে।

মারিয়া কিন্তু চুপচাপ বসে নেই। বাকোর অন্য হাত থেকেও ট্র্যাকার খুলে নিয়ে লুকিয়ে রাখল নিজের পকেটে। তারপর চেঁচিয়ে উঠল গলা ছেড়ে। 'ঠিক আছে... আপনাদের কথা মতোই সব হবে। তবে দয়া করে কারও ক্ষতি করবেন না...'

কথাটা বলা শেষ হয়েছে কি হয়নি, আরেকটা গুলির আওয়াজে কেঁপে উঠল প্রজননবিদ। ঘাড় ঘুরিয়ে অস্ত্রধারীর দিকে তাকাল কোয়ালস্কি। সম্ভবত এই হারামিটাই দলের নেতা। একটু আগের ঘোষণাটাও তার মুখ থেকেই বেরিয়েছিল। এই মুহূর্তে জ্যাকের বুকে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে সে।

শুয়োরের বাচ্চা...

কেয়ারটেকারের মৃতদেহ চোখে পড়তেই গোঙানি বেরিয়ে এল মারিয়ার মুখ দিয়ে। ততক্ষণে আরও দুই পা এগিয়ে এসেছে অস্ত্রধারী। পিস্তলের নল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, সোজাসুজি কোয়ালস্কির বুকের দিকে তাক করা।

নিজের চরম পরিণতির কথা কল্পনা করে চোখ বন্ধ করে ফেলল সিগমা এজেন্ট।

তবে মারিয়া লোকটাকে আটকাল। 'না! আমাকে আর বাকোকে কাজে লাগাতে চাইলে জো-কেও আপনাদের সাথে নিতে হবে। ও বাকোর ট্রেইনার। কীভাবে প্রানিটাকে শান্ত রাখতে হয়, কীভাবে আদেশ দিতে হয়... সব জানে।' হড়বড় করে এক দমে কথাগুলো বলে থামল প্রজননবিদ। জানে না, এতে কাজ হবে কি না।

ঘাড় নামিয়ে নিজের বুকের দিকে তাকাল কোয়ালস্কি। কোনও গুলি এখনও হাড়-মাংস ফুটো করে ঢুকে পড়েনি। বুক পকেটে এমোরি ইউনিভার্সিটির লোগো ছাপা। ভাগ্যিস, জ্যাকের কভারঅলটা ছিল।

দ্বিধা-বিভক্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকয়ে আছে বাকো। কোয়ালস্কি জানে, এখন একমাত্র এই প্রানিটাই পারে ওর জীবন ভিক্ষা দিতে।

বাঁচা আমাকে শালা...

দমবন্ধ করা কয়েক সেকেন্ড পর অবশেষে নড়ে উঠল বাকো, হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল সিগমা এজেন্টের এক হাত। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল কোয়ালস্কি।

যাক...এবারের মতো অন্তত প্রাণটা রক্ষা পেয়েছে...

তীক্ষ্ম নজরে তিন জনের ছোট দলটার দিকে তাকিয়ে আছে পিস্তলবাজ। 'চপারে তুলে নাও সবাইকে।'

সাথে সাথে এগোনোর তোড়জোড় শুরু করল হামলাকারীদের দলের বাকি সদস্যরা। এক ফাঁকে কোয়ালস্কির দিকে ফিরে তাকাল বাকো, এক হাত মুঠো পাকিয়ে অন্য হাতের নিচে রেখে তুলে ধরেছে উপরের দিকে। তবে ইশারার দরকার ছিল না। আবেদনটা তার চোখের দৃষ্টিতেই স্পষ্ট।

[সাহায্য করো আমাদের]

মারিয়ারও একই ভঙ্গি। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল কোয়ালস্কির মুখ দিয়ে। এই মাত্র ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে দু'জন।

কিন্তু একা আমি কতটুকু আর করব!

দুপুর ১২:২৩

চোখ কচলে কম্পিউটার মনিটরে ভেসে থাকা সিটি স্ক্যান রিপোর্টের দিকে ভালো করে তাকাল মঙ্ক। আসলেই অন্যান্য গরিলার চাইতে বাকোর মস্তিষ্কের গঠন বেশ আলাদা। কর্টেক্সের ভাঁজগুলো সাধারণের তুলনায় প্রায় তিন গুণ বেশি, আকার বড় হওয়ায় খুলির ভেতর আঁটসাটভাবে বসে আছে।

পাশে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছে অ্যামি ভু, হোয়াইট হাউজ থেকে তার এক সহকর্মীর কল এসেছে।

'ঠিক আছে,' ওপ্রান্ত থেকে কিছু একটা বলা হয়েছে মহিলাকে। তারই জবাব দিল সে। 'ব্যবস্থা করছি, জাইজিয়ান।'

কথা শেষে চাইনিজ ভাষায় বিদায় জানানোর ব্যাপারটা খেয়াল করেছে মঙ্ক। তাহলে সম্ভবত কলটা হোয়াইট হাউজ থেকে আসেনি। পরমুহূর্তেই মনিটরের

কোনায় একটা নড়াচড়া তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আর এ কারণেই বেঁচে গেল এ যাত্রা।

অ্যামির হাতে ছোট্ট একটা পিস্তল বেরিয়ে এসেছে।

সহজাত প্রতিক্রিয়ার বশে নড়ে উঠল মঙ্ক। মনিটর ছেড়ে সরে গিয়ে সাথে সাথে বসার চেয়ারটা ধাক্কা মারল মহিলাকে লক্ষ্য করে। ততক্ষণে অবশ্য ট্রিগারে চেপে বসেছে অ্যামির আঙুল, তবে শেষ মুহূর্তে বাধা পাওয়ায় শিকারকে ছেড়ে কম্পিউটার মনিটরটাকে মাকড়শার জালে পরিণত করল বুলেট।

চেয়ারের বেকায়দা ধাক্কায় এক পা পিছিয়ে গেছে অ্যামি। সময়টুকু কাজে লাগিয়ে শোল্ডার হোলস্টার থেকে গ্লক পিস্তলটা বের করে আনল মঙ্ক, সাথে সাথে সেফটি ক্যাচ নামিয়ে অন্ধের মতো টিপে দিয়েছে ট্রিগার। গুলিটা মহিলার উরুতে আঘাত হানতেই হাঁটু ভেঙে মেঝেতে বসে পড়ল সে। অস্ত্র এখনও সিগমা এজেন্টের দিকে তাক করা।

একইসাথে বুলেট উগড়াল দু'জনের পিস্তল।

চট করে গুলির রেখা থেকে সরে গিয়ে কানের পাশ দিয়ে মৃত্যুকে বেরিয়ে যেতে দিল মঙ্ক। তবে অ্যামির ভাগ্য অতটা ভালো না। সময় মতো সরতে পারেনি সে। ফলাফল, ঘাড়ে চুমু দিয়ে গেল বুলেট। আঘাতের তীব্রতায় মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল মহিলা।

তবে শক্তপাল্লা বলতে হবে তাকে। এই অবস্থাতেও হাল ছাড়েনি। মঙ্ক অস্ত্রটা লাথি মেরে সরিয়ে দেয়ার আগেই, বিকৃত মুখে আবারও পিস্তল উঁচু করল প্রতিপক্ষের দিকে।

আর কোনও উপায় না দেখে ট্রিগার টিপল সিগমা এজেন্ট, এবার মাথা লক্ষ্য করে।

আক্ষরিক অর্থেই তরমুজের মতো বিস্ফোরিত হলো অ্যামির মাথা। এগিয়ে গিয়ে তার সেলফোনটা তুলে নিল মঙ্ক। পাখি মুখ খোলার মতো অবস্থায় নেই, কিন্তু এটা থেকে হয়ত কিছু একটা বের করা যাবে। তবে ততক্ষণে আরও একটা চিন্তা ভর করেছে টেকো সিগমা এজেন্টের মাথায়।

কোয়ালস্কি আর মারিয়া...

কেউ ফোন করে অ্যামিকে বলেছিল, মঙ্ককে শেষ করে দিতে। অর্থাৎ, তার আর দরকার ছিল না। আঁতকে উঠে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। লক্ষ্য- বাকোর ক্লাসরুম। নিচে নেমে জানালা দিয়ে তাকাতেই দেখা গেল, জায়গাটা পুরো খালি।

কোনও মৃতদেহ নেই, নেই কোনও রক্ত কিংবা ধস্তাধস্তির চিহ্ন।

এমনকি বাকোও নেই।

দ্বিধাবিভক্ত দৃষ্টিতে চারপাশে চোখ বুলাল মঙ্ক।

কোথায় সবাই?

এমন সময় হলওয়ের শেষ মাথায় একটা শব্দ শোনা গেল। কণ্ঠটা লিওনার্ড ট্রাস্কের। আর কোনও রাস্তা না পেয়ে সেদিকেই ছুট লাগাল মঙ্ক।

'কুকুরটাকে কে ছেড়েছে?' রাগী ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে চলেছেন ডিরেক্টর। 'এটাকে কেউ খোঁয়াড়ে ঢোকাও...

পার্টিশন দিয়ে আলাদা করা প্রানিদের থাকার জায়গা আর ল্যাব পেরিয়ে ছুটছে মঙ্ক। ট্রাস্ক হয়ত এই মুহূর্তে তাকে সাহায্য করতে পারবেন। হলের শেষ মাথায়, লোডিং ডকে পৌঁছে শেষ হলো তার দৌড়। লক্ষ্য করল, একটা খোলা দরজা দিয়ে বাইরের বৃষ্টিমুখর পরিবেশ দেখা যাচ্ছে।

ভিজে নেতিয়ে পড়া একটা কুকুরছানার উপর উবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ট্রাস্ক। জুতো দিয়ে দেয়ালের সাথে আটকে রেখেছেন প্রানিটাকে। অবশেষে কভারঅল পরা একটা মেয়ে এসে জন্তুটাকে উদ্ধার করল।

সামনে বাড়ল মঙ্ক। 'কী হয়েছে?'

ঘুরে তাকালেন ট্রাস্ক, রাগে লাল বর্ণ ধারণ করেছে মুখ। 'কুকুরটাকে কে যেন...' কিন্তু মঙ্কের হাতে পিস্তল দেখে মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল তার। 'আপনি... কী করছেন এসব!'

ব্যাখ্যা করার সময় নেই এখন।

একটা ফিতা এনে কুকুরছানাটার গলায় বাঁধছে মেয়েটা। কাজটা করার সময় একটা জিনিস গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

উৎসাহী ভঙ্গিতে হাত বাড়ালেন ট্রাস্ক। 'দেখি তো।'

জিনিসটা এগিয়ে দিল সে। 'এটা তো বাকোর ট্র্যাকারগুলোর একটা।'

এক পা এগিয়ে গেল মঙ্ক। 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন ডিরেক্টর। 'কিন্তু এটা কুকুরছানাটার গলায় কীভাবে এল?'

চিন্তিত দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে লাগল সে। 'ড. ক্রেন্ডাল বাকো আর ট্যাঙ্গোকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন।'

'কখন?' জিজ্ঞেস করল মঙ্ক।

'সঠিক সময় বলতে পারব না। তবে আধা ঘন্টার কম হবে না। জ্যাক ট্যাঙ্গোকে কুকুরশালা থেকে বের করার সময় আমার শিফট সবে শুরু হয়েছে।'

খোলা দরজাটা দিয়ে বাইরে তাকাল মঙ্ক।

'সম্ভবত ওরা বাইরেই আছে,' ট্রাস্ক বললেন। 'বেশ কিছু ট্রেইল আছে ওদিকে।'

কু ডাকছে মঙ্কের মন। একটু ভালোভাবে তাকাতেই সবুজ ঘাসের ভেতর কালচে কিছু একটা চোখে পড়ল। সামনে এগোতেই দেখা গেল, মানুষের দেহ ওটা।

হাঁ হয়ে গেল ট্রাস্কের মুখ। 'এ তো জ্যাক!'

বাকিদের খোঁজে চারদিকে চোখ বুলাল মঙ্ক। দেরি হয়ে গেছে।

'কেউ নেই,' বিড়বিড় করে বললেন ডিরেক্টর।

তার হাতের জিপিএস ট্র্যাকারের উপর স্থির হলো সিগমা এজেন্টের নজর।

নেই ঠিকই... তবে হারায়নি সম্ভবত।

দুপুর ১২:৪৮

খাঁচার ভেতর হাঁটু মুড়ে বসে আছে বাকো। আশেপাশের আওয়াজ যেন একেবারে মাথার ভেতর আঘাত করছে। ইচ্ছা করছে- চেঁচিয়ে ওঠে গলা ছেড়ে, দুই হাতে বুকে চাপড় দেয়, বের করে দেয় বুকের সব জমাট কষ্ট। পাশ্ববর্তী জানালা দিয়ে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে বৃষ্টিভেজা প্রকৃতি। প্রাকৃতিক ঝড়ের সাথে মনের ঝড় মিলেমিছে একাকার।

এসব ঝড়-বাদলের ভেতর একমাত্র আশার আলো হচ্ছে শুধু তার মা। খাঁচাটার পাশেই বসে আছেন তিনি। নিঃশ্বাস নিচ্ছেন অবিরত, চোখ দুটো বিস্ফোরিত, আতঙ্কে সাদা হয়ে আছে মুখ।

এক হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করার প্রয়াস পেল বাকো।

মা...

কিন্তু মায়ের হাত দুটো পেছনে বেঁধে রাখা।

বিশালদেহী লোকটাও তার পাশে আছে। সতর্ক ভঙ্গিতে চোখ বুলাচ্ছে চারদিকে। হাত বাঁধা পেছনে।

অন্য সিটগুলোতে মুখ ঢাকা খারাপ লোকগুলো বসা। তাদের চোখ সরু সরু, চামড়ার রঙও ভিন্ন।

মায়ের সেই বান্ধবীর মতো...ওই যে সেই মহিলা, যে মাঝে মাঝে বাকোকে সুড়সুড়ি দিতে আসত...

তবে এরা তার মতো অতটা ভালো নয়। সবাইকে কষ্ট দিচ্ছে।

বাকোর মনে আছে, কীভাবে ওরা তাকে খাঁচায় এনে ঢুকিয়েছে। একটা লম্বা লাঠি আছে লোকগুলোর কাছে, মাথা দিয়ে নীলচে আগুন বের হয়। অনেক ব্যথাও দেয়। মা ওদের থামিয়েছে। তার কথাতেই ভালো ছেলে মতো খাঁচায় ঢুকেছে বাকো। নইলে খারাপ লোকগুলো আরও কষ্ট দিত।

তারপর ওরা মা আর নতুন লোকটার কাছ থেকে সেলফোন কেড়ে নেয়। বাকো কিন্তু ফোন চিনতে পারে। জিনিসটা দিয়ে মাঝে মাঝে মায়ের বোন অর্থাৎ লিনার সাথে কথা বলে সে।

'সব ঠিক আছে,' মা বললেন।

নাক দিয়ে না-বোধক আওয়াজ করল বাকো।

কিচ্ছু ঠিক নেই...

নড়াচড়া করে একটু ঘুরে বসলেন মা। গরাদের ফাঁকে আঙুল নেড়ে একটা ইশারা করলেন তারপর।

[লুকিয়ে রাখো]

কথাটা বুঝতে পারলেও অর্থটা ধরতে পারেনি বাকো। কী লুকাবে সে? মা অবশ্য তার সাথে মাঝে মাঝে লুকোচুরি খেলেন। এখনও কি তাকে সেটাই করতে আদেশ দিচ্ছেন তিনি?

ঠোঁট সরিয়ে দাঁতের পাটি দেখাল বাকো। বুঝতে পারেনি মায়ের কথার অর্থ।

এবার অন্য হাতের মুঠো খুললেন মা। তালুতে প্লাস্টিকের তৈরি গোলাকার একটা জিনিস। এটা অবশ্য বাকো চেনে। ঘুরতে বেরোবার সময় তার দুই হাতে এরকম দুটো পরিয়ে দেয়া হয়। খারাপ লোকগুলোর হাতে ধরা পরার আগে একটা খুলে পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছিলেন মা।

আবারও এক হাতে চিহ্নটার পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি।

[লুকিয়ে রাখো...নাও]

এবার বুঝতে পেরেছে বাকো। হাত বাড়িয়ে জিনিসটা নিয়ে নিল মায়ের হাত থেকে। পিছিয়ে খাঁচার কোনায় চলে এল সাথে সাথে, বুঝতে পারছে না কোথায় রাখবে ওটা। মায়ের কথা না শুনলে তো ভালো ছেলে হওয়া যাবে না। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে জিনিসটা মুখে ঢুকিয়ে ফেলল। জিহ্বা দিয়ে চেপে রাখল একপাশের গালের সাথে।

ততক্ষণে মা-কে আবার ঘুরিয়ে বসিয়ে দিয়েছে একটা খারাপ লোক। ওই অবস্থাতেই মুচকি হেসে মাথা নাড়লেন তিনি। মায়ের মনের কথা কিন্তু বাকো ঠিকই বুঝেছে।

[ভালো ছেলে]

বিশালদেহী নতুন মানুষটাও তাকিয়ে আছে তার দিকে। হাসছে না যদিও, তবুও লোকটার চেহারায় ফুটে ওঠা সম্মতির ছাপ ধরতে পেরেছে বাকো।

খাঁচার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল গরিলা। এবার মনটা একটু শান্ত লাগছে।

মা বলেছেন, আমি ভালো ছেলে।

অধ্যায় নয়
৩০ এপ্রিল, সকাল ৭:৩০
বেইজিং, চীন

ক্ষমা করুন আমাকে...

'কিং বু শি... কিং বু শি...' হাঁটু গেড়ে বসে কাকুতি মিনতি করছে লোকটা। দৃষ্টি মেঝের দিকে নিবদ্ধ। 'শাওজিয়াং লাও, কিং বু শি।'

তার দিকে পেছন ফিরে আছেন মেজর জেনারেল জিয়াইং লাও, তাকিয়ে আছেন একটা ক্লিপবোর্ডের দিকে। বিভিন্ন ল্যাব থেকে আসা সকালের রিপোর্ট লেখা আছে তাতে। জানালা দিয়ে উনিশশো ছয় সালে গোড়াপত্তন হওয়া চীনের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বের বৃহত্তম চিড়িয়াখানাগুলোর মধ্যে অন্যতম- বেইজিং চিড়িয়াখানা দেখা যাচ্ছে। স্থাপনের সময় অবশ্য গবেষণাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হত জায়গাটা।

বর্তমান কাজের সাথে বেশ মিল আছে...মনে মনে ভাবলেন মেজর জেনারেল।

মনে মনে বেশ গর্ব অনুভব করছেন জিয়াইং। এতো বছরের পরিকল্পনা ও পরিশ্রম আলোর মুখ দেখতে আর খুব বেশি দেরি নেই। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি। চিড়িয়াখানার উত্তরদিকের কোনায়, উনিশ শতকে সম্রাজ্ঞী ডোজার সিজির সম্মানে বানানো একটা প্রাচীন প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে। মেজর জেনারেল কল্পনা করলেন, উল্টোদিকের জানালায় দাঁড়িয়ে সম্রাজ্ঞীও তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

অবশ্য মর্যাদার দিক দিয়ে তিনি নিজে কোনও সম্রাজ্ঞীর চাইতে কম কিছু না।

চিড়িয়াখানার এক্সিবিশন হল কিংবা দুইশো একর জায়গায় আবদ্ধ পনেরো হাজার প্রানির উপর হয়ত তার কর্তৃত্ব খাটে না, কিন্তু মাটির নিচে লুকানো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ জায়গাটার একচ্ছত্র সর্বেসর্বা জিয়াইং। মূল্যের দিক দিয়ে ওটা সম্প্রতি আয়োজিত বেইজিং অলিম্পিকের সমান, তবে গুরুত্বের দিক দিয়ে তার চাইতেও অনেক অনেক গুণ দামী।

চোখ বন্ধ করে একেবারে গোড়া থেকে সব ভাবা শুরু করলেন মেজর জেনারেল।

হাজার কিলোমিটার দূরের, তিব্বতের দক্ষিণ অংশের এক উপত্যকা থেকে আনা একটা বীজ রোপন করা হয়েছে চিড়িয়াখানার ভূগর্ভস্থ অংশে। সময়ের সাথে সাথে বিশাল এক মহীরূহে রূপান্তরিত হচ্ছে ওটা। বিশ্ববাসীর কাছে তিব্বতের তাৎপর্য

এমনিতেও কম না। নেপাল আর ভারত সীমান্তের অদূরে অবস্থিত এই জায়গাটা বৌদ্ধ এবং হিন্দু, দুই ধর্মেরই তীর্থস্থান হিসেবে বিবেচিত। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী, মহাদেব শিবের বাসস্থান কৈলাশ পর্বতের অবস্থানও ওখানে।

নিজের অতীত সম্পর্কে আরেকটু গভীরে চলে গেলেন জিয়াইং। চিড়িয়াখানার সীমানা পেরিয়ে বেইজিং-এর সুউচ্চ ভবনগুলো দেখা যাচ্ছে। এই শহরেরই ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে পড়ালেখা করেছেন তিনি। মিলিটারি সায়েন্সে অবদান রাখার জন্য ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল তাকে ওখানে ভর্তি করিয়েছিলেন। কথাটা ভাবতেই সম্মানিত বোধ করেন জিয়াইং। তখন অবশ্য তার উনিশ বছরের জীবনটা পুরোপুরি সাদা একটা খাতার মতো ছিল।

এসবই আজ থেকে চার দশক আগেকার কথা।

জানালার কাঁচে ফুটে ওঠা নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকালেন মেজর জেনারেল। কানের পেছনে গুঁজে রাখা ছোট করে ছাঁটা ধূসর চুলগুলো পরিপাটি করে আঁচড়ানো। মুখের বলিরেখাগুলো যেন অতীত জীবনের সাফল্যের সাক্ষী দিচ্ছে। দায়িত্ব পালনের নেশায় বিয়ে কিংবা সন্তানসুখ, কোনওটারই ধার ধারেননি। পরনের সবুজ ইউনিফর্মটার দু'পাশের কাঁধে একটা করে তারা সজ্জিত, পিপল লিবারেশন আর্মির মেজর জেনারেল পদের প্রতীক। প্রতিদিন সকালে তারাগুলো পালিশ করেন জিয়াইং। তবে ব্যাপারটার সাথে একটা তিক্ত সত্যি জড়িয়ে আছে। জানেন, এই এক তারাতেই থমকে গেছেন তিনি।

মেয়ে হয়ে জন্মানোর পাশাপাশি, পিএলএ অর্থাৎ পিপল লিবারেশন আর্মির সায়েন্টিফিক ডিভিশনের সাথে যুক্ত থাকাও এর একটা কারণ। কিন্তু তবুও হাল ছাড়েননি তিনি। তাছাড়া এযাবৎকাল পর্যন্ত তার পদে কোনও মহিলার সাক্ষর পড়েনি। সবকিছুরই শুরু বলে একটা কথা আছে। বর্তমান লক্ষ্যটা পূরণ হলে শুধু অতিরিক্ত তারা না, আরও অনেক কিছুই কপালে জুটবে। তাই বিগত চার দশকের পুরো ক্যারিয়ারটাই বাজিতে লাগিয়ে দিয়েছেন মেজর জেনারেল।

যে কোনও মূল্যে সাফল্য চাই তার।

জানালার ওপাশে নীলচে পানিতে ভরা একটা লেগুন। পাশ্ববর্তী গাছের ফাঁক গলে কতগুলো ক্রেনের মাথা ঝুলছে পানির উপর। লেগুনটার চারপাশে বিস্তৃত রূক্ষ প্রান্তরে ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গওয়ালা কতগুলো পুকুর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। জলাশয়ের শেষ মাথায় স্থাপন করা হয়েছে চিড়িয়াখানার মূল আকর্ষণগুলোর মধ্যে অন্যতম- পান্ডা হাউজ।

মনোমুগ্ধকর চিড়িয়াখানার নিচে অবস্থিত ভূগর্ভস্থ এলাকাটার বিস্তৃতি প্রায় ত্রিশ হাজার বর্গমিটার। ল্যাবরেটরি, প্রাণী সংরক্ষণাগার, কৃত্রিম আবহাওয়া সমৃদ্ধ গুহা... কী নেই ওখানে! জায়গাটা আসলে দু'হাজার তিন সালে মার্কিন সেনাদের

অভিযানের সময় আবিস্কৃত, বাগদাদ চিড়িয়াখানার নিচে লুকানো ফ্যাসিলিটি থেকে অনুপ্রাণিত। তবে আকার এবং কাজের পরিধিতে আরও বিশাল পরিসরের।

আগে থেকেই জেনেটিক গবেষণা চলে আসছে এখানে। কিন্তু বর্তমানের প্রজেক্টের তুলনায় ওসব বলতে গেলে খুবই সাধারণ। তিব্বতের কৈলাশ পর্বতের আবিষ্কারটা এক নিমিষে পাল্টে দিয়েছে সব।

প্রায় বছর দশেক আগে ওখানে স্থাপিত একটা রিসার্চ স্টেশনে, স্থানীয় লোকজনের জিন সম্পর্কে গবেষণা করছিল বিজ্ঞানীরা। একাধিক ধর্মের তীর্থস্থান হওয়ায় ওখানে দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে মানুষ আসে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নৃতত্ত্ববিদরা একটা জেনেটিক ডাটাবেস স্থাপনের ব্যাপারে কাজ করছিল। ভারত, তিব্বত, নেপাল, ভুটানের সাথে চলমান সীমান্ত বিরোধের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে মিলিটারিদের তত্ত্বাবধানে চলছিল সবকিছু।

জিনগত নমুনা সংগ্রহের পাশাপাশি স্থানীয় গালগল্পের ব্যাপারেও গবেষকদের আগ্রহ ছিল। তিব্বতী নীল ভালুক, তুষার চিতাবাঘসহ ওই এলাকায় এরকম বেশ কিছু কাল্পনিক প্রানির অস্তিত্বের গুজব প্রচলিত আছে। এছাড়া হাড়ের ফসিল, পুরনো চামড়া, কাঠের খন্ড ইত্যাদির কথা তো অগণিত।

তারপরই ঘটে সেই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আট বছর আগে, স্থানীয় একজন গাইড কৈলাশ পর্বতের এক গুহায় হিমালয়ের কিংবদন্তি প্রাণী ইয়েতির ডেরা খুঁজে পাওয়ার দাবী করে। ভুটানের লোকজন অবশ্য ইয়েতিকে চেনে মাইগো নামে, চীনে আবার নামটা পাল্টে হয়ে গেছে অ্যালমা। যাই হোক, লোকটার দাবীর সত্যতা প্রমাণিত না হলেও যুগান্তকারী এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার থমকে দেয় সবকিছু।

ভাগ্য ভালো, জিনিসটা চিহ্নিতকারী লোকটা ছিল মিলিটারি সায়েন্স অ্যাকাডেমির সদস্য। ব্যাপারটা গোপনভাবে অ্যাকাডেমির ডেপুটি ডিরেক্টরকে জানানো হয়। তিনিই মেজর জেনারেল জিয়াইং লাও-কে ঘটনাস্থলে পাঠান। তদন্তের পর জিয়াইং বুঝতে পারেন, ওই জিনিসের আসল জায়গা বেইজিং-এর এই গবেষণাগারে। আর সেই যুগান্তকারী কাজে বিন্দুমাত্র ফাঁকফোকরও সহ্য করা হবে না।

'কিং বু শি...' আবারও আর্তি জানাল কুব ঝেং নামের লোকটা।

পদবীর দিক দিয়ে সে ফ্যাসিলিটির একজন কম্পিউটার এক্সপার্ট। বয়স আটাশ বছর। গতকাল রাতে মিলিটারি স্যাটেলাইট ব্যবহার করে সাংহাইতে, নিজের প্রেমিকাকে ফোন করার মতো ধৃষ্টতা দেখিয়েছে ঝেং। ব্যাপারটা খুব একটা বিপজ্জনক না হলেও এখানকার নীতিবিরুদ্ধ।

চোখ বন্ধ করে কৈলাশ পর্বতের কথা ভাবলেন জিয়াইং। বিনাশক হিসেবে মহাদেব শিবের খ্যাতি আছে।

তার নিজের পারিবারিক পদবী, লাও- অর্থও হচ্ছে 'ধ্বংস'।

সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মেজর জেনারেল। 'ওকে নিয়ে আর্ক-এ ঢুকিয়ে দাও।'

আতঙ্কের একটা চিৎকার বেরিয়ে এল কুনের গলা বেয়ে। জায়গাটা সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানে না ও, তবে যেটুকু জানে তাকে কুখ্যাতিই বলা যায়। ওখানে যাদের নিয়ে যাওয়া হয়, তাদের কারও ফিরে আসার রেকর্ড নেই।

নির্বিকার চিত্তে সামনে থেকে লোকটাকে টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে নেয়ার দৃশ্যটা উপভোগ করলেন মেজর জেনারেল। পরমুহূর্তে পেছন থেকে আরেকটা কণ্ঠ ভেসে এল।

'শেংমাহন, শাওজিয়াং লাও।'

'ক্ষমা করবেন, মেজর জেনারেল লাও।'

ভাষাটা ক্যান্টোনিজ। যথাযোগ্য সম্মানের সাথে বলা হলেও গূঢ় অর্থটা উপলব্ধি করতে পারছেন জিয়াইং। চীনের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত গুয়াংডং প্রদেশে বড় হয়েছেন তিনি। ওখানে এই ভাষাটা প্রচলিত। চীনের সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ম্যান্ডারিন-এর বদলে এটা ব্যবহার করে তার অতীত সম্পর্কে মনে করিয়ে দিয়েছে বক্তা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যান্ডারিনে জবাব দিলেন জিয়াইং, কণ্ঠে রুক্ষতা। 'ক্ষমা চাইতে হবে না, ঝংজিয়াও সান। বল কী হয়েছে?' ঝংজিয়াও শব্দটার অর্থ হচ্ছে- লেফটেন্যান্ট কর্নেল। পদমর্যাদা উল্লেখ করে লোকটাকে সূক্ষ্ম অপমান করার সুযোগটা হাতছাড়া করেননি তিনি।

মাথা নত করে বো করল চ্যাং সান। পরনে খাকি ইউনিফর্ম। লম্বায় সে মেজর জেনারেলের সমান হলেও বয়সের দিক দিয়ে বিশ বছরের ছোট। কালো চুল, নিদাগ ত্বক, পেশী-পুষ্ট সবল শরীরে তারুণ্যের সমস্ত চিহ্ন বিদ্যমান।

কৈলাশ পর্বতে গাইডের চিহ্নিত ঢালে যুগান্তকারী আবিষ্কারটা চ্যাং-এরই করা। সেজন্যই পদোন্নতি দিয়ে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে ওকে। তবে এটুকু অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট না লেফটেন্যান্ট কর্নেল। জিয়াইং-এর মতো সে-ও চায় ক্ষমতার যতটা সম্ভব শিখরে পৌঁছাতে।

'ক্রোয়েশিয়া থেকে প্যাকেজ নিয়ে আমার লোকজন পৌঁছে গেছে,' চ্যাং বলল। 'এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে ওদের।'

'বাহ! খুব ভালো কথা। আর আমেরিকার অন্য প্যাকেজটা?'

'আসছে। কয়েক ঘন্টার ভেতর পৌঁছে যাবে।'

মাথা নেড়ে সায় দিলেন জিয়াইং। খুশি হয়েছেন খবরগুলো শুনে। তার ডান হাত হিসেবে কাজ করে চ্যাং। তবে খুব ভালো করেই জানেন, উচ্চাভিলাষী লোকটা প্রয়োজনে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরকেও ছাড় দেবে না।

'শুনলাম, হোয়াইট হাউজের ওই কর্মচারী নাকি আটলান্টার অপারেশনের সময় মারা গেছে।'

'হ্যাঁ,' নড করল চ্যাং। 'ক্ষতিটা বিরাট। তবে সামাল দেয়া যাবে।'

'আর ক্রোয়েশিয়ার ব্যাপারটা?' ঠান্ডা গলায় প্রশ্ন করলেন জিয়াইং। ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের বরাতে জানা গেছে, আমেরিকান প্রজননবিদের জমজ বোন নাকি নির্ধারিত সময়ের একদিন আগেই পাহাড়ে পৌঁছে গিয়েছিল। লিপজিগ ছাড়ার আগে ওকে জার্মানি থেকেই অপহরণ করে ফেলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। দুই বোন একসাথে হাতে থাকলে, একজনকে হুমকি দিয়ে আরেকজনকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়া সহজ হত।

'সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ড. লিনা ক্রেন্ডাল মারা গেছে।' জবাব দিল চ্যাং। 'তবে অনুসন্ধান চলছে।'

'আর ওখানে যে লোকগুলোকে হারালে?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লেফটেন্যান্ট কর্নেল। 'মৃতদেহগুলো সরিয়ে নেয়া হয়েছে। আমাদের দিকে আঙুল তোলার উপায় নেই। তবুও এরকম কিছু হয়ে গেলে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।'

'তোমার লোকদের এই হাল কে করল? জানতে পারলে কিছু?'

না-বোধক মাথা নাড়ল চ্যাং। চোখে-মুখে রাগের আভাস। তবে এই রাগের কারণ বিশ্বস্ত সৈনিকগুলোকে হারানো নয়... ওর ক্যারিয়ারে একটা কালো দাগ পড়ে গিয়েছে বলে। 'এখনও কিছু জানা যায়নি।'

'আপাতত ওদিকেই নজর দাও,' জিয়াইং বললেন। 'আমি বরং অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তৈরি হই।'

'ঠিক আছে, মেজর জেনারেল লাও।' বলে বিদায় নিল চ্যাং।

আবারও জানালার দিকে চোখ ফেরালেন জিয়াইং। নীচে পানির হ্রদটা দেখে তার আরেকটা জলাশয়ের কথা মনে পড়ছে- কৈলাশ পর্বতের প্রখ্যাত রাক্ষসতাল হ্রদ। ক্ষার পানি আর কিংবদন্তীর কুখ্যাত দশ মাথাওয়ালা দৈত্যের কারণেই এই অদ্ভূত নাম।

জানালার কাঁচে ফুটে ওঠা নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকালেন মেজর জেনারেল। জানেন, দৈত্য-দানোর চাইতেও আরও খারাপ জিনিস পৃথিবীতে আছে।

মুচকি হেসে ভাবলে লাগলেন তিনি, ওগুলো বানানোর পেছনে আমারও হাত আছে।

সকাল ৬:৪৪

হলওয়ে ধরে পায়ে পায়ে সামনে এগোচ্ছে কুন ঝেং। অবশ্য খুব যে স্বেচ্ছায় যাচ্ছে, সেটা না। হাত বাঁধা অবস্থায় যখন পেছন থেকে দুই সশস্ত্র সৈন্য ঠেলা-ধাক্কা মারতে থাকে, একজনের হাতে আবার বৈদ্যুতিক শক দেয়া ইলেকট্রিক পড...তখন সামনে এগোনো ছাড়া আর উপায় কী!

হলওয়েটা ফ্যাসিলিটির একেবারে মাঝ বরাবর এগিয়েছে। সামনে পড়ার সাথে সাথে সভয়ে সরে যাচ্ছে লোকজন, বুঝতে পারছে হতভাগা কুনের পরিণতি সম্পর্কে।

পাশ্ববর্তী একটা হল থেকে চারজন সৈনিক বেরিয়ে এল। দু'জন লোককে এসকর্ট করে আনছে তারা। তার মতো, ওদের হাতও পেছনে বেঁধে রাখা। পেছন পেছন আরো দুজনকে এগিয়ে আসতে দেখে গেল। ওদের হাতে কফিনের মতো একটা প্লাস্টিকের বাক্স। কুন বুঝতে পারল, হেলিপ্যাড থেকে রওনা হয়ে মেজর জেনারেলের কাছে যাচ্ছে সবাই।

দশ মাস আগে এখানে চাকরি করতে আসার কথা মনে করল কুন। সেই অবস্থার সাথে বর্তমান অবস্থার কি আকাশ-পাতাল তফাৎ! চোখে ফেটে কান্না বেরিয়ে আসছে। শেষবারের মতো দেখতে ইচ্ছা করছে মায়ের মুখটা, আদর করতে ইচ্ছা করছে সদা উৎফুল্ল ছোটবোনকে। মনে পড়ছে প্রেমিকার কথাও। সেই মুখ...সেই চুল...সেই ঠোঁটগুলো... আর কখনও হয়তো ওকে চুমু খাবার ভাগ্য হবে না।

কথা বলে উঠেছে সৈনিকদের পাহারা দিয়ে আনা লোক দু'জনের ভেতর অপেক্ষাকৃত বয়স্কজন। কণ্ঠে ব্রিটিশ টান।

'এই...কোন জায়গা এটা?'

কথাগুলো বোঝার মতো ইংরেজি জানা আছে কুন-এর। তবে আতঙ্কের কারনে উত্তরটা মাতৃভাষাতেই দিল। 'ডিয়ু... তা শি ডিয়ু!'

পেরিয়ে যেতে যেতে অন্য লোকটাকেও মুখ খুলতে শুনল হতভাগা কম্পিউটার এক্সপার্ট। কথার সুরে মনে হলো- ফ্রেঞ্চ। কুনের কথাটাই অনুবাদ করছে আগন্তুক। 'ও বলেছে...এটা নাকি নরক।'

চেঁচিয়ে ওঠতে যাচ্ছিল কুন, তবে পিঠে বৈদ্যুতিক শকের তীব্রতায় ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সামলে নিল।

ততক্ষণে টেনেহিঁচড়ে আরও সামনে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে। পথে দু'পাশে ভেড়া, চমড়ি গাই ইত্যাদি নানা রকম পশুর খোঁয়াড়। অবশেষে হলের শেষ মাথায়, বিশাল একটা বন্ধ স্টিলের দরজার সামনে এসে যাত্রা শেষ হলো। দরজার উপর গাঢ় লাল রঙে জ্বলছে একটা ধাতব সাইন।

方舟

দ্য আর্ক।

নামটা চোখে পড়তেই কাতরে উঠল কুন। 'না!'

গুজব আছে, এই দরজার ওপাশে ওঁত পেতে আছে মৃত্যু।

দরজার ইলেকট্রনিক লকের পর্দায় হাতের তালু ছোঁয়াল এক গার্ড। এ মুহূর্ত পর দেখা গেল, যন্ত্রপাতির কব্জায় ভর করে খুলতে শুরু করেছে বিশাল পাল্লা।

এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া কুন-কে জায়গায় জমিয়ে দিল। সাথে সাথে সরসর করে দাঁড়িয়ে পড়েছে ঘাড়ের লোম। পিছু ফিরে দৌড় দিতে মন চাইছে। কিন্তু বিধি বাম... ফিতায় বাঁধা হাতজোড়া এখনও বজ্রমুষ্টিতে আবদ্ধ।

হাতের বাঁধন খুলে ধাক্কা মেরে দরজার বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হলো তাকে। তাল সামলে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ততক্ষণে আবার বন্ধ হয়ে গেছে পাল্লা। নিজেকে বিশালাকায় একটা খাঁচার ভেতর আবিষ্কার করল কুন। পাথুরে কাঠামো কেটে কেটে কৃত্রিম একটা বুনো পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে এখানে। মেঝেতে জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পাথরের বোল্ডার। শেষ মাথা অনেকগুলো ছোট বড় গর্ত। কিছু মাটির সমান্তরালে, কিছু আবার খানিকটা উঁচুতে।

দরজায় ধাক্কা মারতে মারতে চেঁচিয়ে উঠল কুন। মানুষের চিৎকারে কখনো ইস্পাতের মন গলার ইতিহাস নেই, কিন্তু আওয়াজটা অন্য একজনের কানে ঠিকই পৌঁছেছে।

বিশালাকৃতি খাঁচার গর্তগুলো থেকে কয়েকটা ছায়া বেরিয়ে আসতে দেখা গেল।

আবারও ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল হতভাগ্য কম্পিউটার এক্সপার্ট... এবারই শেষ।

চোখের পলকে ফড়ফড় করে ছিঁড়ে ফেলা হলো তার বুকের খাঁচাটা।

দ্বিতীয় অংশ

Σ

ইভ-এর দেহাবশেষ

অধ্যায় দশ
৩০ এপ্রিল, ভোর ৫:৪৫
জাগরেব, ক্রোয়েশিয়া

রান্নাঘরে পা রাখা মাত্র লিনা ক্রেন্ডালের চেহারায় ফুটে ওটা আশা আর ভয়ের মিশ্রণটা গ্রে-র নজর এড়াল না। হাতে বানানো বরগার উপর দাঁড়িয়ে আছে ছাদ, দেয়ালগুলো সতেরো শতাব্দীর ইট দিয়ে তৈরি। ক্রোয়েশিয়ার রাজধানী জাগরেবের সেইন্ট ক্যাথেরিন'স চার্চে আছে এখন ওরা। একটা ওক কাঠের টেবিলে বসে আছে প্রজননবিদ। তার পেছনেই একটা পাথুরে ফায়ারপ্লেস, শব্দ করে কাঠ ফাটছে ওটার আগুনে।

'মারিয়ার কোন খবর?' জানতে চাইল লিনা।

শেইচানও চোখ তুলে চাইল। তবে কিছু জিজ্ঞেস না করে গ্রে-র দিকে এগিয়ে দিল ধোঁয়া ওঠা এক কাপ কফি। হাত বাড়িয়ে কাপটা নিল ও, সেই সাথে টেবিলের উপরে রাখা পনির জাতীয় স্ট্রুকলি নামের খাবারটা চেখে দেখতেও ভুলল না!

'ওয়াশিংটন থেকে খবর পেয়েছি বটে,' জবাব দিল কমাণ্ডার। 'আপনার বোনের সাথে থাকা জিপিএস ট্র্যাকারের উপর নজর রাখছে ওরা। তবে সব-সময়ের পরিবর্তে কিছুক্ষণ পরপর সংকেত পাঠায় ওটা।'

নজর নামিয়ে নিল লিনা, টেবিলের উপর রাখা হাতজোড়া সাদা হয়ে গিয়েছে। 'জিনিসটা আসলে অপেক্ষাকৃত কম পাল্লার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত। কখনও বাকো বনে হারিয়ে গেলে বা বেড়ার বাইরে চলে গেলে যেন আমরা তার অবস্থান জানতে পারি, সেজন্য রেখেছিলাম।'

সংকর গরিলাটার কথা মনে পড়ে গেল গ্রে-র। গতকাল রাতে অগুলিন থেকে জাগরেব আসার পথে লিনা তার গবেষণার ব্যাপারে অনেক কিছুই বলেছে। প্রাইমেট রিসার্চ সেন্টারে হওয়া আক্রমণের সাথে এখানে আক্রমণের কোনও না কোনও সম্পর্ক না থেকেই পারে না।

কিন্তু কী সেই সম্পর্ক?

কোয়ালস্কির চেহারা মনে করল গ্রে, লোকটা কি এখনও বেঁচে আছে?

লিনার মনেও একই চিন্তা চলছে, তবে ওর জমজ বোনকে নিয়ে।

সান্ত্বনা দেবার প্রয়াস পেল গ্রে। 'আপাতত ট্র্যাকারটা ঠিকমতোই কাজ করছে। প্যাসিফিকের পশ্চিমে যাচ্ছে ওরা। আমাদের একটা দল এরইমাঝে রওনা হয়ে গিয়েছে। বেশি দূরে নেই তারা। অপহরণকারীরা মাটিতে পা রাখার সাথে সাথে, ফাঁদে আটকা পড়বে।'

পেইন্টারের ভয়টার কথা আর উল্লেখ করল না ও। সিগমা প্রধানের ধারণা, এই দুই আক্রমণের জন্য দায়ী চীনের একটা দল। সেক্ষেত্রে মূল ভূ-খণ্ডে নামার পর মারিয়ার দলটাকে উদ্ধার করাটা বেশ কঠিনই হবে।

অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হবে না।

আরেকটা দুশ্চিন্তার কথা বলল লিনা। 'একদিন...বড়জোর দুইদিন কাজ করবে ট্র্যাকার। যদি মাটিতে নামার আগে ওগুলোর ব্যাটারি ফুরিয়ে যায়, তাহলে তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না কাউকে।'

টেবিলে বসে পড়ল গ্রে। পেইন্টার তো এই তথ্যটা জানাননি!

কে জানে, তিনি নিজেই হয়ত জানেন না!

অবশ্য গ্রে-র ওই ব্যাপারে করার মতো কিছু নেই। ওকে শুধু লিনাকে নিরাপদে আমেরিকায় ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব দিয়েছেন পেইন্টার।

'প্রফেসর রাইটসন আর ড. আরনডের কী হলো?' জানতে চাইল লিনা।

মাথা নাড়ল গ্রে। ব্রিটিশ ভূ-তত্ত্ববিদ আর ফ্রেঞ্চ জীবাশ্মবিদ যদি এখনও বেঁচে থাকেন, তাহলে সম্ভবত অনেক আগেই এখান থেকে চলে গিয়েছেন। এখন লুকিয়ে থাকতে হবে ওদেরকে, লিনার বেঁচে থাকার কথা গোপন রাখতে হবে সবার কাছ থেকে। ফাদার নোভাক এ ব্যাপারে ওদের সাহায্য করছেন-এই চার্চে আপাতত মাথা গোঁজার অনুমতি দিয়ে। পেছনের একটা ঘরে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়েছে সবাই, সূর্য উঠতে এখন আর বেশি দেরী নেই।

খুব তাড়াতাড়ি পথে নামতে হবে ওদেরকে।

দরজার বাইরে থেকে আসা বুটের আওয়াজ গ্রে-র মনোযোগ কেড়ে নিল। ঘরে প্রবেশ করল রোল্যান্ড নোভাক, এক হাতে বিশাল একটা বই। অন্য হাতটাও খালি নেই; আরেকটা বই ধরে রেখেছে, চারকোনা একটা ধাতব প্লেটও সাথে আছে।

কমবয়সী যাজককে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। মনে হয়, সারারাত এক মুহূর্তের জন্যও ঘুমাতে পারেনি। তবে হাব-ভাবে ঠিকরে পড়ছে উত্তেজনা।

'আপনাদের এটা দেখা উচিত।' টেবিলের কাছে আসতে আসতে বলে উঠল সে, কথা শুনে শেইচানও এগিয়ে এসেছে।

বড় বইটা টেবিলের উপর রাখল যাজক, চামড়ায় মোড়া বাঁধাইয়ের উপর লেখাঃ মান্ডাস সাবটেরেনিয়াস।

'ষোলশো পয়ষট্টি সালে ফাদার অ্যাথেনাসিয়াস কার্কার-এর ছাপানো বইয়ের একটা কপি এটা।' বলে উঠল যাজক, সেই সাথে খুলল ছোট বইটাও। 'আর এটা হচ্ছে গুহায় পাওয়া বইটা-জার্নালও বলতে পারেন। আমার বিশ্বাস এটাও একই রেভারেন্ড ফাদারের!'

গ্রে প্রচ্ছদের গোলকধাঁধাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল।
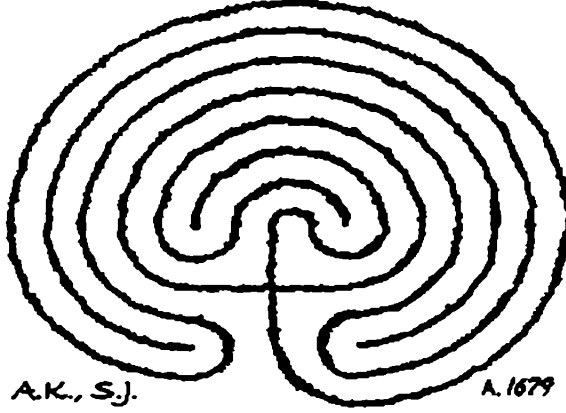
কিছুক্ষণ আগে রোল্যান্ড আর লিনার মুখে পাহাড়ের গুহায় করা আবিষ্কারের কথা জানতে পেরেছে ওঃ নিয়ানডারথাল যুগের এক লোকের দেহাবশেষসহ একটা চ্যাপেল! ওটার সাথে নাকি এই ফাদার অ্যাথেনাসিয়াস কার্কারেরও সম্পর্ক আছে। সতেরো শতাব্দীর জেসুইট এই যাজক সম্ভবত এক মহিলা নিয়ানডারথালের হাড়-গোড় সরিয়েছিলেন ওখান থেকে।

বিগত কয়েক ঘণ্টা সম্ভবত এ নিয়ে গবেষণা করেই কাটিয়ে দিয়েছে রোল্যান্ড। যুবক বয়সী লোকটার কাজের প্রতি ভালোবাসা আর লেগে থাকার দৃঢ়তা দেখে আরেক ভ্যাটিকান যাজকের কথা মনে পড়ে গেল গ্রে-র।

এখন যদি আপনি এখানে থাকতেন, ভিগর...

যাজকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে রোলান্ডের কথায় মন দিল ও।

'তবে দুর্ভাগ্যক্রমে,' বলে চলেছে রোল্যান্ড। 'এই জার্নালের লেখা অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কয়েকটা সূত্র ছাড়া আর কিছু পাইনি।'

'একটা চাবিও খুঁজে পেয়েছি আমরা।' পকেট থেকে বড় একটা চাবি বের করে টেবিলের উপর রাখল লিনা। অনেক বয়স হয়েছে ওটার, কিন্তু উপরে খোদাই করা দেবদূতের মুখ আর খুলিগুলো এখনও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

মাথা নেড়ে সায় দিল রোল্যান্ড। 'এই চাবিটা ঠিক কোন তালার জন্য, সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই নেই। যাই হোক, আমি প্রথমেই সবচেয়ে সহজ সূত্রটা নিয়ে গবেষণা চালালাম।' বলে প্রচ্ছদের গোলকধাঁধার উপর হাত বুলাল সে। 'এই আকৃতিটা পরিচিত বলে মনে হচ্ছিল। আমার ধারণা, এটা প্রাচীন ক্রিটের সেই

নামকরা গোলকধাঁধা! ওই যে, যেখানে কুখ্যাত মিনেটরকে রাখা হয়েছিল। এই দেখুন।'

বড় বইটার পাতার ভেতর থেকে একটা ম্যানিলা খাম বের করে নিল তরুণ যাজক, ভেতর থেকে বের করে আনল একটা কাগজ। ওতে প্রাচীন একটা রূপালী মুদ্রার ছবি ছাপা। 'এই মুদ্রাটা তৈরি করা হয়েছিল ক্রিটের রাজধানী, নোসোসে।'

মুদ্রার গায়ে আঁকা কাঠামোর সাথে প্রচ্ছদের আকৃতিটা মিলিয়ে দেখল গ্রে। 'প্রায় অবিকল!'

'আমার গবেষণা বলে, এই গোলকধাঁধার অস্তিত্ব কেবলমাত্র ক্রিটেই সীমাবদ্ধ নেই। ইতালি, স্পেন, আয়ারল্যান্ড, ফিনল্যান্ডসহ প্রায় সারা বিশ্ব জুড়ে আঁকা অনেক গুহাচিত্রে এই আকৃতিটা দেখতে পাবেন আপনি। আর শুধু গুহা কিংবা দেয়ালচিত্রেই না, এর উদাহরণ মিলবে অন্য অনেক যায়গাতেও। ভারতীয় পুরাণ-মহাভারতে পদ্ম-ব্যূহ নামের এক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কথা বর্ণিত আছে, ওটাও দেখতে প্রায় এরকমই।'

'ওয়াও!' মুদ্রার ছবিটা নিজের দিকে টেনে নিল লিনা। 'মনে হচ্ছে, এই আকৃতির ধারণা প্রাচীন বিশ্বের সবগুলো প্রধান সভ্যতার কাছেই ছিল। তাই যার যার সমাজে তারা এর আত্মীকরণ করেছে। ক্রিটে বানানো হয়েছে গোলকধাঁধা, ভারতে যুদ্ধের ব্যূহ।'

'সম্ভবত এই নক্সা কোনও বাস্তব স্থানের অনুকরণে করা।' প্রচ্ছদটার দিকে তাকিয়ে বলল রোল্যান্ড। 'যাই হোক, ফাদার কার্কার যখন এখানে এটা এঁকে রেখেছেন, তার মানে জিনিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমি আরও গবেষণা চালাই, ফলাফল এই মোটা বইটা।' বলে মান্ডাস সাবটেরেনিয়াস নামের বইটার উপর হাত রাখল সে।

লিনার পাশে এসে বসল শেইচান। 'এই যাজকের নাম তো আগে কখনও শুনিনি। কে তিনি?'

মুচকি হেসে বিশাল বইটা খুলল রোল্যান্ড। গ্রে জানত, ওই জেসুইট যাজকের ব্যাপারে অগাধ জ্ঞান আছে বলেই তাকে ক্রোয়শিয়ার সাইটে ডেকে পাঠানো

হয়েছিল। যদি কেউ এই সূত্রগুলোকে একসাথে জুড়তে পারে, তবে সেটা একমাত্র ফাদার নোভাক।

অ্যাথেনাসিয়াস কার্কারের ছবি সম্বলিত একটা পাতা বের করে দেখাল রোলান্ড। কণ্ঠে শ্রদ্ধার সুর।

P ATHANASIVS KIRCHERVS FVLDENSIS
ætatis LIII

'ফাদার কার্কারকে অনেকেই তার সময়ের লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি বলে ডাকে। জীববিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, ভূতত্ত্ববিদ্যা, মানচিত্র থেকে শুরু করে স্থাপত্যবিদ্যা পর্যন্ত... নানা বিষয়ে অগাধ জ্ঞান ছিল তার। তবে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল ভাষা নিয়ে। তিনিই প্রথম বুঝতে পারেন, প্রাচীন মিশরীয় ভাষার সাথে বর্তমান কোপটিক ভাষার সম্পর্ক আছে। অনেকের মতে, অ্যাথেনাসিয়াস কার্কারই হচ্ছেন মিশর-তত্ত্বের জনক। হায়ারোগ্লিফের উপরে অনেক বই লিখেছেন তিনি। জীবনের সায়াহ্নে এসে তার মনে হয়, এই মিশরীয় ভাষাই হলো অ্যাডাম আর ইভের হারানো ভাষা। তাই নিজের মতো করে রোমে স্থাপিত মিশরীয় স্তম্ভে হায়ারোগ্লিফ খোদাই করার কাজে মন দেন।'

গ্রে-র মনে লোকটার সম্পর্কে কৌতূহল উত্তরোত্তর বাড়ছে। ছবিটার দিকে ভালো করে তাকাল সে। চিন্তাশীল চোখদুটো যেন তাকে ভিগর ভেরোনার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। দু'জনের জন্মের মাঝে শত শত বছরের ব্যবধান থাকলেও, কাজ এবং চিন্তাধারায় কী মিল! শুধুমাত্র বাইবেলের পাতায় না, বরং পুরো বিশ্বের সৃষ্টির মাঝে ঈশ্বরকে খুঁজে ফিরতেন তারা।

বলে চলেছে রোল্যান্ড, 'অবশেষে ভ্যাটিকান কলেজে একটা জাদুঘর স্থাপন করেন ফাদার কার্কার। সেখানেই গবেষণার কাজ করতেন, আর ফাঁকে ফাঁকে ছাত্র পড়াতেন। অচিরেই প্রাচীন নিদর্শনের এক বিশাল সংগ্রহশালায় পরিণত হয়

মিউজিয়াম কার্কারিয়ানাম নামের সেই জাদুঘর। পাশাপাশি একটা সমৃদ্ধ লাইব্রেরি আর তার নিজস্ব আবিষ্কার তো ছিলই। আপনাদেরকে ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য ওই জাদুঘরের একটা স্কেচ দেখাচ্ছি।'

খাম থেকে আরেকটা ছবি বের করে আনল সে।
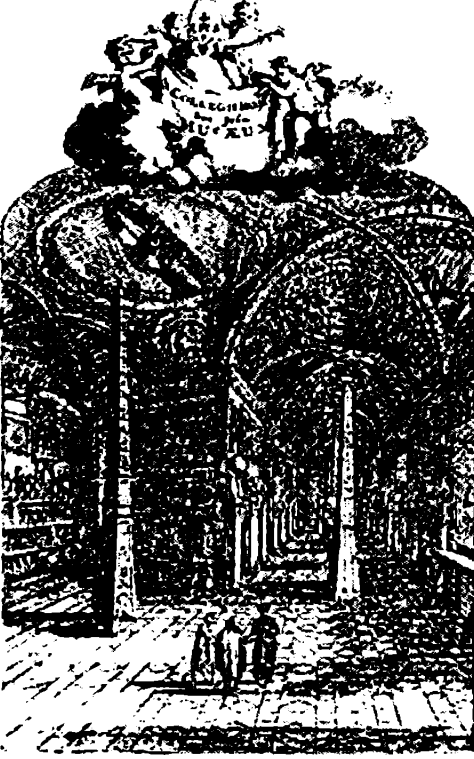
ডোম-ওয়ালা বিশালাকৃতি ঘরের ছবিটার দিকে তাকাল গ্রে, বিস্মিত না হয়ে পারছে না। একজন প্রতিভাবান মানুষের সারা জীবনের কাজ জমা হয়েছে ওখানে।

শেইচানকে খুব একটা প্রভাবিত বলে মনে হলো না। 'তাহলে ওই যাজক এই ক্রোয়েশিয়ার সুদূর পাহাড়ে এলেন কীভাবে?'

মাথা নাড়ল রোলান্ড। 'জানা নেই। আসলে তিনি যে ওখানে এসেছিলেন, সেটাই কেউ জানে না! ফাদার কার্কারের ইতিহাস নিয়ে আমি গবেষণা করেছি। নিশ্চিতভাবে যা জানা যায় তা হলো, আমাদের এই শহরে তিনি এসেছিলেন ১৬৬০ সালের বসন্তে। উদ্দেশ্য ছিল জাগরেব ক্যাথেড্রালের নির্মাণকাজ দেখাশোনা করা।'

শহরে আসার পথে দেখা, টাওয়ার-ওয়ালা ভবনটার কথা মনে করতে পারল গ্রে। বেশ লম্বাই ছিল বলতে হবে।

'সে সময় অটোমানদের হুমকি খাঁড়ার মতো ঝুলছিল সাম্রাজ্যের উপরে,' ব্যাখ্যা করতে লাগল রোল্যান্ড। 'তাই ক্যাথেড্রালকে ঘিরে শক্ত-পোক্ত দেয়াল বানাবার প্রয়োজন হয়েছিল। রোমান সম্রাট, প্রথম লিওপোল্ড নিজে কার্কারকে এ দায়িত্ব

দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, দক্ষিণ দেয়াল বরাবর যেন একটা ওয়াচ টাওয়ার বানানো হয়। দেয়ালটা নজরে রাখার জন্য ওটা ব্যবহার করতে চাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু গবেষণা করতে গিয়ে কিছু সমস্যা ধরা পরে আমার চোখে। রেভারেন্ড ফাদার এখানে কাজ করার সময় মাঝে মাঝেই সপ্তাহখানেকের জন্য উধাও হয়ে যেতেন। গুজব ছিল, রোমান সম্রাট আসলে তাকে অন্য কোন উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পাঠিয়েছেন। ওয়াচ টাওয়ার বানাবার গল্প পুরোটাই ভুয়া।'

'আসল উদ্দেশ্যটা মনে হয় না আর বেশি দিন গোপন থাকবে।' বলে মাথা দিয়ে জার্নালটার দিকে ইঙ্গিত করল গ্রে। 'তবে প্রশ্ন হলো, কেউ যদি হাড় আর ছবি ভর্তি গুহা খুঁজেও পায়, তাহলে রোমান সম্রাট ফাদার কার্কারকেই বা ডেকে পাঠাবেন কেন?'

'তা তো নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না। তবে হ্যাঁ, জীবাশ্ম এবং প্রাচীন মানুষের হাড় নিয়ে রেভারেন্ড ফাদারের আগ্রহ ছিল ব্যাপক।' মান্ডাস সাবটেরানিয়াস বইটার পাতা উল্টাতে উল্টাতে জবাব দিল রোল্যান্ড। 'ফাদার কার্কারের এই লেখাটা মোটামুটি বিশ্বের সব বিষয়কেই স্পর্শ করেছে। ভূ-তত্ত্ব, ভূগোল থেকে শুরু করে রসায়ন আর পদার্থ বিজ্ঞান-কিছুই বাদ দেননি। ষোলশো সাঁইত্রিশ সালে ভিসুভিয়াস পর্বতে অগ্নুৎপাত হবার পর এই বই লেখার আগ্রহ পান তিনি। লাভা নিঃসরণের প্রকৃতি বোঝার জন্য ফাদার এমনকি দড়ি ব্যবহার করে জ্বালামুখের ভেতরে পর্যন্ত গিয়েছিলেন!'

একেবারে কাজ পাগল ছিল লোকটা, গ্রে ভাবল।

'ফাদার কার্কারের বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীর অভ্যন্তরে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অগণিত টানেল, ঝর্ণা আর সমুদ্রের মতো বিশাল বিশাল জলাধার আছে। সেই ভূগর্ভস্থ পৃথিবীর সন্ধান করতে গিয়ে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন হাজার হাজার জীবাশ্ম আর কাগজপত্র।' বইয়ের ভেতর থেকে একটা মাছের জীবাশ্মের ছবি বের করে দেখাল রোল্যান্ড।
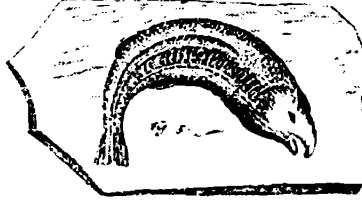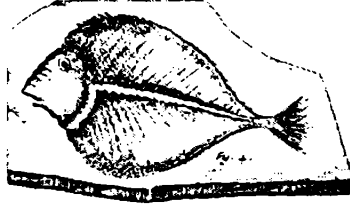
'বইটাতে এই ধরনের অগণিত ছবি আছে। ফাদার কার্কার দক্ষিণ ইতালিতেও কিছু গুহা আবিষ্কার করেন। বিশাল বিশাল সব হাড় খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি ওখানে। ম্যামথদের পায়ের হাড়কে ভুল করে দানব বলে ধরে নিয়েছিলেন। তার ধারণা ছিল, প্রাগৈতিহাসিক আমলের মানুষের সাথে বাস করত ওগুলো।'

পাতা উল্টে ফাদার কার্কারের ওই দানবদের ছবি আঁকার একটা প্রচেষ্টা দেখাল রোল্যান্ড। স্বাভাবিক মানুষের সাথে ওগুলোর আকৃতির পার্থক্যও বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন কল্পনাপ্রবণ যাজক।

অবিশ্বাসের হাসি খেলে গেল উপস্থিত সবার চেহারায়।

নিজেও মুচকি হাসল রোল্যান্ড। 'মানছি, রেভারেন্ড ফাদার বেশ হাস্যকর কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তবে সময়টার কথাও মাথায় রাখতে হবে আমাদের। সেসময় জ্ঞান আর প্রযুক্তির যতটুকু হাতে ছিল, সেগুলো ব্যবহার করেই এগোতে হয়েছে তাকে। এই বইতে এরকম আরও অনেক হাস্যকর তত্ত্ব আছে। প্রাচীন দানব

থেকে শুরু করে আটলান্টিস কোথায় ডুবে গিয়েছে, সে ব্যাপারেও মন্তব্য করেছেন তিনি।'

সোজা হয়ে আড়মোড়া ভাঙ্গল গ্রে, অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকায় পিঠ ব্যথা হয়ে গিয়েছে। ধৈর্য হারাতে শুরু করেছে সে। 'এগুলোর সাথে আমাদের গুহা-রহস্যের কী সম্পর্ক?'

আচমকা প্রশ্নে বিব্রত হলো না রোল্যান্ড। 'এগুলো বলছি, কারণ আমি ফাদার কার্কারের এখানে আসার কারণটা জানি।' বলে টেবিলের উপর রাখা ধাতব প্লেটটা সবার সামনে উল্টিয়ে ধরল সে। নিচের দিকটা নতুন করে পরিষ্কার করা হয়েছে বলে মনে হলো। 'ওই গুহার চ্যাপেলের বাইরে এটা শক্ত করে লাগানো ছিল।'

গ্রে খেয়াল করল, প্লেটের গায়ে অনেকগুলো লাইন লেখা। সবগুলোই ল্যাটিন ভাষায়, একদম নিচের দিকে কতগুলো চিহ্নও আছে। 'অনুবাদ করতে পেরেছেন লেখাগুলো?'

নড করল রোল্যান্ড। 'এতে লেখা- ওই গুহাগুলোতে যে প্রবেশ করবে, তার জন্য শাস্তি হিসেবে রয়েছে মৃত্যুদণ্ড।'

'কেন?' জানতে চাইল শেইচান। 'এমন কী হাতি-ঘোড়া সুরক্ষিত ছিল ওখানে?'

একটা ল্যাটিন লাইনের উপর হাত বুলাল রোল্যান্ড, উচ্চ স্বরে অনুবাদ করতে শুরু করেছে। 'এখানে বিশ্রাম নিচ্ছেন অ্যাডাম, মানবজাতির পিতা। কেউ যেন তাকে কখনও বিরক্ত না করে...' বুক ভরে শ্বাস নিয়ে লাইনটা শেষ করল সে। '...নইলে পৃথিবীর ধ্বংস সুনিশ্চিত।'

সকাল ৬:১৪

শেষ শব্দ কয়েকটা শুনে শিউরে উঠল লিনা। মান্ডাস সাবটেরেনিয়াসে আঁকা দানবের ছবিটা তার মাথায় ঘুরছে। গুহার দেয়ালেও কিন্তু ওরকম কিছু ছায়া ছায়া অবয়ব অঙ্কিত ছিল। সাধারণ মানুষের চাইতে বেশ বড় ওগুলো।

ঠিক যেন, ফাদার কার্কারের সেই দানবগুলোর একটা বাহিনী।

গ্রে-র কথা শুনে চমক ভাঙ্গল তার। 'ওই নিয়ানডারথালের হাড়গুলোকে অ্যাডামের হাড় বলে বিশ্বাস করলেন কেন ফাদার কার্কার?'

'ভুল করেছেন আর কি।' শ্রাগ করল রোল্যান্ড। 'যেমন ভুল করেছিলেন ম্যামথের হাড়ের ব্যাপারে। হয়তো এগুলোর বয়স দেখে চিন্তাটা এসেছিল তার মাথায়। অথবা অন্য কিছু আবিষ্কার করেছিলেন বলে। অদ্ভুত কিছু দেয়াল চিত্র ছিল গুহায়, ছিল তারকা-আকৃতির হাতের ছাপ...' সমর্থনের জন্য লিনার দিকে তাকাল সে।

মাথা নাড়ল মেয়েটা, ওর কাছেও কোন ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু যাজকের কথায় অন্য আরেকটা রহস্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠল তার মনে। 'আরেকটা কঙ্কাল ছিল না ওখানে? যেটা ফাদার কার্কার সরিয়ে নিয়েছিলেন? ওগুলোকে কি ইভের হাড় বলে ধরে নিয়েছিলেন নাকি তিনি?'

'সম্ভবত।' কথাটা মেনে নিল রোল্যান্ড। 'তবে এই প্লেটে উধাও হয়ে যাওয়া হাড়ের ব্যাপারে কিছু লেখা নেই।'

'ধরে নিলাম যে ওই হাড়গুলোকে কার্কার ইভের বলেই মনে করছেন, তাহলে সরাবেন কেন?' আবারও প্রশ্ন করল মেয়েটা। 'আদমের হাড়ের মতো ওগুলোও রেখে আসলেন না কেন?'

'জানি না আমি,' উত্তর দিতে গিয়ে ভ্রূ কুঁচকে গেল রোল্যান্ডের। 'মানে এখনও পর্যন্ত জানি না।'

শেইচান হাত বাড়িয়ে প্লেটের চিহ্নগুলোর উপর টোকা দিল। 'এগুলোর মানে কী?'

লিনাও ওগুলো দেখেছে। 'চাঁদের বিভিন্ন অবস্থা বলে মনে হচ্ছে। দেখ, মোট আটাশটা গোলাকার চিহ্ন আছে। চান্দ্র মাস কিন্তু আটাশ দিনেই হয়।'

'আমার মনে হয়, ড. ক্রেন্ডালের ধারণাই সত্যি।' রোল্যান্ড বলল। 'চাঁদ নিয়েও মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন ফাদার কার্কার। তার বিশ্বাস ছিল- শুধু পৃথিবীর নিয়ম ঠিক রাখা নয়, বরং মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও চাঁদ অত্যন্ত জরুরী। টেলিস্কোপ ব্যবহার করে চাঁদের কক্ষপথের একটা নিখুঁত চিত্র আঁকার চেষ্টা করেন তিনি।' কথা শেষ করেই মান্ডাস সাবটেরানিয়াসের পাতা খুলে সেরকম কিছু ছবি দেখাল সে। সেগুলোর মধ্যে হাতে আঁকা একটা ছবির উপর স্থির হলো তার আঙুল।

ফাদার কার্কারের বেঁচে থাকার সময়টা আমলে নিলে, ছবিগুলোকে প্রায় নিখুঁত না বলে উপায় নেই। চাঁদের নানা গর্ত, শুকিয়ে যাওয়া সাগর, পাহাড়-সবকিছুই আছে ছবিটায়।

গ্রে-র মনোযোগ কিন্তু অন্য বইটার উপরে। 'কার্কার নিশ্চয় কাউকে না কাউকে কিছু বলতে চাইছিলেন। নইলে এই জার্নালকে ওই দেয়ালচিত্র ভর্তি গুহায় রেখে আসার অর্থ হয় না।'

লিনা একমত হলো। গুহায় দেখা দৃশ্যগুলো ফুটিয়ে তুলল মনে। 'ফাদার কার্কার গুহা থেকে শুধু হাড়ই নেননি,' হঠাৎ আরেকটা কথা মনে পড়েছে তার। 'তিনি ওখানকার একটা প্রকোষ্ঠ থেকে আরও কিছু একটা নিয়ে এসেছিলেন। সেই সাথে এই জার্নালটাও ফেলে আসেন ওখানে। হয়তো ভবিষ্যতে যদি কোন অনুসন্ধানকারীর জন্য সূত্র হিসেবে!'

'কিন্তু এসব সূত্রের অর্থ কী? কী বোঝাচ্ছে এগুলো?' জানতে চাইল গ্রে।

জার্নালের অবস্থা দেখে মাথা নাড়ল লিনা। 'তিনি যা-ই রেখে আসেন না কেন, সেগুলো অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।' টেবিলে রাখা চাবিটা দেখাল সে। 'তবে আমার মনে হয়- এই চাবিটা দিয়ে যে তালা খোলা যাবে, সূত্রগুলো ওটার অবস্থানই নির্দেশ করত।'

জার্নাল থেকে চোখ সরাতে পারছে না গ্রে। লিনা বুঝতে পারল, ঘন-নীল চোখ জোড়ার পেছনে থাকা মগজটা ঝড়ের গতিতে কাজ করতে শুরু করেছে। অনেকক্ষণ পর আঙুল দিয়ে গোলকধাঁধার নিচে লেখা একটা তারিখ দেখাল যুবক।

'ষোল'শ উনআশি।' উচ্চ-স্বরে লেখাটা পড়ে রোল্যান্ডের দিকে তাকাল গ্রে। 'আচ্ছা, ফাদার কার্কার ষোল'শ উনসত্তর সালে জাগরেবে পা রেখেছিলেন না?'

এগিয়ে এলো যাজক। 'হ্যাঁ। এই অমিলটা আমার লক্ষ্য করা উচিত ছিল। যার অর্থ, ফাদার এখানে প্রথমবার পা রাখার দশ বছর আবার ফিরে এসে ওই গুহায় ঢুকেছিলেন। চাবি আর এই জার্নাল তখনই রেখেছিলেন বলে মনে হচ্ছে।'

'কেন?' জানতে চাইল লিনা।

'জানি না,' জবাব দিল রোল্যান্ড। 'তবে ফাদার কার্কার ঠিক তার পরের বছর মারা যান। হয়তো আপনার কথাই সত্যি, তিনি ভবিষ্যৎ অভিযাত্রীদের জন্য কোন সূত্র রেখে যেতে চেয়েছিলেন।'

চাবিটা উঁচু করে ধরল লিনা, শতাব্দী প্রাচীন নিদর্শনটা যেন সময়ের ভার বহন করে চলছে।

কোন তালা খুলবে চাবিটা দিয়ে? নিজের সময়ের এই 'লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি' এমন কী রহস্যকে লুকিয়ে রেখে গিয়েছেন?

জার্নালটা হাতে নিয়ে আলতো করে খুলল গ্রে। ছত্রাক খাওয়া কাগজগুলোয় এক সময় মনের কথা লিখে রেখেছিলেন রহস্যময় রেভারেন্ড ফাদার কার্কার। আচমকা প্রচ্ছদের ভেতরে অংশে নজর চলে গেল ওর। কিছু একটা খুঁজে পেয়ে ভালো মতো

দেখার জন্য আগুনের কাছে চলে গেল সে। 'এখানে কিছু একটা লেখা আছে, আমি ধরতে পারছি না।'

রোল্যান্ডের পাশাপাশি লিনাও এগোল ওদিকে।

'ঠিক ধরেছেন!' অবাক হয়ে গেল মেয়েটা। চোখ কুঁচকে তাকাচ্ছে উল্টানো পাখার মাঝে স্থাপিত একটা ক্রসের ছবির দিকে।

শেইচানের মত অবশ্য ভিন্ন। 'ক্রসের নিচে ওগুলো আগুনের শিখা না?'

আঁতকে উঠে এক পা পিছিয়ে এল রোল্যান্ড, বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে এসেছে চোখ দুটো। 'না, ওগুলো আগুন না। হরিণের শিং।'

হরিণের শিং?

'বুঝতে পেরেছি ফাদার কার্কার আমাদের কোথায় যেতে বলছেন।' বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল তরুণ যাজক।

সকাল ৬:৩৩

বই আর প্রাচীন ল্যাটিন বার্তা ফেলে রান্নাঘরের ফ্রিজের দিকে এগোল রোল্যান্ড। ঠাণ্ডা মদের একটা বোতল বের করে এনে রাখল টেবিলের উপর।

হাত বাড়িয়ে বোতলটা নিয়ে জার্মান ভাষায় লেখা লেবেল পড়ল শেইচান, 'ইয়াগারমাইস্টার? চার্চের লোকেরা আনন্দ উদযাপন করার সময় পবিত্র মদ পান করে বলেই তো জানতাম!'

'মনসিয়র ঘুমাতে যাবার আগে দুই এক চুমুক পান করতে পছন্দ করেন।' জবাব দিল রোল্যান্ড। 'তবে এটা আপনাদের এজন্য দেখাচ্ছি না।' বলে বোতলটা গ্রে-র দিকে এগিয়ে দিল সে। ভাবখানা এমন, যেন আর কোন ব্যাখ্যার দরকার নেই।

আসলেই দরকাই নেই। এক নজর দেখেই ব্যাপারটা বুঝতে পারল গ্রে। 'লোগো...'

হরিণের শিঙ-এর ঠিক মাঝখানে একটা উজ্জ্বল ক্রস-এই হলো ইয়াগারমাইস্টার ব্র্যান্ডের লোগো!

'কোম্পানির মতে এই চিহ্নটা সেইন্ট হিউবারটাস, অর্থাৎ শিকারি যাজকের প্রতিনিধিত্ব করে।' ব্যাখ্যা করলেন রোলান্ড। 'প্রাচীন ইয়াগারমাইস্টাররা ছিল জার্মান পশুপালক আর বনরক্ষক। তাই তাদের মদের এই নাম।'

'এর সাথে ফাদার কার্কারের কী সম্পর্ক?' প্রশ্ন করল লিনা।

এক হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল রোল্যান্ড, ধৈর্য ধরতে বলল যেন। 'সেইন্ট হিউবারটাসের গল্পটা আগে বলি। একদিন শিকারে বেরিয়েছিলেন তিনি, আচমকা দেখতে পান সামনে এক হরিণ দাঁড়িয়ে। তার দুই শিঙয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে একটা সোনালী ক্রস। তবে ক্যাথলিকদের অনেকে বলে, এই গল্পটা আসলে তারও অর্ধ শতাব্দী আগেকার-সেইন্ট ইউস্টাসের। কথিত আছে, প্লাসিডাস নামক এক রোমান সেনাপতি রোমের কাছাকাছি এরকরম একটা দৃশ্য দেখতে পান। সাথে সাথে খ্রিষ্ট-ধর্ম ধারণ করেন তিনি, নাম নেন-ইউস্টাস।'

'কিন্তু,' গ্রে একই প্রশ্ন আবার করল। 'গল্পটার সাথে এই রহস্যের কী সম্পর্ক?'

'বৃদ্ধ বয়সে ইতালিয়ান এক গ্রামে চলে যান ফাদার কার্কার। যাত্রা পথে আবিষ্কার করেন একটা ছোট্ট চার্চ। যায়গাটা ছিল জিওভেনজানো ভ্যালির কিছু উপরে, মেন্টরেলার স্যাংচুয়ারিতে। সেইন্ট ইউস্টাসের সম্মানে সম্রাট কন্সট্যানটাইন ওটা বানিয়ে ছিলেন।'

হাতে ধরা মদের বোতলটার দিকে তাকাল গ্রে।

শিকারীদের রক্ষাকর্তা সন্ত!

বলে চলেছে রোল্যান্ড। 'আবিষ্কারের পর চার্চটাকে মেরামতের কাজে মন দিলেন কার্কার। সেজন্য চাঁদা তুললেন, নজর রাখতে শুরু করলেন নির্মাণকাজে। যতদূর জানি, প্রায় পুরো দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন তিনি। অনুমতি ছাড়া নির্মাণাধীন এলাকায় কাউকে ঢুকতে পর্যন্ত দিতেন না।'

'আপনার সন্দেহ, ওখানে তিনি কিছু একটা লুকিয়ে রেখেছিলেন?' জিজ্ঞেস করল গ্রে।

'ইতিহাস বলে, জায়গাটার ব্যাপারে একেবারে পাগলপারা হয়ে গিয়েছিলেন ফাদার। জীবনের বাকি বছরগুলো ওখানেই কাটিয়ে দেন, এমনকি অনুরোধ করেছিলেন-তাকে যেন সেখানেই কবর দেয়া হয়।'

'আসলেই তাকে ওখানে কবর দেয়া হয়েছিল?' এবারের প্রশ্নটা লিনার মুখ থেকে বেরোল।

'পুরো দেহ না, কেবল তার হৃদপিণ্ড।' বলে চারপাশে তাকাল রোল্যান্ড, কথাটার গুরুত্ব বোঝাতে চাইছে। 'এমনকি সেই সময়ের পোপ- তেরোতম ইনোসেন্টও অনুরোধ করেছিলেন যেন তার নিজের হৃদপিণ্ড ওখানে কবর দেয়া হয়।'

নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা আছে ওই যায়গায়।

টেবিলের উপর থেকে প্রাচীন চাবিটা তুলে নিল গ্রে, বাঁকানো অংশটা খুলির মতো দেখতে। আচমকা ফাদার কার্কারের হাড় চুরির কথা মনে পড়ল ওর।

এই চাবিটাকে স্কেলেটন কী বলাই যায়।

'অনুসন্ধান করে দেখা দরকার,' শেইচান প্রস্তাব দিল। 'চাইলেই আমরা ঘন্টা দুয়েকের ভেতর রোমে পৌঁছাতে পারি।'

গ্রে-র ইচ্ছা হলো, প্রস্তাবটা লুফে নেয়। একই রকম ইচ্ছা আর একজনেরও হচ্ছে!

'আমিও যেতে চাই,' রোল্যান্ড বলল। 'আপনাদের আমার অভিজ্ঞতা দরকার হবে।'

'তাহলে আমিও যাব,' সবাইকে অবাক করে বলল লিনা।

গ্রে মানা করার জন্য মুখ খুলছিল, কিন্তু আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লিনা বেশ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

'কেউ না কেউ তো গুহা থেকে হাড়গুলো চুরি করেছে,' ব্যাখ্যা করল মেয়েটা। 'টাকার জন্য যে নয়, তা তো আমরা সবাই জানি। ক্রোয়েশিয়া এবং আটলান্টার হামলা দুটো যে দক্ষতার সাথে করা হয়েছে, তাতে আর সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই।' বোনের কথা মনে পড়ায় প্রজননবিদের কণ্ঠে দুঃখের রেশ। 'ওই হাড়গুলোর বিশেষ কোন জেনেটিক বৈশিষ্ট্য না থেকে পারেই না। আমি মাত্র একনজর দেখেছি ওটাকে। তাতেই বুঝে গেছি- ওই খুলির গড়নে কোন না কোন সমস্যা আছে! একটু ভালোভাবে খতিয়ে দেখতে পারলে হয়ত-'

'ঠিক বলেছেন,' মেয়েটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রোল্যান্ড। 'ওই হাড়গুলোকে ফাদার কার্কার কোথায় লুকিয়েছেন, তা জানতে পারলে সম্ভবত আমাদের উপর হওয়া আক্রমণের কারণটাও বুঝতে পারব। আমার বিশ্বাস, ফাদার কার্কার ওই গুহায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু না কিছু খুঁজে পেয়েছিলেন। নিয়ানডারথালদের ব্যাপারে দক্ষ কেউ হয়তো ব্যাপারটা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে।'

'কথা সত্যি,' শ্রাগ করল শেইচান। 'আমরা কিছু একটা আসলে ধরতে পারছি না। আর পেইন্টার চীনে যে অভিযান চালাচ্ছেন, তাতে আমরা খুব একটা কাজে আসব না।'

হার মানতে রাজি নয় গ্রে, এমনকী দলের সবাই ওর সাথে দ্বিমত করলেও না। লিনাকে সুরক্ষা দেয়ার ভার ওর উপর ন্যস্ত, দায়িত্বটা অবহেলা করার উপায় নেই।

প্রজননবিদও সিগমা কমান্ডারের মনের কথা ধরতে পেরেছে। 'আমি যে রোমে যাব, সেটা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।' চাপ দিল সে। 'তাছাড়া মারিয়া বিপদে থাকবে, আর আমি কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকব-তা কিছুতেই হতে পারে না।'

জবাবে গ্রে কিছু বলার আগেই, ওর স্যাটেলাইট ফোনটা বেজে উঠল। রিংটোন শুনেই টের পেল, সিগমা কমান্ড থেকে ফোন এসেছে।

'কমান্ডার পিয়ার্স,' পেন্টারের কণ্ঠ শুনতে পেল ও। 'তোমাদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্রোয়েশিয়ান বিমান বাহিনির একজন তোমাদেরকে সামরিক বিমানে করে...'

কথা শেষ করার আগেই ডিরেক্টরকে থামিয়ে দিল গ্রে। 'স্যার, আমাদের পরিকল্পনায় একটা পরিবর্তন এসেছে।'

সকাল ৭:২২

ছোট্ট একটা কফি হাউজে বসে আছে লোকটা। সামনে একটা ভাঁজ করা খবরের কাগজ ধরা, তবে নজর জানালা দিয়ে বাইরের দিকে। সেইন্ট ক্যাথরিন স্কয়ারের ঠিক উল্টোদিকে একটা পুরনো চার্চ রয়েছে, নামও একই। ধর্মীয় শহরটাতে এরকম চার্চ হামেশাই পাওয়া যায়। এমনকি এখানে বসেও জাগরেবের ক্যাথলিক ক্যাথেড্রালের সর্পিল চূড়া দুটো দেখা যাচ্ছে।

বিশাল স্থাপনাটার উপর নজর রাখছে আরও দু'জন। সেই সাথে চোখ রাখা হয়েছে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আর ট্রেন স্টেশনের দিকেও।

গতকাল গুহায় প্রবেশ করা মানুষদের মাঝে একজন যাজকও ছিল, এমনটা শোনা গিয়েছে বলেই নজর রাখা হচ্ছে ক্যাথেড্রালের উপর। সে কিংবা আমেরিকান মেয়েটা পাহাড় থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছে কিনা, তা এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। তবে ঝংজিয়াও অর্থাৎ লেফটেন্যান্ট কর্নেল সান জোর দিয়ে বলেছেন, রাজধানীর উপর যেন কড়া নজর রাখা হয়।

আদেশ মানতে আপত্তি নেই তার। পাহাড়ে মৃত সাথীদের কথা মনে হওয়া মাত্র ধক করে উঠছে বুক। যে করেই হোক, ওদের রক্তের দাম চুকাতে হবে।

নড়াচড়া লক্ষ করে ক্যাথেড্রাল থেকে তার মনোযোগ সরে গেল পার্শ্ববর্তী আর্ট গ্যালারির দিকে। এত সকালে তো ওটা খোলার কথা না। কিছুক্ষণ আগেই একটা কালো সেডান এসে থেমেছে ওটার সদর দরজায়। এখনও চালু আছে গাড়িটার ইঞ্জিন, থেকে থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে টেইলপাইপ থেকে।

চারটা অবয়ব গ্যালারি থেকে দৌড়ে বেড়িয়ে অপেক্ষমান সেডানে চড়ল। সবার মাঝে একটা মেয়ের উপর নজর পড়ল তার, কালো পোশাকের ফাঁক দিয়ে সোনালী চুল দেখা যাচ্ছে সহজেই। প্যাসেঞ্জার সীটের দরজা খুলে যাওয়া মাত্র ক্রোয়েশিয়ান বিমান বাহিনীর উর্দি পরিহিত ড্রাইভারকে দেখতে পেল সে।

আবারও ধক করে উঠল ওর হৃদপিণ্ড, নিশ্চিত হতে পেরেছে।

খবরের কাগজটা তুলে সেটা দিয়ে আড়াল করল সেলফোন। একটা বাটন চেপে অপেক্ষায় রইল তারপর। কানেকশন পাওয়া মাত্র বলে উঠল, 'ঝংজিয়াও সান, ওদের খুঁজে পেয়েছি আমি।'

অধ্যায় এগারো
৩০ এপ্রিল, দুপুর ২:০৫
পূর্ব চায়না সমুদ্রের উপরে

কেবিন স্টুয়ার্ড একটা ট্রে হাতে ঝুঁকে আছে। অনেকগুলো কাপড় সুন্দরভাবে ভাঁজ করে রাখা ওতে। 'বেইজিং-এ নামতে আর বেশি হলে এক ঘণ্টা সাময় লাগবে। চাইলে একটু ফ্রেশ হয়ে নিতে পারেন।'

একটা ন্যাপকিন হাতে নিল মঙ্ক। কৃত্রিম হাতে টের পাচ্ছে, এখনও যেন ধোঁয়া উঠছে কাপড়টা থেকে। 'ধন্যবাদ।'

'আপনার স্ত্রী'র জন্য কিছু?'

'কিছু লাগবে, প্রিয়তমা?' ভ্রমণ সঙ্গিনীর দিকে ফিরল ও।

'নাহ, ধন্যবাদ।' ভদ্র কণ্ঠে জবাব দিল মেয়েটা।

স্টুয়ার্ড ফিরে গেলে, ঈষৎ ভেজা গরম ন্যাপকিনটা মুখে চেপে ধরল মঙ্ক। উষ্ণতা যেন মুছে দিচ্ছে সব ক্লান্তি।

'সাধারণত এভাবেই ভ্রমণ করো নাকি?' হাসতে হাসতে জানতে চাইল মেয়েটা, আঙুল দিয়ে অবাধ্য চুলগুলো সরিয়ে দিচ্ছে আকর্ষণীয় চেহারার সামনে থেকে। 'তাহলে তো ক্যাটের প্রস্তাব মেনে তোমাদের সংস্থায় যোগ দিতে হবে!'

শ্রাগ করল মঙ্ক। 'সুযোগ পেলে। তবে অধিকাংশ সময় কোন গাড়ির ট্রাঙ্কে হাত-পা অবস্থায় যাতায়াত করতে হয় আমাদের।'

কিম্বারলি ময়-এর বয়স প্রায় মঙ্কের সমান। কিন্তু মেয়েটার সৌন্দর্যে এমন একটা ধার আছে যাতে অনেক কমবয়সী বলে ভ্রম হয় ওকে। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ছদ্মবেশ নিয়েছে বলে ব্যাপারটা একটু বেমানান মনে হচ্ছে।

তবে লম্বা সময় ধরে সফর করতে হচ্ছে বলে এই ছদ্মবেশের বিকল্প নেই।

মাফ করে দিও, ক্যাট।

মঙ্কের আসল স্ত্রী ক্যাথরিন ব্রায়ান্ট এখনও ডি.সি. তে, সিগমা ডিরেক্টর ক্রো-কে সাহায্য করছে। অভিযানের জন্য কিম্বারলিকে সে নিজেই খুঁজে এনেছে। ইউ.এস. ন্যাভাল অ্যাকাডেমির দিন থেকে তারা একে-অন্যকে চেনে। কিম্বারলি শেষ পর্যন্ত ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সীতে যোগ দিলেও, দু'জনের বন্ধুত্বে চিড় ধরেনি। চীনের

সবগুলো ভাষায় দক্ষ হওয়ার পাশাপাশি মেয়েটা স্নাইপার হিসেবেও প্রথম শ্রেনির। হাতাহাতি লড়াইতেও নিজ এজেন্সীর অধিকাংশ পুরুষকে হারাতে সক্ষম।

বোয়িং ৭৫৭-এ আছে এখন ওরা। মাত্র বায়ান্ন সীটের বিমানটা এখন কেবল অর্ধেক ভর্তি। চব্বিশ দিনে এই বিমান মোট আটটা দেশে ভ্রমণ করে। বাহনটাতে ওদের টোকিও থেকে বেইজিং যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে ক্যাট। এতে করে ওদের ধনী আমেরিকান হবার কাভারটা আরও পোক্ত হয়েছে।

এই মুহূর্তে ওরা ছাড়া বিমানের পেছনদিকে আর কেউ নেই।

স্যাটেলাইট ফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মঙ্ক, স্ক্রিনে চীনা উপকূলের মানচিত্র ভেসে আছে। বাকোর কব্জিতে লাগানো ট্র্যাকারটার অবস্থান সরাসরি দেখাচ্ছেন পেইন্টার। আপাতত ওটা চীনের রাজধানীতেই আছে। পরবর্তী গন্তব্য কী হয়, তা দেখার জন্য অপেক্ষা করছে মঙ্করা।

ওদের দুজনের দায়িত্ব আসলে রেকি করা। মারিয়া, কোয়ালস্কি আর বাকোকে অপহরণকারীরা কোথায় কোথায় নিয়ে যেতে পারে, সেটা বের করার জন্য ওদের আগমন। উদ্ধারকারী দলটাও রাস্তায়, ওদের পিছু পিছু আসছে।

নতুন একটা মেসেজ আসায় কেঁপে উঠল মঙ্কের ফোন, পেইন্টারের কাছ থেকে এসেছে ওটা। স্ক্রিনে দ্রুত নজর বুলিয়ে নিল সিগমা এজেন্ট। সামনে কী কী সমস্যা হতে পারে, তা ইতিমধ্যে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। ফোনে এখন ভেসে আছে ডা. অ্যামি ভু-এর ব্যাপারে সিগমার জড়ো করা সমস্ত তথ্য। ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনের এই গবেষকই ওই প্রাইমেট সেন্টারে আক্রমণের মুল হোতা। সে যে ফাউন্ডেশনে থাকা চীনের চর, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আতঙ্কের বিষয়, এগোতে এগোতে হোয়াইট হাউসের সায়েন্স কাউন্সিল পর্যন্ত চলে গিয়েছিল মহিলা।

অ্যামি চার প্রজন্ম ধরে আমেরিকান। এমন একজন কেন দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তা কেউ বুঝতে পারছে না। অতীত ঘেঁটেও সমাজতন্ত্রের প্রতি সে অনুরাগী, এমন কোন প্রমাণ মেলেনি। তবে সিগমার অনুসন্ধানে বেইজিং থেকে আসা অর্থের কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ভু-র হাত হয়ে সেগুলো চলে গিয়েছে বিভিন্ন প্রজেক্টের ফান্ডে।

কিছুই পরিষ্কার হচ্ছে না।

কিম্বারলির হাতে ফোনটা ধরিয়ে দিল মঙ্ক, সে-ও পড়ুক। পড়া শেষ করে কিছুক্ষণ পরেই ফোন ফিরিয়ে দিল মেয়েটা। আশেপাশে তিন চার সীটের মাঝে কেউ নেই, তবুও নিচু স্বরে বলল, 'আমরা অনেকদিন ধরেই আমেরিকায় চাইনিজদের কর্মকাণ্ডের উপর নজর রাখছি। ওদের গুপ্তচররা গুরুত্বপূর্ণ অনেক সংস্থায় ঢুকতে সমর্থ হয়েছে। স্নাতক আর স্নাতকোত্তর পর্যায়ের অগণিত চাইনিজ

ছাত্র এখন আমেরিকায় থাকে। এখানে দক্ষ হয়ে ফিরে যায় মাতৃভূমিতে। অনেক ক্ষেত্রেই সেই জ্ঞান কাজে লাগানো হয় আমাদেরই বিরুদ্ধে।'

'তাহলে আমরা ওদেরকে সেই সুযোগ দিচ্ছি কেন?'

'ভালো প্রশ্ন করেছ। সোজাসাপ্টা উত্তর হলো, আমাদের পি.এইচ.ডি. প্রোগ্রামে যতজন ছাত্র নেবার সুযোগ আছে, ততজন যোগ্য আমেরিকান ছাত্র আমরা বানাতে পারিনি। শুধু এক পদার্থবিজ্ঞানের কথাই ধরো। দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে বলা যায়, প্রতি বছর ডক্টরেট পাওয়া ছাত্রদের মাঝে অর্ধেকই বাইরের দেশের। এরা ডিগ্রী নিয়ে নিজেদের দেশে ফিরে যায়। এসবের জন্য আমাদের করদাতাদের টাকাই কিন্তু খরচ হচ্ছে।'

'তার মানে, আমরা শুধু আমাদের তরফ থকে শত্রুপক্ষকে শিক্ষাই দিচ্ছি না। সেটার খরচও বহন করে চলেছি?'

মাথা নেড়ে সায় দিল মেয়েটা। 'কারও কারও মতে, এতে দীর্ঘমেয়াদি কিছু লাভের সম্ভাবনাও আছে।'

ভ্রু কুঁচকাল মঙ্ক। 'কীভাবে?'

'আমেরিকান পুঁজিবাদ, ব্যবসা প্রণালী আর শিক্ষা ব্যবস্থা এতে ছড়িয়ে পড়ছে দেশের বাইরে। তবে এই মতের কিছু সমস্যাও আছে- আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরি করছি। জ্ঞান নামক মূলধনটা পাচার করছি বহির্বিশ্বে।'

এই অভিযানের জন্য কিম্বারলিকে কেন পছন্দ করেছে ক্যাট, তা মঙ্ক বুঝতে পারছে। মেয়েটা নিজের ক্ষেত্র সম্পর্কে ভালোই জানে!

'একটা উদাহরণ দেই,' বলে চলেছে সে। 'হার্ভার্ডে লেখাপড়া করা এক চাইনিজ ছাত্রী আমাদের দেশের সেরা প্রজননবিদ আর বায়ো-ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে কাজ করত। কয়েকদিন আগে সাংহাই-এ ফিরে যায় মেয়েটা। গিয়েই শুরু করেছে এমন কাজ করা, যেটাকে পাশ্চাত্য সভ্যতা অমানবিক বলে মনে করে।'

'যেমন?'

'জেনেটিক্যালি কীভাবে মানব-ভ্রূনের মাঝে পরিবর্তন আনা যায়, ওই বিষয়ে গবেষণা করা শুরু করেছে সে।' সিটে হেলান দিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিম্বারলি। 'চল্লিশটারও বেশি দেশে এই ধরনের গবেষণা নিষিদ্ধ। কারণটা নিশ্চয় বলে দিতে হবে না? এসবের উদ্দেশ্য কী জানো? জেনেটিক্যালি উন্নত মানুষ তৈরি করা। ফলে দেখা যাবে, ভবিষ্যতে আমরা হয়ে গিয়েছি মানব সমাজে নিচু শ্রেনির সদস্য। আর ওই জেনেটিক্যালি উন্নতরা উঁচু শ্রেনির।'

ভ্রূ কুঁচকে ফেলল মঙ্ক। 'তোমার কী মনে হয়, আক্রমণটা ওই কারণেই হয়েছে? অ্যামি ভু কিন্তু ক্রেন্ডাল বোনদের গবেষণায় টাকা ঢালছিল। তাদের গবেষণার বিষয় ছিল- মানব বুদ্ধিমত্তার জেনেটিক উৎস।'

মাথা নাড়ল কিম্বারলি। 'বলা শক্ত। তবে ড. ভু-র ব্যাপারে আমার ধারণা হচ্ছে- রাজনৈতিক না, বৈজ্ঞানিক কারণে সে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আজকাল গবেষণা করার সময় 'কাজটা করা যাবে কিনা'-এই ব্যাপারটা মাথায় রাখা হয়। 'কাজটা করা উচিৎ কিনা'-তা খুব কম গবেষকই চিন্তা করে। জ্ঞানের স্বার্থে জ্ঞানার্জন বলতে পারো, এতে দুনিয়া ধ্বংস হলেই বা কী!'

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ব্যাপারে করা অ্যামির মন্তব্য মনে পড়ে গেল মঙ্কেরঃ মানব ভ্রূণ ব্যবহার করে করা এই গবেষণা আমরা অনুমোদন করতে পারব না। লাখ লাখ মানুষ তাহলে প্রতিবাদে ফেটে পড়বে।

এ ব্যাপারে আসলে উচিৎ কিংবা অনুচিতের প্রশ্ন ছিল না। যা ছিল সেটা হচ্ছে- ধরা পড়ে যাবার ভয়।

আবার কেঁপে উঠল তার ফোন। পেইন্টার মেসেজ পাঠিয়েছেনঃ

সিগন্যাল বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

হয় ট্র্যাকারটাকে কেউ খুঁজে পেয়েছে, আর নয়তো ওটার ব্যাটারি ফুরিয়ে গিয়েছে।

সর্বশেষ অবস্থান জানিয়ে দিচ্ছি।

ফোনস্ক্রিনের মানচিত্রে ফিরে এলো মঙ্ক, ট্র্যাকারের সর্বশেষ অবস্থান হিসেবে একটা সবুজ এলাকা ভেসে উঠেছে।

কিম্বারলিও দেখার জন্য ঝুঁকল। 'ওটা তো বেইজিং চিড়িয়াখানা!'

মাথা নেড়ে সায় দিল সিগমা এজেন্ট। শত্রুপক্ষের সাথে যখন একটা গরিলা আছে, তাই ওখানে যাওয়াটাই তো যুক্তিসঙ্গত।

'এখন কী করব?' জানতে চাইল কিম্বারলি।

'হে প্রিয়তমা স্ত্রী,' মেয়েটার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল মঙ্ক, কণ্ঠে মেকি আদর। 'চলো, চীনের বিখ্যাত পান্ডা দেখা আসি।'

দুপুর ২:২২

হেলিকপ্টার ঘুরন্ত পাখাগুলোকে মাথা নিচু করে এড়াল মারিয়া। এই যান্ত্রিক ফড়িংটা ওদেরকে বেইজিং-এর একটা সামরিক বিমান বন্দর থেকে এখান পর্যন্ত উড়িয়ে এনেছে। এখানে মানে একটা হেলিপ্যাড, পাশেই বয়ে যাচ্ছে চওড়া একটা নদী। নামার সময় চারপাশটা দেখে নিয়েছে ও। দক্ষিণ দিকে অনেকগুলো খাঁচা, খোঁয়াড় আর বড় বড় দালান দেখতে পেয়েছে। সেই সাথে অনেক লোকের হাঁটাচলাও নজর এড়ায়নি।

চিড়িয়াখানা...সম্ভবত বেইজিং চিড়িয়াখানাই।

নিরাপদ স্থানে পৌঁছাবার পর, সোজা হয়ে আড়মোড়া ভাঙ্গল সে। কোয়ালস্কি শেই আছে, বিরক্তিতে কুঞ্চিত চেহারা।

'এমন গন্ধ...' বলে উঠল সে।

আসলেই দুর্গন্ধ ছড়িয়ে আছে চারপাশে। বাতাসে তেল পোড়া গন্ধ, নদীর পাশের সুউচ্চ দালানগুলোকে ঢেকে রেখেছে হলদে কুয়াশা। বেইজিং এর বায়ু াণ যে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে, পড়েছিল মারিয়া। কিন্তু এতটা যে খারাপ বস্থা, তা বুঝতে পারেনি। এরইমধ্যে চোখ জ্বলতে শুরু করেছে, কাশি থামাবার ন্য মুখে হাত দিতে হলো ওকে।

'হাঁটতে থাকো।' পেছন থেকে একটা আদেশ ভেসে এল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে দলটার লম্বা নেতার দিকে তাকাল মারিয়া। এখানে আসার পথে নতে পেরেছে, লোকটার নাম গাও। কিন্তু এটা ওর ডাক-নাম না বংশের-নাম, তা নে না এখনও। ত্রিশের কোঠায় হবে বয়স। কালো চুলগুলো কানের পাশে ছোট-ট, কিন্তু মাথার উপরে লম্বা।

নেতার পেছনে একটা ছোট ফর্ক-লিফট দেখা গেল, সামরিক হেলিকপ্টারটার চ থেকে কিছু একটা নামাচ্ছে। সেটা যে বাকোর খাঁচা, তা বুঝতে পারল রিয়া। গরাদ ধরে ঝাঁকাচ্ছে গরিলা, ঠোঁট গোল করে 'মা'-র সাহায্য চাইছে, খে ভয়। কিন্তু এতদূর থেকে প্রানিটার চিৎকার শোনা যাচ্ছে না।

এক পা সামনে বাড়তেই গাও ওর পথরোধ করে দাঁড়াল।

'এগোও!' শক্ত কণ্ঠে বলল সে, হাতে বেরিয়ে এসেছে ভয়ঙ্কর দর্শন পিস্তল।

এই অস্ত্রটাই জ্যাককে খুন করেছে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল মারিয়া। ছেলেটার া মাথায় খুন হবার দৃশ্যটা কল্পনা করল সে, হতাশা আর রাগে মুঠো হয়ে এসেছে দুটো। একদৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল ও, রাগটা বোঝাতে চাইল কে।

কোয়ালস্কি ওর হাত ধরে এগিয়ে গেল। 'অন্য কোনও সময়।' ওয়াদা করছে া।

চুপচাপ হাঁটতে শুরু করল মারিয়া, মনোযোগ অন্য দিকে সরানোর জন্য চোখ ল চারপাশে। দূরে একটা বিশাল বৃত্তাকার ছাদসহ দালান দেখা যাচ্ছে। গাছের ার উপরে একটা ম্যুরাল। সীল, শিকারী তিমি আর ডলফিনওয়ালা একটা দ্রের ছবি আঁকা আছে ওতে।

সম্ভবত একটা অ্যাকুরিয়াম...

তবে ওদের অতদূর যেতে হলো না, খানিকটা সামনে একটা সাধারণ কংক্রিটের ানেই বর্তমান গন্তব্য। দোতালা দালানের ছাদ ভর্তি স্যাটেলাইট ডিশ আর

অ্যান্টেনা। দেয়ালের পাশে একটা লম্বা দরজা। খুলে যেতেই দেখা গেল জিনিসা একটা ফ্রেইট এলিভেটর।

বাকোর খাঁচাবাহী ফর্কলিফটটা ঠিক সেই মুহূর্তেই ওদের পাশ দিয়ে বেড়িে গেল। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল মারিয়া।

'দাঁড়ান,' ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল গাও। কোয়ালস্কির দিকে ইঙ্গিত করে বল 'আপনি গরিলাটার সাথে যান, শান্ত রাখবেন ওকে।'

মারিয়ার দিকে তাকাল কোয়ালস্কি। বাকোর দেখাশোনার দায়িত্ব ওর উপ বোঝাবার যে ভানটা করছিল, সেটা এখনও কেউ ধরতে পারেনি বলেই মনে হচ্ছে

না পারলেই ভালো, কোয়ালস্কির দিকে তাকিয়ে নড করল মারিয়া। 'বাকোে শান্ত রাখার জন্য যা যা করতে পারুন, করুন।'

ভ্রূ কুঁচকে তাকাল কোয়ালস্কি।

কে, আমি?

'বাকোর এখন পরিচিত একটা মুখ দরকার।' জোর দিল মেয়েটা।

সে মুখ যত অল্প সময়ের জন্যই পরিচিত হোক না কেন!

কিন্তু বাকো বেশ বুদ্ধিমান। সে জানে, কোয়ালস্কিকে বিশ্বাস করে মারিয়া। ত আশা করা যায়, ওর উপস্থিতি প্রানিটাকে শান্ত রাখতে পারবে। চোখের সামনে অপহরণকারীরা ওকে বৈদ্যুতিক প্রড দিয়ে শক দিয়েছে। চায় না, বাকোর অ কোনও ক্ষতি হোক।

সাথে সাথে আরেকটা ভয় ওকে নাড়া দিয়ে গেল ওকে।

কী চায় এই অপহরণকারীরা?

মারিয়ার চেহারায় ফুটে ওঠা দুশ্চিন্তা দেখতে পেয়েছে কোয়ালস্কি। 'দুশ্চি করবেন না, আমি ওকে দেখে রাখব।'

কোন কিছু না ভেবেই লোকটাকে জড়িয়ে ধরল ও। বিস্ময়ে শক্ত হয়ে গে কোয়ালস্কির দেহ। পরক্ষণেই শান্ত হয়ে নিজেও জড়িয়ে ধরল মেয়েটাকে। লোকট কথার চাইতে তার শারীরিক উপস্থিতি প্রজননবিদকে বেশি শক্তি জোগাল।

'এগোন!' ওদের দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠল গাও, সেই সাথে পিস্তল দিয়ে খোঁ মেরেছে কোয়ালস্কির পাঁজরে।

মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে তার দিকে চোখ গরম করে তাকাল সিগমা এজেন্ট। এ পা পিছিয়ে এসে মারিয়ার দিকে তাকাল চাইনিজ সৈন্য। 'আপনি আমার সা আসুন।'

রাইফেলধারী আরেক সৈন্য কোয়ালস্কিকে নিয়ে উঠে গেল ফ্রেইট এলিভেটে ভেতর। মারিয়াকে নিয়ে যাওয়া হলো পাশের একটা ছোট দরজার দিকে।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?' গাওকে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'মেজর জেনারেল লাও-এর সাথে দেখা করতে। আপনি বাঁচবেন না মরবেন, সেই সিদ্ধান্ত তিনিই নেবেন।'

দুপুর ২:৪৫

আর কত নিচে যেতে হবে আমাদের?

কোয়ালস্কি বুঝতে পারল, এলিভেটরটা ভূ-গর্ভস্থ কোন ঘরের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু ঠিক কতটা নিচে নেমেছে তা বুঝতে পারছে না। পনেরো সেকেন্ড চলার পর থামল এলিভেটর। পুরোটা সময় বাকোর খাঁচার পাশে দাঁড়িয়ে রইল সে, খাঁচাটা এখনও ফর্ক-লিফটেই আছে। আরও চারজন অস্ত্রধারী প্রহরী আছে লিফটে। এতজনকে সামলানো ওর একার পক্ষে সম্ভব হবে না।

আচমকা কেউ একজন ওর শার্টের হাতা ধরে টান দিল।

চোখ নামিয়ে দেখল, লোমশ কয়েকটা আঙুল ওর কভারঅল আঁকড়ে ধরেছে। ভয়ার্ত এক জোড়া চোখ তাকিয়ে আছে ওর দিকে!

আমি জানি...তুমি ভয় পাচ্ছ, বন্ধু।

এলিভেটরের দরজা খুলে গেলে, হাত ছাড়িয়ে নিল কোয়ালস্কি। এখন অন্য কোনও দিকে মন দেয়ার সময় না। এই ভূ-গর্ভস্থ কমপ্লেক্সের একটা মানচিত্র মনের মাঝে গেঁথে নিতে হবে ওকে। পালাবার সম্ভাবনা যদি সামনে এসেই যায়, তাহলে পথ চেনা থাকলে সুবিধা হবে।

খাঁচাটা নিয়ে ফর্ক-লিফট ওয়্যারহাউজের দিকে রওনা হতেই গুঙিয়ে উঠল গরিলা। ঘরটা প্রায় দুই তলার সমান লম্বা, আরও একটা ফর্ক-লিফট দেখা যাচ্ছে ওখানে।

পিঠে রাইফেলের নলের খোঁচা খেয়ে লিফট থেকে বেরোল কোয়ালস্কি। ঘরটা পার হবার সময় যতটা সম্ভব দেখে নিল সব কিছু। কাজে লাগানো যাবে, এমন কিছু খোঁজে হন্য হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর চোখ। কিন্তু সবগুলো ক্রেট আর কার্টনে চাইনিজ ভাষায় লেখা লেবেল সাঁটা। কোনটার ভেতর কী আছে, তা বোঝার কোনও উপায় নেই।

ওয়্যার হাউজ পার হয়ে অগণিত প্যাসেজের এক গোলকধাঁধায় প্রবেশ করল ওরা। ছাগল, ভেড়া আর মাদি শুয়োর-ওয়ালা খোঁয়াড়ের মতো অংশও চোখে পড়ছে। বাতাসে স্যাঁতসেঁতে গন্ধ।

এটা আবার কেমন যায়গা রে বাবা?

ল্যাব জ্যাকেট আর উর্দি পরা লোকের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে ধীরে ধীরে। অবশেষে কোয়ালস্কিরা এমন এক যায়গায় এসে থামল, যেখানে বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়া একটা লাল চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

খুব সহজেই পড়া যাচ্ছে লেখাটা।

প্রবেশ নিষেধ...

তবে আদেশ মানল না দলটা। হাঁটতে হাঁটতে শেষ পর্যন্ত এসে থামল কয়েদখানার মতো দেখতে একটা জায়গায়। রাস্তার এক পাশে গরাদ দেয়া এক সারি খাঁচা, প্রতিটা আকারে একটা গাড়ি ধরে এমন গ্যারেজের সমান বড়। সবগুলোই খালি, তবে দেয়ালের কংক্রিটে আঁচড় আর পড়ে থাকা আবর্জনা দেখে বোঝা গেল-প্রায়শই কাজে লাগান হয় ওগুলোকে।

বেশ খানিকটা দূরে রয়েছে ব্যাঙ্কের ভল্টের মত দেখতে একটা ধাতব দরজা, উপরে জ্বলজ্বল করছে একটা লালচে সাইন। গার্ডদের একজন ওটার দিকে আঙুল তুলল। কিন্তু অন্য আরেকজন তার হাত নামিয়ে দিয়ে ধমকে উঠল তাকে। ওই দরজার প্রতি কৌতূহল দেখানোটাও স্বাস্থ্যের জন্য সুখকর হবে না- বুঝতে পারল কোয়ালস্কি।

বেশ বেশ...

তবে ওদের গন্তব্য সেই ভল্ট নয়। বাকোর খাঁচাবাহী ফর্ক-লিফটটা সারিবদ্ধ কংক্রিটের খাঁচার ঠিক মাঝখানে গিয়ে থামল, গলা বের করে চাইনিজে কিছু একটা আদেশ দিল ড্রাইভার। সাথে সাথে দৌড়ে গেল গার্ডদের একজন, খুলে দিল একটার গরাদ। এদিকে ততক্ষণে ড্রাইভার খাঁচাটাকে মেঝেতে নামিয়ে রেখেছে। আরও দুজন গার্ড এগিয়ে গেল, তাদের রাইফেল ধরা হাতে এখন উঠে এসেছে বৈদ্যুতিক প্রড। চতুর্থ গার্ড অবশ্য কোয়ালস্কির উপর থেকে নজর হটায়নি। আর তাছাড়া লোকটা এমন দূরত্বে আছে যে, ও চাইলেও কিছু করতে পারবে না।

প্রড হাতের সৈনিক দুজন বাকোকে খোঁচা দেয়ার ভয় দেখাচ্ছে। ভয়ে খাঁচার একেবারে শেষ প্রান্তে চলে গেল বেচারা গরিলা। দরজা খুলে, সৈন্যরা ওকে কাছের সেলে ভরার প্রয়াস পাচ্ছে। ভয়ে শুকনো পাতার মতো কাঁপছে প্রানিটা।

'অনেক হয়েছে!' চিৎকার করে উঠল ও। হাত তুলে বোঝাল যে, ঝামেলা করার ইচ্ছা নেই। 'আমাকে করতে দাও কাজটা। তোমরা তো বেচারাকে হার্টের রোগী বানিয়ে ছাড়বে!'

অপহরণকারীরা ইংরেজি জানে কিনা, তা কোয়ালস্কির জানা নেই। তাই আচার-আচরণে ফুটিয়ে তুলল ইচ্ছাটাকে। গরিলাটার দিকে তাকিয়ে নম্র স্বরে বলল, 'ভয় পেও না বাকো।'

সৈন্যরা ওর কথা বুঝুক আর না-ই বা বুঝুক, সরে গিয়ে যায়গা করে দিল।

দরজা দিয়ে খাঁচায় ঢুকল কোয়ালস্কি। বাকো জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে, ঠোঁটজোড়া কাঁপছে তির তির করে, স্থির দৃষ্টিতে কোথাও তাকাতে পারছে না।

নিজের বুকে চাপড় বসালো কোয়ালস্কি।

[আমার দিকে তাকাও]

কাজ হয়েছে। ওর প্রতি নিবদ্ধ হলো প্রানিটার নজর।

হাত তুলে আস্তে আস্তে ইশারার ভাষায় কথা বলতে শুরু করল সে, শেষ করল হাত মুঠো করে কব্জি একসাথে স্পর্শ করিয়ে।

[আমি তোমাকে রক্ষা করব]

এখনও জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে বাকো, তবে শান্ত হয়ে আসছে চোখের বিহ্বল দৃষ্টি। দুই হাত দিয়ে হাঁটু ধরে ছিল এতক্ষণ। এবার দুই কব্জি একসাথে স্পর্শ করাল।

মাথা নেড়ে সায় দিল কোয়ালস্কি। 'ভয় পেও না, আমি অ।।২।

গরিলাটা ওর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল। এক মুহূর্তের জন্য ওর ছোট বোন-অ্যানের কথা মনে পড়ে গেল কোয়ালস্কির। ভয় পেলেই অভয়ের আশায় বড় ভাইয়ের দিকে এভাবে হাত বাড়াত মেয়েটা।

হাতটা জড়িয়ে ধরল উষ্ণ কয়েকটা আঙুল।

আমি আছি।

পথ দেখিয়ে বাকোকে মেঝেতে নামিয়ে আনল কোয়ালস্কি, এরপর ঢুকিয়ে দিল কংক্রিটের সেলে।

এক খাঁচা থেকে অন্য খাঁচায়।

এক সৈন্য খেঁকিয়ে উঠতেই বাকো এত জোড়ে ওর হাত জড়িয়ে ধরল যে, মনে হলো পিষে ফেলবে। ব্যথাকে পাত্তা না দিয়ে অন্য হাতে সৈন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালাল সিগমা এজেন্ট।

'পেছনেই থাক!'

সেলের ভেতরের পরিবেশ একেবারেই বাজে। মেঝেতে ইতস্ততভাবে খড় ছড়ানো। এক কোনায় একটা পাত্রে দেখা যাচ্ছে সবুজাভ পানি। খেলার মতো কোন খেলানা নেই; বাকো যে দুলবে, সেজন্য কোন দড়িও ঝোলানো নেই! সবচেয়ে বাজে কথা, একদম পেছনের দেয়াল থেকে এক সেট ইস্পাতের হাতকড়া ঝুলছে।

এক গার্ড ডাকল ওকে, এবার নম্র স্বরে, হাত নেড়ে বাইরে বেরোবার নির্দেশ দিল।

নিজের হাত জড়িয়ে রাখা উষ্ণ আঙুলগুলোর দিকে তাকাল কোয়ালস্কি।

চুলায় যাক সব।

ঠাণ্ডা কংক্রিটের উপর বসে পড়ল ও, হাত দিয়ে চাপড় বসাল পাশের খড়ে-বাকোকেও বসতে বলছে। এরপর সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল। 'আমি এখানেই থাকছি।'

কিছুক্ষণ নিজেদের মাঝে আলোচনা করল সৈন্যরা, এরপর একটা সিদ্ধান্তে পৌছেছে বলে মনে হলো। বেতের একটা ঝাঁপি তুলে নিল একজন। ভেতরে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে কলা, গাজর আর পাতা। লাথি মেরে সেটাকে সেলের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল সে। আরেকজন দরজা বন্ধ করে তাতে পেল্লাই এক তালা ঝুলিয়ে দিল।

'আমার কথা বুঝতে পেরেছে দেখি।' বিড়বিড় করে বলল কোয়ালস্কি।

সৈন্যদের নিয়ে চলে গেল সৈন্যরা, দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল একজোড়া দরজা। তবে কোয়ালস্কি দেখল, দরজার ওপাশে এক সৈন্য অবস্থান নিয়েছে।

এরা তাহলে কোন ঝুঁকি নিতে চাইছে না!

বাকোর হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল কোয়ালস্কি। হলের অন্য দিকে তাকাল সে, যেদিকে ইস্পাতের ভল্টটা রয়েছে। দরজার পাশেই দেখা যাচ্ছে একটা পাম রিডার, নিশ্চয় হাতের ছাপ পড়ার জন্য। ছাদে সারি বেঁধে রয়েছে অনেকগুলো ক্যামেরা। সেলগুলোর উপর নজর রাখছে।

সুযোগ পেয়ে বাকো চারপাশের সাথে আত্মস্থ হবার প্রয়াস পেল। নাক উঁচু করে শ্বাস টানতে টানতে এক সময় শুঁকতে গেল খড়ের নিচের দাগ। কী শুঁকল তা কোয়ালস্কি জানে না, তবে সভয়ে পিছিয়ে এল গরিলা।

কোয়ালস্কি ওকে দোষ দিতে পারল না, ওটা দেখে রক্তের দাগ বলেই মনে হচ্ছে।

বাকোর মনোযোগ অন্য দিকে সরাবার জন্য, খাবারের ঝাঁপিটা গরিলার দিকে ঠেলে দিল ও। 'পিজ্জা আর বিয়ার না হলেও, কাজ চলবে।'

একটা কলা বের করে দিল ও, কিন্তু বাকো হাত পর্যন্ত বাড়াল না। অপহৃত হবার পর থেকে এখন পর্যন্ত কিছু মুখে তোলেনি বেচারা। মারিয়া অনেক চেষ্টায় কিছু তরল খাওয়াতে পেরেছিল, ব্যস।

'কিছু না কিছু তো খেতে হবেই।' কোয়ালস্কি বলল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখে আঙুল দিল গরিলা, চোখে এখনও ভয়।

আরে, ট্র্যাকারের কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম...

ক্যামেরা আর বাকোর মাঝখানে দাঁড়াল কোয়ালস্কি। হাত বাড়িয়ে বলল, 'মুখ থেকে বের করতে পারো এখন।'

আদেশ বুঝতে পেরেছে গরিলা। লালা মিশ্রিত ট্র্যাকার ব্যান্ডটা ওর হাতে এসে পড়ল। ক্যামেরার দিকে পিঠ দিয়ে কোয়ালস্কি পরীক্ষা করে দেখল জিনিসটা। জিপিএস মেশিনের সবুজ আলোটা সাধারণত জ্বলজ্বল করে। এখন আর করছে না!

এই পুরু কংক্রিট ভেদ করে অবশ্য সিগন্যাল যাবে বলেও মনে হয় না।

গাল বকে উঠল সিগমা এজেন্ট।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বাকো আওয়াজ করল মুখ দিয়ে, নিচু করে ফেলেছে মাথা। হয়তো ধরে নিয়েছে, কোয়ালস্কি ওর উপর রাগ করেছে।

'তোমার দোষ নেই, বন্ধু।' ট্র্যাকারটা পকেটে ভরে ফেলল বিশালদেহী সিগমা এজেন্ট। আপাতত ওটার ব্যাপারে ভুলে গেলেও চলে। এই মুহূর্তে অন্য একটা চিন্তা ঘুর ঘুর করতে শুরু করেছে মাথায়। 'চলো, কিছু খেয়ে নেয়া যাক।'

আবারও কলাটা এগিয়ে দিল কোয়ালস্কি, কিন্তু গরিলা বেচারা ছুঁয়েও দেখল না ওটাকে। ওর বোন অ্যানকে যখন খাওয়াবার চেষ্টা করত, তখন মেয়েটার চেহারাও এমনই হতো। অবশ্য মাঝে মাঝে খাবারের প্রতি এই অনীহা ছিল ব্যথার কারণে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাইয়ের বাজে রান্নাও ছিল তার জন্য দায়ী।

বাকোর পাশে গিয়ে বসল কোয়ালস্কি। কলাটা গরিলার কোলে ফেলে দিয়ে হাতের পেশি ফোলাল।

[তোমাকে শক্তিমান হতে হবে]

আবারও ইশারাটা দেখাল কোয়ালস্কি, তবে এবার কিছুটা পার্থক্য এনেছে। থাবা দেখাল, তারপর মুষ্ঠিবদ্ধ করল হাত।

[সাথে সাহসীও]

শেষ করল হাতের আঙুলগুলো এক করে মুখে ঠেকিয়ে।

[তাই খেতে হবে তোমাকে]

কলাটার দিকে তাকাল বাকো। কোয়ালস্কি ওটা ছিলে আবার বাড়িয়ে দিল।

এবার গরিলা সাহেব হাত বাড়িয়ে নিল কলাটা। মুখে ঠেকিয়ে কোয়ালস্কির প্রথম ইশারাটা দেখাল নিজে। তবে সব শেষে ইঙ্গিত করল কোয়ালস্কির দিকে।

[শক্তিমান হতে হবে]

অর্ধেক খেয়ে কলাটা বাড়িয়ে দিল ওর দিকে।

মুখ কুঁচকে আধ-খাওয়া কলার দিকে তাকাল কোয়ালস্কি। শ্রাগ করল শেষমেশ। অসুবিধা কী...

মুখে পুরে নিল কলাটা তারপর।

খেতে তো কখনও না কখনও হবেই।

দুপুর ৩:১৩

আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা?

সামনে ওর জন্য কী অপেক্ষা করছে, সেটা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করছে মারিয়া। লালচে-খয়েরী রঙে রাঙানো দেয়াল, জানালার উপরের কাঠটা সোনা দিয়ে গিলটি করা। পায়ের নিচে হাতে বানান মাদুর।

আমি আছিটা কোথায়?

কোয়ালস্কি আর বাকোর কাছ থেকে সরিয়ে নেবার পর, ওকে গাও একটা ভূ-গর্ভস্থ কমপ্লেক্সে নিয়ে এসেছে। বৈদ্যুতিক গাড়ি নিয়ে এসেছিল এক সৈন্য, ওটাতে চড়ে এগোনোর সময় জানালা দিয়ে একটা বিশাল ল্যাবরেটরী দেখতে পেয়েছে ও। জেনেটিক গবেষণার জন্য দরকারী সব যন্ত্রই আছে ওখানেঃ ডি.এন.এ. অ্যামপ্লিফাই করার জন্য থার্মোসাইক্লার, হাইব্রিডাইজেশন ওভেন, সেন্ট্রিফিউজ। একটা ঘরে সিকুইজিন ভার্টিকাল জেল অ্যাপারেটাসও দেখা গেল। ওর নিজের ল্যাবেও এই জিনিস আছে একটা।

অনেকক্ষণ পর, গাড়ি এসে থামল আরেকটা এলিভেটরে। মারিয়াকে অস্ত্র দেখিয়ে বের হতে বাধ্য করল গাও। এলিভেটরটা ওদের আরেকটা দালানে নিয়ে এল। এই ঘরের সাজ দেখে প্রজননবিদের মনে হলো যেন, আধুনিক সময় থেকে সতেরো শতাব্দীতে এসে পড়েছে! আসার সময় পথে জানালা দিয়ে বাইরের কিছু দৃশ্যও দেখতে পেয়েছে সে-লেগুনের উপর উড়তে থাকা পাখির ঝাঁক, সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা গাছপালা।

এখনও তাহলে চিড়িয়াখানাতেই আছি আমি!

আচমকা একটা দরজার সামনে এসে থেমে গেল সবাই। দরজার সামনে খাকি উর্দি আর লম্বা কালো বুট পরিহিত এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। ওর চাইতে বয়স অনেক বেশি লোকটার, তবে চেহারা রুক্ষ হলেও একটা সুদর্শন ভাব আছে। মুখের হাসিটাও বেশ উষ্ণ। হাসিমুখে মারিয়াকে...নাহ, মারিয়ার সঙ্গীকে সম্ভাষণ জানাল লোকটা।

'গাও, হুয়ানিং হুই জিয়া, ডিডি।'

চাইনিজ সৈন্য জবাবে হাতের পিস্তলটা হোলস্টারে ভরে নিয়ে জড়িয়ে ধরল লোকটাকে। 'জাই জাই, চ্যাং।'

আন্তরিক ভঙ্গিতে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরার অবস্থা দেখে মারিয়া বুঝতে পারল, এই দুজন ভাই না হয়ে যায় না। দুজনের মাঝে মিলটাও দেখতে পেল এখন পরিষ্কারভাবে। অল্প যে কয়েকটা পার্থক্য রয়েছে দুজনের মাঝে, সেটাও সহজেই ধরতে পারল। চ্যাং শুধু বয়সে গাও এর চাইতে বড়ই নয়, র‍্যাংকেও উপরে।

বড় ভাই- চ্যাং, অবশেষে দরজায় নক করল। ওপাশ থেকে হালকা একটা আওয়াজ ভেসে আসার পর খুলে গেল পাল্লা। প্রথমে প্রবেশ করল চ্যাং, এরপর মারিয়াকে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল গাও।

আচমকা লোকটার বলা আগের কথাটা মনে পড়ে গেল ওর।

মেজর জেনারেল লাও-এর সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। তুমি বাঁচবে না মরবে, সেই সিদ্ধান্ত তিনিই নেবেন।

মারিয়া ধরেই নিয়েছিল, চাইনিজ সেনাবিহিনির কোন নিষ্প্রাণ বুড়ো এসে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। অথচ ঘরে পা দেয়া মাত্র দেখতে পেল, চিকন এক মহিলা কড়াভাবে ইস্ত্রি করা উর্দি পরে একটা ডেস্কের ওপাশে বসে আছে। বুকের কাছে অনেকগুলো রঙিন রিবন লাগানো। জ্যাকেটে দুটো তারাও আছে। ধূসর চুল আর চেহারার ভাঁজ দেখে বুঝতে পারল, মহিলার বয়স মধ্য-পঞ্চাশের আশেপাশে।

তবে একা নেই উর্দিধারী।

সাথে আরও দুজন বয়স্ক লোক, দুজনের কেউই চাইনিজ না, পাশের একটা সোফায় বসে আছে। সেই সাথে জেনারেলের পেছনে, জানালার পাশে দাঁড়ানো দু'জন অস্ত্রধারী সৈন্য।

দুজনের মাঝে অপেক্ষাকৃত বয়স্কজন উঠে দাঁড়াল। তাকে একইসাথে অবাক আর বিব্রত দেখাচ্ছে।

'লিনা?'

মানুষজনের এই ভুলটা প্রায়শই ঠিক করে দিতে হয় মারিয়াকে। 'লিনা আমার জমজ বোন...আমি মারিয়া।'

'ওহ, তাই তো।' বলতে বলতে আবার বসে পড়ল লোকটা।

এই লোক যে প্রফেসর অ্যালেক্স রাইটসন, সেটা তার ব্রিটিশ উচ্চারণ না শুনেই বুঝতে পারল মারিয়া। এই ভূ-তত্ত্ববিদই ক্রোয়েশিয়ায় গুহাগুলো খুঁজে পেয়েছিলেন। মঙ্কের কাছে ছবি দেখেছে ও দু'জনের। অন্যজন জীবাশ্মবিদ, ড. ডেইন আরনড। তার বয়স রাইটসনের চাইতে কয়েক দশক কম হলেও, এই মুহূর্তে দেখতে অনেক বেশি বয়স্ক বলে মনে হচ্ছে।

বসা থেকে উঠে দাঁড়াল জেনারেল। 'ড. ক্রেন্ডাল, আপনার কাজের খুব বড় ভক্ত আমি। জিয়াইং লাও, পিপলস লিবারেশন আর্মির মেজর জেনারেল।' মহিলার সাথে হাত মেলাল মারিয়া। চায় না, ভাগ্য নির্ধারকের সাথে শুরুতেই খারাপ হয়ে যাক সম্পর্ক।

জিয়াইংয়ের দৃষ্টি চলে গেল গাও আর তার বড় ভাইয়ের দিকে। ম্যান্ডারিনে কিছু একটা বলে দরজাটা হাত দিয়ে দেখালেন। আপত্তি করল চ্যাং, কিন্তু পাত্তা পেল না। ভাইকে সাথে নিয়ে বিদায় হলো তারপর।

তাদের বিরক্তি দেখে মেজর জেনারেলের প্রতি উষ্ণ হলো মারিয়ার মন। নিজে থেকেই কথা বলে উঠল। অনেক কষ্টে নিজের কণ্ঠ দৃঢ় রেখে বলল, 'আপনি আমার কাজের ব্যাপারে জানলেন কী করে?'

জিয়াইং ওকে কাছের একটা চেয়ারে বসার ইঙ্গিত দিলেন। 'আপনার গবেষণার পয়সা কার কাছ থেকে আসে বলুন তো?'

মানসিকভাবে প্রচণ্ড একটা নাড়া খেল মারিয়া, বসে পড়ল চেয়ারে। 'কী...কী বলতে চান আপনি?'

'আপনার সাথে ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনের সম্পর্ক স্থাপন করেছে যে মহিলা... হোয়াইট হাউসের সায়েন্স কাউন্সিলের সদস্য এবং আপনার ও আপনার বোনকে যে গবেষণার টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে-'

'অ্যামি...'

মাথা দোলালেন জিয়াইং। 'ড. ভু বেইজিং থেকে প্রায়ই আপনাদের প্রাইমেট সেন্টারে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করত। তাকে হারিয়ে বেশ খারাপই লাগছে।'

হারিয়ে মানে?

নতুন পাওয়া তথ্যগুলো মনের মধ্যে যেন ঝড়ের সৃষ্টি করেছে, তবে চেহারায় সেই ভাবটা ফুটে উঠতে দিল না মারিয়া। এই গল্প যদি সত্য হয়, তাহলে ওরা দুই বোন অজ্ঞাতসারেই চাইনিজদের হয়ে কাজ করছে! অ্যামি ভু-র হাতের পুতুল হয়ে!

কিন্তু তা কী করে সম্ভব?

অ্যামিকে বন্ধু বলেই গণ্য করে মারিয়া। কিন্তু মহিলা যে কোনও না কোনও ধরনের দ্বি-পাক্ষিক গুপ্তচর তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে মারিয়ার, ইচ্ছা হচ্ছে মাথাটা দুই হাঁটুর ফাঁকে গুজে দেয়। অ্যামি কীভাবে ওদের দুজনকে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার জন্য চাপ দিয়েছিল, তা মনে পড়ে যাচ্ছে এখন।

প্রথম থেকেই কোন জীবন্ত প্রাণী, বিশেষ করে কোন গরিলার উপর গবেষণা চালাতে চায়নি মারিয়া। অ্যামির সাথে এ নিয়ে অনেকবার তর্কাতর্কিও হয়েছে। বানর প্রজাতির সব প্রানিই অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ আর সামাজিক জীবন যাপন করে। আত্ম-পরিচয়ের গুণটা একমাত্র তাদের মাঝেই দেখা যায়। বিশেষ করে সমাজে নিজেদের অবস্থান ভালোভাবেই জানে তারা। এরকম একটা প্রানিকে বন্দী করে তার উপর গবেষণা চালাবার অধিকার মানুষকে দিল কে?

যতই তর্ক করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত অ্যামির কথাই মেনে নিতে হয়েছিল ওকে।

আর তার ফল হলো বাকো।

অবশ্য মনের গভীরে হলেও মারিয়া জানে, সব দোষ অ্যামির ঘাড়ে চাপানো যায় না। সত্যিটা জানার আগ্রহ না হলে, নিজের তত্ত্বকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণের তীব্র ইচ্ছা না থাকলে-অ্যামি কখনোই ওকে দিয়ে কাজটা করাতে পারত না। সত্যি বলতে কী, সবাই যেখানে গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ডের রহস্যের কাছে হার মেনেছে, সেখানে ও সফল হতে পারে কিনা-এটা জানার আগ্রহেই কাজটা করেছে প্রজননবিদ।

লিনাকে সাথে নিয়ে উদ্ভাবন করা আধুনিক প্রজনন-পদ্ধতি এবং জিন প্রকৌশলের কথা এখনও কোথাও ছাপা হয়নি। অ্যামিও ওদের গবেষণার ব্যাপারে সবকিছু জানে না।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

অপহৃত হওয়ার কারণ এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছে মারিয়া। কিন্তু এই গবেষণাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য লিনাই বেশিরভাগ অবদান রেখেছে। বলা চলে, এই প্রজেক্টের আণবিক পর্যায়সহ অন্যান্য কারিগরি সব দিক সে নিজেই দেখেছে। মারিয়ার কাজ ছিল পরবর্তী স্তরে- বাকোকে দেখে রাখা। প্রানিটাকে বড় করা, নানান কিছু শেখানো আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।

'আমাদের আশা, আপনি এখানেও আপনার গবেষণা চালিয়ে যাবেন।' মারিয়ার ভয়কে সত্য প্রমাণিত করে মুখ খুললেন জিয়াইং। 'এখানে আপনাকে এবং আপনার টেস্ট সাবজেক্টকে যেভাবে আনা হয়েছে, তা যে পছন্দ হয়নি সেটা বুঝতেই পারছি। কিন্তু দেখুন, আমরা দুজনেই বিজ্ঞানী, সত্য খোঁজাই আমাদের ব্রত। আপনি এখানে গবেষণা করছেন না আমেরিকায়, তাতে কী যায় আসে? আমাদেরকে সহায়তা করুন, চাইনিজ সরকারের সব সাহায্যই পাবেন। আপনাদের দেশের ফাইল চালাচালি আমাদের এখানে অন্তত পাবেন না আপনি।'

ভয়ে কেঁপে উঠছে বুক, কিন্তু মারিয়া চেহারা আগ্রহীভাব ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেল।

'বলাই বাহুল্য,' যোগ করলেন মেজর জেনারেল। 'আপনার বোনের ক্ষেত্রেও একই প্রস্তাব প্রযোজ্য।'

'লিনা?'

অপহৃত হওয়ার আগে, ক্রোয়াশিয়ার গুহা-ধ্বস আর বন্যা থেকে বোনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে কিনা-সেই খোঁজ পাবার অপেক্ষায় ছিল ও। অথচ এখন পর্যন্ত ওই ব্যাপারে আর কোনও কিছু জানতে পারেনি।

'এখনও...এখনও বেঁচে আছে ও?' আঁতকে উঠল মারিয়া।

'জাগরেবের কাছে দেখা গিয়েছে ড. ক্রেন্ডালকে,' জবাব দিলেন জিয়াইং। 'আশা করি খুব তাড়াতাড়ি দুই বোনের মধুর মিলন ঘটাতে পারব।'

হাতের কম্পন থামাবার জন্য কোলের উপর হাত রাখল প্রজননবিদ, তাকাল বসে থাকা অন্য দুই বিজ্ঞানীর দিকে।

প্রফেসর রাইটসন ওকে দেখে হাসলেন। 'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।'

ড. আরনড অবশ্য মুখ ফিরিয়ে রেখেছেন অন্য দিকে।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাইল মারিয়া। 'ওই গুহাগুলোতে আপনারা আক্রমণ করেছিলেন কেন? আমার বোনকে ধরার জন্য?'

'আসলে জার্মানি থেকেই লিনাকে তুলে নেয়ার কথাছিল। কিন্তু আবহাওয়া খারাপ হওয়ায়, নির্ধারিত সময়ের একদিন আগেই পাহাড়ে চলে যায় সে। ভাগ্যের দান, বোঝা বড় দায়।'

'তাহলে ওই গুহাগুলোতে কী খুঁজছিলেন আপনারা।'

'দাঁড়ান, দেখাচ্ছি।'

সোফার পাশে রাখা একটা লম্বা প্লাস্টিকের বাক্সের দিকে ইঙ্গিত করলেন মেজর জেনারেল। উপরের পাল্লার তালা আগেই খুলে রাখা হয়েছে। ঢাকনা সরিয়ে মারিয়া উঁকি দিয়ে দেখতে পেল, একটা কঙ্কাল রাখা আছে ভেতরে।

হাঁটু গেড়ে বসল প্রজননবিদ, ভালো মতো দেখতে চায় জিনিসটা। 'এই হাড়...এগুলো মানুষের না। মানে কোনও হোমো স্যাপিয়েন্সের না!'

'নিয়ানডারথাল।' জবাবটা রাইটসনের মুখ থেকে বেরোল।

ভ্রূ কুঁচকে নাকের উপর একটা আঙুল রাখল মারিয়া। 'নাহ, আমার তা মনে হচ্ছে না। মানে এই খুলির মালিক পুরোপুরি নিয়ানডারথাল ছিল না। চেহারার হাড়গুলো একটু বেশিই সমতল। পেষণ দাঁত দেখে মনে হচ্ছে, ওগুলো একটু বেশিই ছোট।'

মুখ তুলে দেখতে পেল, হাসছেন জিয়াইং!

এবার মৌনব্রত ভাঙলেন জীবাশ্মবিদ ডেইন আরনড, কণ্ঠে আফসোস। 'আমিও তাই বলেছিলাম। সাবধানে মাপ নেবার পর বুঝতে পারি, আমরা কোন ধরনের সংকর নিয়ে কাজ করছি। আধুনিক মানুষের সাথে নিয়ানডারথালের সঙ্গমের ফলে জন্ম নিয়েছে এই কঙ্কালের মালিক।'

মেঝেতে বসে পড়ল মারিয়া। 'আপনার বক্তব্য ঠিক হয়ে থাকলে তো...'

'এই প্রজাতির আবিষ্কৃত সর্ব-প্রথম নমুনা হতে চলছে এই জীবাশ্ম,' কথাটা শেষ করলেন আরনড। 'তাও আবার নিখুঁত অবস্থায় পাওয়া। প্রফেসর রাইটসন কার্বন-ডেটিং করে বের করেছেন, প্রায় চল্লিশ হাজার বছর আগে দুনিয়ার বুকে হেঁটেছিল এই প্রাণী।'

'তবে,' রাইটসন যোগ করলেন। 'সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো-'

'যথেষ্ট হয়েছে অ্যালেক্স,' বৃদ্ধ প্রফেসরকে চুপ করিয়ে দিলেন আরনড। 'ওই বেমিলগুলোকে কেউ পাত্তা দিচ্ছে না।'

রাইটসনকে দেখে মনে হলো, আপত্তি জানাবেন। কিন্তু কি ভেবে যেন চুপ করে রইলেন। দুই গবেষকের মাঝে যে প্রায়ই তর্ক হয়, তা বুঝতে পারল মারিয়া।

এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করলেন ফ্রেঞ্চ জীবাশ্মবিদ, নিজেকে সামলে নিয়ে খুললেন আবার। 'এই কঙ্কাল আবিষ্কার পরার পর, আমি জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাংক ইন্সটিটিউটের সাথে যোগাযোগ করি। আপনার বোনকে ক্রোয়েশিয়া আসার আমন্ত্রণ জানাবার কারণও সেটাই।'

'নিয়াডারথাল সংকরের উপরে আমাদের গবেষণার জন্য?' মারিয়া প্রশ্নটা করল বটে, তবে উত্তর নিজেই জানে।

মাথা দোলালেন আরনড। 'আমার ধারণা, উপযুক্ত যন্ত্রপাতি আর সাহায্য পেলে আমরা খুব সহজেই এর ডিএনএ বের করে আনতে পারব। এজন্য লিনার সাহায্য প্রয়োজন হবে।'

বুঝতে পারল মারিয়া, এমন একটা আবিষ্কার সব রহস্যের সমাধান দিতে সক্ষম। মানব জাতি কীভাবে 'মানব জাতি' হয়ে উঠল, সেটা উত্তর লুকিয়ে রয়েছে ওই ডিএনএ-র মাঝে।

যদি লিনা আর আমি এরকম একটা নমুনা পেতাম...

জিয়াইং-এর কথা শুনে সম্ভাবনার দুনিয়া থেকে বর্তমানে নেমে এলো মেয়েটা। 'আমরা ড. আরনডের আবিষ্কারের কথা জানতে পেরেছিলাম আমাদেরই এক অপারেটিভের কাছ থেকে। তাই পদক্ষেপ নিতে দেরি করিনি। তবে একটু দেরি করলেই হয়তো বেশি ভালো হতো।'

চাইনিজ সরকারের গুপ্তচরদের দক্ষতার প্রশংসা না করে পারল না মারিয়া। আমেরিকা বা উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে চায়নিজ ছাত্ররা লেখাপড়ার জন্য যায়, তা ভালোভাবেই জানা আছে ওর। তবে এখন বোঝা যাচ্ছে, তাদের অনেকের উদ্দেশ্য থাকে কান পেতে গুরুত্বপূর্ণ খবর জেনে তা মাতৃভূমিতে পাচার করা।

বলে চলেছেন জিয়াইং। 'এরকম একটা তথ্য আমাদের গবেষণার সময়কাল অনেক কমিয়ে আনতে পারে। যদি ঠিক দলটাকে কাজে লাগানো যায়, তাহলে হয়তো কয়েক দশকের জন্য!' মাথা নেড়ে মারিয়া আর অন্য দু'জনকে দেখাল সে।

উঠে দাঁড়াল প্রজননবিদ। 'আপনারা আসলে করতে চাচ্ছেনটা কী?'

'সেটাও দেখাই না হয়।' হাত নেড়ে ওকে দরজার দিকে যেতে বললে জিয়াইং। পুরুষ দুজনও অনুসরণ করল। কোমরে হাত দিয়ে কাতরে উঠলেন রাইটসন, কণ্ঠে মেকি অনুযোগ। 'বুড়ো হাড়গুলো একটু বসারও সুযোগ পাচ্ছে না।'

'আশা করি আমরা আপনার সহায়তা পাব।' মারিয়ার উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন মেজর জেনারেল। 'ডা. আরনড, আপনার দক্ষতাও আমাদের কাজে লাগবে। তবে প্রফেসর রাইটসনের মতো ভূ-তত্ত্ববিদের আমাদের কোন দরকার নেই। তবে আশা করি, অন্য ভাবে কাজে লাগানো যাবে আপনাকে।'

কথাটা শুনে বেশ অবাক হলেন বৃদ্ধ প্রফেসর।

চোখের পলকে পিস্তল বের করে আনলেন জিয়াইং। রাইটসনের দিকে তাক করে টিপে দিলেন ট্রিগার।

বৃদ্ধ লোকটার চেহারা থেকে বিস্ময় মুছে যাবারও সময় পেল না। তার আগেই আছড়ে পড়লেন সোফায়, কপালের ছোট্ট ফুটোটা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

তীব্র শব্দে কানে তালা লেগে গেল মারিয়ার। এক পা পিছিয়ে এলো ও, যেন এখুনি জ্ঞান হারাবে। দৃষ্টিতে তীব্র ঘৃণা নিয়ে চাইনিজ সামরিক অফিসারের দিকে তাকাল তারপর। বুঝতে পারছে, এই নৃশংস কাজটার পেছনে কারণ ছিল শুধু ওকে শিক্ষা দেয়া।

হয় কাজে লাগো...

...আর নয়তো মরো!

অধ্যায় বারো
৩০ এপ্রিল, সকাল ১১:১০
গুয়াডাগনোলো, ইতালি

প্রেনেস্তিনি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠছে এসইউভি-টা, ড্রাইভিং সিটে আছে কমান্ডার গ্রে পিয়ার্স। রোমের এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র এক ঘন্টার দূরত্ব হলেও আশেপাশের দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছে, যেন অন্য কোনও দুনিয়ায় প্রবেশ করেছে সবাই। পার্বত্য ইতালির সবুজের কাছে ফিকে হয়ে এসেছে রোমের জাঁক-জমকপূর্ণ সুউচ্চ অট্টালিকাগুলো।

পেছনের সিটে বসে আছে লিনা, বুক ভরে টেনে নিচ্ছে ফুরফুরে বসন্তের বাতাস। তবে তাতে কিন্তু বোনের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা বিন্দুমাত্র কমেনি। ইতালি আসার পথে খবর এসেছে, বাকোর জিপিএস ট্র্যাকারটা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। বেইজিং-এর কোথাও উড়িয়ে আনা হয়েছে ওদের। অনুসন্ধান চালাচ্ছে সিগমা এজেন্ট মঙ্ক কক্কালিস।

লিনার পাশেই আছে রোল্যান্ড। নাক ডুবিয়ে রেখেছে একটা টুরিস্ট গাইডে, হাঁটুর উপর খোলা আইপ্যাড- ফাদার অ্যাথেনাসিয়াস কার্কার সম্পর্কিত সব তথ্য আছে ওতে। দুপুরের খাবারের জন্য গুয়াডাগনোলো গ্রামে যাত্রাবিরতিকালে গাইডটা সংগ্রহ করেছে এই তরুণ যাজক। সেই সাথে স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে তাদের গন্তব্য- স্যাংচুয়ারিও ডেলা মেন্টোরেলা সম্বন্ধে যতটুকু সম্ভব। জেনেও নিয়েছে।

ফাদার কার্কারের আবিষ্কৃত ক্যাথলিক স্যাংচুয়ারিটার ধ্বংসাবশেষ পাশ্ববর্তী পর্বতমালার একেবারে মাথায় অবস্থিত। এখন অবশ্য ওটাকে আর ধ্বংসাবশেষ বলার উপায় নেই। রেভারেন্ড ফাদার নিজেই গোটাকতক শতাব্দী পূর্বে জায়গাটা সংস্কার করিয়ে ছিলেন।

কার্কারের জার্নালে আঁকা হরিণের শিং-এর চিহ্নটা মনে করল গ্রে। আশা করছে- এতদূর ছুটে আসাটা বেকার হবে না।

গাড়ির গতির সাথে *পাল্লা* দিয়ে পিছিয়ে গেল একটা ট্রাফিক সাইন। খোদাই করা লেখাগুলো ইতালিয়ান ভাষার পাশাপাশি একইসাথে ইংরেজি ও পোলিশে অনুবাদ করা।

ব্যাপারটা শেইচানের চোখে পড়েছে। ভ্রু কুঁচকাল সে। 'এদিকে এত পোলিশ ভাষার ছড়াছড়ি কেন?'

আসার পথে গ্রামে এমনকি পোলিশ ভাষায় লেখা বইয়ের একটা দোকানও লক্ষ্য করেছে সবাই।

রোল্যান্ড ব্যাখ্যা করল, 'আঠারোশো সাতান্ন সালে পোপ একাদশ পায়াস, নতুনভাবে স্থাপিত এই চার্চটাকে একটা পোলিশ ধর্মসভায় স্বীকৃতি পাইয়ে দেন। পরবর্তীতে পোপ দ্বিতীয় জন পল থেকে শুরু করে বর্তমান বেনেডিক্ট পর্যন্ত সবাই পোপ পদে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে এখানে আসা শুরু করেন।'

'তাহলে ফাদার কার্কার নিজের হৃৎপিণ্ড এখানে সমাহিত করার ব্যবস্থা করেন,' মন্তব্য করল গ্রে। 'তারপর থেকে নির্বাচিত হওয়ার পর প্রত্যেক পোপ এখানে আসাকে রীতি বলে মেনে নেন, তাই তো?'

মাথা নেড়ে হাতের টুরিস্ট গাইড উঁচু করল রোল্যান্ড। 'আরেকটা ব্যাপার... কথিত আছে, এখানকার মাটিতে নাকি দু'শো জনেরও বেশি সেইন্টের দেহাবশেষ প্রোথিত।'

কথাটা শুনে অবাক হয়েছে লিনা। 'এত কেন?'

'কারণ, অধিকাংশ ধার্মিকদের মতে- এটাই পৃথিবীর সবিচেয়ে পুরনো মেরিয়ান স্যাংচুয়ারি।'

'মেরিয়ান স্যাংচুয়ারি মানে?'

'মানে জায়গাটা কুমারী মাতা মেরির প্রতি উৎসর্গকৃত,' ব্যাখ্যা করল তরুন যাজক। 'চতুর্থ শতাব্দীতে সম্রাট কনস্টানটাইনের আমলে স্থাপিত এই চার্চ। ধ্বংসাবশেষে পরিণত হবার আগে বেনেডিক্টাইন অর্ডার হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে এটার দেখাশোনা করেছে। সেইন্ট বেনেডিক্টও নাকি এখানকার চার্চের নিচের এক গুহায় বসে ধ্যান করতেন। জায়গাটা টুরিস্টদের জন্য উন্মুক্ত আছে। গেলেই দেখতে পাবেন।'

মাথা নাড়ল লিনা। 'আর কোনও গুহা-ফুহায় আমি ঢুকছি না। ক্রোয়েশিয়ায় যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে।'

শেষ হয়ে এসেছে পাহাড়ি রাস্তা, ছোট্ট একটা কবরখানা হয়ে থেমেছে চার্চের সামনে। ভবনের স্থাপত্যবিদ্যায় রোমান ছাপ স্পষ্ট। কাঠের দরজার উপর গোলাপফুল আকৃতির জানালা গলে নেমেছে সূর্যের আলো। নিচে দাঁড়িয়ে আছে পোপের একটা ব্রোঞ্জ মুর্তি। আশির্বাদের প্রতিরূপ হিসেবে এক হাত উপরে তোলা।

'এটাই ওই জায়গা নাকি?' লিনার গলায় হতাশা।

গাড়ি থেকে নেমে বাকিরাও যোগ দিল তার সাথে।

'আগে চার্চে যাওয়া যাক,' প্রস্তাব করল রোল্যান্ড। 'ওখানকার নান-দের সাথে কথা বললে আশা করি অনেক কিছু জানতে পারব।' বলে হাঁটা ধরল দরজা লক্ষ্য করে, এক ফাঁকে ঠিকঠাক করে নিল ঘাড়ে থাকা যাজকদের রোমান কলারটা। পেছন পেছন হাঁটতে শুরু করেছে সবাই। কিন্তু শেইচানকে কেমন যেন আড়ষ্ট দেখাচ্ছে।

'কি হলো?' জানতে চাইল গ্রে।

'এখানে আসার রাস্তাটা...একমুখী।' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জবাব দিল সাবেক আততায়ী।

কথা সত্যি। ক্রোয়েশিয়ার গুহায় হামলার পর এরকম সন্দেহ করা অমূলক না। জ্যাকেটের নিচে হোলস্টারে রাখা সিগ সাওয়ারটা ঠিকঠাক আছে কি না দেখে নিল সিগমা কমান্ডার।

'তোমরা যাও, আমি বরং এখানেই থাকি,' শেইচান বলল।

তর্কে গেল না গ্রে। বাইরে নজর রাখার জন্য আসলেই কাউকে দরকার। বাকিদের এগোনোর ইঙ্গিত করে বান্ধবীকে আলিঙ্গন করল সে। 'সাবধানে থেক।'

সকাল ১১:২১

চার্চের দরজা দিয়ে ঢোকার সময় বিড়বিড় করে প্রার্থনা করল রোল্যান্ড। ভ্যানিলার সুগন্ধযুক্ত মোমবাতির ঘ্রাণকে তার পরম বন্ধু বলে মনে হচ্ছে।

ভবনের বাইরের অংশ খুব একটা চাকচিক্যময় না হলেও, দেয়ালের ভেতর দিকের সাদা প্লাস্টারের প্রতি ইঞ্চিতে যেন মিশে আছে পবিত্রতা। কাঠের আসনগুলো সার বেঁধে এগিয়েছে বেদির দিকে। একটা ল্যান্ডিং-এর উপর ঝুলছে আঠারো শতকের অ্যান্টিক পাইপ-অর্গান। ঘষা কাঁচের জানালাগুলোতে শতাব্দী-প্রাচীন বিভিন্ন ছবি ছাপা। তবে স্যাংচুয়ারি অফ মেন্টোরেলার আসল সম্পদটা হলো এর প্রধান বেদিতে।

বেদির পেছনে, দ্বাদশ শতকে তৈরি মাতা মেরির কাঠের একটা বিশাল মূর্তি। শিশু যীশুকে কোলে নিয়ে রাজসিংহাসনে বসে আছেন তিনি। দু'জনের মাথাতেই মূল্যবান পাথর-খচিত মুকুট। ব্রোঞ্জ বাতির কারিকুরিতে মনে হচ্ছে যেন গোটা কাঠামোটা থেকে উজ্জ্বল দ্যুতি ছড়াচ্ছে। চারদিকে শান্ত-স্নিগ্ধ পবিত্রতা।

মুগ্ধ হয়ে সামনে বাড়ল রোল্যান্ড।

লিনাই সবার আগে নীরবতা ভাঙল। 'খোঁজাখুঁজি শুরু করব কোত্থেকে?'

কাজের কথা মনে পড়তেই শ্লথ হয়ে এল যাজকের পায়ের গতি। সাহায্য চাওয়ার মতো আশেপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আসনে বসে প্রার্থনা করছে এক দম্পতি আর একজন বুড়ি মহিলা। তবে ভালোভাবে তাকাতেই বেদির ওপাশে নানের কালো পোশাক পরা একজন নজরে এল।

ব্যবহারের দিক দিয়ে ভাবগাম্ভীর্য ধরে রাখলেও মেয়েটার বয়স বিশের বেশি হবে না। স্কার্ফের নিচে বাঁধা চুল। নীল চোখজোড়ায় তারুণ্যের দ্যুতি। রোল্যান্ডের কাঁধে রোমান কলার দেখে মৃদুভাবে মাথা নোয়াল সে। তরুণ যাজকের পরিচয় ধরতে পেরেছে।

'দেখা যাক... ইনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন কি না,' বলতে বলতে আসনের ফাঁক গলে সামনে বাড়ল রোল্যান্ড। 'জাই ডোবরি?'

'ভালো আছেন?'

মুচকি হেসে মাথা নাড়ল নান। কৌতুহলী টুরিস্টদের এভাবেই হয়ত স্বাগতম জানায় সে।

'লেই পারলা ইংলেস?' ইতালিয়ান ভাষায় আবার প্রশ্ন করল রোল্যান্ড। 'ইংরেজি বোঝেন?'

'অবশ্যই, ফাদার।' পরিষ্কার ইংরেজিতে জবাব এল, তবে কণ্ঠে পোলিশ টান স্পষ্ট। 'আসলে জুয়ারিদের ডিলার হিসেবে আটলান্টিকে দুই বছর ছিলাম আমি।'

হাসল তরুন যাজক। 'ওটা অন্তত ঈশ্বরের সেবা ছিল না।'

মেয়েটার মুখেও লজ্জার হাসি। 'আসলে চাকরিটা উপভোগ্য ছিল। ভাল বেতন, বাইরের পৃথিবীর সাথে পরিচয়। ওখান থেকেই এখানে আসা।'

'বুঝতে পেরেছি,' মাথা নাড়ল রোল্যান্ড। 'আপনার নামটা জানতে পারি?'

'সিস্টার ক্লারা।'

'ঠিক আছে, সিস্টার ক্লারা। আমরা একটা কাজে এসেছি। আশা করি আপনার সাহায্য পাব।'

'অবশ্যই, ফাদার। বলুন।'

বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলতে শুরু করল রোল্যান্ড, 'ক্রোয়েশিয়া থেকে এসেছি আমরা। এই স্যাংচুয়ারির ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই। আরও বিশদভাবে বলতে গেলে, সতেরো শতকে স্থাপনাটা পুনঃনির্মাণ করা সেই ফাদারের সম্পর্কে।'

মাথা নেড়ে সায় দিল মেয়েটা। 'ফাদার কার্কারের কথা বলছেন তাহলে।'

'হ্যাঁ। জাগরেবের ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটির প্রভাষক হিসেবে রেভারেন্ড ফাদারের উপর ডক্টরেট থিসিস করেছি আমি। এখন জানতে চাচ্ছি, এই স্যাংচুয়ারিটা পুনঃনির্মাণের নেশা তার মাথায় কেন চেপেছিল? আশা করি, আপনারা- অর্থাৎ এখানে যারা সেবিকা আছেন- তারা হয়ত সাধারণ বই কিংবা পত্রিকা থেকে তার সম্পর্কে আরও বেশি কিছু জানেন।'

'গুজব-টুজব যে কোনও কিছু,' যোগ করল গ্রে। 'আসলে আমরা এখানে তার কাজের বিস্তৃতিটা জানতে চাচ্ছি।'

বেদির সামনের মেঝের দিকে ইঙ্গিত করল সিস্টার ক্লারা। 'আমরা তাহলে বরং এখান থেকে শুরু করি। বেদিটার নিচেই ফাদার কার্কারের হৃৎপিণ্ড সমাহিত আছে। পোপের কাছে তিনি অনুরোধ করেছিলেন, যেন মাতা মেরির কৃপা-দৃষ্টি সব সময় তার অন্তরের উপর থাকে।'

এবার লিনা মুখ খুলল, 'অর্থাৎ ফাদার কার্কারের মাতা মেরির উপর একটা আসক্তি ছিল।'

'হ্যাঁ। কুমারী মাতাকে প্রচুর সম্মান করতেন তিনি। এ কারণেই এই চার্চটা পুনঃনির্মাণ করেন ফাদার। জায়গাটা মেরির সবচেয়ে প্রাচীন উপাসনালয়গুলোর মধ্যে অন্যতম।'

কথাটা শুনে লিনার চোখে-মুখে ফুটে ওঠা দীপ্তি রোল্যান্ডের নজর এড়াল না। মেয়েটার সাথে গ্রে-কেও টেনে একপাশে সরিয়ে আনল সে। 'কী মনে হচ্ছে?'

'ইভও একজন মহিলা ছিলেন, আমাদের সবার আদি মাতা।' জবাব দিল প্রজননবিদ। 'তার দেহাবশেষ যদি ফাদার কোথাও সংরক্ষণ করতে চান, তবে...'

নিঃসন্দেহে এটাই সেই জায়গা।

'কিন্তু যদি তাই হতে থাকে, তাহলে তিনি ওই জায়গাটা চিহ্নিত করেছেন কীভাবে?'

গ্রে একটা প্রস্তাব করল, 'ফাদার নোভাক তো বলেছিলেন- মিশরীয় হায়ারোগ্লিফ সম্পর্কে ফাদার কার্কারের বেশ আগ্রহ ছিল।'

'তা ঠিক, কিন্তু...'

হাল ছাড়ছে না সিগমা কমান্ডার। 'আর তিনি তো এটাও ভাবতেন যে, হায়ারোগ্লিফই হচ্ছে অ্যাডাম আর ইভ-এর ভাষা।'

বিস্ময় ছেয়ে গেল রোল্যান্ডের চোখে, সেই সাথে আমেরিকান লোকটার প্রতি সম্মান। 'ঠিক বলেছেন,' বলে সিস্টার ক্লারার দিকে ফিরল সে। 'সিস্টার, শুনেছিলাম এখানে পুনঃনির্মাণ কাজ চলার সময় রেভারেন্ড ফাদার নিজ হাতে কিছু সাজসজ্জার কাজ সেরেছিলেন?'

মাথা নেড়ে সায় দিল নান। 'হ্যাঁ।'

'এবারের প্রশ্নটা আপনার কাছে একটু অদ্ভুত মনে হতে পারে, তবে আমাদের জন্য বেশ গুরুত্ববহ। তিনি কি কোথাও সাজসজ্জায় মিশরীয় হায়ারোগ্লিফ ব্যবহার করেছেন?'

রোল্যান্ডের বিস্ময় যেন ক্লারাকেও ছুঁয়ে গেল। 'হ্যাঁ,' বলে চার্চের একপাশের দরজার দিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটা। 'উপরে, সেইন্ট ইউস্টাসের চ্যাপেলে। চাইলে এখনই আপনাদের ওখানে নিয়ে যেতে পারি।'

উচ্ছ্বাস যেন ঠিকরে বেরোচ্ছে রোল্যান্ডের গলায়। 'অবশ্যই, সিস্টার।'

বেদি পেরিয়ে সামনে বাড়ল নান, খুলে দিল কাঠের দরজাটা। পথটা চার্চ ভবনের বাইরে একটা প্রাঙ্গনের দিকে নির্দেশ করছে। জলপাই গাছ আর গোলাপ ঝাড়ে ভর্তি সবুজ জায়গাটাকে দ্বি-খণ্ডিত করেছে পাথুরে একটা ট্রেইল। গাছের ফাঁকে কয়েকটা মার্বেল পাথরের তৈরি মূর্তিও দেখা যাচ্ছে।

'এই পথে গেলে...' বলতে শুরু করল নান, '...তিনমুখী একটা বাঁক পাবেন। একদিকের পথ ধরে তো আপনারাই যাচ্ছেন। সামনের বাম দিকটা ঢালু। সেইন্ট বেনেডিক্টের গুহায় ঢোকার মুখ ওটা। আর ডানদিকে গেলে পাবেন স্কালা সান্টা অর্থাৎ 'পবিত্র ধাপ'। মার্বেল পাথরের সিঁড়িগুলো আপনাদের সেইন্ট ইউস্টাসের চ্যাপেলে পৌঁছে দেবে।'

সবার আগে গ্রে এগিয়ে গেল। 'ধন্যবাদ, সিস্টার।'

তবে রোল্যান্ড পা চালানো শুরু করতেই ক্লারা হাত ধরে ওকে থামাল। 'বলা হয়ে থাকে, ওই চ্যাপেলে ফাদার কার্কার শুধুমাত্র একজন সঙ্গী ছাড়া আর কাউকে ঢুকতে দিতেন না। তার নাম হলো বিশপ নিকোলাস স্টেনো। আমাদের নথি অনুযায়ী, বিশপ আর রেভারেন্ড ফাদার দিনের অধিকাংশ সময় ওখানেই কাটাতেন। আর নিকোলাস স্টেনোই সেই ব্যক্তি, যে মৃত্যুর পর ফাদারের হৃৎপিণ্ড নিয়ে স্যাংচুয়ারি অফ মেন্টোরেলায় সমাহিত করেছিলেন।'

'কথাগুলো আমাদের কাজে আসবে,' রোল্যান্ড বলল। 'অনেক ধন্যবাদ।'

মুচকি হেসে মাথা নাড়ল নান, তারপর ফের ঢুকে গেল চার্চে।

গ্রে আর রোল্যান্ডের পাশে গিয়ে দাঁড়াল লিনা। 'এতে কী প্রমাণিত হয়?'

মাথা নাড়ল তরুণ যাজক। 'সম্ভবত কিছুই না। তবে ফাদার কার্কারের ব্যাপারে পড়াশোনা করার সময় আমি নিকোলাস স্টেনোর নাম পেয়েছি। ডেনিশ লোকটা বয়সে ফাদারের চাইতে বেশ তরুণ হলেও, একই ধরনের কাজের প্রতি উৎসাহ থাকায় বন্ধুতে পরিণত হন দু'জন। আগ্রহ জাগানিয়া ব্যাপার হচ্ছে, স্টেনো তৎকালীন সময়ে যে ধারা অনুযায়ী কাজ করতেন আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় তাকে বলা হয় জীবাশ্মবিদ্যা। পুরনো হাড়, ফসিল, দেহাবশেষ ইত্যাদি।'

'আপনার কী ধারণা- ফাদার কার্কার ইভের দেহাবশেষ সরিয়ে আনা এবং সংরক্ষণের কাজে এই লোকটাকে সামিল করেছিলেন?'

সরাসরি উত্তর দিল না রোল্যান্ড। 'সিস্টার ক্লারার কথা সত্যি হয়ে থাকলে, চ্যাপেলে গোপন কিছু একটা নিয়ে কাজ করছিলেন দুই বন্ধু।'

হাঁটতে হাঁটতে ততক্ষণে তেমাথায় পৌঁছে গেছে ওরা। বামদিকের পথের দিকে ইঙ্গিত করল গ্রে। 'এটাই সেই বিখ্যাত গুহা, যেখানে সেইন্ট বেনেডিক্ট ঈশ্বরের সাধনা করতেন।' তবে তার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেছে প্রবেশমুখের কাচ ঘেরা অংশে।

প্রচুর পরিমাণে মানুষের খুলি আর হাড়গোড় সংরক্ষিত আছে ওখানে। 'এসব আবার কী!'

'স্মারক,' ব্যাখ্যা করল রোল্যান্ড। 'আসার পথে গাইড বুকে পড়লাম- চার্চের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা সেবক-সেবিকাদের দেহাবশেষ রাখা আছে গুহামুখে। কাঁচের উপর থাকা মার্বেলের স্তম্ভে লেখা- মনে রেখঃ তুমি আজ যা, আমরাও এককালে তাই ছিলাম। আর আমরা আজ যা, তুমিও একদিন তা হবে।'

'কথা সত্যি,' ঘুরে দাঁড়াল গ্রে। 'তবে মনে করানোর প্রক্রিয়াটা একটু অদ্ভুত আর কী!'

'প্রার্থনা করুন, আমরা যেন খুব তাড়াতাড়ি এসবে পরিণত না হই।' লিনা বলল।

মৃদু হাসল রোল্যান্ড। 'তা-ও সত্যি।'

ততক্ষণে স্কালা সান্টা নামে পরিচিত সিঁড়িটার ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করেছে সিগমা কমান্ডার। সাদা পাথরে তৈরি ধাপগুলো বহু পায়ের চাপে পড়ে মসৃণ হয়ে গেছে। বামদিকে নিচু একটা দেয়াল, যাতে পা হড়কে আরোহীরা পাহাড়ের তলায় পিছলে না পড়ে।

শিউরে উঠল রোল্যান্ড। 'বেশ বুঝতে পারছি, উপরে পৌঁছাতে হলে অভিযাত্রীদের মনে ভক্তির পাশাপাশি সাহসও থাকা চাই।'

ছাদওয়ালা চেম্বারটা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের একেবারে মাথায়। চারদিকের দেয়ালে চারটা জানালা। চ্যাপেলের মুখে পৌঁছে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল তরুণ যাজক।

এবার আসল কাজ।

দেখা যাক, রেভারেন্ড ফাদার এত গোপনীয়তার সাথে কী করছিলেন এখানে...

সকাল ১১:৪৮

লিনাকে একটু হতাশ দেখাচ্ছে। এতখানি সিঁড়ি বাওয়ার পর এখানে জমকালো কিছু একটা দেখবে বলে কল্পনা করেছিল মেয়েটা। স্পার্টান ধাঁচে সজ্জিত চ্যাপেলটা তার মন ভরাতে পারেনি। চেম্বারটা দুটো গাড়ি রাখার গ্যারেজের চাইতে আকারে অল্প একটু বড় হবে। সাজসজ্জা বলতে শুধু একপাশে মার্বেল পাথরের তৈরি বেদি। উপরে পুরনো মোমদানি।

মাথা উঁচু করে ছাদের দিকে তাকাল রোল্যান্ড। 'গুহায় দেখা চ্যাপেলের মতোই, একই ধাঁচের কাজ।'

তরুণ যাজক ঠিকই বলছে। লিনার চোখেও ধরা পড়েছে ব্যাপারটা। গুহা চ্যাপেলটা বানানো হয়েছিল দেহাবশেষ দুটোকে সংরক্ষণ করার জন্য। এখানে একই রকম ইঁটের কাজ... কোনও গুপ্ত রহস্য না থেকেই পারে না।

আশেপাশে খুঁজতে লাগল রোল্যান্ড। 'সিস্টার ক্লারা বলেছিলেন, এখানে কোথা হায়ারোগ্লিফ আছে।'

দেয়ালে হাত বুলিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল গ্রে। 'সবগুলো ইটেই নানান কি খোদাই করা। প্রতিটা দেয়ালই এমন। উপরের অংশে ল্যাটিন, নিচের দিকে গ্রিক।'

লিনা এগিয়ে আসতে আসতে ততক্ষণে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে সিগম কমান্ডার। 'পরবর্তী স্তরে চাইনিজ, আর সবার নিচের লেখাগুলো মিশরীয়।'

সামনে বাড়ল রোল্যান্ড। 'এগুলো লিখতে অনেক সময় লাগার কথা।'

অবাক দৃষ্টিতে মেঝের উপর তিন সারিতে খোদাই করা হায়ারোগ্লিফগুলো দেখে লিনা।
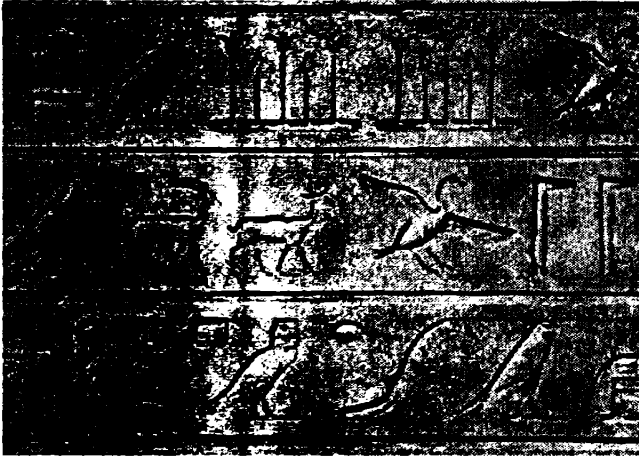
হাঁটু গেড়ে তার পাশে বসে পড়ল তরুণ যাজক। 'ফাদার কার্কারের কাজগুলো মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, তিন খন্ডে লেখা বই 'ওডিপাস ইজিপ্টিয়াকাস'। প্রাচী মিশরকে প্রাধান্য দিলেও, গ্রিক মিথলজি, পিথাগোরাসের গণিত, আর জ্যোতির্বিদ্যা, খৃস্টীয় জ্ঞান এমনকি অ্যালকেমির মতো বিষয়ও সংযুক্ত করে বইটাকে জ্ঞানের এক অত্যাশ্চর্য আধার হিসেবে গড়ে তোলেন তিনি।'

লিনা মাথা নেড়ে সায় দিলেও কথাটায় কান দেয়নি গ্রে। তার নজর এখনও ওই হায়ারোগ্লিফের দিকে। 'এগুলো অনুবাদ করতে পারবেন আপনি?'

ভ্রু কুঁচকালো রোল্যান্ড। 'অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে সব। ফাদার কার্কারের মনে করতেন, তিনি হায়ারোগ্লিফ অনুবাদের সহজ এক পন্থা আবিষ্কার করে ফেলেছেন তবে পরবর্তীতে দেখা যায়, তার ধারণা ভুল।'

'তাহলে এসব থেকে কী পাব আমরা?' জানতে চাইল লিনা।

উত্তর দিল না কেউ। রোল্যান্ডের কাছেও এই প্রশ্নের জবাব নেই।

নীরবে কাটল কয়েকটা মুহূর্ত। পরাজয় মেনে নেয়ার কথা ভাবছে প্রজননবিদ আর তরুণ যাজক, এমন সময় মুখ খুলল গ্রে। 'ওদিকে দেখুন,' বলে দেয়ালের আরেকটা অংশের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'মাঝামাঝি সারিতে, একজোড়া হরিণ... ডানপাশের পশুটার শিং দুটো লক্ষ্য করুন।'
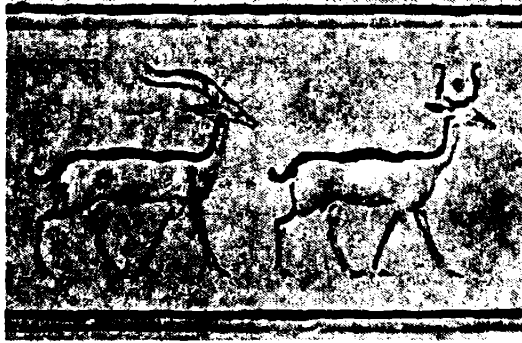
ছবিটার মাথার উপর আঙুল দিয়ে ঘষা দিতেই, দুই শিং-এর মাঝে ছোট্ট একটা ছিদ্র আবিষ্কৃত হলো। 'এটা তো একেবারে সেইন্ট ইউস্টাসের সেই চিহ্নটার মতো। তবে ক্রসের বদলে শুধু একটা ফুটো।'

মাথা নাড়ল লিনা। 'কার্কারের জার্নালে পাওয়া অবিকল সেই আকৃতিটা। কিন্তু এটা দিয়ে ঠিক কী বোঝানো হচ্ছে?'

মেয়েটার দিকে হাত বাড়াল গ্রে। 'আপনার ওই গুহায় পাওয়া চাবিটা দেখি।'

পকেট থেকে বের করে জিনিসটা এগিয়ে দিল প্রজননবিদ।

চাবিটার অগ্রভাগের সাথে ফুটোটার ব্যাস মিলিয়ে দেখল সিগমা কমান্ডার। প্রায় একই মাপের।

তবে রোল্যান্ডকে কিছুটা দ্বিধাজড়িত দেখাচ্ছে। 'এটাই কী সেই কাঙ্ক্ষিত তালা?'

উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে একটা কলম বের করল গ্রে। সুচালো মাথা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করে আনল ফুটোর ভেতরে জমে থাকা ময়লা। তারপর দুই আঙুলের ফাঁকে নিয়ে পরখ করে দেখল গুঁড়াগুলো। 'বালু... সেই সাথে তেল জাতীয় কিছু একটার মিশ্রণ।'

উৎকণ্ঠা দানা বাঁধছে সবার মনে। পরিষ্কার করা ফুটোতে চাবির মাথা ঢুকিয়ে ঠেলা দিল গ্রে। পাথরে ঘষা খাওয়ার কর্কশ আওয়াজ করে খাঁজ পর্যন্ত ঢুকে গেল জিনিসটা। আটকে গেছে আবার।

এবার পকেট থেকে একটা ছুরি বের করল সিগমা কমাণ্ডার। ভালো করে পরিস্কার করে ফেলল প্রাচীন ফুটোটা। এবার চাবি ঢুকিয়ে একটু চাপ দিতেই সড়সড় করে ঢুকে গেল পুরোটা, শুধু গোড়ার খুলিযুক্ত অংশটা বাকি। তারপরও কথা থেকে যায়। এত বছর পর তালাটা ঠিকমত কাজ করবে তো?

'মোচড় দিন,' রোল্যান্ডের চোখের তারায় আশার ঝলক। 'বইপত্র লেখার পাশাপাশি রেভারেন্ড ফাদার স্থাপত্যবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। চুম্বকীয় ঘড়ি থেকে শুরু করে রোমের মিউজিয়ামের জন্য এমন সব মূর্তি তিনি বানিয়েছিলেন, যেগুলো অন্য ঘরে থাকা কোনও মানুষের কথা প্রতিধ্বনিত করতে পারত।'

আশ্বস্ত হয়ে শক্ত হাতে চাবিটা ধরে মোচড় দিল গ্রে। 'চিচিং ফাঁক...'

নিঃশ্বাস আটকে এসেছে সবার। মনে জমাট উৎকণ্ঠা।

এক সেকেন্ড পর দেয়াল থেকে ধাতব ক্ল্যাং-জাতীয় আওয়াজ ভেসে এল। অবাক চোখে সবাই লক্ষ্য করল- লুকানো কজায় ভর করে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে বেদির একটা মার্বেল স্ল্যাব। একটা সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে ওখানে। আলোড়ন উঠছে শতাব্দী পুরনো ধুলায়।

এগিয়ে গিয়ে সদ্য আবিষ্কৃত ফোকড়টার সামনে দাঁড়াল রোল্যান্ড। লিনাকে একটু ভীত দেখাচ্ছে। ফুটো থেকে চাবি খুলে নিয়ে গ্রে-ও তাদের সাথে যোগ দিল। বেদি থেকে শুরু হয়ে ঢালু পথে নিচে নেমেছে পাথুরে সিঁড়ি।

'ঠিক যেন বাইরে দেখা পবিত্র সিঁড়িটার অন্ধকার সংস্করণ,' বিড়বিড় করল তরুণ যাজক।

লিনার তাই ধারণাও।

তবে আসল প্রশ্ন হচ্ছে, এটা শেষ হয়েছে কোন চুলোয়?

দুপুর ১২:১৮

নীল আকাশের একেবারে মাঝখানে এসে ঝুলছে গনগনে সূর্য। চার্চের দেয়ালের ছায়ায় দাঁড়িয়ে একটা বাজপাখিকে পাহাড়ের উপর চক্কর কাটতে দেখছে শেইচান। বাতাসে ভাসছে চত্বরে ফুটে থাকা গোলাপের সুবাস। ভেতরে নানের সাথে গ্রে-দের কথা বলতে শুনেছে সাবেক আততায়ী। ভাবছে সেবিকাদের দিন এখানে কীভাবে কাটে...

শেইচানের অতীত জীবন কেটেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। অভাব-অনটন আর সংগ্রামে ভরা সময়টুকুর কথা মনে পড়তে নিজের অজান্তেই শিউরে ওঠে গা। তারপর সেখান থেকে তুলে এনে নৃশংস খুনি হিসেবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, ফলে হারিয়ে যায় বুকের ভেতর অবশিষ্ট থাকা মনুষ্যত্বটুকুও।

চার্চ পেরিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা চ্যাপেলটার দিকে তাকাল শেইচান। কিছুক্ষণ আগে গ্রে-কে ওখানকার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে দেখেছে সে। ভালবাসার মানুষটার প্রতি তার কোনও অভিযোগ নেই, নেই নিজের মনের উপর সন্দেহও। কিন্তু তবুও সবসময় তাকে হারানোর শঙ্কা যেন পাহাড়সম বোঝার মতো চেপে থাকে। মনে হয়, এই ভালবাসা পাবার কিংবা নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কাটানোর যোগ্য সে নয়।

পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে আসা মধ্যবয়স্ক এক দম্পতি শেইচানের নজর কেড়ে নিল। বয়স একটু বেশি হলেও যেন তারুণ্যের দীপ্তি তাদের প্রতি পদে পদে। মহিলাটা কিছু একটা বলতেই হেসে উঠল তার স্বামী। চমৎকারভাবে একে অন্যের গা ঘেঁষে হাটছে দু'জন।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মেয়েটার মুখ দিয়ে। পরিবার, প্রিয়জন, ভালবাসা... যত যাই থাকুক না কেন, মৃত্যুই হলো জীবনের শান্তির একমাত্র উৎস।

ইঞ্জিনের আওয়াজে সম্বিত ফিরল শেইচানের। ঢাল পেরিয়ে একটা টুরিস্ট বাস এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল, উজ্জ্বল লালচে রঙের বাহনটার দুই পাশে চাইনিজ ড্রাগনের প্রতীক ছাপা।

গোটা ইউরোপে এরকম বাস হামেশাই চোখে পড়ে। কিন্তু শেইচানের মনে কু-ডাক ডাকতে শুরু করেছে। আগেই জানে, কোয়ালস্কি আর লিনার জমজ বোনকে অপহরণ এবং অগুলিনের হোটেলে হামলার পেছনে একটা চাইনিজ দল দায়ী। সাবধানের মার নেই। বাসটা পার্কিং লটে এসে থামতে থামতে একটা দেয়ালের আড়ালে চলে গেল সাবেক আততায়ী। সতর্ক নজর রাখতে লাগল নবাগত অতিথিদের দিকে।

বাসটার দরজা খুলে যেতেই একে একে নেমে আসতে শুরু করল লোকজন। গাইডকে সহজেই চেনা যাচ্ছে। মহিলার পরনে তাদের বাহনের মতোই উজ্জ্বল লাল রঙের জ্যাকেট, হাতের ছাতার রঙও এক। মান্ডারিন ভাষায় সবাইকে জায়গাটা সম্পর্কে কিছু কথা বলার পর এগোতে শুরু করল চার্চের দিকে।

ভালো করে লোকগুলোকে দেখছে শেইচান। সবাই চাইনিজ, তরুণ বয়সী থেকে শুরু করে পিঠ কুঁজো বৃদ্ধও আছে। আপাদমস্তক সাধারণ। তারপরও প্রতিটা জোড়াকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সাবেক আততায়ী।

অবশেষে একে একে ছয়জন লোক তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হলো। প্রত্যেকের বয়স বিশ থেকে ত্রিশের ভেতর। সবাই একসাথে হাঁটছে না যদিও... কিন্তু যে দৃষ্টিতে চ্যাপেলের দিকে তাকাচ্ছে, তাকে আর যাই হোক স্বাভাবিক বলা যায় না। একজন আবার পার্কিং লটে তাদের মার্সিডিজ এসইউভি গাড়িটা দেখে এক পলকের জন্য থমকেও গেল। লোকটা ঘুরে দাঁড়াতেই শেইচান বুঝতে পারল, তার জ্যাকেটের নিচে লম্বা আকৃতির কিছু একটা আছে।

জিনিসটা হাল আমলের লম্বা লেন্সওয়ালা ক্যামেরা হতে পারে। কিন্তু সাবেক আততায়ীর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কখনও ভুয়া সংকেত দেয় না। পিছিয়ে এসে বুদ্ধির খোঁজে মাথার ভেতর হাতড়াতে শুরু করল সে, কী করবে সেটা ধরতে না পারলেও একটা কথা বুঝতে ভুল হয়নি।

এই পাহাড় থেকে শান্তি আপাতত বিদায় নিয়েছে।

দুপুর ১২:৩২

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে সবাই। জায়গাটা এতই সরু যে, একজনের পিছু পিছু আরেকজনকে এগোতে হচ্ছে। পেনলাইট হাতে আগে আগে চলেছে গ্রে, মাঝখানে রোল্যান্ড, ফোন-স্ক্রিনের আলো হাতে সবার পেছনে লিনা। চ্যাপেল থেকে নিচের দিকের বাতাস বেশ ঠান্ডা, সেই সাথে শুষ্কও।

ঠিক যেন কোনও মিশরীয় সমাধি।

একপাশের দেয়ালে হাত রাখল তরুণ যাজক। 'মনে হচ্ছে, টানেলটা আমাদের বেনেডিক্টের গুহার মতো একটা গুহায় নিয়ে যাবে।'

আরও কয়েক পা এগোনোর পর ধারণাটা সত্যি বলে প্রমাণিত হলো। একটা গুহায় গিয়ে থেমেছে গ্রে-র পেনলাইটের আলো। আকারে খুব একটা বড় নয়, বড়জোর পাঁচ গজ হবে। সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে নেমে দাঁড়াতেই যেন নুড়ি পাথরের স্তরে ডুবে গেল তার পা দুটো। পেছন পেছন নেমে এল বাকি দু'জন। পাথরের স্তরে তিনজোড়া পায়ের কচকচ আওয়াজ, গুহার নীরবতার কারণে কয়েকগুণ বেড়ে গিয়ে কানে ধরা দিচ্ছে।

হাতের সেলফোনটা উঁচুতে তুলে ধরল লিনা, বিস্মিত হয়েছে।

কিছু একটা দেখতে পেয়ে সাথে সাথে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রোল্যান্ড। নড়াচড়া লক্ষ্য করে বাকি দু'জন সাথে সাথে ঘুরে তাকাল তার দিকে।

গুহাটার একেবারে মাঝে, পাথর কুঁদে একটা সিংহাসনের আদল দেয়া হয়েছে। তাতে উপবিষ্ট কুমারী মাতা মেরির ব্রোঞ্জের একটা মুর্তি। চার্চের মুর্তিটার অবিকল প্রতিরূপ যেন। মাথায় মুকুট, কোলে শিশু যীশু।

'অসাধারণ!' রোল্যান্ড বিড়বিড় করে বলল।

'কিন্তু আমরা তো আর এটা খুঁজতে আসিনি,' লিনার গলায় হতাশা। 'খুব সম্ভবত এটা ফাদার কার্কারের ধ্যানে বসার স্থান। এখানেই হয়তো মাতা মেরির কাছে প্রার্থনা করতেন তিনি।'

'তারপরও...' জোর দিল রোল্যান্ড। 'শতাব্দী ধরে লুকিয়ে রাখা এমন একটা পবিত্র স্থান আবিষ্কার!'

এগিয়ে এসে মূর্তিটার উপর আলো ফেলল গ্রে। 'আমাদের উত্তর চাই। কেন ফাদার কার্কার এটা এখানে এনে রাখলেন?'

সিস্টার ক্লারার বলা কথাটা মনে করতে পারছে সিগমা কমান্ডার। কার্কার চাইতেন, মাতা মেরির কৃপা-দৃষ্টি যেন সবসময় তার অন্তরের উপর বর্ষিত হয়। অবশ্যই মূর্তিটা এখানে রাখার পেছনে গুপ্ত কোনও রহস্য আছে।

নিচু হয়ে মেঝেতে থাকা নুড়ি পাথরের মতো দেখতে গুঁড়োগুলো আঙুলের ফাঁকে তুলে নিল গ্রে। জিনিসগুলো আদতে নির্মাণকাজের ফলে চূর্ণ হওয়া পাথরের টুকরো কিংবা নুড়ি নয়। কিছু একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলো রাখা হয়েছে এখানে। 'উপরের চাবির ফুটোতেও এরকম গুঁড়োই পেয়েছিলাম আমি। নুড়ি না, এক ধরনের বালুকণা।'

রোল্যান্ডও নিচু হয়ে পরীক্ষা করল জিনিসগুলো। 'সিলিকা।'

'মানে?' জানতে চাইল লিনা।

'সিলিকন-ডাই-অক্সাইডের একটা রূপ। ওই যে...ট্যাবলেটের বোতলের ভেতর ছোট ছোট প্যাকেট করা থাকে না? বড়িগুলোকে শুষ্ক রাখে।'

এজন্যই এখানকার বাতাস এত শুকনো বলে মনে হচ্ছিল!

'জিনিসটা ফাদার কার্কারের সময়কার একটা বৈজ্ঞানিক বিস্ময় ছিল,' বলে চলেছে রোল্যান্ড। 'এর প্রকৃতি এবং শুষ্ককরণ ক্ষমতা নিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা বর্ণনা করেছেন তিনি। নিজের কিছু যন্ত্রপাতি শুকনো রাখতেও এগুলো ব্যবহার করেন।'

সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করল লিনা। 'উপরের তালাটার মতো।'

মাথা নেড়ে সায় দিল তরুণ যাজক।

'আরেকটা কথা,' গ্রে বলল। 'ফাদার নোভাক, আপনি তো বলেছিলেন- রোম মিউজিয়ামে ফাদার কার্কারের বেশ কিছু মূর্তি আছে, যেগুলো কথা প্রতিধ্বনিত করা এবং অঙ্গ নড়াচড়া করানোর মতো মেকানিজম সম্বলিত।'

আমেরিকান যুবকের কথার অর্থ ধরতে পেরে বড় বড় হয়ে গেল রোল্যান্ডের চোখ দুটো। 'আপনি ভাবছেন...' কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই মাতা মেরির মূর্তির দিকে তাকাল সে। 'এ তো অসম্ভব!'

এগিয়ে গিয়ে ভালো করে মুর্তিটা পরীক্ষা করতে শুরু করল গ্রে। অবশেষে মুকুটের উপর পাওয়া গেল সেই কাঙ্ক্ষিত বস্তু- ক্রস আকৃতির একটা ছিদ্র।

আঁতকে উঠে বুকে ক্রস আঁকল রোল্যান্ড। লিনা এতটাই হতভম্ব হয়ে পড়েছে যে, নড়াচড়াই করতে পারছে না। বিহ্বল ভাবে তাকিয়ে আছে শুধু।

চাবিটা বের করে এগিয়ে গেল গ্রে, ছিদ্রটার নাগাল পাবার জন্য মুর্তিটার কোলে দাঁড়াতে হলো ওকে।

'সাবধানে,' সতর্ক করল রোল্যান্ড।

চাবিটা ছিদ্রে ঢুকিয়ে মোচড় দিল সিগমা কমান্ডার। তবে নড়ল না একচুলও। 'মনে হয় ভেতরে কিছু একটা আটকে আছে।'

'আবার চেষ্টা করুন।'

আস্তে আস্তে জোর বাড়াল গ্রে। এবার কাজ হচ্ছে, ঘুরতে শুরু করেছে চাবির মাথা। এক মুহূর্ত পর ঘন্টার মতো ঢং করে বেজে উঠল ব্রোঞ্জের মূর্তি। আঁতকে উঠে পিছিয়ে এল গ্রে, তবে সেই সাথে চাবিটা ঝাঁকি মেরে খুলে আনতে ভোলেনি।

'দেখুন!' সিগমা কমান্ডারের হাত আঁকড়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠল রোল্যান্ড। যতটা না তাকে সুস্থির করার জন্য, তার চাইতে বেশি বিস্ময়ে।

সড়সড় আওয়াজে মাঝখান থেকে দ্বি-খন্ডিত হতে শুরু করেছে ব্রোঞ্জের মাতা মেরি, একেবারে মুকুট থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত। শ্বাসরুদ্ধকর কয়েক সেকেন্ড পর পুরোপুরি খুলে গেল। ঠিক যেন একটা ধাতব কফিন।

ফাঁপা কাঠামোটার ভেতর একটা কঙ্কাল রাখা। হাড়গুলো ব্রোঞ্জের খাঁজে খাঁজে একেবারে মাতা মেরির আদলেই বসানো। চোখের শূন্য কোটর দুটো হাঁ করে ঠিক ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে। পুরু ভ্রু প্রমাণ করছে, আধুনিক মানুষ থেকে খুলিটার গড়ন আলাদা।

'আমরা...' বিস্ময়ে খাবি খাচ্ছে লিনা। 'আমরা ইভকে খুঁজে পেয়েছি! '

'শুধু তাই না,' যোগ করল রোল্যান্ড। 'কোলের উপরে দেখুন।'

ব্রোঞ্জের মুর্তিটার কোলে শিশু যীশুর প্রতিকৃতি ছিল। কঙ্কালটার হাতে তার বদলে হাড়ের তৈরি লম্বা একটা দন্ড। কিন্তু তরুণ যাজক এদিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। কাঠামোটার হাঁটুর কাছে পাথরের একটা বল। জিনিসটা আকারে একটা বড়সড় বাতাবি লেবুর মতো।

গ্রে আলো ফেলতেই গোল তলের উপর আঁকিবুঁকির চিহ্ন দেখা গেল।

'এটা তো চাঁদের রেপ্লিকা বলে মনে হচ্ছে,' রোল্যান্ড মন্তব্য করল।

লিনার কণ্ঠে অবিশ্বাস। 'এটা কীভাবে সম্ভব!'

গ্রে মেয়েটার এই বিস্ময়ের কারণ ধরতে পারছে না। রোল্যান্ড আগেই তাদেরকে চান্দ্রমাসের বিভিন্ন অবস্থার ছবি দেখিয়েছে। তাহলে চাঁদের প্রতিকৃতি দেখে এত অবাক হওয়ার কী আছে!

'কী হলো?'

বলটার নিচের দিকে ইঙ্গিত করল লিনা। 'এদিকে দেখুন, ক্যালসাইটের ঘোলাটে স্তর আটকে আছে।'

এবারও কিছুই বুঝতে পারল না সিগমা কমাণ্ডার।

'এটা ফাদার কার্কারের কাজ না,' ব্যাখ্যা করল রোল্যান্ড। 'আপনাকে তো বলেছিলাম, ক্রোয়েশিয়ার গুহাতে এরকম অনেক পাথরের মুর্তি দেখেছিলাম আমরা, ক্যালসাইটের স্তরে সংরক্ষণ করে রাখা। এটাও সেগুলোর মধ্যে একটা।'

'তার মানে, এই চাঁদের প্রতিকৃতিটার বয়স দশ হাজারের বছরেরও বেশি।' যোগ করল লিনা।

এবার বুঝতে পেরেছে গ্রে। বিস্ময়ে কুঁচকে এল তার ভ্রু-জোড়া।

এ তো অসম্ভব!

পিছিয়ে এল রোল্যান্ড। 'প্রাচীন জ্ঞানের এই হদিস পেয়েই চাঁদের ব্যাপারে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন রেভারেন্ড ফাদার।'

'এজন্যই গুহাটা বন্ধ করে দেন তিনি,' লিনা বলল। 'তারপর সতর্কবার্তা লিখে আটকে দেন ওখানে।'

'আর এখানকার গুহাটাও বন্ধ করে দেন নিজের উদ্ভাবিত তালার সাহায্যে।'

হাত ধরে তরুণ যাজকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল প্রজনবিদ। 'একজন সত্যিকারের বিজ্ঞানীর মতোই কাজ করেছিলেন ফাদার। খ্যাতির মোহে আকৃষ্ট হয়ে প্রচার করেননি নিজের আবিষ্কারবার্তা। লুকিয়ে রেখেছিলেন সঠিক সময়ের অপেক্ষায়।'

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রোল্যান্ডের মুখ দিয়ে। 'নিজের বিশ্বস্ত সঙ্গীকে সাথে নিয়ে এই প্রাচীন রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যই কাজ করতেন তিনি। কোনও সমাধান না পাওয়ায় আর ব্যাপারটা জানাজানি হতে দেননি।'

মুগ্ধ চোখে মুর্তিটার কলকব্জা লক্ষ্য করছিল গ্রে, যাজকের কথাটার সাথে একমত না হয়ে পারল না।

কঙ্কালের হাতে থাকা দন্ডটার দিকে ইঙ্গিত করল লিনা। 'এটা খুব সম্ভবত ম্যামথের হাড় দিয়ে তৈরি, দাঁতও হতে পারে।'

'কিন্তু এটা দিয়ে কী বোঝাচ্ছে?'

'জানি না। হয়ত শুধুই অবলম্বনের একটা লাঠি। কঙ্কালের গড়ন দেখে বোঝা যাচ্ছে, মৃত্যুর সময় বেশ বয়স্ক ছিলেন উনি।'

সামনে ঝুঁকে লাঠিটার দিকে নজর দিল গ্রে। বুড়ো মানুষের ব্যবহৃত সাধারণ একটা লাঠিকে এভাবে এখানে স্থান দেয়ার কথা না। জিনিসটার জায়গায় জায়গায় আবার খাঁজ কাটা দেখা যাচ্ছে, ঠিক কোনও মাপকাঠির মতো।

লিনাও ঝুঁকে এল। 'দেখুন, হাতের একটা আঙুল ভাঙা। গুহায় দেখা সেই ছাপগুলোর মতো।'

'হ্যাঁ,' মাথা নেড়ে সায় দিল রোল্যান্ড। 'চ্যাপেলেও ওরকম ছাপ দেখা গিয়েছে। অর্থাৎ সব জায়গায় এই একই মহিলার অস্তিত্ব ছিল। সম্ভবত গুহায় আঁকা ছবিগুলো এবং চাঁদের প্রতিকৃতি তারই আঁকা।'

ভালোভাবে আলো ফেলতেই আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করল গ্রে। জিনিসটা বাকি দু'জনের চোখ এড়িয়ে গেছে। ব্রোঞ্জের মুর্তির ভেতরের একদিকে একটা মানচিত্র খোদাই করা। একটা দ্বীপের আকৃতি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আরেকদিকের ধাতব কুলুঙ্গিতে চামড়ায় মোড়া একটা বই, প্রচ্ছদে গোলধাঁধার ছবি।

ততক্ষণে তরুণ যাজকও ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। বইটা আনার জন্য হাত বাড়িয়েই আঁতকে উঠল সে। 'এটা তো ফাদার কার্কারের সেই জার্নালের একটা কপি!'

বইটা তুলে আনবে কি না সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই বেজে উঠল গ্রে-র ফোন। কলটা রিসিভ করে কানে ঠেকাতেই ওপ্রান্ত থেকে শেইচানের আতঙ্কিত কণ্ঠ ভেসে এল।

'কতক্ষণ ধরে তোমাকে কল করছি, গ্রে... ... ... আক্রমণ!'

অধ্যায় তেরো
৩০ এপ্রিল, বিকেল ৫:০৪
বেইজিং, চীন

কিম্বারলিকে সাথে নিয়ে বেইজিং জু-র গাছপালায় ছাওয়া পথ ধরে এগোচ্ছে মঙ্ক। হাতে হাত ধরা দু'জনের, সুখী দম্পতি যেন। 'মানচিত্র অনুযায়ী, গরিলাদের থাকার জায়গাটা এদিকেই কোথাও।' বলে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকাল সিগমা এজেন্ট।

ড্রাগনের প্রতিকৃতি সম্বলিত গেট হয়ে পার্কে ঢোকার পর পনেরো মিনিট পেরিয়ে গিয়েছে। তবে বাইরের জাঁকজমকের সাথে ভেতরের পরিবেশের আকাশ-পাতাল তফাৎ।

অধিকাংশ দর্শনার্থীরা এখানে আসে শুধুমাত্র বিখ্যাত পান্ডা হাউজটা দেখতে। জায়গাটা মেইন গেটের একেবারে কাছে। আক্ষরিক অর্থেই রাজকীয় হালে রাখা হয়েছে প্রানিগুলোকে। তবে সেদিকে ধাবমান মানুষের স্রোত উপেক্ষা করে ভেতরের দিকে ঢুকতেই স্পষ্ট হয় পার্কের আসল ছবি।

সোনালি পশমওয়ালা বানরের একটা খাঁচা পাশ কাটাল ওরা। কাঁচগুলো যেমন পুরনো, প্রানিগুলোর থাকার জায়গাটাও তেমনি নোংরা। মাস-দু'মাসে একবার পরিস্কার করা হয় কি না, ঘোর সন্দেহ। সেই সাথে মরার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে যোগ হয়েছে দর্শনার্থীদের আগ্রাসী আচরণ। জন্তুগুলোকে ভয় দেখানোর জন্য রেলিং পেরিয়ে অনবরত ময়লা আবর্জনা ছুঁড়ছে সবাই।

অবশ্য তাদেরকেই দোষ দিয়ে লাভ কি! খাঁচাগুলো দেখাশোনার জন্য কোনও কর্মচারী তো দুরের কথা, কাছেপিঠে একটা কাকপক্ষী পর্যন্ত নেই। সেই সুযোগে অবলা প্রানিগুলোকে জ্বালিয়ে আমোদিত হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেনি সৃষ্টির সেরা জীব।

সামনে মঙ্গোলিয়ান ভালুকের একটা খাঁচা। মেঝেতে যত না বেশি জন্তুটার প্রস্রাব-পায়খানা, তার চাইতে বেশি দর্শনার্থীদের ছুঁড়ে দেয়া প্লাস্টিকের কাপ, ক্যান্ডির মোড়ক, ন্যাপকিন, বোতল ইত্যাদি।

এসব দেখে ক্রমাগত মঙ্কের শরীর শক্ত হয়ে ওঠা টের পাচ্ছে কিম্বারলি। 'ব্যাপারটা আসলেই বিরক্তিকর। উপযুক্ত দেখভালের অভাব, মানুষজনের আগ্রাসী ভাব...সব মিলিয়ে বেশ খারাপ হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি।'

'খারাপ?' রাগী কণ্ঠে বলে উঠল মঙ্ক। 'কিছু মনে কোরো না, জায়গাটাবে নরকের চাইতে ভালো কিছু বলে অন্তত আমার মনে হচ্ছে না।'

'এটা আসলে গোটা দেশটার অবস্থার প্রতিচ্ছবি,' সঙ্গীকে শান্ত করার প্রয়াস পেল কিম্বারলি। 'হ্যাঁ... আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে গেলে, পার্কটার অবস্থ জঘন্যই বলতে হবে। তবে আসার পথে যতটুকু পড়লাম, তাতে জানতে পেরেছি- বেইজিং ছাড়িয়ে শহরতলীতে এটাকে প্রতিস্থাপন করার কথাবার্তা চলছে। ওদিবে জমির দাম আরও সস্তা হওয়ায়, থাকার জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণ জায়গ পাবে প্রানিগুলো। পাবে উপযুক্ত পরিচর্যা।'

'তাহলে দেরি করছে কেন ওরা?' সিগমা এজেন্টের গলায় অধৈর্যের মাত্রা বিন্দুমাত্র কমেনি। 'চায়নিজ সরকার কোটি কোটি ডলার খরচ করে অলিম্পিক ভিলেজ বানাতে পারছে, প্রযুক্তির পেছনে পানির মতো টাকা ঢালছে, আর এদিকে নজর দেয়ার সময় হচ্ছে না? কিছু না হোক, অন্তত ব্যবস্থাপনার মানটুকু তো উন্নত করা দরকার।'

বলতে বলতে আরেকটা খাঁচার দিকে ইঙ্গিত করল সে। ওখানে দর্শনার্থীদের জ্বালাতন থেকে বাঁচতে, গুটিসুটি মেরে খাঁচার কোনায় আশ্রয় নিয়েছে এক শিয়াল পন্ডিত। 'এদের সমস্যাটা কী!'

'ভুলে গেলে চলবে না...' জবাব দিল কিম্বারলি। '...চায়নিজদের কাছে বন্যপ্রাণী ছিল শুধু খাবার, ওষুধপত্র আর বিনোদনের উৎস মাত্র। কিছুদিন আগেও খাঁচার বাইরে লেবেলে লেখা থাকত, কোন জন্তুর মাংস খেতে কেমন এবং সেটা দিয়ে কী কী ওষুধ বানানো সম্ভব। তার সাথে তুলনা করলে স্বীকার করতেই হবে, পরিস্থিতি পাল্টাচ্ছে।'

কথা বলতে বলতে সামনে বাড়ছে দু'জন। আর মাত্র ঘণ্টাখানেক সময় বাকি, তারপরই আজকের মতো বন্ধ হয়ে যাবে বেইজিং জু। তার আগেই যতটা সম্ভব এলাকা টহল দিতে হবে। তবে পার্কটা দুইশো একর জমির উপর নির্মিত। তাই সময়ের সদ্ব্যবহার করার জন্য এইপ অর্থাৎ বানরসদৃশ প্রানিদের থাকার জায়গাতেই প্রধানত জোর দিচ্ছে ওরা। বাকোকে এখানে আনা হলে, ওদিকেই রাখার সম্ভাবনা প্রবল।

পার্ক বন্ধ হয়ে যাবার পর বাইরে থেকে লক্ষ্য রাখতে হবে কোয়ালস্কি কিংবা মারিয়ার কোনও খবর যোগাড় করা যায় কি না। সেই সাথে সিগমা হেডকোয়ার্টারে বসে পেইন্টার ক্রো ওই জিপিএস ট্র্যাকারটার হদিস বের করার তালে আছেন।

পায়ের দিকে তাকাল মঙ্ক। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, পার্কের নিচে ভূগর্ভস্থ ফ্যাসিলিটির অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু জায়গাটার বিস্তৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই

কারও। মাটির উপর আর নিচ মিলিয়ে পুরো এলাকাটার একটা বিশদ মানচিত্র তৈরি করছে ক্যাট।

চিন্তাটা যেন পড়তে পেরে কিম্বারলি। মুখ খুলল সে, 'যে কোনও কিছুই থাকতে পারে কিন্তু ওখানে।'

'মানে?'

'বেইজিং-এর অন্যতম প্রধান পর্যটক আকর্ষণ বলা যায় ভূগর্ভস্থ এলাকাটাকে, দাম-ডিজিয়া চেং। সত্তরের দশকে বোমা হামলা থেকে বাঁচার জন্য শেল্টার হিসেবে এর উৎপত্তি। একশোরও বেশি প্রবেশপথ সমৃদ্ধ জায়গাটার বিস্তৃতি প্রায় আট বর্গমাইল। অলিগলি, দোকান, পুরনো বিল্ডিং... কোথায় নেই এতে ঢোকার পথ! ছোট একটা অংশই শুধুমাত্র জনসম্মুখে আনা হয়েছে। বাকিটুকু লুকানো আছে আঁধারে।'

হাঁ হয়ে গেছে মঙ্কের চোয়াল। তথ্যটা ওর জানা ছিল না। 'এটা কি এই পার্ক পর্যন্তও চলে আসতে পারে?'

'সম্ভবত। রাজধানীর প্রায় প্রতিটা প্রধান প্রধান স্থাপনা যেমন তিয়ানানমেন স্কয়ার, রেলওয়ে স্টেশন ইত্যাদির সাথে এলাকার সংযোগ আছে।'

হাঁটতে হাঁটতে বিশেষ একটা খাঁচার সামনে পৌঁছে গেছে ওরা। সামনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল কিম্বারলি। 'ওই যে দেখ, শিম্পাঞ্জি।'

খাঁচাটা খুব একটা বড় না, আগে দেখা বানর কিংবা শেয়ালের খাঁচাগুলোর চাইতে পরিষ্কারও না। এক কোনে দলামোচা পাকিয়ে বসে আছে একটা গরিলা। মেঝেতে মলমূত্রের প্রাচুর্য- শুকনো এবং টাটকা- দুটোই আছে। কাঁচের ওপ্রান্ত থেকে দুই দর্শনার্থীর দিকে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে প্রানিটা। হয়তো ভয় পাচ্ছে, এই বুঝি ছুঁড়ে মারবে কিছু।

আবারও পুরনো রাগ ফিরে এল মঙ্কের মনে। রাজধানীর প্রধান চিড়িয়াখানায় যদি এই অবস্থা হয়, তবে অন্যান্য শহরের ছোট ছোট চিড়িয়াখানাগুলোর কথা ভাবতেই ভয় লাগছে।

আশেপাশে চোখ বুলাচ্ছে কিম্বারলি, দেখা শেষ হতে খাদে নামিয়ে আনল গলা। নাহ, বাকোকে এদিকে আনার কোনও চিহ্ন চোখে পড়ছে না।'

মনে মনে একটু খুশিই হলো মঙ্ক। এই নরকে যেন আর কোনও প্রানিকে আনা না হয়। জুলুজুলু চোখে গরিলাটা তাকিয়ে আছে তার দিকে, মাথা নাড়ল সিগমা এজেন্ট।

দুঃখিত 'ছোট্ট বন্ধু', তোমাকে এখান থেকে বের করা আমার সাধ্যের বাইরে।

'কানাগলিতে হারিয়ে গেছি বলে মনে হচ্ছে,' নীরবতা ভাঙল কিম্বারলি।

মাথা নেড়ে সায় দিল মঙ্ক। 'চল, যাওয়া যাক।'

মেইন গেটের দিকে পিছিয়ে আসতে শুরু করল দুই তদন্তকারী। এখানকার খাঁচাগুলোর ওপ্রান্তে অবশ্য পরিবেশটা বেশ সুন্দর... উইলো গাছের সারি, বিশাল লেগুনের উপর কিচিরমিচির করে উড়ছে পাখির ঝাঁক, ছোট ছোট পুকুর।

তবে আগে দেখা নিষ্ঠুরতাকে ঢাকার জন্য এই সৌন্দর্য যথেষ্ট নয়।

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ব্যর্থ মঙ্কের মুখ দিয়ে। এখন একমাত্র আশার কথা হচ্ছে, মারিয়া আর বাকো অন্তত একা নয়।

কিছু একটা খেল দেখাও, কোয়ালস্কি...

বিকেল ৫:১৮

'এসো,' মৃদুস্বরে গর্জে উঠল কোয়ালস্কি।

মুখের সাথে সাথে ইশারায় ভাষায়ও নির্দেশটার পুনরাবৃত্তি করছে। পিঠ দিয়ে ঢেকে রেখেছে সিসি ক্যামেরা, মনিটরের সামনে কেউ আছে কি না জানা নেই। ঝুঁকি নেয়ার মানে হয় না।

দ্বিধা-বিভক্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে বাকো।

গত এক ঘন্টা যাবত প্রানিটাকে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করছে। তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আগের ইশারাটার সাথে এবার নতুন একটা ইশারা করল কোয়ালস্কি। হাতের ট্রাম্পকার্ড হিসেবে এই কথাটা বাঁচিয়ে রেখেছিল এতক্ষণ।

[মারিয়াকে আবার দেখতে চাইলে করো যা বললাম]

এবার কাজ হলো। এক হাত তুলে পাল্টা ইশারা করল গরিলাকুমারী।

[মায়ের জন্য?]

'হ্যা...এই তো,' কোয়ালস্কির গলায় উচ্ছ্বাস।

প্রানিটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আবারও ইশারাটা করল সিগমা এজেন্ট।

[এসো]

সাথে সাথে সামনে বাড়ল বাকো। এক হাত মুঠো করে সজোড়ে বসিয়ে দিল কোয়ালস্কির চোয়ালে। আঘাতের তীব্রতায় এক পা পিছিয়ে এল বিশালদেহী মানুষটা। যতটা আশা করেছিল, ধাক্কাটা তার চাইতে অনেক জোরালো। ব্যাটাকে আলাভোলা দেখালে কী হবে, গায়ে বেশ শক্তি ধরে বোঝা যাচ্ছে। নখের আঁচড়ে অল্প কেটে গেছে গাল। তারপর নিচু হয়ে হাতে সংকেত দিল প্রানিটাকে। চোখেমুখে ভয় ফুটে উঠেছে ওটার।

[আমি ঠিক আছি] [আবার]

মেইল ট্রেনের মতোই আবার ছুটে এল গরিলা। কাঁধ দিয়ে কোয়ালস্কিকে ধাক্কা মেরে চেপে ধরল গরাদের সাথে।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে আঘাতের তীব্রতা সয়ে নিল সিগমা এজেন্ট। তারপর চেঁচিয়ে উঠল গলা ফাটিয়ে। 'কে কোথায় আছ! বাঁচাও! মেরে ফেলল আমাকে...'

কয়েক সেকেন্ড পর খুলে গেল খোঁয়াড়ের একপাশের দরজা। বাকোর ঘাড়ের উপর দিয়ে কোয়ালস্কি দেখতে পেল- দুটো অবয়ব এগিয়ে আসছে। একজনের হাতে ইলেকট্রিক পড, আরেকজনের রাইফেল।

ধুশ শালা... সে আশা করেছিল, একজন আসবে। হাতে যতই রাইফেল থাকুক, একজনকে শুইয়ে ফেলা কোয়ালস্কির বাঁ হাতের খেল। কিন্তু এখানে অস্ত্রধারী দু'জন। বাঁ হাত কেন, দুই হাতেও সফলতা আসবে কি না... নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। প্ল্যান বি অনুসারে এগোতে হচ্ছে তাহলে।

গার্ডরা কাছাকাছি চলে আসার আগেই মুক্ত হাতদুটো তুলে বাকোর দিকে আবারও ইশারা করল কোয়ালস্কি।

[আরও আক্রমণাত্মক হও]

তবে বলে দেয়ার দরকার ছিল না, দুই আগন্তুককে দেখে এমনিতেই রেগে গেছে গরিলাটা। রাগে লাল বর্ণ ধারণ করেছে চোখদুটো। কোয়ালস্কিকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল বাকো, থাবা দিয়ে দমাদম হাতুড়ি পিটতে শুরু করেছে বুকে।

কাতরে উঠল কোয়ালস্কি। 'এখান থেকে বের করুন আমাকে...মরেই যাব নইলে।'

ইলেকট্রিক পড হাতে থাকা গার্ড একটা চাবির গোছা বের করল। অস্ত্রটা বাকো দিকে তাক করে রেখে, দরজা খুলে বের করে আনল কোয়ালস্কিকে। সতর্ক ভঙ্গিতে দুরে দাঁড়িয়ে আছে আরেক গার্ড, হাতের রাইফেল সোজা তার দিকে তাক করা।

কাতরানোর ফাঁকে বাকোর দিকে এক হাতে ইশারা করল সিগমা এজেন্ট।

[পিছু হটো]

অনিশ্চিত দেখাচ্ছে প্রানিটাকে, গড়গড় করছে রাগে। তবুও আদেশের প্রতিপালন করল সাথে সাথে। দরজা লাগিয়ে তালা মেরে দিল চাবিওয়ালা গার্ড।

হাউমাউ করে চোখ মোছার ছলে গালের ক্ষত থেকে বের হওয়া রক্ত সারা মুখে লেপ্টে নিচ্ছে কোয়ালস্কি। 'ও ব্যাটা আমাকে আজ মেরেই ফেলত।'

মান্ডারিনে কথা বলতে শুরু করল দুই গার্ড। ইলেকট্রিক পড হাতের লোকটাকে এতক্ষণে চিনেছে সিগমা এজেন্ট। এটাই সেই শূয়োরের বাচ্চা, গাও- জ্যাককে মেরে রেখে ফ্যাসিলিটি থেকে তুলে এনেছে ওদের।

সঙ্গীর সাথে কথা শেষ হলে পড দিয়ে বাকোকে খোঁচা মারার ভঙ্গি করল গাও, তারপর তাকাল আহত কোয়ালস্কির দিকে।

এদিকে নিজেকে ভয়ার্ত দেখানোর যথাসম্ভব চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সে 'আমাকে...আমাকে ড. ক্রেন্ডালের কাছে নিয়ে যান দয়া করে। উনিই প্রানিটার এমন রেগে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।'

জবাব না দিয়ে তাকে পেছন পেছন আসার ইঙ্গিত করল গাও, মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে দরজার দিকে। রাইফেল হাতে আরেকজন সবার ঠিক পেছনে।

চায়নিজ লোকটার পিছু নিয়ে সামনে বাড়ল কোয়ালস্কি। বাকোকে এভাবে একা ফেলে যেতে খারাপ লাগছে। কিন্তু চুপচাপ বসে থাকলে মুক্তি এমনি এমনি হাতে ধরা দেবে না। দরজা দিয়ে অদৃশ্য হবার আগে আগে, গার্ডের চোখ আড়াল করে হাতদুটো বুকের সামনে তুলে ইশারা করল সে।

[সাহস রাখো]

বিকেল ৫:২২

চলে গেছে বিশালদেহী লোকটা। বন্ধ হয়ে গেছে দরজা। মানুষটার শেষ কথাটা বাকো বুঝতে পেরেছে, তবে ভয়ে ছেয়ে আছে মন। গুটিশুটি মেরে মেঝেতে শুয়ে পড়ল সে, মায়ের কথা মনে পড়ছে।

ঘরের চারদিকে চোখ বুলাল বাকো। ড্রয়িং বোর্ড নেই, খেলনা নেই, নেই ঝোলাঝুলি করার জন্য কোনও দড়ি। থাকার মধ্যে আছে শুধু খাবারের ঝুড়িটা, তবে খিদে না থাকায় সেটাও কোনও কাজে আসছে না।

আর আছে ভয়...অনেক বেশি।

সেলের দুর্গন্ধযুক্ত কোনাটা থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে আছে বাকো। গরাদের ভেতর কোনও আলাদা টয়লেট না থাকায় ওখানেই প্রাকৃতিক কাজ সারতে হয়েছে ওকে। তবে দূরে সরে থাকার কারণ ওটা নয়, টেকো লোকটা তার ট্র্যাকারওয়ালা ব্যান্ডটা ওই ময়লার ভেতরই লুকিয়ে রেখেছে।

হলের অপর প্রান্ত থেকে একটা গর্জনের আওয়াজ ভেসে এল। বেশ বোঝা যাচ্ছে, শেষ মাথার লাল সাইনওয়ালা ওই দরজাটার উল্টোদিক থেকেই আসছে আওয়াজটা। সেই সাথে ধাতব দরজায় কিছু একটা বাড়ি খাওয়ার তীব্র শব্দ। আঘাতটা বেশ জোরালো বলতে হবে।

ধপ...ধপ...ধপ...

আবার...আবার...আবারও...

নড়াচড়া করতেও ভয় পাচ্ছে বাকো। প্রতিটা গর্জনের সাথে সাথে ছলকে উঠছে বুকের রক্ত। দাঁড়িয়ে গেছে ঘাড়ের পেছনের পশম। মা তাকে মাঝে মাঝে রাতে

দত্য-দানোর গল্প বলে ঘুম পাড়াত। প্রায়ই লোকালয় থেকে খাবার জন্য ছাগল ধরে নিয়ে যেত ভয়ঙ্কর প্রানিগুলো।

দরজাটার ওপাশেও সেরকম কিছুর অস্তিত্ব আছে বলে মনে হচ্ছে বাকোর।

তবে পার্থক্য হলো, এখানে ছাগলের বদলে আছে সে নিজে।

চিন্তাটা মাথা থেকে জোর করে সরিয়ে দিল বাকো। মায়ের কথা মনে করল।

মা, কোথায় তুমি?

বিকেল ৫:৪২

অষ্টভূজাকৃতি ঘরটায় দাঁড়িয়ে আছে মারিয়া। মেঝে সাদামাটা কংক্রিটের, দেয়ালে সাদা রঙের প্লাস্টার। কাঁচ ঘেরা তাকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বিভিন্ন প্রাচীন নিদর্শন।

এরকমই একটা তাকের সামনে এখন দাঁড়িয়ে ড. ডেইন আরনড। প্রাগৈতিহাসিক আমলের পাথরে তৈরি একটা কুড়াল দেখছেন উবু হয়ে। তবে মারিয়া জানে- এই পর্যবেক্ষণ যতটা না ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য, তার চাইতে বেশি একটু আগে দেখা নির্মম হত্যাকান্ড থেকে মন অন্যদিকে সরানোর উদ্দেশ্যে।

ঠান্ডা মাথায় প্রফেসর রাইটসনকে গুলি করার দৃশ্যটা তাদের দু'জনের মনেই বেশ ছাপ ফেলেছে।

জিয়াইং লাও সাথে করে এখানে নিয়ে আসেন সবাইকে, তারপর দরজায় দুই প্রহরীকে পাহারায় রেখে বেরিয়ে যান। যাবার আগে অবশ্য বলতে ভোলেননি, শীঘ্রই ফিরে আসবেন। তবে তারপর প্রায় এক ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও কথা রাখার কোনও লক্ষণ দেখাননি মহিলা।

'ড. আরনড,' জীবাশ্মবিদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল মারিয়া। 'কী মনে হয়, এখানে কী করছে এরা?'

হতাশ ভঙ্গিতে দরজার দিকে তাকিয়ে না-বোধক মাথা নাড়ল ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানী।

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মারিয়ার মুখ দিয়ে। 'যা-ই করুক না কেন, কাজটা প্রাচীন আমলের ডিএনএ-র সাথে সম্পর্কযুক্ত না হয়েই পারে না। তবে পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে গোপনে। বেশ সফলভাবেই সবকিছু গর্তে লুকিয়ে রেখেছে চাইনিজরা। প্রফেসর রাইটসন আর আপনাকে অপহরণ করে এখানে আনার পথে কিছু শুনতে পাননি?'

'ম্যান্ডারিন ভাষা জানা নেই আমার। তাই কিছু শুনলেও বুঝতে পারিনি।'

নড করল মারিয়া। তার নিজের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

'তবে,' হাত উঁচু করলেন ফ্রেঞ্চ জীবাশ্মবিদ। 'এখানে সংরক্ষিত নিদর্শনগুলো দেখে কিছু ব্যাপার আঁচ করতে পারছি আমি।'

'কী?'

সবচেয়ে বড় তাকটার দিকে এগোলেন আরনড। দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে আস বেদীতে বিশালাকায় একটা খুলি রাখা আছে ওখানে। আকৃতিটা প্রায় মানুষে মতোই, তবে আকারে বেশ বড়। মারিয়া আন্দাজ করল, গরিলা জাতীয় কোন প্রাণ হবে হয়তো।

মুখ খুললেন আরনড, 'এরকম জিনিস আগে কোথাও পাওয়া যায়নি, অন্ততপক্ষে এতখানি নিখুঁত না।'

'কী এটা?'

'গাইগান্টোপিথেকাস ব্ল্যাকাই-গরিলার একটা বিলুপ্ত প্রজাতি। পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যাওয়ার আগে, দক্ষিণ চীন আর ভিয়েতনামের উচ্চভূমিতে এদের দেখ পাওয়া যেত।'

খুলিটার উপর আবার চোখ বুলিয়ে আনল মারিয়া। 'মাথা এতো বড়... পুরে দেহটা নিশ্চয় বিশাল ছিল!'

সায় দিলেন জীবাশ্মবিদ। 'তিন মিটারের মতো লম্বা, আর ওজন ছিল প্রায় পাঁচশ কেজির কাছাকাছি।'

চোখ বন্ধ করে অবয়বটা কল্পনা করার চেষ্টা করল মারিয়া। 'এটা এখানে কী করছে?'

'এখানে রক্ষিত হাড়গোড় আর অন্যান্য নিদর্শনগুলো দেখে মনে হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক ফসিলের গুরুত্বপূর্ণ একটা সংগ্রহ খুঁজে পাওয়া গেছে। আর এখন চেষ্টা করা হচ্ছে, ওগুলো থেকে ঐতিহাসিক কিছু একটা আবিষ্কার করতে।'

ভ্রু কুঁচকে খুলিটার দিকে তাকাল প্রজননবিদ। 'ঐতিহাসিক?'

আবারও মাথা নেড়ে সায় দিলেন আরনড। 'গাইগান্টোপিথেকাস-এর বিলুপ্তি ঘটে আজ থেকে প্রায় এক লক্ষ বছর পূর্বে, এই অঞ্চলে প্রাচীন মানুষের বসবাস শুরু হওয়ার সাথে সাথে।' বলে বেদীতে রক্ষিত পাথরের যন্ত্রপাতির দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'আর এগুলো... আমার মতে এগুলো প্যালিওলিথিক আমলের।'

নিজের পড়াশোনার স্বার্থেই ওই সময়কালের ব্যাপারে জানা আছে মারিয়ার তখন পৃথিবীতে আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষদের পাশাপাশি নিয়ানডারথাল, ডেনিসোভান, হোমো ইরেক্টাস-সহ আরও কয়েক ধরনের মানুষের আদি প্রজাতির বিচরণ ছিল। মানুষের ইতিহাসে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে প্যালিওলিথিক আমল।

একটা পাথুরে মুর্তির দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আরনড। উবু হয়ে আছে মহিলার আকৃতিটা। ঠিকরে বেরিয়ে আছে বড় আকারের পেট। 'তখনকার যুগেই এরকম বিভিন্ন মুর্তির আবির্ভাব হয়। নামগুলোর বেশ আকর্ষণীয় এদের- ভেনাস

অফ উইলেনডর্ফ, ভেনাস অফ লজেল...ইত্যাদি। ভালো করে তাকালে কাঠামোগুলোর গায়ে রঙের আঁচড় লক্ষ্য করা যায়, বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হওয়ার প্রমাণ এগুলো।'

'তাহলে আপনার মতে, সাম্প্রতিক কোনও আবিষ্কার ফলে অবমুক্ত হয়েছে এসব নিদর্শন?'

'শুধু তাই নয়। আমি নিশ্চিত, দক্ষিণ চীনের কোনও এলাকা...সম্ভবত হিমালয় পর্বতমালা হতে এসেছে সবকিছু, এমনকি এই খুলিটাও।' বলে আরেকটা কুলুঙ্গিতে রক্ষিত অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের একটা খুলির দিকে করলেন জীবাশ্মবিদ। 'এই নমুনাটা দেখুন... সমতল মুখ, পুরু হাড়, প্রশস্ত নাক।'

'এটা তো মানুষের বলে মনে হচ্ছে।'

'আপনার ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। খুলিটা সম্প্রতি আবিষ্কৃত দক্ষিণ চীনের অধিবাসী এক গুহাবাসী গোত্রের মানুষের। রেড ডিয়ার কেভ পিপল বলে অভিহিত করা হয়েছে ওদের। আর এই গোত্রটার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনও সন্দিহান।'

'কেন?'

'কারণ- যুক্তি অনুযায়ী তাদের পৃথিবীতে থাকারই কথা না। একটা লম্বা সময় ধরে স্বীকৃত, আধুনিক মানুষের সবচেয়ে কাছের আত্মীয় ছিল নিয়ানডারথালরা। যারা ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হয়েছে। তবে রেড ডিয়ার কেভ পিপলদের ফসিল থেকে জানা যায়, মাত্র এগারো হাজার বছর আগেও তাদের অস্তিত্ব ছিল।'

বিস্ময়ে রসগোল্লার আকার ধারণ করল মারিয়ার চোখ দুটো। মানুষের ইতিহাসের ক্ষেত্রে এটা বেশ বড় একটা চমক।

বলে চলেছেন আরনড, 'অধিকাংশ জীবাশ্মবিদের মতে, এরা হচ্ছে মানুষের একটা অপভ্রংশ। আধুনিক মানুষ অর্থাৎ হোমো স্যাপিয়েন্স আর হোমো ডেনিসোভানস-দের মিলনের ফসল।'

মারিয়া জানে, যুক্তিটা ফেলনা নয়। এটা স্বীকৃত যে, আধুনিক মানুষের দেহে নিয়ানডারথাল এবং ডেনিসোভান, দুই ধরনের জিনেরই অস্তিত্ব আছে। এলাকাভেদে জিনগুলোর পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। তবে গবেষণায় প্রমাণিত, এই দুটো গোত্র ছাড়াও আরোও একটা জাতির জিন বহন করে চলেছি আমরা। তাদের পরিচয়টা অবশ্য এখনও অজ্ঞাত।

ব্যাপারটা নাড়া দিয়ে গেল মারিয়াকে। এই রহস্যের সমাধান বের করা গেলে মানব ইতিহাসের একটা গোপন অধ্যায় উন্মোচিত হবে।

'তাহলে আপনার মতে-' প্রশ্ন করল সে, '-চাইনিজরা আমাদের অতীত অন্বেষণের গুরুদায়িত্ব হাতে তুলে নিয়েছে?'

'কে জানে!' পুরো ঘরে একবার চোখ বুলিয়ে আনলেন ফ্রেঞ্চ জীবাশ্মবিদ। 'তবে এটুকু অন্তত নিশ্চিত, খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু খুঁজে পেয়েছে এরা। এমন কিছু, যা আমাদের ইতিহাসের ভিত নাড়িয়ে দিতে সক্ষম।'

ধারণাটা মারিয়ার মনেও শিকড় গেড়ে বসেছে। লোকচক্ষুর আড়ালে এরকম একটা আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্যাসিলিটিতে আর যাই হোক, ছেলেখেলা চলছে না। তবে সবকিছুর পেছনে কে আছে?

দরজার দাঁড়ানো গার্ডদের দিকে তাকাল মেয়েটা। 'ধরে নিলাম, আপনার ধারণাই ঠিক। কিন্তু এসব দেখভালের দায়িত্ব চাইনিজ মিলিটারির হাতে কেন দেয়া হলো?'

ভ্রু কুঁচকালেন আরনড। 'হয়তো আবিষ্কারটার মাধ্যমে কোনও অত্যাধুনিক অস্ত্র উদ্ভাবনের চেষ্টা করা হচ্ছে।'

বড় করে নিঃশ্বাস টানল মারিয়া। কথাটার গুরুত্ব নিরূপণের চেষ্টা করছে মনে মনে।

'আর তাছাড়া, ড. ক্রেন্ডাল, আপনার নিজের রিসার্চও তো শুনলাম ইউ.এস. মিলিটারির সায়েন্টিফিক ডিভিশন ডারপা-র তত্ত্বাবধানে চলছে?'

কথাটা সত্যি। নিজের হাতদুটোর দিকে তাকাল মারিয়া, আদৌ কি পরিষ্কার এগুলো?

বায়োলজিকাল টেকনোলজি নামে পরিচিত ডারপা-র একটা শাখা থেকে তার রিসার্চের যাবতীয় খরচ পাঠানো হয়। চুক্তিতে রাজি হওয়ার আগে ওদের বিভিন্ন প্রজেক্ট সম্পর্কে পড়াশোনা করেছে মারিয়া। তার নিজের গবেষণা মানব বুদ্ধিমত্তা-সংক্রান্ত হলেও বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে উন্নতমানের সেনাবাহিনী তৈরি-মূলক প্রজেক্টের তালিকাও ছিল ওখানে।

সত্যিটা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে মারিয়ার। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী জৈব অস্ত্র বানানোর দৌড়ে সামিল হয়েছে সে আর তার বোন। কিন্তু কাদের জন্য কাজ করছে তারা? অ্যামি ভু-র হাস্যোজ্জ্বল মুখটা মনে পড়ল হঠাৎ। যুক্তরাষ্ট্র? নাকি চীন সরকার?

চিন্তাগুলো মাথা থেকে সরিয়ে দিয়ে দরজার দিকে তাকাল প্রজননবিদ। নিজের ক্ষেত্রে রাইটসনের পরিণতি মেনে নিতে পারবে না সে।

কাজে লাগো...নয়তো মরো।

তার দৃষ্টির জবাবেই যেন খুলে গেল দরজাটা। তবে এক অস্ত্রধারীর সাথে ঘরে যে প্রবেশ করল, তাকে এখন এখানে দেখার আশা করেনি মারিয়া।

কোয়ালস্কি!

উৎসাহিত দৃষ্টিতে তার দিকে চোখ ফেরাল ছদ্মবেশী সিগমা এজেন্ট। পরনে নতুন ধূসর রঙের কভারঅল, গালে ব্যান্ডেজ। গাও নামের সেই হারামজাদাটা ওকে অস্ত্রের মুখে এখানে নিয়ে এসেছে।

'এই তো, আপনি!' বিড়বিড় করে বলল সে।

'কী হয়েছে?' তার ব্যান্ডেজের দিকে সেঁটে আছে মারিয়ার নজর। 'বাকো...?'

গালে হাত বুলালো কোয়ালস্কি। 'ও পাগল হয়ে গেছে। আরেকটু হলে মেরেই ফেলত আমাকে।'

আঁতকে উঠল মারিয়া, কিন্তু পরক্ষণেই নিচু হয়ে থাকা সিগমা এজেন্টের অন্য হাতের দিকে চোখ পড়ল। ইশারায় ভাষায় নড়ছে ওটা।

[আমি মিথ্যা বলছি]

তবে মুখে বলছে অন্য কথা, 'আমাদের ওর কাছে যাওয়া উচিত। শান্ত করতে হবে প্রানিটাকে।'

মারিয়া জবাবে কিছু বলার আগেই কোয়ালস্কিকে ধাক্কা মেরে সামনে এগিয়ে দিল গাও। 'মেজর জেনারেল আসার আগপর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করবে তোমরা।'

অপমানে শক্ত হয়ে এসেছে বিশালদেহী সিগমা এজেন্টের চোয়াল। সময়মত মজা টের পাবে বাছাধন, মনে মনে বলল।

গটগট করে হেঁটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল গাও, কিছু একটা নিয়ে উত্তেজিত মনে হচ্ছে তাকে।

'কী হয়েছে?' দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই আবার মুখ খুলল মারিয়া।

গলাটাকে খাদে নামিয়ে আনল কোয়ালস্কি। হাস্যোজ্জ্বল মুখে প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'সম্ভবত আমাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে ওয়াশিংটন বাহিনী।'

সন্ধ্যা ৬:০৫

'আমি নিশ্চিত, আমার ভাই এমন কোনও ট্রেইল রেখে আসেনি যার জের ধরে আমেরিকানরা পেছনে লাগতে পারে,' কটমট করে বলল লেফটেন্যান্ট কর্নেল চ্যাং সান। রাগ প্রকাশ পাচ্ছে জ্বলন্ত চোখদুটোতে। 'কথাটার উপর জীবন বাজি রাখতেও প্রস্তুত আমি।'

ঠিক আছে বাছা; আমি রাজি, জবাব দিলেন জিয়াইং... তবে মনে মনে।

কমপ্লেক্সের সিকিউরিটি অফিসে দাঁড়িয়ে আছেন মেজর জেনারেল। মিনিস্ট্রি অফ স্টেট সিকিউরিটি থেকে খবর পাঠানো হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। ইউএস ইন্টেলিজেন্সের তৎপরতা দেখে আন্দাজ করা হচ্ছে, সম্ভবত প্রাইমেট সেন্টারে করা হামলার পেছনে তাদের হাত থাকার ব্যাপারে কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছে

আমেরিকা। জিয়াইং-এর ধারণা, ব্যাপারটা তদন্তের জন্য অচিরেই চীনে লোক পাঠানো হবে।

যদি এতক্ষণে পাঠানো হয়ে গিয়ে না থাকে...

সিকিউরিটি সেন্টারে এসেই পুরো ফ্যাসিলিটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার আদেশ দেয়া হয়েছে। এমনিতে অবশ্য জায়গাটা চ্যাং-এর নিয়ন্ত্রণে থাকে।

দেয়ালে আটকানো মনিটরগুলোর দিকে তাকালেন জিয়াইং। এগুলোর মাধ্যমেই ফ্যাসিলিটির উপর চোখ রাখে টেকনিশিয়ানরা। তবে লেফটেন্যান্ট কর্নেলের সাথে কথা শুরু করার আগে সবাইকে বের করে দিয়েছেন তিনি।

একটা মনিটরে দেখাচ্ছে- গরাদের ভেতর বসে আছে ড. ক্রেন্ডালের সাথে আমেরিকা থেকে আনা গরিলাটা। সেদিকে ইঙ্গিত করলেন জিয়াইং। 'লুকানো কোনও ট্র্যাকারের খোঁজে প্রানিটাকে স্ক্যান করা হয়েছে তো?'

'এই মাত্র গরিলা এবং কেয়ারটেকার লোকটার মাথা থেকে পা পর্যন্ত স্ক্যান করেছে গাও। কিছুই পাওয়া যায়নি। আগেই বলেছিলাম, আমার ভাই নিজের কাজে খুবই দক্ষ। আমেরিকানদের পথ দেখানোর মতো কিছু ওর চোখ এড়ায়নি।'

'তবে স্টেট সিকিউরিটির ভাষ্য অনুযায়ী, সেটাই ঘটছে।' মেজর জেনারেলে কণ্ঠে অসহিষ্ণুতার ছাপ।

'তাহলে সম্ভবত হোয়াইট হাউজের সায়েন্স ডিভিশনে ফুটো হয়েছে। কে জানে, মরার আগে ড. ভু ওদের কিছু বলে গিয়েছে কি না।'

জিয়াইং জানেন, ওই মহিলা তাদের সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানত না। আর জানলেও কথা ফাঁস করার মানুষ ছিল না ও। তাহলে সমস্যাটা কোথায়?

'ড. ক্রেন্ডালের কী হলো?' জানতে চাইল চ্যাং।

অন্য আরেকটা মনিটরের দিকে তাকালেন মেজর জেনারেল। আমেরিকান প্রজননবিদ আর ফ্রেঞ্চ জীবাশ্মবিদকে রাখা ঘরের ফুটেজ ভাসছে ওখানে। একটু আগে জু-কীপার লোকটাকেও ওই ঘরে রেখে এসেছে গাও।

'তার সাথে আমার কথা আছে,' জবাব দিলেন জিয়াইং। 'সাথে একজন টেকনিশিয়ান নেব। মেয়েটাকে ওখানেই সার্চ করা হবে।'

'কী মনে হয়, ও কি সাহায্য করতে রাজি হবে?'

'এটা নির্ভর করছে মেয়েটার উপর আমরা কতটা চাপ প্রয়োগ করতে পারি, তার উপর। ইতালির খবর কী?'

কথাটা উঠতেই চ্যাং-এর মুখ কালো হয়ে উঠল। তার ব্যর্থতার কারণেই ক্রোয়েশিয়ার হামলা থেকে বেঁচে ফিরতে পেরেছে লিনা। তারপর রওনা হয়েছে ইতালির দিকে। সাথে নাকি আবার কয়েকটা বন্ধুও জুটিয়েছে। লোকগুলোর পরিচয় অবশ্য এখনও অজ্ঞাত।

ক্যাথলিক স্যাংচুয়ারিতে কী করতে গিয়েছে ওরা?

'হয়তো আর এক ঘন্টার মাঝেই ফলাফল পাব,' মৃদুস্বরে জবাব দিল লেফটেন্যান্ট কর্নেল।

মাথা নাড়লেন জিয়াইং। 'তাহলে ওইদিকে নজর দাও। এবার অন্তত কোনও খারাপ খবর শুনতে চাই না আমি।' বলে আরেকটা মনিটরের দিকে নজর ফেরালেন তিনি। এই মুহূর্তে অবশ্য কালো হয়ে আছে ওটা। আর্ক-এর ভিডিও ফুটেজ দেখাতে সক্ষম ক্যামেরাটা শুধুমাত্র দু'জন লোক চালু করতে পারে, তিনি এবং চ্যাং। আশা করা যায়, দুই বোনকে হাতে আনার পর ফ্যাসিলিটির সবচেয়ে বড় সমস্যাটা সমাধান করা কঠিন কিছু হবে না।

চ্যাং-এর দিকে শীতল দৃষ্টিতে তাকালেন মেজর জেনারেল। 'নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করো। বহিরাগত কেউ যেন কিছুতেই ঢুকতে না পারে।'

'আর আমার ভাইয়ের ব্যাপারটা?'

দরজার দিকে ফিরলেন জিয়াইং। 'মন্ত্রনালয় থেকে আসা একজন এজেন্ট খুব শীঘ্রই গাও-কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তারপর আমাদের লক্ষ্য পূরণ হওয়া পর্যন্ত ফ্যাসিলিটির বাইরে রাখতে হবে ওকে।'

'কিন্তু...'

'আমার নির্দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছ তুমি, লেফটেন্যান্ট কর্নেল?'

নিজের পিঠে লোকটার জ্বলন্ত দৃষ্টি উপলব্ধি করতে পারছেন জিয়াইং। দুই ভাইকে আলাদা করে রাখাটাই বর্তমান পরিস্থিতির পক্ষে ভালো। ভাইয়ের ক্যারিয়ার হুমকির মুখে আছে জানা থাকলে নিজের কাজে আরও সতর্ক হবে চ্যাং।

'ঠিক আছে, শাওজিয়াং লাও।' অবশেষে মাথা নত করল লোকটা।

মুচকি হেসে দরজার দিকে এগোলেন জিয়াইং। হাতের ইশারায় পুরুষমানুষকে নাচানোর ব্যাপারটা বেশ মধুর লাগে তার কাছে।

সন্ধ্যা ৬:১৮

হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মারিয়া। একটা ইলেকট্রনিক দন্ড হাতে তাকে স্ক্যান করছে টেকনিশিয়ান। পাশেই দাঁড়ানো মেজর জেনারেল জিয়াইং লাও। মারিয়া বুঝতে পারছে, সম্ভবত জিপিএস ট্র্যাকারের ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরেছে চাইনিজরা। তবে খোঁজাখুঁজির অনিশ্চিত ভাব দেখে মনে হয়, এখনও জিনিসটা খুঁজে পায়নি। নির্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে আছে কোয়ালস্কি। খুব সম্ভবত, তার এবং বাকোর সাথে আগেই দন্ডধারী টেকনিশিয়ানের মোলাকাত হয়ে গেছে।

লোকটা নিজের কাজ শেষ করে ম্যান্ডারিন ভাষায় মেজর জেনারেলকে কিছু একটা বলল। ভাষাটা জানা না থাকলেও কথাটার অর্থ বুঝতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না।

কিছু নেই।

জিনিসটা তবে গেল কোথায়? অবাক হয়ে ভাবত লাগল মারিয়া। কোয়ালস্কি কি ওটা বাকোর সেলের কোথাও লুকিয়ে রেখেছে? নাকি মনের ভুলে গিলে ফেলেছে বাকো নিজেই? তবে উত্তরটা জানার জন্য কোয়ালস্কির সাথে কথা বলতে হবে ওকে। আর এখন কোনওমতেই তা সম্ভব না।

সামনে বাড়লেন জিয়াইং। 'ঠিক আছে তবে, ড. ক্রেন্ডাল। চলুন এগোনো যাক। আমি জানি, আমাদের লক্ষ্য সম্পর্কে সবটা শোনার পর আপনি খুশি মনে সাহায্য করতে রাজি হবেন।'

খেয়ে-দেয়ে যেন আর কাজ নেই আমার, মনে মনে জবাব দিল মারিয়া। তবে মুখে বলল, 'সম্ভবত আপনাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে- জিনগত উন্নয়নের মাধ্যমে অতিরিক্ত দৈহিক ক্ষমতাধর সৈন্য তৈরি করা। তাই না?'

'অনেকটা সেরকমই, তবে আরও বৃহৎ পরিসরে। শুরুটা মিলিটারির মাধ্যমে হলেও ধীরে ধীরে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে আমাদের আবিষ্কার। ইন্টারনেটের ব্যাপারটাই দেখুন না। প্রথমদিকে তো শুধু ইউএস মিলিটারি ব্যবহার করত এই সেবা। তারপর সময়ের সাথে পুরো বিশ্বটাকে কীভাবে পাল্টে দিল।'

'তাহলে মানুষের জিনকে স্থায়ীভাবে উজ্জীবিত করতে চাইছেন আপনারা,' মন্তব্য করল মারিয়া। 'কিন্তু বর্তমান জীবনধারায় ব্যাপারটা কতখানি বিরূপ প্রভাব ফেলবে, সেটা ভেবেছেন কী?'

'চিন্তাধারা আরও প্রসারিত করুন, ড. ক্রেন্ডাল। মানুষের কাজ অনেক আগে থেকেই তাদের জিনকে উজ্জীবিত করে আসছে। জানেন আশা করি, মাদকদ্রব্য সেবনের মাধ্যমে শুক্রাণুতে মিউটেশন ঘটে। বিকলাঙ্গ পিতার পরিবর্তীত বৈশিষ্টগুলো বাচ্চাদের মাঝেও সঞ্চারিত হয়। তবে এগুলোর সবই হচ্ছে বিক্ষিপ্ত বিষয়। পরিবর্তন যখন ঘটছেই, তাহলে কেন এই ব্যাপারগুলোর নিয়ন্ত্রণ আমরা নিজের হাতে তুলে নিচ্ছি না?'

মাথা নাড়ল মারিয়া। 'নিয়ন্ত্রণ... এতক্ষণে আসল কথায় এসেছেন। ধরুন আপনাদের কথা অনুযায়ী ঘটল সব। নিজস্ব ডিজাইনের মাধ্যমে শক্তিমান বাচ্চা জন্মদান করতে পারবে মানুষ। তবে তখন তো সাধারণ ক্ষমতার অধিকারী শিশুদের ছুঁড়ে ফেলা হবে আস্তাকুঁড়ে। দুই ভাগে বিভাজিত হয়ে পড়বে গোটা সমাজ। তখন? আদৌ কি এভাবে ভালো কিছু করা সম্ভব?'

'ভালো কিছু হবে না কেন? অনাকাঙ্খিত রোগ থেকে বাঁচতে পারব আমরা, পাব ক্যান্সার থেকে নিরাময়, উপভোগ করব বর্ধিত জীবন। সর্বোপরি, প্রকৃতির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হবে। উন্নতির জন্য প্রকৃতির খেয়ালখুশির দিকে কেন তাকিয়ে থাকবে মানুষ, বলুন তো। তাছাড়া, আপনার নিজের দেশও কিন্তু এই সম্পর্কিত গবেষণায় কোনওরকম বিধিনিষেধ আরোপ করেনি।'

এই কথাটা অন্তত সত্যি। মারিয়া খুব ভালো করেই জানে, তার নিজের কাজের উদ্দেশ্যও প্রায় একই রকম। তারাও তো পরীক্ষাগারে জন্ম দিয়েছে বাকোকে। গবেষণা করছে তার বুদ্ধিমত্তা নিয়ে।

এবার মুখ খুললেন ড. আরনড। 'সবই বুঝলাম। তবে এখানে রক্ষিত জিনিসগুলো দেখে আমার মনে হচ্ছে, উদ্দেশ্যটা সফলে সহায়ক এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা আবিষ্কার করেছেন আপনারা। নইলে এরকম একটা ফ্যাসিলিটি স্থাপনের ঝুঁকিতে যেত না চাইনিজরা। প্রশ্ন হলো, জিনিসটা কী?'

'মনে করিয়ে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ, ড. আরনড। ওটা দেখানোর জন্যই আপনাদের এখানে আনা হয়েছে।' জবাব দিলেন জিয়াইং। 'কৈলাশ পর্বত সম্পর্কে ঠিক কতটুকু জানেন?'

'খুব বেশি না।'

'হিমালয় পর্বতমালায় অবস্থিত ওই জায়গাটা হিন্দু এবং বৌদ্ধ, দুই জাতের মানুষের কাছেই তীর্থস্থান হিসেবে বিবেচিত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তীর্থযাত্রীরা পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে যায় ওখানে। বলা হয়ে থাকে, কৈলাশ পর্বতেই ধ্যানমগ্ন আছেন হিন্দুদের পরম আরাধ্য দেবতা শিব। কয়েক বছর আগে ওখানেই আমাদের কাহিনীর সূত্রপাত।'

'তাকে সাজানো নিদর্শনগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলেন ফ্রেঞ্চ জীবাশ্মবিদ। 'এসব কি ওখান থেকেই এসেছে?'

'হ্যাঁ, সেই সাথে আশেপাশের আরও কিছু গুহা থেকে।' বলে সামনে বাড়লেন মেজর জেনারেল। হাত রাখলেন দেয়ালের একটা নির্দিষ্ট অংশে। জিনিসটা আসলে একটা হাতের ছাপ শনাক্তকারী যন্ত্র। 'প্রথম গুহায় এটা পেয়েছি আমরা।'

দেয়াল থেকে ধীরে ধীরে একটা ড্রয়ারের মতো অংশ বেরিয়ে আসছে। আকারে বড় একটা কফিনের মতো।

বলে চলেছেন জিয়াইং, 'যে মেষপালক গুহাটা খুঁজে পায়, তার ধারণা ছিল ওটা হচ্ছে কিংবদন্তীর দানব ইয়েতি-র আস্তানা। অবশ্য তাকে খুব একটা দোষ দেয়া যায় না। আপনাদের এখন যা দেখাতে চলেছি, ইয়েতির কিংবদন্তী সৃষ্টির পেছনে তারও হাত আছে। তবে জানেন নিশ্চয়ই, সত্য বরাবরই কল্পনার চাইতে বিস্ময়কর।'

পিছিয়ে এলেন মেজর জেনারেল। সামনে এগিয়ে ড্রয়ারের ভেতর উঁকি দিল মারিয়া আর ফ্রেঞ্চ জীবাশ্মবিদ। এমনকি কোয়ালস্কিও তাকাল ঘাড় উঁচু করে।

ভেতরের জিনিসটা দেখার সাথে সাথে আঁতকে উঠলেন ড. আরনড। বিস্ময় চাপতে মুখে হাত চাপা দিতে হলো মারিয়াকে।

ড্রয়ারের ভেতর শুয়ে আছে মানবাকৃতির একটা কঙ্কাল, পুরোপুরি অক্ষত অবস্থায়। মাথার খুলির মোটা ভুরু আর কপালের অংশটা বাদে বর্তমান মানুষের সাথে বেশ মিল। তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হলো কঙ্কালটার আকৃতি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত আট ফুটের কম হবে না। খুলিটার আকারও সাধারণ মানুষের তুলনায় দ্বিগুণ।

'এ কী!' বিড়বিড় করল কোয়ালস্কি।

'অসাধারণ!' আরনডের কণ্ঠে মুগ্ধতা। 'এরকম খুলির হাড় আগেও দেখেছি আমি। তবে অতটা নিখুঁত ছিল না ওগুলো। মেগানথ্রোপাস...অর্থাৎ বিশালাকায় মানুষ নামে ডাকা হয় এই প্রজাতিটাকে।'

'আকারের দিক দিয়ে নামটা যথার্থই হয়েছে বলতে হবে,' মন্তব্য করল কোয়ালস্কি।

বলে চলেছেন ড. আরনড। 'অশিকাংশ জীবাশ্মবিদরা এদের শনাক্ত করেছেন হোমো ইরেক্টাস প্যালিওজাভানিকাস হিসেবে। তারা বিশ্বাস করেন, এরা আসলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী আমাদের আদিম আত্মীয় হোমো ইরেক্টাস প্রজাতির একটা অপভ্রংশ।'

'জীবিত অবস্থায় এদের ওজন কত ছিল ডক্টর?' জিজ্ঞেস করল মারিয়া।

উত্তরটা জিয়াইং-এর মুখ থেকে এল। 'খুলির বিশাল আকৃতি আর পুরু হাড় থাকায় আমাদের ধারণা, সংখ্যাটা তিনশো থেকে তিনশো পঞ্চাশের মাঝামাঝি।'

অর্থাৎ একটা গরিলার প্রায় দ্বিগুণ।

'তবে আরেকটা ব্যাপার আছে,' বাধা দিলেন আরনড। 'সাধারণ মেগানথ্রোপাসের তুলনায় ভিন্ন কিছু ব্যাপার লক্ষ্য করছি এটাতে।'

মাথা নেড়ে সায় দিলেন জিয়াইং। 'ঠিক ধরেছেন। শনাক্তকারী পরীক্ষায় জানা গেছে, এই জীবটা আসলে মেগানথ্রোপাস আর আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষদের মিলনের ফসল। তাই প্রজাতিটাকে হোমো মেগানথ্রোপাস নামে অভিহিত করেছি আমরা। প্রানিটা জিনগত দিক দিয়েও আমাদের মতামতকে সমর্থন করছে।'

কণ্ঠে ফুটে ওঠা বিস্ময় লুকানোর চেষ্টা করল না মারিয়া। 'তার মানে, আপনারা এটার জিন ম্যাপিং করে ডিএনএ উদ্ধার করে ফেলেছেন?'

'অবশ্যই,' মেজর জেনারেলের গলায় গর্বের ছাপ।

ভালো করে তাকাতেই কঙ্কালটার মেরুদণ্ডের গোড়ায় করা ছোট ছোট ছিদ্রগুলো মারিয়ার নজরে এল। ধাঁধাঁর টুকরোগুলো যেন নিজে নিজেই জোড়া লেগে যাচ্ছে এখন। বিজ্ঞানীরা আগে থেকেই প্রমাণ করেছেন, আধুনিক মানুষের শরীরে তৃতীয় একটা অজ্ঞাত গোত্রের জিন বিদ্যমান। প্রজাতিটা হোমো ইরেক্টাস গোত্রের কোনও অপভ্রংশ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি ছিল।

এটাই তাহলে সেই অজ্ঞাত প্রজাতি? আমাদের প্রাগৈতিহাসিক আত্মীয়?

ড. আরনডের মনেও একই চিন্তা চলছে। 'যদি আমাদের পূর্বপুরুষের সাথে ওই গোত্রের মিলন ঘটে থাকে, তাহলে সেই সময়কালটা কত ছিল? এই হাড়গুলোর বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে কী?'

'হ্যাঁ,' মাথা নাড়লেন জিয়াইং। 'ওসব প্রায় ত্রিশ হাজার বছর আগের ঘটনা।'

'অর্থাৎ, আধুনিক মানুষের সাথেই পৃথিবীতে বিচরণ করত এরা!'

'কথা সত্যি,' সায় দিলেন মেজর জেনারেল। 'এখনও হিমালয়ে ইয়েতিদের দেখার গুজব শোনা যায়। কে জানে, হয়তো এখনও এদের অস্তিত্ব বর্তমান।'

মারিয়াও মনে মনে কথাটায় সায় না দিয়ে পারল না। ওই অঞ্চলে প্রায়ই মানুষের চাইতে বড় আকারের দানব দেখার কথা শোনা যায়। যা রটে, তার কিছুটা তো বটে।

'তো তাহলে, আমাদের ক্ষুদে আকারের পূর্বপুরুষরা এই দানবদের পৃথিবী থেকে বিতাড়িত করল কীভাবে?' জানতে চাইল কোয়ালস্কি। 'গায়ে গতরে তো একেকটা একেবারে জবড়জং ছিল।'

মাথা নাড়লেন আরনড। 'আসলে ব্যাপারটা অতিরঞ্জিত করছেন আপনি। টিকে থাকার মূল শক্তি থাকে মাথায়, হাতে-পায়ে না। মস্তিষ্কের আকার দেখে বুঝতে পারছি, এদের বুদ্ধিমত্তা ছিল নিতান্তই কম। হোমো ইরেক্টাসদের মতোই বড়জোর আগুন জ্বালানো আর অল্প কিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারত এরা।'

'তাহলে এদের গুহায় এসব যন্ত্রপাতি কোত্থেকে এল?' তাকে সাজানো পাথরের বিভিন্ন নিদর্শনের দিকে ইঙ্গিত করল মারিয়া। 'আপনার মতে তো, এরা এগুলো তৈরি করার মতো ক্ষমতাবান ছিল না।'

এবার হাল ছেড়ে দিলেন জীবাশ্মবিদ। 'জানি না।'

'উনি ঠিকই বলেছেন,' জবাব দিলেন জিয়াইং। 'ওসব যন্ত্রের রহস্য উন্মোচনের জন্য বছরের পর বছরে ধরে আশেপাশে থাকা গোত্রগুলো সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে হয়েছে আমাদের।'

তাকে সাজানো ছোট খুলিটার দিকে ইঙ্গিত করলেন ড. আরনড। 'ডিয়ার কেভ পিপল?'

মাথা নেড়ে সায় দিলেন জিয়াইং। 'হ্যাঁ। এগুলো ওদেরই তৈরি। সেই সাথে কৈলাশ পর্বতে আরও কিছু জিনিস পেয়েছি আমরা, এই যে দেখুন।'

বলে দেয়াল থেকে আরেকটা ড্রয়ার খুলে আনলেন তিনি। এটাতে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের ভাঙা মাথার খুলিসহ হাত-পায়ের অন্যান্য হাড়গোড় রাখা। জায়গায় জায়গায় কালচে ছোপ। 'মেগানথ্রোপাসদের গুহায় ছাইয়ের স্তূপে পাওয়া এই পোড়া হাড়গুলো ডিয়ার কেভ পিপলদের।'

'অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন, মেগানথ্রোপাসরা নরভোজী ছিল?' প্রশ্ন করল মারিয়া।

সায় দিল মহিলা। 'গবেষণায় দেখা গেছে, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গুহাবাসীদের শিকার করে খেত এই বিশালাকায় প্রজাতি। আর গুহায় পাওয়া যন্ত্রপাতিগুলো তো আর তাদের নিজেদের আবিষ্কার না। ওগুলো ছিনিয়ে আনত ওরা।'

'তারপর?'

'অন্য আরেকটা গুহায় মেগানথ্রোপাসদের পোড়া হাড়গোড়ও আবিষ্কৃত হয়।'

শিউরে উঠল মারিয়া। অর্থাৎ নরভোজী গোত্রের প্রাণীগুলোর নিজেদের মাংসেও অরুচি ছিল না।

'নিজেদের মৃতদেহও পুড়িয়ে নিয়ে খেত এরা। এজন্যই এদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে এত ঝামেলা পোহাতে হয়েছে।' মন্তব্য করলেন আরনড।

'তবে সফল হয়েছি আমরা,' যোগ করলেন জিয়াইং। 'এবার এদের জিন থেকে সাফল্য লাভের পালা।'

'সাফল্য?' জানতে চাইল মারিয়া। 'কীভাবে?'

'এই সংকর প্রাণীগুলো অর্থাৎ হোমো মেগানথ্রোপাসদের অস্তিত্ব নিরূপণের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি, আসলে মানুষ চাইলেই এরকম বিশালদেহী আর প্রচন্ড শক্তির অধিকারী হতে পারে। আমাদের মাঝে সেই ক্ষমতা প্রকৃতিই দিয়েছে।'

'তবে আরেকটা ব্যাপার ভুলে যাচ্ছেন,' মারিয়া বলল, 'এদের মস্তিষ্কের আকৃতি কিন্তু বেশ ছোট।'

জবাবে হাসল চাইনিজ মহিলা। 'এজন্যই তো আপনি আজ এখানে, ড. ক্রেন্ডাল।'

কথাটার অর্থ বুঝতে মারিয়ার কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল। এবার বুঝতে পারছে, কেন এত ঝুঁকি নিয়ে এখানে আনা হয়েছে ওদের। কেনই বা ক্রোয়েশিয়ার হাইব্রিড নিয়ানডারথাল দেহাবশেষটা চাইনিজদের কাছে এতটা মূল্যবান।

ড্রয়ারে রাখা কঙ্কালটার দিকে চোখ ফেরাল প্রজননবিদ। মানুষের বুদ্ধিমত্তার শিকড় নিয়ে গবেষণা করছিল ওরা দুই বোন। চাইনিজরা অতিমানবদের শক্তির

্যহস্য উন্মোচন করে ফেলেছে। এখন শুধু বুদ্ধিটা চাই। এজন্যই ধরে আনা হয়েছে ওদের।

মারিয়া কিছু বলার আগেই দরজা খুলে ঘরে ঢুকল চ্যাং, বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছে ওকে। হড়বড় করে ম্যান্ডারিন ভাষায় মেজর জেনারেলকে বলল কিছু একটা। কথাটা শেষ হতেই হাসি ফুটে উঠল মহিলার মুখে।

ছলকে উঠল মারিয়ার বুকের রক্ত। চাইনিজদের খুশি হওয়া মানেই, তাদের জন্য কোনও দুঃসংবাদ।

লেফটেন্যান্ট কর্নেলের সাথে কথা শেষ করে তার দিকে তাকালেন জিয়াইং।

'ভালো খবর ড. ক্রেন্ডাল। মনে হচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি আপনার বোন আমাদের সাথে যোগ দেবেন।'

অধ্যায় চৌদ্দ
৩০ এপ্রিল, দুপুর ১:০০ টা
গুয়াডাগনোলো, ইতালি

'এখন কী করব?' জানতে চাইল লিনা।

শেইচানের কাছ থেকে সতর্কবার্তা আসার পর পেরিয়ে গেছে মুল্যবান কয়েকটা মিনিট। পিস্তল হাতে সুড়ঙ্গের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারছে না, কী করবে। চ্যাপেলে পৌঁছালেও তো লাভ নেই। নিচে অপেক্ষা করে আছে হামলাকারীর দল।

'ছবি তোলা শেষ হলো?' জিজ্ঞেস করল সিগমা কমান্ডার।

হাতের সেলফোন উঁচু করে দেখাল লিনা। 'হ্যাঁ।'

শেইচানের ফোন পাওয়ার পর থেকেই যাওয়ার জন্য গোছগাছ শুরু করে সবাই। মুর্তির ভেতর লুকানো কঙ্কালটার সরু সরু হাত, লাঠি আর চাঁদের প্রতিকৃতিসহ সবকিছুর বেশ অনেকগুলো ছবি তুলেছে লিনা।

অন্যদিক থেকে সাড়া দিল রোল্যান্ড, 'আমার কাজও শেষ।'

মুর্তির ভেতর থেকে কার্কারের জার্নালটা খুলে এনেছে সে, বইটার প্রচ্ছদে গোলকধাঁধার ছবি ছাপা। ফাঁপা কাঠামোটার যে জায়গায় বইটা ছিল, তার উল্টোপাশে খোদাইকৃত মানচিত্রের দিকে ইঙ্গিত করল তরুণ যাজক। 'লিনা, এটার ছবি তুলেছেন তো?'

মাথা নাড়ল প্রজননবিদ। 'যতটুকু সম্ভব তুলেছি... আসলে জিনিসটা বেশ অস্পষ্ট।'

'সমস্যা নেই,' এগোতে এগোতে জবাব দিল রোল্যান্ড। 'এটা আগেও এক জায়গায় দেখেছি আমি।'

কথাটা শুনে একটু অবাক হলো লিনা। তবে এখন বিস্তারিত জানার সময় নেই। তড়িঘড়ি করে গ্রে-র পেছন পেছন সিঁড়িতে উঠে এল সবাই।

'চলুন, যাওয়া যাক,' মুর্তিটার উপর শেষবারের মতো চোখ বুলাল রোল্যান্ড। ইতিমধ্যে গোটা কাঠামোটার মাপ নিয়েছে সে, খুলে নিয়েছে কঙ্কালের সাথে থাকা পাথরের তৈরি চাঁদের প্রতিকৃতি। বহুমূল্য জিনিসটা আপাতত তার পিঠের ঝোলানো ব্যাগে রাখা আছে।

লিনার ইচ্ছা ছিল, পুরো কঙ্কালটাই খুলে সাথে নিয়ে নেয়। তবে ব্রোঞ্জের মূর্তির সাথে তার দিয়ে আটকানো থাকায় এই মুহূর্তে ওটা করা সম্ভব হয়নি। এখন সবার আগে প্রাণে বাঁচতে হবে। বেঁচে থাকলে আবার আসা যাবে না হয়।

'পেছন পেছন আসুন,' গ্রে বলল। 'আমি আগে গিয়ে দেখছি উপরের কী অবস্থা।'

একে একে সিঁড়ি বাইতে শুরু করেছে সবাই। ট্র্যাপডোরের ফোকড় বেয়ে আবছা আলো আসছে। একেবারে মুখের কাছে পৌঁছে উবু হয়ে কিছু একটা পরীক্ষা করল গ্রে। 'এখানে একটা লিভার আছে। সম্ভবত ভেতর থেকে ট্র্যাপডোর খোলা আর বন্ধ করার কাজে এটা ব্যবহার করতেন ফাদার কার্কার।'

'আপনার পরিকল্পনা কী? ' জিজ্ঞেস করল রোল্যান্ড।

লিনা অবশ্য ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারছে, তবে তার আগেই গ্রে জবাব দিল, 'আমি উপরে যাব, আপনারা দু'জন এখানেই থাকবেন। কোনও ঝামেলা দেখলে লিভার টেনে বন্ধ করে দেবেন দরজাটা।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল তরুণ যাজক। তবে তার মনোভাব বুঝতে পেরে আবারও মুখ খুলল গ্রে, 'রোল্যান্ড, যা বলছি তাই করুন। আপনার কাছে ওয়াশিংটনের ইমারজেন্সি ফোন নাম্বারটা আছে না?'

'হ্যাঁ।'

'আমার থেকে আলাদা হয়ে গেলে, কিংবা কোনও বিপদে পড়লে ওটাতে কল করবেন। ডিরেক্টর ক্রো সাহায্য করবেন আপনাদের।'

'ঠ...ঠ...ঠিক আছে,' ভাঙা গলায় জবাব দিল রোল্যান্ড।

গ্রে-কে মাথা নেড়ে চ্যাপেলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল লিনা। লিভারে চেপে বসেছে তার উত্তেজনায় কাঁপতে থাকা আঙুলগুলো। মনে একটাই চিন্তা।

হে ঈশ্বর... আমাকে যেন লিভারটা টানতে না হয়।

দুপুর ১:০২

চ্যাপেলের দরজায় এসে দাঁড়াল গ্রে, সামনেই দেখা যাচ্ছে পবিত্র সিঁড়ি- চার্চ থেকে চ্যাপেলে উঠে আসার একমাত্র পথ। গলায় লাগানো থ্রোট মাইক স্পর্শ করল সিগমা কমান্ডার। 'শেইচান, শুনতে পাচ্ছ?'

কোনও জবাব নেই।

সুড়ঙ্গ থেকে উঠে আসার পথে স্যাটেলাইট ফোন আর রেডিও, দুই মাধ্যমেই কয়েকবার মেয়েটার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়েছে গ্রে। তবে একবারও সাড়া পাওয়া যায়নি। কোনও গন্ডগোল আছে নিশ্চিত।

বর্তমান অবস্থান থেকে নিচের বাগানের দিকে সরাসরি চোখ রাখতে পারছে গ্রে দুপুরের রোদ পড়ে যেন দ্যুতি ছড়াচ্ছে পবিত্র সিঁড়ির পাথুরে ধাপগুলো। আপাতত সিঁড়িটা খালিই আছে, তবে যে কোনও সময় উঠে আসবে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা চার্চের প্রাঙ্গনে লাল ছাতাওয়ালা টুরিস্ট গাইডের সামনে জড়ো হয়ে আছে দর্শনার্থীদের একটা দল।

চুপ হয়ে যাওয়ার আগে চাইনিজ পর্যটকদের একটা দলের কথা বলেছিল শেইচান, এটাই সম্ভবত। ছয় হামলাকারী এদের সাথেই এসেছে এখানে।

এমন সময় কথা শেষ করে ছাতা উঁচিয়ে চ্যাপেলের দিকে ইঙ্গিত করল ট্যুর গাইড।

আঁতকে উঠল গ্রে।

সর্বনাশ! দর্শনার্থীরা উপরে উঠে আসবে এখন।

হামলাকারীরা এগিয়ে এলে বাধ্য হয়েই গুলি ছুঁড়তে হবে ওকে। তখন যদি সিঁড়িতে সাধারণ লোকজন থাকে, তাহলে কাজটা কয়েকগুণ কঠিন হয়ে যাবে।

বাগানের দিকে চার্চের দরজায় একটা নড়াচড়া লক্ষ্য করে সেদিকে চোখ ফেরাল গ্রে। দরজা খুলে সিস্টার ক্লারা বেরিয়ে এসেছে। সাথে জ্যাকেট পরা দু'জন চাইনিজ। হাত তুলে চ্যাপেলের দিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটা।

নানের সরলতায় গ্রে হাসবে নাকি কাঁদবে, বুঝতে পারছে না। লোকগুলো তাদের কথা জিজ্ঞেস করার সাথে সাথে উপরের দিকে দেখিয়ে দিয়েছে সে। কথা শেষ করে মেয়েটার উদ্দেশ্যে মাথা নিচু করে বাউ করল একজন। আরেকজন এগিয়ে এল বাগানের পথে লুকিয়ে থাকা আরও দুই জ্যাকেটধারীর দিকে। কিছু একটা বলল সঙ্গীদের, ওদের ব্যাপারে নানের কাছ থেকে শোনা কথাগুলোই সম্ভবত।

দু'জন এগিয়ে আসতে শুরু করল সিঁড়ির দিকে, বাকি দু'জন যাচ্ছে সেইন্ট বেনেডিক্টের গুহায়, জায়গাটা খুঁজে দেখতে চায়।

এই তাহলে হামলাকারীদের চারজন, ভাবল গ্রে। বাকি দু'জন নিশ্চয়ই নিচে পাহারা দিচ্ছে। নিজেকে ফাঁদে পড়া খরগোশের মতো মনে হচ্ছে তার। সিঁড়িটা ছাড়া নিচে নামার পথ একমাত্র পাহাড়ের খাড়া ঢাল। পাখা না থাকলে সেদিকে এগোনোর দুঃসাহস দেখানো উচিত নয় মোটেই।

গ্রে একবার ভাবল, ট্র্যাপডোর দিয়ে নিচে নেমে লুকিয়ে থাকে লিনা আর রোল্যান্ডের সাথে। কিন্তু পরক্ষণেই বাতিল করে দিল চিন্তাটা। লোকগুলো জানে, তারা এখানেই আছে। এখন উপরে এসে কাউকে না পেলে হয়তো ঝড়টা চার্চের নানদের উপর দিয়ে যাবে। তাছাড়া শেইচানও নিচেই কোথাও আছে।

মাথা ঠান্ডা করে শত্রুদের দিকে নজর দিল গ্রে। উঠে আসতে আসতে পরনের জ্যাকেটের চেইন খুলে ফেলেছে একজন। ভেতর থেকে কেভলার ভেস্টের সাথে

সাথে উঁকি দিচ্ছে জেড-এইচ-জিরো-ফাইভ মডেলের অ্যাসল্ট রাইফেল। গ্রে-র জানা আছে, চাইনিজ স্পেশাল ফোর্সে আজকাল বেশ জনপ্রিয় এই অস্ত্র। মাথায় একটা গ্রেনেড লঞ্চার ফিট করা।

রাইফেল আর গ্রেনেড লঞ্চারের বিপরীতে তার হাতে শুধু একটা সিগ সাওয়ার পিস্তল। শত্রুপক্ষের অবস্থানও তার চাইতে বেশ সুবিধাজনক। মরার উপর খাঁড়ার ঘা একেবারে। হতাশায় কপাল চাপড়াতে ইচ্ছা করছে সিগমা কমান্ডারের।

নিচে ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে আগত দর্শনার্থীরা। ঘাড় ঘুরিয়ে চ্যাপেলের দিকে তাকাতেই একটা বুদ্ধি এল গ্রে-র মাথায়।

চ্যাপেলে ভিন্ন ভিন্ন দিকে মুখ করা চারটা জানালা আছে। দুই হামলাকারীকে ভেতরে ঢুকিয়ে সে যদি জানালা দিয়ে বের হয়ে যায়, তবে অতর্কিতে আক্রমণের সুযোগ পাওয়া কঠিন হবে না।

তবে তার আগে লিনা আর রোল্যান্ডের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

ট্র্যাপডোরের দিকে এগোল সিগমা কমান্ডার। 'বন্ধ করে দিন। আমাদের বন্ধুরা এসে গেছে।'

মাথা নেড়ে সায় দিল লিনা। শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরেছে লিভার। তবে শত বছরের পুরনো মেকানিজম প্রতিবাদ জানাচ্ছে বেশ ভালোভাবেই। অবস্থা বেগতিক দেখে রোল্যান্ডও এগিয়ে এল। দু'জনে প্রাণপণে মোচড় দিতেই আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে আসতে লাগল ট্র্যাপডোরের মুখ।

সন্তুষ্ট হয়ে বেদির দিকে ছুট লাগাল গ্রে। লক্ষ্য- একদিকের খোলা জানালা। তবে জানালা পর্যন্ত পৌছানোর আগেই দরজার দিক থেকে গ্রেনেড লঞ্চারের আওয়াজ ভেসে এল।

ততক্ষণে তিন লাফে জানালার কাছে পৌছে গেছে সিগমা কমান্ডার। গ্রেনেডটা বেদিতে ঠোক্কর খেয়ে গড়িয়ে পড়েছে মেঝেতে। কিন্তু চ্যাপেলের বাইরে শরীর গলিয়ে দেয়ার ঠিক আগমুহূর্তে, এক ঝলক ভেতরের দৃশ্যটা দেখে ঠান্ডা হয়ে এল তার হাত-পা।

ট্র্যাপডোরের মুখটা এখনও পুরোপুরি বন্ধ হয়নি, আর গ্রেনেডটা গড়াতে গড়াতে টুপ করে ঢুকে পড়েছে একেবারে তার ভেতর। পরক্ষণেই, বুমমমমম...

জানালার বাইরে আছড়ে পড়তে পড়তে রোল্যান্ড আর লিনার মুখটা কল্পনা করল গ্রে।

এ আমি কী করলাম!

দুপুর ১:০৮

কী করছ তুমি, গ্রে?

সেইন্ট বেনেডিক্টের গুহায় লুকিয়ে আছে শেইচান। বিস্ফোরণের আওয়াজে যেন গায়ের হাড়-মাংস সব কেঁপে উঠেছে। গুহার বাইরেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে বিকট শব্দ। এতে অবশ্য ভালোই হয়েছে, ভাবল সাবেক আততায়ী। সাধারণ লোকজন ভয় পেলে সরে গেলে অন্তত কারও গায়ে গুলি লাগার ভয় থাকবে না।

গুহার ভেতরে থাকায় গ্রে-র সাথে রেডিও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। কে জানে বিস্ফোরণে ক্ষয়-ক্ষতি কেমন হলো। তাই মাথা থেকে চিন্তাটা সরিয়ে নিজের কাজে মন দিল নানের ছদ্মবেশধারী শেইচান। হামলাকারীদের দেখার সাথে সাথে চার্চে ঢুকে পোশাকটা চুরি করে আনে সে। চার্চের প্রাঙ্গণে মুক্তভাবে ঘোরাফেরা করতে হলে সেবিকার ছদ্মবেশের চাইতে উপযুক্ত আর কিছু হয় না।

উবু হয়ে সর্বশেষ শিকারের ঘাড় থেকে নিজের ছুরিটা খুলে আনল সাবেক আততায়ী। পাশেই পড়ে আছে তার সঙ্গী, লোকটার গলা এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত হাঁ করা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে।

শেইচান জানত, হামলাকারীরা অবশ্যই এই গুহায় অনুসন্ধান করতে আসবে। তাই তাদের আগেই এখানে এসে ফাঁদ পাতে সে। আকস্মিক আক্রমণে লোকগুলো কোনও প্রতিক্রিয়া দেখানোর সময় পায়নি। নিঃশব্দে প্রাণ দিয়েছে তার ছুরির আঘাতে।

তবে এখানে আসার আগে নিচে আরেকজনের ব্যবস্থা করে এসেছে দুর্ধর্ষ মেয়েটা। পার্কিং লটে পাহারায় ছিল ওই হতভাগ্য হামলাকারী। বুঝতে পারেনি শিকার করতে এসে নিজেই শিকার হতে চলেছে। গলায় ছুরির নির্মম পোঁচ অনুভব করার সময় বুঝতে পারে, অনেক দেরি হয়ে গেছে। টুরিস্ট বাসের তলায় এখন শুয়ে আছে লাশটা।

ছুরিটা শিকারের কাপড়ে মুছে কব্জির স্ট্র্যাপে ঢুকিয়ে রাখল শেইচান। লোকটার হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে এনে গুঁজল কোমরে। তারপর টেনেটুনে নিজের বেশভুষা ঠিকঠাক করে বেরিয়ে এল পথে। সাথে সাথে দেখা হয়ে গেল বাচ্চা নিয়ে পালাতে থাকা এক বিহ্বল মহিলার সাথে। গুলি আর গ্রেনেডের আওয়াজে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে সে, বুঝতে পারছে না কোনদিকে যাবে। নানের পোশাক পরা শেইচানকে দেখে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। হড়বড় করে কী বলে উঠল ম্যান্ডারিন ভাষায়। 'জিয়ান, জিউ মিং...'

'বোন, সাহায্য করুন আমাকে!'

হাত তুলে খেঁকিয়ে উঠে তাকে পার্কিং লটের গেটের দিকে এগোতে ইশারা করল সাবেক আততায়ী। তবে জবাবে শুধু বাচ্চাটাকে আঁকড়ে ধরল মহিলা, এগোতে ভয় পাচ্ছে।

চোখ পাকিয়ে পিস্তল বের করল শেইচান।

'পালাও!'

এবার ম্যাজিকের মতো কাজ হলো। আঁতকে উঠে বাচ্চা সমেত দৌড় শুরু করেছে মহিলা।

ঝামেলা মিটিয়ে সিড়িঁর দিকে এগোল শেইচান। দুই হামলাকারীকে উঠে যেতে দেখা যাচ্ছে। একজনের হাতে পিস্তল, অন্যজনের হাতে গ্রেনেড লঞ্চারযুক্ত অ্যাসল্ট রাইফেল। ধোঁয়া বেরোচ্ছে সদ্য ফায়ার করা লঞ্চারের মুখ থেকে।

পিস্তল উঁচু করল সাবেক আততায়ী। তবে লক্ষ্য বেশ দূরে। এখান থেকে গুলি লাগবে কি না নিশ্চিত না। তাই বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করল সে। আঁকড়ে ধরল থ্রোট মাইক।

'গ্রে, ঠিক আছ?'

সাথে সাথে ফিসফিসিয়ে জবাব এল। 'বেঁচে আছি আর কি!'

স্বস্তির আবেশ ছড়িয়ে পড়ল শেইচানের শরীরে। 'তোমার দরজায় দুই অতিথি দাঁড়িয়ে আছে।'

'জানি,' জবাব দিল গ্রে। 'আপ্যায়নের ব্যবস্থা করছি। তুমি বাকিদের ব্যবস্থা করো। যেভাবেই হোক, বেরোতে হবে এখান থেকে।'

'ঠিক আছে,' বলে চার্চের দিকে চোখ ফেরাল শেইচান।

ইতিমধ্যে তিনজনকে শুইয়ে ফেলেছে ও। গ্রে-র ভাগে দু'জন। সর্বশেষ হামলাকারী আশা করা যায় নিচেই আছে। নজর রাখছে চারপাশে। পিস্তলটা কাপড় দিয়ে আড়াল করে পিছিয়ে আসতে লাগল সে। দেখা যাক, কোথায় লুকিয়ে আছে মারাধনের শেষ ছেলেটি।

চার্চের দরজার কাছাকাছি পৌঁছাতেই উপর থেকে রাইফেলের আওয়াজ ভেসে এল। সাথে সাথে দৃশ্যপটে হাজির শেষ হামলাকারী। গুলির আওয়াজ শুনে দেখতে এসেছে, সঙ্গীরা কী করছে। মুচকি হেসে পিস্তল উঁচু করল শেইচান। লোকটার বুক লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল।

তবে পরপর কয়েকটা গুলি খেয়েও যখন তার বুক থেকে রক্তের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না, ততক্ষণে আসল কাহিনি বোঝা হয়ে গেছে শেইচানের। নিশ্চয়ই বডি আর্মার পরা আছে। শেষ রাউন্ডটা একেবারে শত্রুর কপালের মাঝখানে সেঁধিয়ে দিল সে।

এবার কাজ হলো। গুলির আঘাতে অর্ধেক উড়ে যাওয়া মাথা নিয়ে উল্টে পড়
হামলাকারী।

কাজ শেষ। স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল শেইচানের মুখ দিয়ে। তবে ততক্ষ
হাঙ্গামা দেখে হাজির হয়েছে ছাতাওয়ালি নিরীহদর্শন ট্যুর গাইড। চোখের সাম
গোলাগুলি দেখেও তার মুখে কোনও বিকার নেই। প্রমাদ গুনল শেইচান। হিসা
একটা ভুল হয়ে গেছে। জ্যাকেটপরা ছয় হামলাকারীর বাইরেও যে কেউ থাক
পারে, এটা সে ভাবেনি। আঁতকে উঠে খালি হয়ে যাওয়া পিস্তলটা ফেলে হোলস্টা
থেকে নিজের সিগ সাওয়ারটা তুলে নিল সে।

ধারণাটাকে সত্যি প্রমাণ করার জন্যই যেন ছাতার আড়াল থেকে ছুটে এল কয়ে
রাউন্ড গুলি।

ক্ষিপ্র খরগোশের গতিতে একদিকে শরীর গড়িয়ে দিল মেয়েটা। গুলি গা
আঘাত না করলেও হাত থেকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে পিস্তল।

ধুশ শালা...

দুপুর ১:১২

দরজার দিক থেকে গুলির শব্দ শুনে জানালা দিয়ে উঁকি দিল গ্রে। চ্যাপেলের ভেত
ঢুকে পড়ছে এক হামলাকারী। উচ্চস্বরে বাইরে দাঁড়ানো সঙ্গীকে জানাল, ভেত
কেউ নেই।

মুচকি হেসে তার মাথা লক্ষ্য করে দুটো গুলি পাঠাল গ্রে, জানে অন্য কোথা
গুলি করে লাভ নেই। পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে হারামজাদারা, প্রত্যেকের গা
কেভলার আর্মার।

অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল লোকটা। সঙ্গীর অবস্থা বেগতিক দে
দরজা থেকে সরে গেছে অন্যজন। তবে যাবার আগে জানালার বাইরে শত্রু
অবস্থান দেখে নিতে ভোলেনি।

দুই হাতে পিস্তল আঁকড়ে ধরে আবার চ্যাপেলে ঢোকার প্রয়াস পেল গ্রে। সত
নজর রাখছে চারপাশে। ক্ল্যাং...ক্ল্যাং...ক্ল্যাং... পরপর তিনবার ধাতব আওয়া
ছাড়ল হামলাকারীর গ্রেনেড লঞ্চার। এবারের লক্ষ্য তিন জানালা।

গাল বকে চ্যাপেলের মেঝেতে নামল গ্রে। সাথে সাথে আবারও তুমু
বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে উঠল গোটা পাহাড়। একে একে তিনবার।

দরজার পাল্লা আড়ালে দেখা যাচ্ছে লোকটাকে। ভাব ধরেছিল- সরে গিয়ে
আগের অবস্থান থেকে, তবে আসলে সরেনি। মেঝেতে পড়ে থাকা লাশটা তু

নিল সিগমা কমান্ডার। দরজা আর নিজের মাঝে ব্যারিকেড হিসেবে শরীরটাকে রেখে গুলি ছুঁড়তে লাগল শত্রুকে লক্ষ্য করে।

জবাব এল সাথে সাথে। গ্রে অনুভব করল, কিছু একটা যেন তার হাতের বাইসেপ চিরে বেরিয়ে যাচ্ছে। পরক্ষণেই আরেক বিভীষিকা... গ্রেনেড। বেদিতে আঘাত করে একেবারে তার পায়ের কাছে গড়িয়ে এসে থামল ২০ মিলিমিটার মাপের ধাতব সিলিন্ডারটা। আর কোনও উপায় না দেখে সামনে থাকা লাশটাকেই গ্রেনেডের উপর চাপা দিল সিগমা কমান্ডার। আশা করা যায় কেভলারের বডি আর্মার বিস্ফোরণের তীব্রতা সামলে নিতে পারবে।

বুমমমম...

শক ওয়েভের ধাক্কায় লাফিয়ে উঠল গ্রে-র শরীর, ছাদে বাড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। আঘাতের দমকে বুক থেকে সবটুকু বাতাস বেরিয়ে গেলেও, হাত থেকে পিস্তল ছাড়েনি। নিচের লাশটা ততক্ষণে পরিণত হয়েছে রক্ত-মাংসের দলায়।

ঝাপসা চোখে দরজা দিয়ে হামলাকারীকে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন চ্যাপেলে ঢুকতে দেখল সিগমা কমাণ্ডার। ভাবছে হয়তো, গ্রেনেডের আঘাতে শত্রুর দফারফা হয়ে গেছে। ধারণাটা ভুল প্রমাণ করার কোনও সুযোগ তাকে দিল না গ্রে। আলতো হাতে পিস্তল উঁচু করে লোকটার মাথায় খালি করল পুরো ম্যাগাজিন।

আস্তে আস্তে কালো হয়ে আসছে ঝাপসা দৃষ্টি। কতক্ষণ এভাবে ছিল, জানে না গ্রে। চোখে আলো পড়তে সম্বিত ফিরল। কেউ একজন কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে তাকে...লিনা। রোল্যান্ডও আছে তার পাশে।

ঠোঁট বাঁকিয়ে গ্রে কোনওরকমে শুধু একটা নাম উচ্চারণ করতে পারল।

'শেই...চান...'

দুপুর ১:১৫

গুলির আঘাতে গুঁড়িয়ে গেল বাগানে থাকা অ্যাঞ্জেলের একটা মুর্তির হাত।

নয় নম্বর...

মুর্তির পেছনে দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষের প্রতিটা বুলেট গণনা করছে শেইচান। গাইডের অস্ত্রও যদি সেইন্ট বেনেডিক্টের গুহায় লাশটা থেকে পাওয়া পিস্তলের মতো একই মডেলের হয়, তাহলে ম্যাগাজিনে গুলি ধরবে পনেরোটা। অর্থাৎ হামলাকারীর কাছে এখনও যথেষ্ট পরিমাণ অ্যামুনিশন রয়ে গেছে।

চার্চের বাগানে গত দুই মিনিট ধরে এই ইঁদুর-বেড়াল খেলা চলছে। উপরের চ্যাপেল থেকে আসা একের পর এক বিস্ফোরণের আওয়াজ সেই খেলায় ইন্ধন জোগাচ্ছে যেন। তবে প্রতিপক্ষের মাঝে হাল ছাড়ার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

শেইচান বেশ ভালো করেই বুঝে গেছে, শত্রুও তারই মতো ইস্পাতকঠিন মনোবল রাখে।

দৌড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে ছাতার আড়ালে থাকা ট্যুর গাইডের অবয়বটা বেশ কয়েকবার চোখে পড়েছে ওর। মেয়েটার বয়স বিশের বেশি হবে না। মাথার চুলগুলো কপাল বরাবর ছোট করে ছাঁটা, পেছনদিকে অবশ্য দৈর্ঘ্যটা বেড়ে কানের লতি পর্যন্ত এগিয়েছে। হালকা-পাতলা শরীরটা পাঁচ ফুটের মতো লম্বা। এজন্যই আরও ক্ষিপ্র হয়েছে তার গতি।

ছুটে যাওয়া পিস্তলটা আবারও হাতের মুঠোয় আনার চেষ্টা করেছিল শেইচান। তবে মেয়েটা তাকে সেই সুযোগ দেয়নি। বাধ্য হয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশে লুকানো থ্রোয়িং নাইফগুলো ব্যবহার করতে হয়েছে। তবে অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুঁড়ে দেয়া দুটো ছুরিই ছাতার সাহায্যে ঠেকিয়ে দিয়েছে ট্যুর গাইড। এখন মাত্র একটা ছুরিই অবশিষ্ট আছে।

এবার অন্তত ব্যর্থ হওয়া যাবে না।

স্টিলের তৈরি ছুরিটার ব্লেডের চকচকে তলে শত্রুর প্রতিবিম্ব দেখে নিল শেইচান। ছাতার আড়াল হয়ে একেবারে চার্চের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে হামলাকারী।

ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনা স্থির করল সাবেক আততায়ী। মূর্তির আড়াল থেকে বামদিকে খানিকটা বের করে দিল শরীর। এমন ভাব ধরল যেন, আড়াল ছেড়ে বের হতে চলেছে বাম দিক দিয়ে। সাথে সাথে সেদিকে নজর দিল ট্যুর গাইড। তবে পরক্ষণেই লাফিয়ে উঠল শেইচান, দিক পরিবর্তন করেছে চোখের পলকে। ডান দিক দিয়ে মূর্তির আড়াল ছেড়ে বেরিয়েই থ্রোয়িং নাইফটা ছুঁড়ে দিল বেসামাল প্রতিপক্ষের পা বরাবর। নিখুঁত লক্ষ্যভেদ, গাইডের হাঁটুর ঠিক নিচে গিয়ে বিঁধল ছুরিটা।

তবে তাতেও কোনও বিকার নেই মেয়েটার। মুচকি হেসে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে পড়া শেইচানের উদ্দেশ্যে অস্ত্র উঁচু করল সে। এক গুলিতেই ভবলীলা সাঙ্গ করার ইচ্ছা।

তার পেছনের দৃশ্য দেখে হাসি ফুটল শেইচানের মুখেও। দরজা খুলে চার্চ থেকে বেরিয়ে এসেছে সিস্টার ক্লারা, হাতে পিতলের তৈরি ভারি একটা ক্রুশ। হামলাকারীর মাথার উপর জিনিসটা নামিয়ে আনল মেয়েটা।

ঝটকা মেরে সামনে বাড়ল শেইচান। চোখের পলকে মাটি থেকে তুলে নিয়েছে মেয়েটার হাত থেকে ছুটে যাওয়া পিস্তল। নড়াচড়া করছে না চাইনিজ, তবে বুক ঠিকই ওঠছে-নামছে। একেবারে তার কপাল বরাবর নিশানা করল সাবেক আততায়ী।

'না!' আঁতকে উঠল ক্লারা।

যুবতী নানের চোখমুখে ভয় ফুটে উঠেছে। চোখের সামনে ঠান্ডা মাথায় করা খুনটা দেখতে পারবে না। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল শেইচান। দলের একমাত্র জীবিত সদস্য হিসেবে একে বাঁচিয়ে রাখা উচিত। গ্রে নিজেও হয়তো মেয়েটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইবে।

মাথা উঁচু করে চ্যাপেলের দিকে তাকাল সাবেক আততায়ী। উপর থেকে আর গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। গিয়ে দেখতে হবে, ঘটনা কী।

ক্লারার দিকে পিস্তলটা বাড়িয়ে দিল শেইচান। 'চালাতে পারেন?'

এক পা পিছিয়ে গেল নান। 'হ্যাঁ, কিন্তু...'

'পাহারা দেবেন কি না বলুন। নয়তো গুলি করছি আমি।'

এবার হাতে অস্ত্র তুলে নিল মেয়েটা। 'ঠিক আছে।'

আড়চোখে একবার শুয়ে থাকা চাইনিজের দিকে তাকিয়ে, মাটি থেকে নিজের পিস্তলটা তুলে নিল শেইচান। পরক্ষণেই উঠতে শুরু করল পবিত্র সিঁড়ি বেয়ে। প্রতি পদে পদে একটাই চিন্তা আঘাত করছে মাথার ভেতর।

গ্রে, তুমি ঠিক আছ তো?

দুপুর ১:১৮

বেদিতে হেলান দিয়ে বসে আছে গ্রে। চুমুক দিচ্ছে লিনার বাড়িয়ে দেয়া পানির বোতলে। পাশেই দাঁড়ানো প্রজননবিদ, রোল্যান্ডও সাথে আছে। গ্রেনেড বিস্ফোরণে বেঁচে গেলেও গায়ে অজস্র কাটাকুটির দাগ। তরুণ যাজকের মুখের একপাশে চিরে গিয়েছে লম্বালম্বিভাবে।

পায়ের আওয়াজ শুনে দরজার দিকে এগোল লিনা। আঁতকে উঠল সাথে সাথে। 'পিস্তল হাতে এক নান উঠে আসছে।'

সাথে সাথে আবারও পিস্তলের বাটে চেপে বসল গ্রে-র হাত।

তবে পরমহূর্তেই নিজের ভুল শুধরে নিল প্রজননবিদ। 'এটা তো দেখছি শেইচান।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে আবারও পেছনে হেলান দিল গ্রে। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

এক সেকেন্ড পরই বাজপাখির মতো ছুটে ঘরে ঢুকল সাবেক আততায়ী। সবাইকে অক্ষত দেখে স্বস্তি ছুঁয়ে গেল তাকেও। 'ভালোই আছ দেখছি।'

'তুমিও,' বলে মুচকি হাসল গ্রে। 'তবে নতুন পোশাকটা কিন্তু বেশ মানিয়েছে।'

এমন একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে এরকম হাসি-ঠাট্টা দেখে ভ্রু কুঁচকালো রোল্যান্ড। তবে কথাগুলোর পেছনে লুকিয়ে থাকা ভালবাসার গভীরতা বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয়নি।

'অনেক জিরানো হয়েছে,' শেইচান বলল। 'এবার উঠতে হবে। বেরিয়ে যেতে হবে এই অভিশপ্ত পাহাড় থেকে।'

রোল্যান্ড এগিয়ে গিয়ে গ্রে-কে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল।

'ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞতা জানাল সিগমা কমান্ডার। 'তবে গ্রেনেড বিস্ফোরণ থেকে বাঁচলেন কীভাবে আপনারা?'

জবাবটা লিনার মুখ থেকে বেরোল। 'গ্রেনেডটা গড়াতে গড়াতে একেবারে গুহার ভেতরদিকে চলে গিয়েছিল। প্রবল শকওয়েভ আর ছোটখাট কিছু পাথরের টুকরো ছাড়া বড় কিছু আমাদের আঘাত করেনি।'

'মেরির মুর্তিটার কী হলো?'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রোল্যান্ড। 'চেক করে দেখছি। গ্রেনেডটা একেবারে মুর্তির গোড়ায় বিস্ফোরিত হয়। ব্রোঞ্জের কাঠামোটা এই ধকল সইতে পারেনি। ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে একেবারে।'

'আর কঙ্কালটা?'

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল লিনার মুখ দিয়ে। 'ওগুলোর অবস্থা আরও খারাপ। কপাল ভালো, প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আগেই সংগ্রহ করে রেখে...'

নিচ থেকে একটা গুলির আওয়াজে তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল।

আঁতকে উঠে দরজার দিকে পিস্তল উঁচু করল শেইচান। মুখ দিয়ে খিস্তি বেরিয়ে এসেছে সাথে সাথে।

পরবর্তী কয়েক সেকেন্ড আর কিছু না হওয়ায়, সাহস করে জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল রোল্যান্ড।

'কী হলো?' জানতে চাইল লিনা।

তবে জবাবের অপেক্ষা না করে ছুটে বেরিয়ে গেল শেইচান। বাকিরাও তার পিছু নিল।

নিচে নেমে দেখা গেল, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে সিস্টার ক্লারা। উধাও হয়ে গেছে জখম হওয়া চাইনিজ। এগিয়ে গিয়ে নানের মাথা নিজের কোলে তুলে নিল শেইচান।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল গ্রে।

জবাবটা শেইচানের মুখ থেকে এল। 'কুত্তিটা আমার ছুরিই ব্যবহার করেছে। উপরে যাবার আগে ওর পা থেকে ওটা খুলতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

হাঁটু গেড়ে মেয়েটার পাশে বসল রোল্যান্ড। বুক আর পেটের মাঝামাঝি অংশে বিঁধে আছে একটা থ্রোয়িং নাইফ। তবে আশার কথা, সে এখনও মারা যায়নি।

'গুলি করতে চেয়েছিলাম...' তরুণ যাজকের জামার হাতা আঁকড়ে ধরে কাতরে উঠল ক্লারা। 'তবে বেশ দ্রুত...'

মেয়েটাকে শান্ত করার প্রয়াস পেল রোল্যান্ড। 'সব ঠিক আছে।'

'আমাকে ক্ষমা করবেন, ফাদার।' যন্ত্রণাক্লিষ্ট কণ্ঠে আবারও বলে উঠল নান।

'ক্ষমা করার মতো কিছু করোনি তুমি,' বলতে বলতে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বাকিদের উপর চোখ বুলাল রোল্যান্ড, বুঝতে পারছে না আর কী করবে।

তাকে বিব্রত অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্যই যেন উপত্যকার নিচ থেকে সাইরেনের আওয়াজ ভেসে এল। চার্চের দরজা দিয়েও বেরিয়ে এসেছে দুই নান, একজনের হাতে লাল রঙের ফার্স্ট এইড বক্স।

'আমাদের এখন যেতে হবে,' শেইচান বলল।

ইতস্তত করছে লিনা। 'কিন্তু...ওকে এই অবস্থায় রেখে...'

মেয়েটার হাত আঁকড়ে ধরে বসে আছে রোল্যান্ড। তারও একই অভিমত।

'সাহায্য আসছে,' জোর করল শেইচান। 'তার আগেই আমাদের চলে যাওয়া উচিত।'

'যান,' তরুণ যাজকের উদ্দেশ্যে ফিসফিস করে বলল ক্লারা। 'থামান ওই খারাপ লোকগুলোকে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রোল্যান্ড। 'প্রতিজ্ঞা করছি, তাই করব।'

লিনাও কথাটাতে মাথা নেড়ে সায় দিল।

পৌঁছে গেছে ফার্স্ট এইড বক্স হাতে থাকা নান। সরে গিয়ে তাকে কাজ করার সুযোগ করে দিল রোল্যান্ড। জানে না এই ধাওয়া, পাল্টা-ধাওয়ার শেষ কোথায়। তবে একটা প্রতিজ্ঞায় এখন বাঁধা পড়েছে সে।

কিছুতেই এটা ভাঙা চলবে না।

অধ্যায় পনেরো
৩০ এপ্রিল, সন্ধ্যা ৭:২২
বেইজিং, চীন

'ওরা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?' বিড়বিড় করে প্রশ্ন করল কোয়ালস্কি।

না-বোধক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মারিয়া, জানে না। একটা ইলেকট্রিক গাড়িতে কোয়ালস্কির পাশে বসে আছে সে। গালের ব্যান্ডেজে বারবার চলে যাচ্ছে লোকটার হাত। তার এই অবস্থার জন্য বাকো দায়ী, কথাটা জানতে পেরে অনুশোচনায় ভরে উঠেছিল মারিয়ার মন। তবে পরমুহূর্তেই ইশারাটা দেখে বুঝতে পারে, এটা পরিকল্পনারই অংশ।

নতুন জায়গাটা নিশ্চয়ই বাকোর মনে চাপ সৃষ্টি করছে। মারিয়া জানে, তার এখন গরিলাটার সাথে থাকা উচিত, তাকে শান্ত রাখা উচিত। কিন্তু হোমো মেগানথ্রোপাসের কঙ্কাল দেখানোর পর মেজর জেনারেল জিয়াইং লাও তাদের নতুন একটা গন্তব্যে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন।

এই মুহূর্তে ইলেকট্রিক গাড়িটার সামনের সিটে, ড্রাইভারের পাশে বসে ফোনে কথা বলছে মহিলা। ভাষা না বুঝলেও গলার স্বর শুনে বোঝা যাচ্ছে, বেশ রেগে আছেন তিনি।

কিছুক্ষণ পর গাড়িটা দুই পাল্লাওয়ালা একটা বিশালাকায় স্টিলের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। আগে থেকেই ক্যামোফ্লাজড পোশাক পরা একজন অপেক্ষা করছিল সেখানে। এগিয়ে আসতেই দেখা গেল, সে সেই কুখ্যাত গাও এর ভাই-লেফটেন্যাট কর্নেল চ্যাং সান।

'এখানেই থাকুন,' ঘুরে তাদের দিকে ফিরে আদেশ করলেন জিয়াইং, তারপর চ্যাং-কে নিয়ে সরে গেলেন খনিকটা তফাতে।

'এখানেই থাকুন,' নিচু গলায় মেজর জেনারেলের কণ্ঠ নকল করল কোয়ালস্কি। 'যাবটাই বা কোথায়!'

এমন সময় পেছনে দ্বিতীয় আরেকটা গাড়ির ব্রেক কষার আওয়াজ এলো। ওটা ড. ডেইন আরনডসহ কয়েকজন সশস্ত্র সৈনিক বহন করছে। দীর্ঘ দরজাটার উপর চোখ বুলালেন ফ্রেঞ্চ জীবাশ্মবিদ। সিলিং-এ লম্বা স্টিলের তৈরি ট্র্যাক পথের এপাশ থেকে শুরু হয়ে হারিয়ে গেছে দরজার ওপাশে।

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল আরনডের মুখ দিয়ে। 'ড. ক্রেন্ডাল, মনে হচ্ছে- আপনাকে যে কারণে এখানে আনা হয়েছে, তার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছি আমরা।'

মারিয়ার মনেও একই চিন্তা চলছে। কঙ্কালটা দেখার পর আর কোনও সন্দেহ নেই, ওটার ডিএনএ থেকে অতিমানব তৈরি করার প্রক্রিয়া চালাচ্ছে চাইনিজরা।

প্রশ্ন হচ্ছে, সাফল্যের পরিমাণ কতখানি?

'যতদূর বুঝতে পারছি,' আবারো মুখ খুললেন ড. আরনড, 'আপনাদের দুই বোনের গবেষণার বিষয় হচ্ছে এটা প্রমাণ করা যে, পূর্ববর্তী মানুষের সাথে নিয়ানডারথালদের মিলনের ফলেই ঘটে গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড। সেই সাথে নতুন রূপ পায় মানুষের বুদ্ধিমত্তার বিকাশ।'

'হ্যাঁ, ওটাই আমাদের কাজের মূলনীতি। ওই সংকরায়নের ফলে নতুন ধরনের একটা প্রজাতির উদ্ভব হয়, যারা তৎকালীন পৃথিবীকে দেখতে পায় পূর্বপুরুষদের চাইতে ভিন্ন চোখে।'

'আর তারাই ঘটায় গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড?'

'ঠিক তাই,' সায় দিল মারিয়া। 'জ্ঞান হচ্ছে একটা ছোঁয়াচে ভাইরাসের মতো, যা ক্রমাগত একজনের কাছ থেকে আরেকজনে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সংকরায়নের ফলে জন্মানো ওই হাতেগোণা কয়েকজনই পরবর্তীতে ছড়িয়ে যায় গোটা পৃথিবীতে। বাকিদের শেখায় উন্নত বিদ্যাবুদ্ধি, দৃষ্টিভঙ্গি। এখন যদি গবেষণার মাধ্যমে সেই অসাধারন জ্ঞানসম্পন্ন প্রাণীদের আবারও ফিরিয়ে আনা যায়, তাহলে ফলাফলটা বেশ সুদূরপ্রসারী হবে।'

'কিংবা ধ্বংসাত্মক,' যোগ করলেন আরনড। 'মানে যদি আবিষ্কারটা অপশক্তির হাতে পড়ে আর কি।'

মাথা নেড়ে সায় দিল প্রজননবিদ।

'আপনাদের কাজের অগ্রগতি কতটুকু?'

বাকোর কথা ভাবল মারিয়া। ইতিমধ্যেই নিয়ানডারথাল জিন ব্যবহার করে সংকরায়ন প্রক্রিয়া সফল হয়েছে। তবে চূড়ান্ত সাফল্য কতখানি হয়েছে, তা এখনও অজ্ঞাত। 'দেখুন, বুদ্ধিমত্তার পেছনে কোন কোন জিন ভূমিকা রাখে, সেটা এখনও সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। অনুমানের উপর নির্ভর করে সম্ভাব্য কয়েকটা ক্রমধারা নিয়ে কাজ করছি আমি আর আমার বোন। শেষ সিদ্ধান্তে আসা এখনও বেশ সময়সাপেক্ষ।'

'তবে আপনারা দুই বোনই কিন্তু এই সংকরায়ন নীতির আবিস্কারক। বাকিরা আপনাদের আবিস্কৃত পথই অনুসরণ করছে।' মন্তব্য করলেন জীবাশ্মবিদ।

আরনডের সাথে কথা বলার ফাঁকে মারিয়া লক্ষ্য করেছে, ধীরে ধীরে কঠোর হচ্ছে মেজর জেনারেলের কণ্ঠ। সেই সাথে পাল্লা নিয়ে নিভে আসছে চ্যাং-এর তেজ। লিনার নামটাও কয়েকবার উচ্চারণ করতে শোনা গেল।

'মনে হচ্ছে, ওদের বাড়া ভাতে ছাই ঢেলে দিয়েছে কেউ,' বিড়বিড় করে বলল কোয়ালস্কি। 'আর ছাইটা কে ঢেলেছে, সেটাও আন্দাজ করতে পারছি আমি।'

সন্ধ্যা ৭:২৯

'তো তাহলে ওরা কোথায় গিয়েছে, সে সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণাই নেই?' রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন মেজর জেনারেল জিয়াইং লাও। আরও একবার অকৃতকার্য হয়েছে চ্যাং সান।

মাথা নিচু করে আছে লেফটেন্যান্ট কর্নেল, মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ।

ইতালির অভিযান পুরোপুরি ব্যর্থ। লিনা ক্রেন্ডাল তো হাতছাড়া হয়েছেই, সেই সাথে চ্যাং-এর নিজ হাতে নির্বাচিত হামলাকারী দলের সবার লাশ উদ্ধার করেছে ইতালিয়ান ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড মিলিটারি সিকিউরিটি সার্ভিস- সিসমি।

'নিহত সৈন্যদের সবার পরিচয় সুরক্ষিত আছে,' মিনমিন করে বলল লেফটেন্যান্ট কর্নেল। 'খুঁজলেও চাইনিজ আর্মির সাথে তাদের কোনও যোগসূত্র আবিষ্কার করতে পারবে না কেউ। স্থানীয় কেউ হতাহত হয়নি। অর্থাৎ সহজেই ঘটনাটাকে দুর্বৃত্তদের বিচ্ছিন্ন হামলা বলে চালিয়ে দেয়া যাবে।'

কথা সত্যি, কিন্তু তাই বলে বারবার ব্যর্থতা মেনে নেয়া যায় না। আরও একবার চাইজিনদের হাত ফস্কে পালালো মারিয়ার বোন।

'আগে যদি জানাতেন- ওখানে আপনারও একজন লোক থাকবে,' জোর দিল চ্যাং। 'তাহলে আরও নির্ভার হয়ে কাজ করতে পারত আমার সৈন্যরা। হয়তো ফলাফল অন্যরকমও হতে পারত।'

'বাদ দাও,' নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠেছে জিয়াইং-এর মুখে। 'যা হওয়ার হয়ে গেছে। আশার কথা, হামলা থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছে ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট ওয়েই। লিনার সাথে থাকা অজ্ঞাতনামা শত্রুদের সম্পর্কে একটা ধারণাও পেয়েছে সে।'

ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট শু ওয়েই হচ্ছে শেংডু মিলিটারি রেজিয়ন স্পেশাল ফোর্সের একটা বিশেষ ইউনিট- ফ্যালকন এর সর্বকনিষ্ঠ সদস্য, সেই সাথে চৌকষও। সম্পর্কের দিক দিয়ে সে মেজর জেনারেল জিয়াইং-এর বোনের মেয়ে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাকে চ্যাং-এর টিমের উপর নজর রাখতে, প্রয়োজনে সাহায্য করতে পাঠিয়েছিলেন জিয়াইং।

বলে চলেছেন মহিলা, 'লিনা এবং ক্রোয়েশিয়ান যাজকের সাথে থাকা দলটা' ম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পেয়েছে ওয়েই। খুব সম্ভবত, ওরা আমেরিকান ।লিটারির কোনও একটা বিশেষ গ্রুপ। চার্চের এক নানের মাধ্যমে ওদের ওখানে ।ওয়ার কারণ সম্পর্কেও জানতে পেরেছে সে।'

'কী কারণ?' প্রশ্ন করল চ্যাং, ভয় সরিয়ে তার মনে জায়গা করে নিচ্ছে কৌতূহল।

'সতেরো শতকের এক যাজক- ফাদার অ্যাথেনাসিয়াস কার্কার-এর ব্যাপারে তথ্য রছে ওরা।'

ভ্রু কুঁচকালো চ্যাং। বুঝতে পারছে না, ওদের কাজের সাথে এই যাজকের ম্পৃক্ততা কোথায়।

জিয়াইং-এর জন্যও একই কথা প্রযোজ্য। 'কাজটাকে এখন ওয়েই এগিয়ে নিয়ে যাবে। তদন্ত করে দেখবে, আমেরিকান দলটা আমাদের লক্ষ্যে কোনওরকম বাধা সৃষ্টি করতে পারবে কি না। সেই সাথে হাতে পাওয়া মাত্র খুন করবে লিনা ক্রেন্ডালকে।'

'কিন্তু...আমাদের তো ওই প্রজননবিদকে জীবিত ধরার কথা ছিল!'

'ইতিমধ্যে ওটা করতে একাধিকবার ব্যর্থ হয়েছ তুমি। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আর কোনও ঝামেলায় না গিয়ে সরাসরি কাজ সারতে হবে। নিজের ইউনিট থেকে লোক নিয়ে একটা স্ট্রাইক টিম বানিয়ে কাজ শুরু করছে ওয়েই।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল চ্যাং। 'ঠিক আছে। আমি যথাসম্ভব সাহায্য...'

হাত তুলে তাকে থামালেন মেজর জেনারেল। 'কোনও দরকার নেই। তুমি বরং এখানকার কাজে মনোযোগ দাও।'

ঘুরে দাঁড়ালেন জিয়াইং। বুঝতে পারছেন, অপমানে কালো হয়ে গেছে লেফটেন্যান্ট কর্নেলের চেহারা। 'ফ্যাসিলিটির নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রাখবে তুমি। মনে রেখ, আর কোনও ব্যর্থতা আমি মেনে নেব না।'

নিঃশব্দে মাথা নত করে বাউ করল চ্যাং। রাগে ফেটে পড়তে ইচ্ছা করলেও উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সামনে এমন কিছু করাটা বোকামি হয়ে যাবে।

মুচকি হেসে গাড়ির দিকে এগোলেন মেজর জেনারেল।

এবার অতিথিদের দিকে নজর দেয়া যাক।

সন্ধ্যা ৭:২৭

এই যে আসছে...ঝামেলা।

জিয়াইং-কে গাড়ির দিকে এগোতে দেখে মনে মনে ভাবল কোয়ালস্কি।

সামনে এসে তাদের নেমে আসতে ইশারা করল মহিলা। 'আসুন, আপনাদে দেখাই আমাদের কাজ। সেই সাথে এটাও বলি, কীভাবে আমাদেরকে সাহায করতে পারেন আপনারা।'

গাড়ি থেকে নামতে নামতে নিজের ঘাড়ে আঁকা ডিএনএ ট্যাটুতে একবার হা বুলাল মারিয়া। তার জ্ঞানকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চাচ্ছে চাইনিজরা কিন্তু কাজটা কী?

খুলে দেয়া হলো লম্বা স্টিলের দরজার পাল্লা দুটো। সাথে সাথে জন্তুদের গায়ে বোটকা গন্ধের পাশাপাশি অ্যান্টিসেপটিক আর ব্লিচের গন্ধ যেন হামলে পড় নাকে।

সামনে অর্ধেক ফুটবল মাঠের সমান আয়তনের একটা বিশাল ঘর দেখা যাচ্ছে একপাশে সারি সারি খাঁচা, অন্যপাশে দেয়ালের সাথে লাগোয়া দশটা স্টিলে অপারেশন টেবিল। কয়েকটার সাথে আবার ফিতা আটকানো। সব মিলিয়ে জায়গাটা দেখতে একটা বড় মর্গের মতো।

একটা টেবিল সম্প্রতি ব্যবহার করা হয়েছে। সাদা ল্যাব কোট পরা একজ পানির পাইপ নিয়ে ওতে লেগে থাকা রক্ত পরিষ্কার করছে। সবচেয়ে ভীতিকর ব্যাপার হচ্ছে, টেবিলের সামনে থাকা কাউন্টারের উপর বোতলবন্দি বিভিন্ন ধরনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রাখা। বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে জ্ঞান নিতান্ত কম থাকা সত্ত্বেও, বেশ বড়সড় একটা হৃৎপিণ্ড চিহ্নিত করতে পারল কোয়ালস্কি।

ওরা ভেতরে ঢুকতেই যেন চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে কর্মরত লোকগুলোর মাঝে। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, মেজর জেনারেলের সামনে পড়তে চাচ্ছে না কেউ।

খাচাগুলোর উপর চোখ বুলালো মারিয়া। রিসার্চ ল্যাবে যেরকম দৃশ্য দেখা যায়, অনেকটা সেরকমই বলা চলে। গোলাপি নাক বাড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে কয়েকটা ইঁদুর। একটাতে কয়েকটা খরগোশ রাখা। অপেক্ষাকৃত বড় একটা খাঁচায় একটা শিম্পাঞ্জি, প্রানিটার হাতের গোড়া আর মাথার চূড়ার মতো অংশের লোম নিখুঁতভাবে চাঁছা।

কোয়ালস্কিকে এই অদ্ভুত ব্যাপারটাতে একটু কৌতুহলী মনে হচ্ছে। তবে পরের খাঁচার ভেতর চোখ পড়তেই উত্তর পাওয়া গেল। ছলছল চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে বাচ্চা শিম্পাঞ্জিটা। তবে শুধুমাত্র চোখদুটো ছাড়া শরীরের অন্য কোনও অংশ নাড়ানোর ক্ষমতা বেচারার নেই। ঘাড়ের উপর স্টিলের একটা ফ্রেম লাগিয়ে আটকে রাখা হয়েছে ওকে। মাথার খুলির উপরের অংশটা কাটা। ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে গোলাপি মস্তিষ্ক। বিভিন্ন রঙের কয়েকটা ইলেকট্রোড লাগানো আছে ওখানে। মৃদু একটা কাতরোক্তি ভেসে এল হতভাগা প্রানিটার কাঁপতে থাকা ঠোঁটজোড়া থেকে।

'শুয়োরের বা...' সবেমাত্র গালিটা দিতে শুরু করেছে কোয়ালস্কি, এমন সময় জর জেনারেলকে তার দিকে তাকাতে দেখে চুপ হয়ে গেল। এই অবস্থায় হিলাকে চটানো ঠিক হবে না।

দৃশ্যটা দেখে শিউরে উঠেছে মারিয়াও। চোখের কোণ বেয়ে নেমে এলো দু'ফোঁটা ল।

হতাশ ভঙ্গিতে প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে আছেন ড. আরনড। শিম্পাঞ্জিটার চোখে টে থাকা ভয় তাকেও স্পর্শ করেছে।

'এই দিকে,' তাড়া দিলেন জিয়াইং।

তার গন্তব্য- ল্যাবের শেষ মাথায় থাকা বিশালাকৃতির একটা জানালা। দেয়াল ড়ে থাকা পুরু কাঁচের ওপাশে বড়সড় একটা চেম্বার দেখা যাচ্ছে।

তড়িঘড়ি করে সেদিকে এগোল সবাই।

'আপনাদের দুই বোনকে অশেষ ধন্যবাদ, ড. ক্রেন্ডাল' হাঁটার ফাঁকে মুখ খুললেন জর জেনারেল। 'দেখুন আপনাদের সংকরায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে কতদূর গিয়ে গিয়েছি আমরা।'

কাছাকাছি গিয়ে জানালা দিয়ে একযোগে উঁকি দিল মারিয়া আর ড. আরনড। ক সেকেন্ড পর কোয়ালস্কিও যোগ দিল তাদের সাথে। পরমুহূর্তেই আঁতকে উঠে ছিয়ে এল।

'শুয়োরের বাচ্চা...'

ন্ধ্যা ৭:৪৮

নচ্যাং নদীর পাড়ে একটা বেঞ্চে বসে আছে মঙ্ক আর কিম্বারলি। সড়কবাতির লো পড়ছে কালো পানিতে। সোজাসুজি বেইজিং চিড়িয়াখানার মাঝখান দিয়ে গিয়েছে এই নদী। খানিকটা সামনেই একটা ফেরি ঘাট, এখন অবশ্য বন্ধ হয়ে ছে। ওখান থেকে যাত্রী নিয়ে চিড়িয়াখানার ভেতর দিয়ে চলাচল করে ছোট-বড় কারের বিভিন্ন নৌকা।

'কী ভাবছ?' প্রশ্ন করল মঙ্ক।

হাত নামিয়ে নিজের হাঁটুতে মৃদু ডলা দিল কিম্বারলি। প্রায় তিন ঘন্টা ধরে হাঁটতে য়েছে ওদের। প্রথমে পার্ক, তারপর চষে ফেলেছে বাইরের সব রাস্তাঘাট। সব ষে পুরো এলাকায় একটা চক্কর কেটে এখন এসে বসেছে উত্তরদিকের গেটের মনে থাকা এই বেঞ্চে।

'আমার ভুল না হলে জেড-এইটিন-এ মডেলের এই হেলিকপ্টার চাইনিজ আর্মি বহার করে, সৈন্য আর মালামাল বহনের কাজে।'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল মঙ্ক। পার্কের কোনায় হেলিপ্যাডে পার্ক করে রাখা যান্ত্রি ফড়িংটা তার চোখেও ধরা পড়েছে। এজন্যই মূলত এখানে বসেছে তা পরিস্থিতির উপর নজর রাখার উদ্দেশ্যে।

'বেশ তৎপরতা দেখতে পাচ্ছি ওদিকে,' বিড়বিড় করল সিগমা এজেন্ট।

কথা সত্যি। গত দশ মিনিট ধরে হেলিকপ্টারে মালপত্র তোলা হচ্ছে। সম্ভব ওড়ার জন্য প্রস্তুতি। মঙ্ক ভয় পাচ্ছে, এই বাহনে করেই অপহৃতদের কোথাও সরি নিচ্ছে চাইনিজরা। সশস্ত্র সৈন্যের একটা দল পাহাড়া দিচ্ছে সবকিছু।

'সামনে এগোব নাকি?' জানতে চাইল মঙ্ক। 'দেখি ওরা এখানে আছে কি না।'

'তারপর?' পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ল কিম্বারলি। 'গোটা এলাকা সৈন্যে গিজগিজ করে তাছাড়া তুমি নিশ্চিতভাবে জান না, অপহৃতদের এখানেই রাখা হয়েছে কি না। মুহূর্তে নিজের পরিচয় ফাঁস করা বোকামি।'

ঠিকই বলেছে মেয়েটা। তবে চুপচাপ বসে থাকা মঙ্কের ধাতে সয় না আসলে।

পার্শ্ববর্তী রাস্তা থেকে একটা গর্জন তাদের মনোযোগ কেড়ে নিল। বড় আকা সেনাবহনকারী একটা ট্রাক পার্কের গেটে এসে থেমেছে। সাথে সাথে লাফি নামতে শুরু করল সশস্ত্র সৈনিকের ঝাঁক। ট্রাকের উপরে থাকা হেভি আর্টিলা দায়িত্বেও আছে একজন। দু'জন এগিয়ে আসতে শুরু করেছে বেঞ্চের দিকে।

মঙ্ক ধারণা করল, পার্কের অন্য গেটটাও এরকম তীক্ষ্ম নজরদারির আওতায় নি আসা হয়েছে। কিম্বারলির দিকে ফিরল সে। 'এখনও বুঝতে পারছ না কিছু?'

মাথা নেড়ে সায় দিল মেয়েটা। 'এখানে আসলেই কিছু একটা ঘটছে। সেই স আমাদের আগমন সম্পর্কেও টের পেয়ে গেছে চাইনিজ কর্তৃপক্ষ। অন্ততপ আন্দাজ করেছে কিছু একটা।'

মুখে বলতে বলতে হাতে ইশারা করল সঙ্গীর দিকে। যাবার সময় হয়েছে।

উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটা ধরল দু'জনেই। সোজা রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে মঙ্ক। ম চিন্তা, এই বুঝি পেছন থেকে ডাক দেয় সৈন্যরা। হেলিকপ্টারের রোটর ঘুরতে শু করেছে, থপ থপ আওয়াজ আসছে কানে।

'তাকিও না,' সতর্ক করল কিম্বারলি।

তাকানোর প্রয়োজনও নেই। মনের চোখ দিয়েই মঙ্ক দেখতে পাচ্ছে, হেলিপ ছেড়ে আকাশে উঠে যাচ্ছে যান্ত্রিক ফড়িং। জানে না, কোয়ালস্কি আর মারিয়া ও আছে কি না। তবুও পরাজয়ের গ্লানিতে ছেয়ে আছে মন।

পার্ক ছেড়ে রাস্তায় উঠে এলো ওরা। যদি অপহৃতরা এখনও চিড়িয়াখা ভেতরেই থেকে থাকে, তবুও কিছু করার নেই। চাইনিজ মিলিটারি দিয়ে ভর্তি হ আছে পুরো এলাকা।

'এখন কী করবে?' জানতে চাইল কিম্বারলি।

'অপেক্ষা,' নিচুস্বরে জবাব দিল সিগমা এজেন্ট, তবে উত্তরটা নিজের কাছেই বেমানান ঠেকছে। 'আশা করা যায়, ক্যাট আর ডিরেক্টর ক্রো হয়তো জিপিএস ট্র্যাকারটাকে আবার শনাক্ত করতে পারবেন। না হলে আমরা গেছি।'

কিছুক্ষণ আগে ওয়াশিংটনের সাথে যোগাযোগ হয়েছে। পেইন্টার জানিয়েছেন, পাঁচ সদস্যের কমান্ডো দলটা ইতিমধ্যে বেইজিং-এ পৌঁছে গেছে। ওদের কাছ থেকে সংকেত পেলেই উদ্ধার অভিযান শুরু করা হবে।

ঘাড় ঘুরিয়ে চিড়িয়াখানার দিকে তাকাল মঙ্ক।

হচ্ছেটা কী ওখানে?

সন্ধ্যা ৭:৫০

নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস হচ্ছে না মারিয়ার।

এটা হতে পারে না...

বাঁকানো জানালা দিয়ে নিচের দিকে বাস্কেটবল কোর্ট সাইজের একটা চেম্বার দেখা যাচ্ছে। জায়গাটা পাথর কুঁদে তৈরি। দেয়ালে আবার গুহামুখের মতো বেশ কিছু গর্ত। তবে তাদের সবার নজর খোলা জায়গাটার উপর নিবদ্ধ।

প্রায় তিনতলা সমান নিচে পশমওয়ালা বিশালাকায় কিছু জন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবগুলোর উচ্চতাই আট থেকে নয় ফুটের ভেতর। ওজন কম করে হলেও অর্ধেক টন হবে। তুলনা করলে গেলে, পূর্ণবয়স্ক পাহাড়ি গরিলার দ্বিগুণ। পা-গুলো গাছের গুঁড়ির মতো মোটা, হাত অবশ্য সেই তুলনায় একটু চিকন। কয়েকটা বসে আছে কংক্রিটের মেঝেতে, তবে সবচেয়ে বড় জন্তুটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সদর্পে। ওটার পিঠের দিকের লোমগুলো পুরোপুরি সাদা রঙের। ঘাড় সোজা করে জানালার দিকে তাকিয়ে ধারালো হলদেটে দাঁতগুলোর প্রদর্শনী করছে যেন। নীরব গর্জনে বিকৃত হয়ে আছে মুখ।

পায়ের ফাঁকে পড়ে আছে সদ্য করা শিকার। মারিয়া অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, ওটা একটা মানুষের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ। গায়ে এখনও শতচ্ছিন্ন ইউনিফর্ম। এখানে আসার পথে কর্মচারীদের পরনে যেরকম দেখেছে, অবিকল সেরকম।

হতভম্ব প্রজননবিদ কিছু বলার আগেই জন্তুটা নিচু হয়ে কিছু একটা তুলে নিল, ছুঁড়ে মারল উপরের জানালা লক্ষ্য করে। ধুপ শব্দে জানালার গায়ে বাড়ি খেল জিনিসটা, তারপর আবার গড়িয়ে পড়ল নিচে। তবে যাবার আগে কাঁচের উপর রক্তের একটা রেখা ফেলে যেতে ভোলেনি। মৃত মানুষটার একটা হাত ওটা।

আঁতকে উঠল মারিয়া। 'এ...এ...এসব কী?'

মুচকি হাসলেন মেজর জেনারেল। 'আমরা এটাকে বলি- দ্য আর্ক। প্রাইমেট সেন্টারে বাকোকে আপনারা যে ঘরে রাখতেন, অনেকটা সেরকম।'

বাকোর সাথে নিচের প্রানিগুলোর তুলনা দেয়ার কথা ভাবতেই গা রি-রি করে উঠল মারিয়ার। 'এগুলো তো গরিলা...'

'সংকর,' কথাটা সংশোধন করে দিলেন জিয়াইং।

আগের ঘরে দেখা বিশালাকায় গরিলার কঙ্কালটার কথা মনে করল মারিয়া- গাইগান্টোপিথেকাস ব্ল্যাকাই। এই প্রানিগুলোর আকৃতিও অনেকটা সেরকম।

খুক খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করলেন ড. আরনড। 'মেগানথ্রোপাস কঙ্কালটার ডিএনএ ব্যবহার করে এই প্রানিগুলোকে জন্ম দিয়েছেন আপনারা। তাই তো?'

মাথা নেড়ে সায় দিলেন মেজর জেনারেল। 'কাজটা করতে প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। অবশেষে ড. ক্রেন্ডালদের সংকরায়ন নীতির মাধ্যমেই সফলতা লাভ করি আমরা। পার্থক্য শুধু, তারা নিয়ানডারথাল ডিএনএ ব্যবহার করেছিলেন, আমরা নিয়েছি মেগানথ্রোপাস ডিএনএ।' বলতে বলতে জানালার দিকে ইঙ্গিত করল মহিলা। 'এমনকি তাদের ধারা অনুসরণ করেই আমরা নমুনা হিসেবে গরিলা বেছে নিই। ফলাফল আমাদের আশার চাইতেও চমকপ্রদ হয়েছে। এই প্রানিগুলোর দৈহিক শক্তি আর সামর্থ সাধারণ গরিলার চাইতে দুই গুণ বেশি। আর মানুষের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা দাঁড়াবে দশ-এ।'

অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে জিয়াইং-এর দিকে তাকিয়ে আছে মারিয়া। কানে বাজছে তার বলা বাক্যটা- অবশেষে ড. ক্রেন্ডালদের সংকরায়ন নীতির মাধ্যমেই সফলতা লাভ করি আমরা। অনুশোচনায় ভরে উঠছে মন। ভাবতে ভাবতে আবারও নিচের দিকে তাকাল প্রজননবিদ। শিকারের বুক থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুলে এনে চিবুচ্ছে সাদা পশমওয়ালা হিংস্র সংকর গরিলা।

বলে চলেছেন জিয়াইং, 'মানুষের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার আগে কিছু বিষয়ের দিকে নজর দিতে হবে।'

'কী বিষয়?'

'এই প্রাণীগুলো প্রয়োজনের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি হিংস্র। খিদে পেলেই নিজেদের মধ্যে মারামারি করে রক্তারক্তি কান্ড ঘটাচ্ছে। এদের শান্ত রাখতে সবসময় পেট ভর্তি রাখতে হয়।'

মেগানথ্রোপাস গোত্রের ইতিহাস মনে করল মারিয়া। আশেপাশের জনবসতি থেকে মানুষ ধরে আনার পাশাপাশি নিজেদের মাংসেও এদের অরুচি ছিল না। ওই একই বৈশিষ্ট্য সংকর জীবগুলোর মাঝেও সংক্রমিত হয়েছে।

শীতল দৃষ্টিতে প্রজননবিদের দিকে তাকালেন মেজর জেনারেল। 'এজন্যই আপনার সাহায্য চাই আমরা। এদের শক্তির সাথে বুদ্ধিমত্তার মেলবন্ধন ঘটাতে হবে, যেটা আপনাদের টেস্ট সাবজেক্টের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছেন আপনারা।'

বাকোর শান্ত স্বভাবের কথা ভাবল মারিয়া। 'আপনারা যা বলছেন, তার জন্য শত শত সম্ভাবনা, শত শত জিনের ক্রমধারা নিয়ে কাজ করতে হবে। কাজটা বেশ সময়সাপেক্ষ। বছরের পর বছর লেগে যেতে পারে।'

'সেটা জানি,' সায় দিলেন জিয়াইং। 'এজন্যই বেনামে আপনাদের প্রজেক্টে সহায়তা করছিলাম আমরা। তারপরই ক্রোয়েশিয়ার পাহাড়ে ড. আরনডের আবিষ্কারের ব্যাপারে জানতে পারি।'

কথাটা শুনে অবাক হলেন জীবাশ্মবিদ। 'আমার আবিষ্কার আপনাদের কীভাবে সাহায্য করবে?'

'কারণ মানুষের পূর্বপুরুষ আর নিয়ানডারথালদের ওই সংকর থেকে যদি ডিএনএ উদ্ধার করা যায়, তাহলে আমরা সহজেই সংকর জীবের বুদ্ধিকেন্দ্রিক জিনগুলোর বিন্যাস সম্পর্কে জানতে পারব।'

চোখ বন্ধ করে সম্ভাবনাটা খতিয়ে দেখল মারিয়া। মহিলা ঠিকই বলছে। ওই কঙ্কালের ডিএনএ থেকে জেনেটিক কোডিং বের করা গেলে গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ডের রহস্যও সমাধান হয়ে যাবে। গোটা ব্যাপারটা আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে আসছে তার কাছে। এই প্রজেক্টের হর্তাকর্তা যে ই হোক না কেন, এরকম একটা আবিস্কারের ফলে বৈশ্বিক জৈবপ্রযুক্তির যুগে দিকপাল হিসেবে বিবেচিত হবে। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হলি গ্রেইল হিসেবে সম্মানিত হবে ওই হাড়গুলো। এজন্যই এভাবে মরিয়া হয়ে পেছনে লেগেছে চাইনিজরা। তাদের আসলে দোষ দেয়া যায় না, সুযোগ পেলে ডারপাও হয়তো একই পদক্ষেপ নিত। খেলাটা কোন দেশের একার নয়। পুরো বিশ্বই এখন ছুটছে এই লক্ষ্যের পেছনে।

'এবার আসি বাকোর প্রসঙ্গে,' নীরবতা ভাঙলেন জিয়াইং।

সোজা হয়ে দাঁড়াল কোয়ালস্কি। 'ওর ব্যাপারে আবার কী?'

'প্রানিগুলোর হিংস্রতার সাথে আরও একটা সমস্যা মুখোমুখি হয়েছি আমরা,' জবাব দিলেন জিয়াইং। 'প্রজনন সংক্রান্ত ব্যাপার এটা। পরীক্ষা করে দেখেছি- মহিলারা গর্ভধারণে সক্ষম হলেও, পুরুষ সংকরগুলো প্রজনন অক্ষম।'

মারিয়া জানে, সংকর প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ঘোড়া আর গাধার মিলনের ফলে মিউল অর্থাৎ খচ্চর নামে একটা প্রজাতি জন্মগ্রহণ করে। মহিলা মিউলদের কেউ কেউ প্রজননে সক্ষম হলেও পুরুষরা সবাই অক্ষম।

সায় দিলেন আরনড, 'বেশিরভাগ জীবাশ্মবিদের মতে, নিয়ানডারথাল সংকরদের ক্ষেত্রেও এই কথাটা প্রযোজ্য।'

'তাহলে তো,' মারিয়ার গলায় অবিশ্বাস। 'আধুনিক মানুষের দেহে যে নিয়ানডারথাল জিন আছে, সেগুলো মহিলা নিয়ানডারথালদের কাছ থেকে পাওয়া।'

'এজন্যই বাকোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ,' জোর দিলেন জিয়াইং। 'ধারণা করছি, আপনাদের ওই টেস্ট সাবজেক্ট সন্তান জন্মদানে সক্ষম।'

মাথা নাড়ল মারিয়া। 'নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। বাকোর বয়স মাত্র তিন বছর। মিলনের জন্য এখনও ওকে আরও তিন কি চার বছর অপেক্ষা করতে হবে।'

'সম্ভবত,' হাল ছাড়তে রাজি না চাইনিজ মহিলা। 'তবে আমরা এখানে বাকোকে দৈহিক সঙ্গম করাতে যাচ্ছি না। আমাদের শুধু ওর 'ওয়াই' ক্রোমোজোমটা দরকার, সেই সাথে বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটানো নিয়ানডারথাল জিনগুলো।'

মারিয়ার মুখ দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

বেচারা বাকো...

'ওর গালের কিছু টিস্যু, রক্ত আর বোন ম্যারো পরীক্ষা থেকেই ওগুলো পাওয়া সম্ভব,' বলে চলেছেন জিয়াইং। 'তবে সেই সাথে আমরা চাই ওর মস্তিষ্কের ব্যাপারে বিস্তারিত পর্যালোচনা করতে। এরকম একটা জীবিত টেস্ট সাবজেক্ট পাওয়া আসলেই ভাগ্যের ব্যাপার।'

'আপনারা ওর মস্তিষ্ক নিয়েও পরীক্ষানিরীক্ষা করতে চান?' অবাক হলো মারিয়া।

'হ্যাঁ,' সায় দিলেন মেজর জেনারেল। 'তবে এক্ষেত্রে অন্তত আপনারা দুই বোন আমাদের থেকে পিছিয়ে,' বলে খুলি কাটা শিম্পাঞ্জিটার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'আমরা জানতে পেরেছি, এভাবে মাথা ব্যবচ্ছেদ করেও কোনও প্রানিকে দুই বছরের বেশি সময় ধরে জীবিত রাখা সম্ভব। আর বাকো তো শিম্পাঞ্জিটার চাইতে বেশ বড়। ওর ক্ষেত্রে সম্ভবত সময়সীমাটা দ্বিগুণ হবে।'

'না!' দৃশ্যটার বীভৎসতা কল্পনা করে শিউরে উঠল প্রজননবিদ। 'আমি কিছুতেই এটা হতে দেব না।'

'আপনি হতে দিন বা না দিন, এটা হবেই। সার্জনরা ইতিমধ্যে অপারেশনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে।'

'কখন?' দুর্বল হয়ে আসছে মেয়েটার কণ্ঠ।

'কাল সকালে। ভ্রমণের ক্লান্তি কাটিয়ে ওঠার জন্য আজ রাতটা ওর বিশ্রাম প্রাপ্য।'

হতবিহ্বল মারিয়া কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। 'যদি...যদি তাই করেন, আমার কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা ছেড়ে দিন। প্রাণে মেরে ফেললেও আপনাদের কোনওরকম সাহায্য করব না আমি।'

কোয়ালস্কির দিকে স্থির হলো জিয়াইং-এর শীতল দৃষ্টি। 'আমাদের কথা অনুযায়ী না চললে, আপনার আগেই অন্য আরেকজনকে প্রাণের মায়া ত্যাগ করতে হবে। আমি কিন্তু খুব একটা দয়ালু না। প্রফেসর রাইটসনের সাথে কী করেছি, তা তো দেখেছেনই।'

কোয়ালস্কির দিকে তাকাল মারিয়া।

শ্রাগ করল সিগমা এজেন্ট। 'করতে দিন, যা পারে।'

মুচকি হেসে সাথে থাকা গার্ডকে চোখের ইশারায় কিছু একটা নির্দেশ দিলেন মেজর জেনারেল। মাতা-কাটা শিম্পাঞ্জির খাঁচার সামনে গিয়ে একটা যন্ত্রের নব ধরে মোচড় দিল লোকটা। জিনিসটা সম্ভবত শক দেয়ার কিছু হবে। সাথে সাথে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠল হতভাগা প্রানিটা। চিৎকারের তীব্রতায় মনে হতে লাগল যেন, কোটর ছেড়ে চোখ দুটো বেরিয়ে আসছে।

'থামুন!' চেঁচিয়ে উঠল মারিয়া।

তবে কোনও প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন জিয়াইং। যেন আমোদ পাচ্ছেন প্রানিটার চিৎকার শুনে।

চট করে পিছিয়ে গেল কোয়ালস্কি। নিজের দিকে টেনে নিল একটু তফাতে দাঁড়ানো গার্ডের অস্ত্র। রাইফেলটা লোকটার গলায় ঝুলতে থাকা অবস্থাতেই সেফটি ক্যাচ অফ করে ট্রিগার টিপে দিল।

বদ্ধ ঘরে বজ্রপাতের মতো কানে বাজল গুলির আওয়াজ ।

সরাসরি খাঁচার দিকে তাক করা ছিল রাইফেল। গুলির আঘাতে উড়ে গেছে হতভাগ্য শিম্পাঞ্জির অর্ধেকটা মাথা। থেমে গেছে তারস্বরে চিৎকার।

কাজ হয়েছে বুঝতে পেরে অস্ত্র থেকে হাত সরিয়ে নিল সিগমা এজেন্ট। ততক্ষণে বাকি গার্ডদের প্রত্যেকের রাইফেলের নল তার দিকে তাক করা হয়ে গেছে। এমনকি মেজর জেনারেলের হাতেও বেরিয়ে এসেছে পিস্তল।

গুলি করার বদলে পিস্তলটা আবারও হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখলেন জিয়াইং। 'আপনাদের জু-কীপারও দেখছি আপনার মতোই দয়ালু,' বলে মারিয়ার দিকে ফিরলেন তিনি। 'তবে আপনার কিংবা বাকোর কোনও সাহায্যেই আসবে না ও। তাই বলছি, আমার কথামতো কাজ করুন। প্রানিটাকে যথাসম্ভব কম কষ্ট দেয়া হবে। আপনার কাছ থেকে শুধু সাহায্য চাই না আমি...ফলাফল চাই।'

সবাইকে ল্যাব থেকে সরিয়ে নেয়ার জন্য গার্ডদের ইশারা করল চাইনিজ মহিলা। 'ঘরে যান।'

প্রতিবাদ জানাল মারিয়া। 'দাঁড়ান! আজ রাতটা আমি বাকোর সাথে থাকতে চাই।'

কঠোর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন মেজর জেনারেল।

'দয়া করুন,' প্রজনবিদের কণ্ঠে অনুনয়।

'ঠিক আছে, তবে যদি ওর কোনও ক্ষতি করার চেষ্টা করেন,' কোয়ালস্কির দিকে স্থির হলো মহিলার নজর। 'বাকোর বদলে আরেকজনের খুলি কাটব আমি।'

শ্রাগ করল সিগমা এজেন্ট। 'আমিও ওদের সাথে থাকব আজ। বাকোকে শান্ত রাখতে ড. ক্রেন্ডালের আমাকে প্রয়োজন পড়বে।'

'হুম,' সায় দিলেন জিয়াইং। 'তবে সারারাত আপনাদের উপর নজর রাখা হবে।'

ল্যাব থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে কোয়ালস্কির হাতটা খুঁজে নিল মারিয়ার আঙুলগুলো। পা-জোড়া অসাড় হয়ে আসছে ওর। মনে ঝড় তুলছে একটাই চিন্তা-কাল সকালে ওর সাথে কী ঘটতে যাচ্ছে, এটা জানা থাকার পরও কীভাবে বাকোর সামনে দাঁড়াব আমি!

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা শক্ত হাত ওর কোমর জড়িয়ে ধরল।

'সব সামলে নেব আমরা,' বিড়বিড় করে বলল কোয়ালস্কি।

'কীভাবে?'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সিগমা এজেন্ট। 'জানি না।'

'তাহলে...?

'আপনাকে শান্ত রাখার জন্য বললাম আর কি।'

ইলেকট্রিক গাড়িতে উঠে বসতে বসতে মুচকি হাসল মারিয়া। লোকটার সততা ওকে মুগ্ধ করেছে।

পাশে উঠে বসল কোয়ালস্কিও। 'চলুন দেখা যাক, আমাদের পশমওয়ালা খোকা কী করছে।'

রাত ৮:৪৪

মা-কে এগিয়ে আসতে দেখছে বাকো। চাপা খুশি ছড়িয়ে পড়ছে সারা গায়ে। কাছাকাছি আসার সাথে সাথে হাত দিয়ে ইশারা করছে মা।

[আমি তোমাকে ভালবাসি]

গরাদ ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল বাকো, তারপর জবাব দিল ইশারার ভাষায়।

[বাকোও মা-কে ভালবাসে]

মুচকি হাসল মা, তবে আগের মতো মন থেকে না। তার চোখের কোনায় খেলা করছে চাপা বেদনা। বাকো বুঝতে পারছে, মায়ের এই চিন্তা তাকে নিয়েই। তাই আবারও হাত তুলে ইশারা করল।

[আমি ভালো আছি]

খারাপ লোকগুলোর একজন এসে গেটের তালা খুলছে। এই মানুষগুলোর গায়ের গন্ধেই কেমন যেন অশুভ আভাস পায় বাকো। এদেরই একজন এসে বৈদ্যুতিক লাঠি দিয়ে কিছুক্ষণ আগে ভয় দেখিয়েছে ওকে।

অবশেষে খুলে গেল দরজা। মা ভেতরে ঢুকল। সাথে বিশালদেহী লোকটাও আছে। আগেই তার সাথে পরিচয় হয়েছে বাকোর। জো ওর নাম।

এগিয়ে এসে বাকোকে জড়িয়ে ধরেছে মা। পাল্টা আলিঙ্গন ফিরিয়ে দিচ্ছে সে ও। তবে কোথাও কিছু একটা সমস্যা আছে। আগের মতো মা তার নাকে চুমু দিল না। বরং তার চোখের কোনা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে পানি। কিন্তু কেন?

মায়ের আদর খাওয়া শেষ হলে, হাঁটু গেড়ে বসল বিশালদেহী লোকটা। এক হাতে ইশারা করছে।

[তুমি ঠিক আছ?]

মাথা নাড়ল বাকো। সেই সাথে বুকের সামনে দোলাল এক হাত।

[ভয় পাচ্ছি]

হাত দিয়ে ইশারা করতে করতে আরও খানিকটা এগিয়ে এল জো।

[আমাদের সাহস রাখতে হবে... তোমাকে এবং আমাকে]

তারপর মায়ের দিকে ইঙ্গিত করল।

[মায়ের জন্য]

বাকোও হাত নেড়ে জবাব দিল।

[ঠিক আছে...মায়ের জন্য]

সন্তুষ্ট হয়ে তার কাঁধ চাপড়ে দিল জো। 'ভালো ছেলে।'

দরজা লাগিয়ে চলে গেছে খারাপ লোকগুলো। তবে যাওয়ার আগে বালিশের মতো দেখতে দুটো বড় বড় কী যেন ছুঁড়ে দিয়ে গেছে। মা আর জো মিলে জিনিস দুটো খুলতে শুরু করল।

বাকোকে কৌতুহলী হয়ে উঠতে দেখে ইশারা করল মা।

[এগুলো বিছানা]

তবে কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না বাকো। এই গুটানো জিনিস আবার বিছানা হয় কীভাবে?

জো কিছু একটা বলতেই শব্দ করে হেসে উঠল মা। হাসিটা শুনতে বাকোর খুব ভালো লাগছে। তারপর বিছানাগুলোর একটা খোলা হয়ে যেতেই জো ভেতরে ঢুকে পড়ল।

খাওয়ার জন্য বাকোকে কয়েকটা কলা এগিয়ে দিল মা, তারপর ঢুকে পড়ল নিজের বিছানার ভেতর। মুচকি হেসে একটা হাত বের করে তাকে দু'জনের মাঝখানে শুতে ইঙ্গিত করল জো।

গুটিশুটি মেরে দুই স্লিপিংব্যাগের মাঝে শুয়ে পড়ল বাকো। মা চুমু খেল তার কপালে। ঠিক এটাই চাইছিল সে। এখানে আসার পর প্রথমবারের মতো ভয় সরিয়ে মনে জায়গা করে নিচ্ছে শান্তি।

হাত বাড়িয়ে জো-র একটা হাত জড়িয়ে ধরল সে। পরম নির্ভরতা যেন লুকিয়ে আছে সেই স্পর্শে।

শক্ত করে তার হাতটা আঁকড়ে ধরল জো। মুখে প্রশ্ন, 'এবার খুশি?'

পরম সুখের আবেশে বাকোর চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। উত্তরটা একেবারে মন থেকে বেরোল।

'হ্যাঁ।'

অধ্যায় ষোলো
৩০ এপ্রিল, বিকেল ৫:৪৪
রোম, ইতালি

'আমাদের ধারণা, চাইনিজরা এখনও কোয়ালস্কি আর মারিয়াকে চিড়িয়াখানার ভেতর কোথাও আটকে রেখেছে,' ফোনে বললেন পেইন্টার ক্রো।

সেলফোন কানে ধরে, গ্রেগোরিয়ান ইউনিভার্সিটির একটা ভবনের তিনতলার জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সিগমা কমান্ডার গ্রে পিয়ার্স। এটা আসলে রোল্যান্ডের এক সহকর্মীর অফিস। তাদেরকে এখানে থাকার সুযোগ করে দিয়ে বিশ্রাম নিতে চলে গেছেন ভদ্রলোক। পাহাড়ের হামলা থেকে বেঁচে ফেরার পর, পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করার জন্য এরকমই একটা নিরিবিলি জায়গা দরকার ছিল ওদের। একই কাজে ইউনিভার্সিটির ঐতিহ্যবাহী লাইব্রেরীটাও রোল্যান্ডকে সহায়তা করবে। তার অনুসন্ধানের সময়টুকু হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করার কাজে ব্যয় করছে গ্রে।

'জিপিএস ট্র্যাকারটার কি হলো?' প্রশ্ন করল সিগমা কমান্ডার। 'আর কোনও খবর পাওয়া যায়নি?'

'না। তবে চিড়িয়াখানায় মিলিটারি তৎপরতা দেখে মনে হচ্ছে, চাইনিজিরা বুঝতে পেরেছে যে আমরা ওদের পেছনে লেগেছি। অন্তত মঙ্কের রিপোর্ট শোনার পর ক্যাটের সেরকমটাই ধারণা।'

গ্রে জানে, স্বামীকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে সিগমার সেকেন্ড ইন কমান্ড ক্যাথরিন ব্রায়ান্ট। অবশ্য চিন্তা করাটাই স্বাভাবিক। কারণ ওরকম মার্কামারা চেহারাসুরত নিয়ে আর যে ই হোক, মঙ্ক অন্তত বেইজিং-এর ভিড়ে মিশে যেতে পারবে না।

'এখন কী করবে মঙ্ক?' জানতে চাইল সে।

'আপাতত ওকে আর ওর সঙ্গীকে চুপচাপ থাকতে নির্দেশ দিয়েছি। ক্যাট বিস্তারিত খোঁজখবর জানার চেষ্টা চালাচ্ছে। কেন আমেরিকার মাটিতে চাইনিজরা হামলা করল, কারণটা সম্পর্কে এখনও অন্ধকারেই আছি আমরা।'

শক্ত হয়ে এল ছোট ছোট ব্যান্ডেজের আড়ালে প্রায় ঢাকা পড়ে যাওয়া গ্রে-র মুখ, সারা শরীরেই এই অবস্থা। শুয়োরের বাচ্চারা শুধু আমেরিকাতেই না, এখানেও হামলা চালিয়েছে তাদের উপর। 'শুরু থেকেই চাইনিজরা ক্রোয়েশিয়ার গুহায় আবিষ্কৃত হাড়গুলোর দখল নিতে চেয়েছিল,' মন্তব্য করল গ্রে। 'কোনও না কোনওভাবে মানুষের বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত ক্রেন্ডালদের প্রজেক্টের সাথে সম্পর্ক আছে এই ব্যাপারটার।'

'তোমার ধারণা সত্যি,' সায় দিলেন পেইন্টার। 'জানতে পেরেছি, ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনের অপারেটিভ ড. অ্যামি ভুর মাধ্যমে বেনামে ক্রেন্ডালদের প্রজেক্টে টাকা ঢালছিল ওরা। তবে এতে কিছু প্রমাণ করা যাচ্ছে না। আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, কেনই বা চাইনিজদের কাছে এতখানি গুরুত্ব বহন করে ওই প্রাচীন হাড়গুলো।'

'সেটা নিয়েই কাজ করছি আমরা,' জবাব দিল গ্রে। ইতিমধ্যে স্যাংচুয়ারি অফ মেন্টোরেলায় কী পেয়েছে, সেটা সবিস্তারে পেইন্টারকে জানিয়েছে ও। 'রহস্যটা সমাধানের জন্য ফাদার কার্কারের পদাঙ্ক অনুসরণ করছি এখন।'

'কেন?'

'কারণ, ফাদার কার্কারও কিছু একটা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। এমন যুগান্তকারী কিছু, যেটা তৎকালীন সময়ে পৃথিবীর সামনে উন্মোচিত করতে চাননি তিনি। এই রহস্য সমাধান করতে পারলেই চাইনিজদের এক হাত নিতে পারব আমরা। আর কিছু না হোক, এটা অন্তত জানতে পারব- কেন ওরা ওই হাড় আর ক্রেন্ডালদের পেছনে লেগেছে।'

'ঠিক আছে,' সায় দিলেন পেইন্টার। 'দেখো কী করতে পারো।'

'পরবর্তী অগ্রগতি সম্পর্কে জানাব আপনাকে,' বলে কল কেটে দিল গ্রে। তবে তার দৃষ্টি এখনও নিচের রাস্তার দিকে নিবদ্ধ। পাহাড়ে হামলাকারীদের ভেতর এক চাইনিজ মেয়ে পালাতে সক্ষম হয়। স্থানীয় নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর কাছে রিপোর্ট এসেছে, হামলার পরপরই ঘটনাস্থল থেকে কিছুটা দূরে এক কৃষকের গোলাঘর থেকে একটা মোটর সাইকেল চুরি গিয়েছে। খুব সম্ভবত, পলায়নরত মেয়েটার কাজ।

আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও রাস্তায় সন্দেহজনক কিছু ধরা পড়ল না গ্রে-র চোখে। রাস্তায় যা আছে সবই হয় ভেসপা, নয় বাইসাইকেল। কোনও মোটরসাইকেলের চিহ্নমাত্র নেই।

এমন সময় পেছন থেকে সরু একটা হাত ওর কাঁধ আঁকড়ে ধরল।

শেইচান।

সাবেক আততায়ীর ঘরে ঢোকার বিন্দুমাত্র আভাস পায়নি সিগমা কমান্ডার। ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়েটার কোমর জড়িয়ে ধরল সে, টেনে নিল নিজের দিকে। অনেক হয়েছে গোলাগুলি, এখন একটু ভালবাসা বিনিময় করা যাক। পাতলা কোমল অধরে ডুবে গেল গ্রে-র নিষ্ঠুর ঠোঁটজোড়া।

আদিম আবেশে কতক্ষণ কেটেছে হিসেব রাখেনি কেউ। দরজার নব ঘোরানোর শব্দ বাগড়া দিল দু'জনার অনুভূতিতে।

দু'হাত ভর্তি বইয়ের স্তুপ নিয়ে ফিরেছে রোল্যান্ড। উত্তেজিত ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকেই হড়বড় করে মুখ খুলল সে।

'মনে হচ্ছে, গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা খুঁজে পেয়েছি আমি!'

বিকেল ৫:৫২

সোফায় আধশোয়া হয়ে ঝিমাচ্ছিল লিনা। যাজকের কণ্ঠ কানে যেতেই ধড়মড় করে উঠে বসল।

লোকটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা খুঁজে পেয়েছে!

সে নিজেও রোল্যান্ডের সাথে লাইব্রেরীরে যেতে চেয়েছিল। তবে প্রাচীন বইয়ের সংগ্রহশালায় যাজকরা ব্যতীত অন্যান্য জনসাধারণের ঢোকার অনুমতি নেই। তাই বিশ্রাম নিতে চলে আসে ও।

কয়েকবার চোখ পিটপিট করল লিনা, তন্দ্রা তাড়ানোর জন্য একবার কচলেও নিল ভালোমতো। তারপর দরজা পেরিয়ে ঢুকে গেল পাশের ঘরে। দেয়ালের একপাশে উঁচু তাকে সারি সারি পুরনো পান্ডুলিপি সাজানো। ধুলো জমে থাকায় বোঝা যাচ্ছে, বেশ অনেকদিন হলো এগুলো ছুঁয়েও দেখেননি রোল্যান্ডের বন্ধু।

ঘরের মাঝে রাখা বিশালাকৃতি লাইব্রেরী টেবিল থেকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল তরুণ যাজক। 'আসুন, দেখুন এগুলো। আমার ধারণা ঠিক হয়ে থাকলে, ধরে নেয়া যায় সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।'

এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসল লিনা। কৌতূহলে পুরোপুরি টুটে গেছে ঘুমের রেশ। গ্রে-ও এসে বসল পাশে, তবে শেইচান এখনও জানালার পাশে দাঁড়ানো। সতর্ক নজর রাখছে রাস্তার উপর। অবশ্য তাকে দোষ দেয়া যায় না। উপর্যুপরি হামলার শিকার হওয়ার পর সাবধানতা অবলম্বন না করাটাই বরং অস্বাভাবিক।

জ্যাকেটের পকেট থেকে কার্কারের জার্নালের কপিটা বের করে টেবিলে রাখল রোল্যান্ড। আগে থেকেই আরও কতগুলো বই রাখা আছে ওখানে। জার্নালের

প্রচ্ছদে গিলটি করা গোলকধাঁধাটা যেন জানালা দিয়ে আসা সূর্যের আলোয় চকচক করছে।

এখানে আসার পথে গাড়িতে বসে প্রাচীন ডায়েরীটায় চোখ বুলিয়েছে লিনা ভেতরে নানা ধরনের ছবি, মানচিত্র আর ল্যাটিন ভাষায় হিজিবিজি লেখা। বল বাহুল্য, বুঝতে পারেনি কিছুই।

'এটা থেকে কিছু জানতে পেরেছেন?' জার্নালটা দেখিয়ে প্রশ্ন করল প্রজননবিদ।

জবাবে ভ্রু কুঁচকালো রোল্যান্ড। 'আসলে বিস্তারিত পরীক্ষানিরীক্ষা করার সময় ব সুযোগ কোনওটাই পাইনি আমি। পৃষ্ঠাগুলোর সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করা বে সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে এখন আমাদের কাজে লাগতে পারে, ইতিমধ্যে এম কিছু পয়েন্ট চিহ্নিত করতে পেরেছি।'

'তাহলে এতক্ষণ যাবত লাইব্রেরীতে কী করছিলেন?' এবারের প্রশ্নটা গ্রে-র মু থেকে বেরোল।

'ব্রোঞ্জ মুর্তির ভেতর খোদাই করা মানচিত্রটার ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করেছি, বলতে বলতে ব্যাগ থেকে আইপ্যাড বের করল যাজক। 'মানচিত্রটা আমার কা বেশ পরিচিত মনে হয়েছিল। আসলে ফাদার কার্কারের লেখাতেই এটা সর্বপ্রথ দেখি আমি।'

আইপ্যাড অন করে গুহায় লিনার তোলা ছবিটা পর্দায় ফুটিয়ে তুলল রোল্যান্ড জায়গাটা দেখতে বেশ অনেকটা কোনও দ্বীপের মতো।
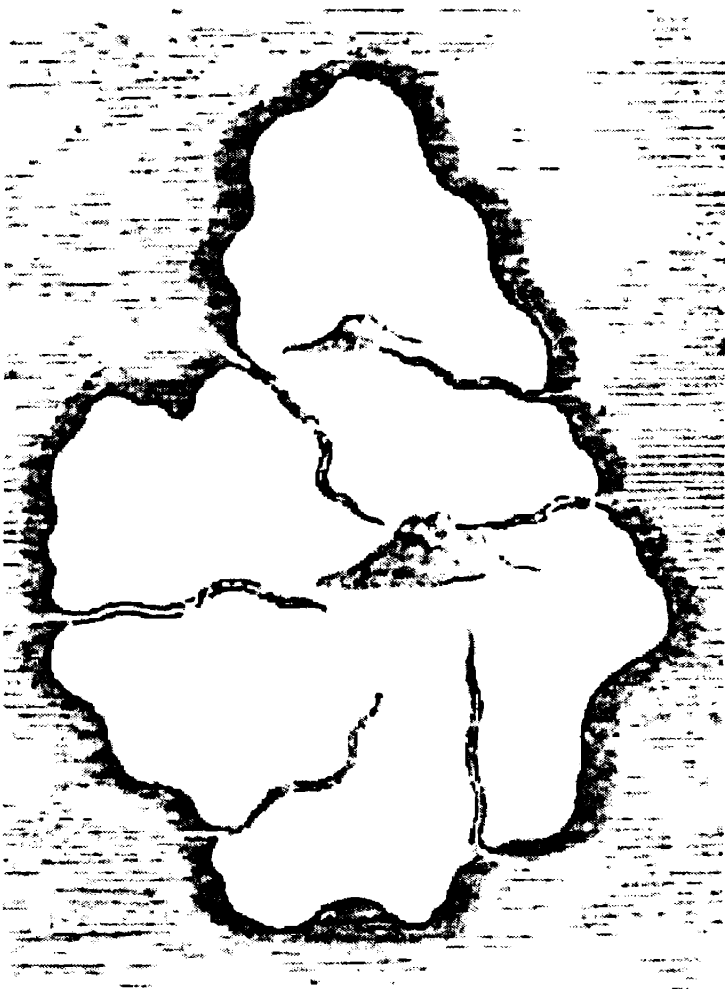
'কোন জায়গা এটা?' জিজ্ঞেস করল গ্রে।

ঘাড় সোজা করে তার দিকে তাকাল তরুণ যাজক, চেহারায় ফেটে পড়ছে চাপা উচ্ছ্বাস। 'আপনাদের সম্ভবত বিশ্বাস হবে না কথাগুলো। আসলে প্রথমে আমার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছিল না।'

সামনের দিকে ঝুঁকল লিনা। 'বুঝিয়ে বলুন।'

আইপ্যাডের স্ক্রিনে টাচ করল রোল্যান্ড। 'মানচিত্রটা ফাদার কার্কারের রচিত মান্ডাস সাবটেরানিয়াস বইতে আগেই দেখেছিলাম আমি, তবে ওখানে আরও বিস্তারিতভাবে আঁকা ছিল।'

নাম শোনা মাত্র বইটার কথা মনে করতে পারল লিনা। রোল্যান্ডের মাধ্যমেই ওটার সাথে পরিচয় হয়েছে সবার।

'এই যে, দেখাচ্ছি,' বলে আইপ্যাড ঘেঁটে মান্ডাস সাবটেরানিয়াসের একটা পৃষ্ঠার ছবি বের করল তরুণ যাজক। প্রয়োজনীয় সবকিছুই ডিভাইসটাতে সংরক্ষণ করা আছে।
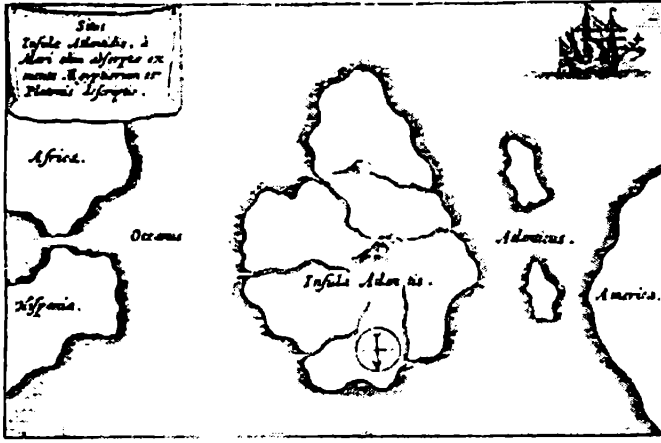
আসলেই ব্রোঞ্জের মুর্তির তুলনায় এখানে আরও বিস্তারিতভাবে আঁকা আছে মানচিত্রটা। এমনকি ল্যাটিন ভাষায় দ্বীপের নামটা পর্যন্ত লেখা।

'এখানে এটা কী লেখা?' মানচিত্রের উপরের কোনার দিকে ইঙ্গিত করল লিনা।

মুচকি হেসে বাক্যটা অনুবাদ করল রোল্যান্ড। 'প্লেটোর বর্ণনা এবং মিশরীয় মাধ্যমসমূহ থেকে পাওয়া আটলান্টিস দ্বীপের অবস্থান।'

'তার মানে এটাই কিংবদন্তীর সেই আটলান্টিস?' গ্রে-র কণ্ঠে নিখাদ বিস্ময়।

'হ্যাঁ,' মাথা নেড়ে সায় দিল রোল্যান্ড। 'মান্ডাস সাবটেরানিয়াসে ফাদার কার্কার উল্লেখ করেছেন, এই অবস্থানটা মিশর সংক্রান্ত অনুসন্ধানের সময় প্লেটোর বক্তব্য থেকে লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি। প্রখ্যাত সেই গ্রিক দার্শনিকের মতে, জায়গাটা ছিল বিশেষ ক্ষমতাধর শিক্ষকদের আবাসস্থল। মিশরীয় পুরাণেও উল্লেখিত আছে, ওখান থেকে দেবতাদের আশীর্বাদপ্রাপ্ত গুরুরা এসে ফারাওদের প্রাচীন জ্ঞান শিক্ষা দিতেন।'

লিনা অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, কথাগুলো গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড সংক্রান্ত তাদের মতবাদের সাথে মিলে যাচ্ছে। মানুষের পূর্বপুরুষ আর নিয়ানডারথালদের মিলনের ফলে জন্মলাভ করা উন্নত প্রজাতির জীবগুলোই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে অন্যদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছিল নিজেদের আধুনিক চিন্তাধারা।

বলে চলেছে রোল্যান্ড। 'এই ধরনের বিশেষ ক্ষমতাধর শিক্ষকদের কথা শুধু গ্রিক বা মিশরীয় উপকথাতেই সীমাবদ্ধ নেই। সুমেরীয় পুরাণেও এমন শিক্ষাগুরুদের কথা বলা হয়েছে। প্রাচীন সুমেরীয়রা তাদের নাম দিয়েছিল ওয়াচার। বাইবেলেও এই ওয়াচারদের ব্যাপারে উল্লেখ আছে। তবে এই সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা পাওয়া যায় ইহুদিদের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ- বুক অফ ইনোক-এ। প্রাচীন এই লিপিতে একেবারে ওয়াচারদের নামসহ পরিচয় দেয়া আছে।'

টেবিলে রাখা স্তুপ থেকে পুরনো একটা বই টেনে নিল রোল্যান্ড, তারপর বের করল আগে থেকেই চিহ্ন দিয়ে রাখা কাঙ্ক্ষিত পৃষ্ঠাটা। পড়তে শুরু করল জোর

গলায়- "ইউরিয়েল আমাদের শেখাল তারার গতিবিধি... সেমজাযা শেখাল জাদুবিদ্যা আর শিকড়ের ঔষধি গুণ... বারাকিজাল চেনাল জ্যোতিষশাস্ত্র... কোকাবেলের ঝুলিতে ছিল নক্ষত্রপুঞ্জ সম্পর্কিত জ্ঞান... আরাকিয়েল দেখাল মাটির গুণাগুণ... আর চাঁদের গতিপথ মাথায় গাঁথতে সাহায্য করল সারিয়েল।"

পড়া শেষ হলে বইটা বন্ধ করে লিনার দিকে তাকাল তরুণ যাজক। 'সংকর জীব সম্পর্কিত আপনাদের মতবাদকেও সমর্থন করছে প্রাচীন এসব পাণ্ডুলিপি। ডেড সী স্ক্রলে ওই ওয়াচার আর মানুষের রক্তের সংমিশ্রণ ঘটার কথা উল্লেখিত আছে। বলা হয়েছে তাদের মিলনের ফলে জন্মানো সন্তানের কথা।'

কার্কারের গুহায় ব্রোঞ্জ মূর্তির ভেতোর লুকানো ইভের কঙ্কালটার কথা মনে করল লিনা। বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, ওই সংকরদের আবির্ভাবের ফলেই তৈরি হয়েছে এসব উপকথা।

'তাহলে ফাদার কার্কার ভাবতেন, ইভও আটলান্টিস থেকে আসা ওই ওয়াচারদের একজন?' প্রশ্ন করল সে। 'এজন্যই মানচিত্রটা কঙ্কালের সাথে মূর্তির ভেতর খোদাই করা ছিল?'

'সম্ভবত। মূর্তির গায়ে মানচিত্রের অবস্থানটা মনে করে দেখুন। জিনিসটা এমন এক জায়গায় আঁকা ছিল, যেখানে মূর্তিটা বন্ধ থাকার সময় তাকিয়ে থাকত ইভের কঙ্কালের শূন্য কোটরদুটো।'

'তবে ওই কঙ্কালের সাথে আটলান্টিসের কিংবদন্তীর মেলবন্ধন ঘটানো একটু অদ্ভুত ঠেকছে না?' অনেকটা আপন মনেই প্রশ্নটা করল গ্রে।

ভাবনাটা নাকচ করে দিল লিনা, তাকাল টেবিলে রাখা চাঁদের প্রতিকৃতিটার দিকে। মূর্তির ভেতর থেকে জার্নালের সাথে এটাও খুলে এনেছে রোল্যান্ড। 'এই জিনিসটা ক্রোয়েশিয়ার ওই গুহা থেকে সরিয়ে এনেছিলেন ফাদার কার্কার। নিশ্চিতভাবেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, গুহায় যারাই বাস করে থাকুক না কেন, সময়ের চাইতে অনেক এগিয়ে ছিল ওরা। মনে করে দেখুন, ফাদার ম্যামথের হাড়কে দৈত্যের হাড় ভেবে ভুল করেছিলেন। তাঁর পক্ষে কঙ্কালটার ব্যাপারে ওরকম আকাশ-কুসুম কল্পনা করাটা অযৌক্তিক না।'

'তবে এক্ষেত্রে...' মিটিমিটি হাসছে রোল্যান্ড, '...ফাদার ভুল করেননি।'

ঝটকা দিয়ে তার দিকে ঘাড় ঘোরাল লিনা। 'মানে?'

স্ক্রিনে ফুটে থাকা মানচিত্রটার দিকে এক পলক তাকাল রোল্যান্ড, তারপর ধীরে-ধীরে মাথা তুলল উপরের দিকে। 'মানে হচ্ছে... আমি জানি, আটলান্টিসের অবস্থান কোথায়।'

সন্ধ্যা ৬:০৭

কথাটা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেছে সবাই।

আইপ্যাডটা টেনে নিয়ে মান্ডাস সাবটেরানিয়াসে আঁকা ছবিটায় জুম করল রোল্যান্ড।
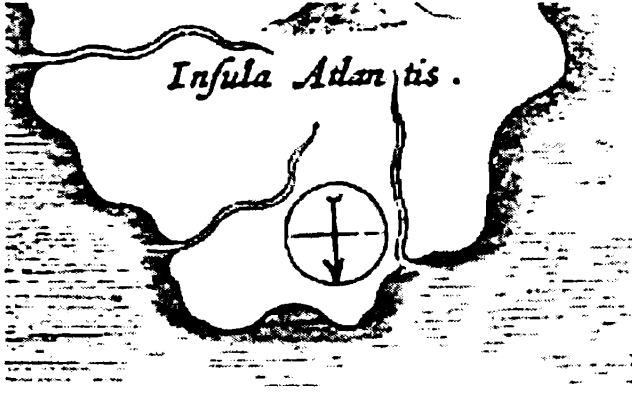
'লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, রেভারেন্ড ফাদারের আঁকা ছবিতে কম্পাসের তীর চিহ্নটা নিচের দিকে। অর্থাৎ ছবিটাতে নিচের দিক হচ্ছে উত্তর আর উপরদিক দক্ষিণ।'

'সাধারণ মানচিত্রের ঠিক উল্টো,' লিনা বলল।

'হ্যাঁ,' সায় দিল যাজক। 'তবে তৎকালীন মানচিত্রগুলো এভাবেই আঁকা হত,' বলে আরেকটা ছবি বের করল সে। 'ছবিটাকে এডিট করে উল্টো করে নিয়েছি আমি। ফলাফল কী পেলাম দেখুন।'
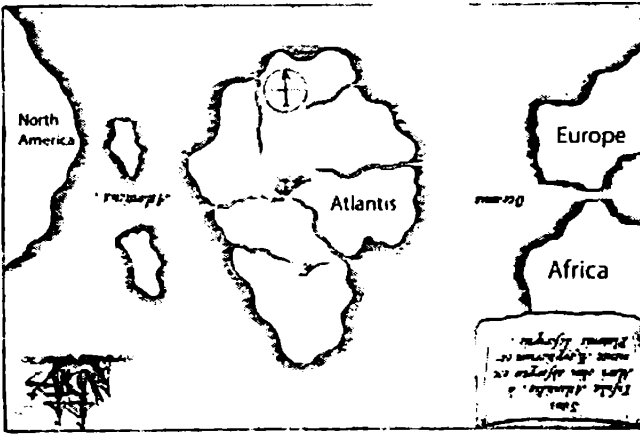
ভালোভাবে ছবিটা পর্যবেক্ষণ করছে গ্রে। 'আমার ধারণা যদি ভুল না হয়...তবে এই দ্বীপটা আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যবর্তী কোনও অংশে অবস্থিত। জায়গাটা অন্ততপক্ষে উত্তর আমেরিকা আর ইউরোপের মাঝামাঝি।'

'আপনার কথাটা প্লেটোর বক্তব্যকে সমর্থন করে,' বলে স্তুপ থেকে আরেকটা গ্রিক বই তুলে নিল রোল্যান্ড। 'তার মতে, আটলান্টিসের অবস্থান হচ্ছে পিলারস অফ হারকিউলিস নামক একটা প্রণালীতে...আজ যাকে আমরা ডাকি জিব্রাল্টার নামে।'

'অর্থাৎ, মেডিটেরানিয়ান-এর বাইরে!' যোগ করল গ্রে।

'ঠিক তাই,' বলে হাতে থাকা বইটার দিকে ইঙ্গিত করল রোল্যান্ড। 'তবে একইসাথে প্লেটো এটাও উল্লেখ করেছেন, আটলান্টিসের আয়তন হচ্ছে লিবিয়া এবং এশিয়া একসাথে করলে যেমন হবে, ঠিক ততটুকু।'

ভ্রু কুঁচকালো সিগমা কমান্ডার। 'তাহলে তো জায়গাটা কোনও দ্বীপ না, বরং একটা মহাদেশের আকারের।'

'আর জিব্রাল্টার প্রণালীর বাইরে, উত্তর আমেরিকার কাছাকাছি এমন কোন মহাদেশ আছে বলুন তো?'

খসখস করে গাল চুলকালো গ্রে। 'ওদিকে মহাদেশ বলতে তো একমাত্র দক্ষিণ আমেরিকা।'

'একদম ঠিক।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, আসলে দক্ষিণ আমেরিকাই হচ্ছে আটলান্টিস?' বলে মানচিত্রটার দিকে ইঙ্গিত করল গ্রে। 'অবশ্য দ্বীপটার উপকূল রেখার সাথে দক্ষিণ আমেরিকার কিন্তু বেশ মিল আছে।'

আইপ্যাড থেকে আরেকটা ছবি বের করল রোল্যান্ড। 'ব্যাপারটা আমার মাথাতেও ছিল। মিলিয়ে দেখার সুবিধার্থে বর্তমান দক্ষিণ আমেরিকার মানচিত্রের সাথে প্রাচীন মানচিত্রটা পাশাপাশি রেখেছি আমি। দুটো ছবি একসাথে মেলালে প্রমাণিত হয়, মিলটা শুধু উপকূল রেখাতেই নয়। বরং নদী আর পাহাড়ের সীমানাগুলোও খাপেখাপ মিলে যাচ্ছে।'
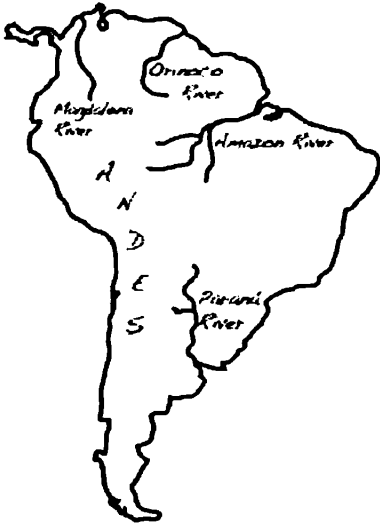
'হ্যাঁ, ঠিকই তো!' লিনার কণ্ঠে উচ্ছ্বাস। 'আমাজন, ওরিনোকো ছাড়া অন্যান্য প্রধান নদীগুলোর গতিপথও অবিকল একইভাবে আঁকা।'

হাত নেড়ে তাকে থামাল গ্রে। 'তারপরও কথা থেকে যায়। ধরে নিলাম, দক্ষি আমেরিকাই হচ্ছে কিংবদন্তীর আটলান্টিস, ওই বিশেষ ক্ষমতাধর শিক্ষকদে আবাসভূমি। তাহলে তাদের পূর্ববর্তী অবস্থানের কোনও প্রমাণ নেই কেন?'

'কে বলে নেই?' স্তূপ থেকে একটা আর্কিওলজিক্যাল ম্যাগাজিন বের কে টেবিলে মেলে ধরল রোল্যান্ড। 'দু'হাজার পনেরো সালে, ব্রিটিশ এস.এ.এ বাহিনীর তত্ত্বাবধানে হন্ডুরান অভিযাত্রীদের একটা দল রেইন ফরেস্টে হারানো এ শহরের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পায়। তারা মনে করে, ওটা হচ্ছে সিউদাদ ব্ল্যাংকা হাজার বছর আগে কলম্বিয়ান অধিবাসীদের গড়ে তোলা কিংবদন্তীর এক স্বর্ণশহর পনেরোশো ছাব্বিশ সালে স্প্যানিশ রাজার কাছে লেখা অভিযাত্রী হার্নান কর্টেস-এ এক চিঠিতে সর্বপ্রথম এই শহরের বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি উল্লেখ করেন ওখানকার অধিবাসীরা এক বানর দেবতার আশীর্বাদ নিয়ে জন্মেছে। এমনকি ওখানকার বাচ্চাকাচ্চারা বানরের মতো আচরণও করত।'

'বানরের মতো আচরণ,' কথাটা লিনার চিন্তার আগুনে ঘি ঢালল যেন 'তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের পক্ষে ইভের মতো বিশেষ বৈশিষ্ট্যধারী সংকরদের বানরের সাথে তুলনা করা অদ্ভুত কিছু না।'

বলে চলেছে রোল্যান্ড, 'স্যাটেলাইট ম্যাপিং এবং গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রাডারের সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে, ওখানকার জঙ্গলে আসলেই এরকম বেশ কিছু ভগ্নপ্রায় শহরের স্থাপনার অস্তিত্ব রয়েছে।'

সোজা হয়ে বসল গ্রে। 'তাহলে আপনার মতে, ওয়াচাররা ওরকম কোনও একটা শহরেই বসবাস করত?'

'সম্ভবত। ওই গোত্রের বিচারবুদ্ধির যে ধারণা আমরা পেয়েছি, তাতে বোঝা যায়, দিক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা ছিল ওদের। তাই নিজেদের প্রাচীন আবাসস্থল ছেড়ে জ্ঞানের বিস্তারের জন্য বাইরের পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া, এবং কখনও কখনও সেখানেই স্থানীয় গোত্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে থিতু হওয়াতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

আলতো করে মাথা নাড়ল লিনা। তার ধারণাও প্রায় একই রকম। 'তবে একটা খটকা রয়ে গেছে। যতদূর জানি, প্লেটো তো বলে গিয়েছেন- আটলান্টিস পরবর্তীতে সাগরের নিচে হারিয়ে যায়। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকা তো এখনও সদর্পে মাথা উঁচু করে জেগে আছে। তাহলে দুটো জায়গা এক হলো কীভাবে?'

আগে রেফারেন্স দেয়া প্রাচীন বইটার দিকে ইঙ্গিত করল রোল্যান্ড। 'কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। প্লেটোর বর্ণনার ধারাগুলো পুরোপুরি পড়লে বোঝা যায়, উনি সম্ভবত প্রাকৃতিক দুর্যোগ অর্থাৎ ভূমিকম্প, বন্যা ইত্যাদিতে জায়গাটা ক্ষতিগ্রস্ত

হওয়ার কথা বলেছিলেন। তাও পুরোটা না, অপেক্ষাকৃত ছোট কোনও শহর বা অংশ।'

'তারপরও...' হাল ছাড়তে রাজি নয় গ্রে। 'ধরে নিলাম, ফাদার কার্কার বিশ্বাস করতেন- চ্যাপেলের ওই হাড়গুলো হচ্ছে ইভের এবং ওগুলোর সাথে প্রাচীন ওয়াচারদের সম্পর্ক আছে। তাহলে আমাকে বলুন, এই সবকিছু মিলে দক্ষিণ আমেরিকার কোথায় দিক নির্দেশ করছে?'

আমেরিকান লোকটার একগুঁয়েমিতে মুচকি হাসল রোল্যান্ড। 'এসব আমাদের পথ দেখাচ্ছে ওই হারানো শহরের দিকে, যেখানে বসবাস করত কিংবদন্তীর ওয়াচাররা, জীবনের শেষ এগারোটা বছর লাগিয়ে যার পেছনে ছুটে বেরিয়েছেন ফাদার কার্কার। সেখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে সব রহস্যের সমাধান, সব উত্তর- কেন বারবার হামলা করা হচ্ছে আমাদের উপর, কেন অপহরণ করা হয়েছে লিনার বোনকে, কেনই বা ওই প্রাচীন হাড়গুলোর পেছনে আঠার মতো লেগে আছে চাইনিজরা।'

সন্ধ্যা ৬:১২

'ওই এগারো বছরে কতটুকু আবিস্কার করেন ফাদার কার্কার?' প্রশ্ন করল গ্রে।

'তার চাইতে বেশি আবিষ্কার করেছেন তার বন্ধু বিশপ নিকোলাস স্টেনো,' জবাব দিল তরুণ যাজক।

সিস্টার ক্লারার মুখে আগেই নামটা শুনেছে গ্রে। পেশায় জীবাশ্মবিদ এই লোকের সাথেই স্যাংচুয়ারি অফ মেন্টোরেলাতে অধিকাংশ সময় কাটাতেন ফাদার।

কার্কারের জার্নালটা হাতে তুলে নিল রোল্যান্ড। 'এতে উল্লেখিত আছে, বিস্তারিত অনুসন্ধানের জন্য একজোড়া তরুণ চোখ প্রয়োজন ছিল রেভারেন্ড ফাদারের। তাই ক্রিট, মিশর, আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে নিজে না গিয়ে বন্ধুকে পাঠাতেন তিনি।'

'কোন কাজে পাঠানো হয়েছিল তাকে?' জানতে চাইল লিনা।

'ওই হাড়ের রহস্য উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে,' জবাব দিল রোল্যান্ড। 'জার্নালটা যদিও এখনও পর্যন্ত পুরোটা পড়তে পারিনি। তবে এটুকু বুঝে গেছি, পৃষ্ঠাগুলোয় আঁকা মানচিত্র এবং বিভিন্ন স্থানের তথ্যগুলো সব নিকোলাস স্টেনোর জবানিতে বর্ণিত।'

আইপ্যাডে আরেকটা ছবি ফুটিয়ে তুলল তরুণ যাজক। 'এটা দেখুন, মান্ডাস সাবটেরানিয়াসে এই মানচিত্রটাও এঁকে গেছেন ফাদার। দক্ষিণ আমেরিকাকে আরও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে এখানে।'

গ্রে-র মুখে অনিশ্চিত ভাব স্পষ্ট। 'ফাদার কি এই বইটা ইভের হাড়গুলো পাওয়ার আগে প্রকাশ করেননি?'

'হ্যাঁ,' সায় দিল রোল্যান্ড। 'তিনি আসলে দক্ষিণ আফ্রিকার জলপথের বর্ণনা দেয়ার উদ্দেশ্যে মানচিত্রটা এঁকেছিলেন। কিন্তু মাঝের এই গর্তের মতো অংশটা দেখুন।'

'কী এটা?'

'ফাদার কার্কার বিশ্বাস করতেন, আন্দেজের গভীরে ভূগর্ভস্থ বিশাল একটা জলাধার লুকানো আছে।'

'বুঝলাম,' মাথা নাড়ল লিনা। 'কিন্তু আমাদের রহস্যের সাথে এর সম্পর্ক...'

'তাহলে দেখুন,' কথার মাঝখানে তাকে থামিয়ে দিল রোল্যান্ড। 'নিকোলাসের লেখা থেকে এই জিনিসটা পেয়েছি আমি। একই মানচিত্রের আরেকটু বিস্তারিত অংশ এটা।' বলে জার্নালের একটা পৃষ্ঠা খুলে সবার চোখের সামনে মেলে ধরল সে।
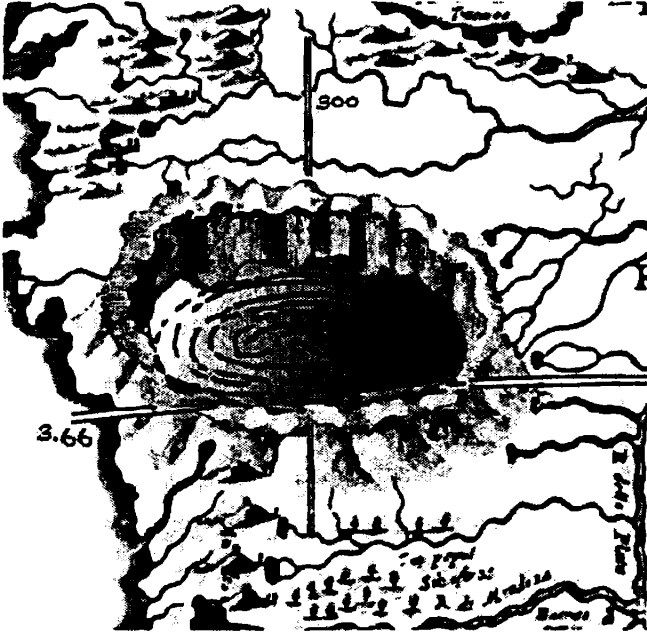
গর্তটার উপর পানির রেখার আদলে একটা চিহ্ন আঁকা।

'এটা তো...এটা তো জার্নালের প্রচ্ছদে ছাপা গোলকধাঁধাটা!' বিস্মিত কণ্ঠে লিনা বলল।

'হ্যাঁ,' সায় দিল রোল্যান্ড। 'ক্রিটের কিংবদন্তী...মিনোটোরের সেই গোলকধাঁধা।'

যাজকের মুখ থেকে পূর্বে শোনা এই চিহ্নের ইতিহাসের কথা মনে করল গ্রে। ক্রিটের পাশাপাশি ইতালি, স্পেন, আয়ারল্যান্ড, ফিনল্যান্ড এমনকি মহাভারতেও বিস্তৃত হয়ে আছে এই আকৃতিটা।

সবার উপর চোখ বুলিয়ে আনল রোল্যান্ড। 'আমার ধারণা, ক্রোয়েশিয়ার গুহায় পাওয়া নিদর্শন আর ফাদার কার্কারের অনুমানের উপর ভিত্তি করে ওয়াচারদের সেই হারানো শহরটা খুঁজে বের করেন নিকোলাস স্টেনো, আর মানচিত্র জায়গাটা চিহ্নিত করে রাখেন এই চিহ্নের সাহায্যে।'

'আগেই বলেছেন, আটলান্টিসের ডুবে যাওয়ার কিংবদন্তী হচ্ছে মূলত প্রাকৃতিক দূর্যোগ- যেমন ভূমিকম্প, বন্যা ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।' বলতে বলতে মানচিত্রের গর্তটার দিকে ইঙ্গিত করল গ্রে। 'তাহলে এটাই সেই জায়গা?'

'সম্ভবত,' সায় দিল রোল্যান্ড। 'অন্ততপক্ষে ফাদার কার্কার তেমনটাই বিশ্বাস করতেন। তাছাড়া নিকোলাসের দেয়া তথ্যের সাথে প্লেটোর বর্ণনাও মিলিয়ে দেখেছেন তিনি। দক্ষিণ আমেরিকার ওই অরণ্যে নিশ্চিতভাবেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা খুঁজে পেয়েছিলেন নিকোলাস। এমন কিছু, যা এই ছেঁড়া সুতোগুলোকে একসাথে জুড়তে সক্ষম।'

'ইশ!' লিনার কণ্ঠে হতাশা। 'একবার যদি যেতে পারতাম ওখানে!'

'অবশ্যই পারব।' জোর গলায় বলল রোল্যান্ড।

'কীভাবে?'

মুচকি হেসে মানচিত্রের দিকে ইশারা করল তরুণ যাজক। 'কারণ, আমি জানি জায়গাটা কোথায়।'

ভালোভাবে ছবিটার দিকে তাকাতেই গ্রে-ও ব্যাপারটা ধরতে পারল। 'রেখাগুলোর সাথে কতগুলো সংখ্যা বসানো আছে।'

মাথা নেড়ে সায় দিল রোল্যান্ড। 'ল্যাটিচিউড আর লঙ্গিচিউড। ফাদার কার্কারের সময় ল্যাটিচিউড এখনকার পদ্ধতিতে হিসাব করা হলেও, লঙ্গিচিউডের ক্ষেত্রে প্রাইম মেরিডিয়ানের পরিবর্তে ফেরো মেরিডিয়ান পদ্ধতি অনুসরণ করা হত।'

'মানটা রূপান্তর করতে পারবেন আপনি?' জানতে চাইল গ্রে।

'ইতিমধ্যে জায়গাটার অবস্থান নির্ণয় করে ফেলেছি আমি,' বলে আইপ্যাডটা টেনে নিয়ে পর্দায় একটা ছবি ফুটিয়ে তুলল যাজক।
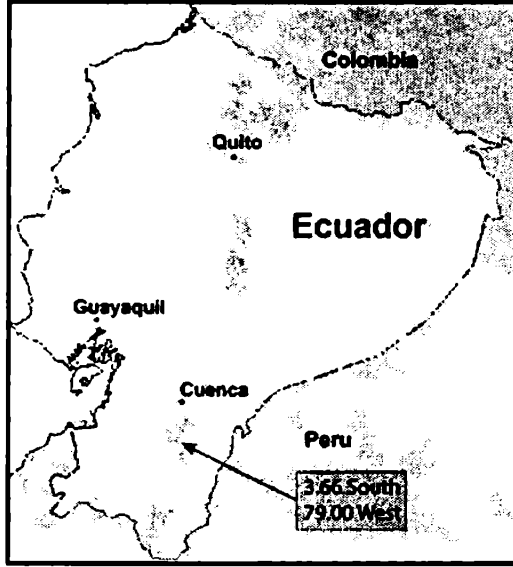
'এটা তো ইকুয়েডরে!' মন্তব্য করল সিগমা কমান্ডার।

নড করল রোল্যান্ড। 'আন্দেজ পর্বতের গভীরে, কোয়েঙ্কা শহর থেকে দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ মাইল।'

'এতখানি নিশ্চিত হচ্ছেন কীভাবে?' দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জানতে চাইল লিনা।

উচ্ছ্বাসের দীপ্তিতে যেন জ্বলজ্বল করছে রোল্যান্ডের চোখদুটো। 'কারণ, আমাদের আগেও মানুষজন ফাদার কার্কারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ওখানে গিয়েছে।'

'মানে?'

'পিএইচডি ডিগ্রীর জন্য গবেষণা করার সময় জানতে পারি, আগেই ফাদার কার্লোস ক্রেসপি নামে একজনের পা পড়েছে ওখানে। ফাদার কার্কারের মতোই হরেক কাজের কাজী ছিলেন এই যাজক। উদ্ভিদবিদ্যা, নৃবিদ্যা, ইতিহাস, সঙ্গীত

ছাড়াও বেশ কিছু বিষয়ে তার দক্ষতা ছিল। মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত, একাধারে প্রায় চল্লিশ বছর কোয়েঙ্কায় অবস্থান করেন এই মহান ব্যক্তিত্ব।'

'কোয়েঙ্কা?' লিনার কণ্ঠে বিস্ময়। 'ওটা তো আপনার চিহ্নিত জায়গাটার একেবারে পাশে।'

'ঠিক তাই। ভেবে পাচ্ছিলাম না, ফাদার ক্রেসপির মতো একজন কেন ওই প্রত্যন্ত অঞ্চলে এতগুলো বছর কাটিয়ে দিলেন? আজ সেই প্রশ্নের উত্তর মিলল।'

'আপনার ধারণা, তিনি ফাদার কার্কারের পথ অনুসরণ করেই ওখানে পৌঁছেছিলেন?'

'হ্যাঁ,' সায় দিল রোল্যান্ড। 'মিউজিয়াম কার্কারিয়ানামের ব্যাপারে তো আপনাদের আগেই বলেছি। ওখানে রেভারেন্ড ফাদার এবং নিকোলাস স্টেনোর বেশ কিছু চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি রক্ষিত ছিল। জাদুঘরটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বেশ অনেকগুলো বছর হয়ে গেলেও ওগুলোর কোনও তালিকা করা হয়নি। অবশেষে এই কাজের দায়িত্ব ফাদার ক্রেসপির ঘাড়ে এসে পড়ে।'

'তাহলে আপনার ধারণা, ওই কাগজপত্র ঘেঁটেই ইকুয়েডরের ব্যাপারে জানতে পারেন ফাদার ক্রেসপি?' জিজ্ঞেস করল গ্রে।

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তারপর কাজের অজুহাতে চলে আসেন এখানে?' এবারের প্রশ্নটা বেরোল লিনার মুখ থেকে।

না-বোধক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল তরুণ যাজক। 'তদন্তের পাশাপাশি ওখানকার অদিবাসীদের সাহচর্য পাওয়াও তার অভিযানের অন্যতম কারণ বলে আমি মনে করি। স্থানীয় লোকজনের কাছে বেশ সম্মানের পাত্র ছিলেন তিনি।'

'তারপর? ফাদার কার্কারের প্রতি এই অনুরাগের পুরস্কার হিসেবে কী পেয়েছিলেন ক্রেসপি?'

মুচকি হাসল রোল্যান্ড। 'ফাদার ক্রেসপি এমন এক রহস্যের জন্ম দেন, যা যুগের পর যুগ ধরে অভিযাত্রীদের ভাবিয়েছে। ব্রিটিশ অভিযাত্রীদের একটা দলও এই ব্যাপারটার সাথে জড়িত। তবে দলটা ব্রিটিশ হলেও তাদের নেতৃত্ব ছিল এক স্বনামধন্য আমেরিকানের হাতে।'

'স্বনামধন্য আমেরিকান?' গ্রে-র কণ্ঠে বিস্ময়।

টেবিলে রাখা চাঁদের প্রতিকৃতিটা হাতে তুলে নিল রোল্যান্ড। তাকাল গোল পাথরটার এবড়োখেবড়ো পৃষ্ঠের দিকে। 'নিল আর্মস্ট্রং।'

চাঁদে পা রাখা প্রথম মানুষ।

নামটা শুনে হতভম্ব হয়ে গেছে গ্রে। জবাবে কিছু বলার আগেই জানালার পাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠল শেইচান।

'ভাগো!'

সন্ধ্যা ৬:২২

জানালার সামনে থেকে লাফিয়ে সরে এসেছে শেইচান। তাল সামলাতে না পেরে বেকায়দাভাবে উল্টে পড়েছে ডেস্কের একপাশে।

একটু আগে ভ্যাটিকান ইউনিভার্সিটির একটা বিল্ডিং-এর সামনে, কালো পোশাক পরা কয়েকজন নানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ও। খানিকটা তফাতে রাস্তায় পার্ক করা একটা মোটরসাইকেল। দৃশ্যটা গুরুত্ব দেয়ার মতো তেমন কিছু না। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পরই বাহনটার দিকে এগোতে শুরু করে এক নান। কাছাকাছি পৌঁছে রোব উঠিয়ে তলা থেকে বের করে আনে অ্যাসল্ট রাইফেল।

সাথে সাথে ঘোমটার আড়ালে অর্ধেক ঢাকা মুখটা চিনতে পারে শেইচান। ক্লারাকে ছুরি মেরে পালানো সেই চাইনিজ ট্যুর গাইড। স্থির চোখদুটোতে শীতল দৃষ্টি।

সুস্থির হওয়ার আগেই জানালা দিয়ে কালো একটা আকৃতি উড়ে এল।

গ্রেনেড...

ততক্ষণে নড়ে উঠেছে গ্রে। রোল্যান্ডকে অফিসের দরজার দিকে ধাক্কা মেরেই একহাতে টেবিল থেকে তুলে নিয়েছে কার্কারের জার্নাল, অন্য হাতে লিনার কোমড় জড়িয়ে ধরা।

তবে শেইচানের ভাগ্য অতটা সুপ্রসন্ন না।

ঝটকা মেরে তলা দিয়ে লাইব্রেরী টেবিলটা পেরিয়ে এল সে। তারপর বেদম এক লাথি কষাল একদিকের কোনায়। সাথে সাথে উল্টে পড়ে তার আর গ্রেনেডের মাঝখানে একটা সুরক্ষা ঢাল তৈরি করল টেবিলটা।

বুমমমমম...

বিস্ফোরণের ধাক্কায় যেন কেঁপে উঠেছে গোটা ভবন। শকওয়েভের ধাক্কায় টেবিল সমেত দরজার সামনে পৌঁছে গেছে শেইচান। শ্র্যাপনেল ছিটানোর বদলে গলগল করে ধোঁয়া উদগিরণ করছে গ্রেনেডের ধাতব ছোট কাঠামো।

স্মোক গ্রেনেড...

চাইনিজ মেয়েটা চাইছে, আতঙ্কিত হয়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসুক ওরা।

গ্রে-ও ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। 'এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে,' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'তবে মেইন গেট দিয়ে না।'

'বেসমেন্ট।' পাল্টা চিৎকার করে জবাব দিল রোল্যান্ড। 'ওখানে একটা সার্ভিস টানেল আছে। কয়েক ব্লক দূরে একটা এক্সিটে গিয়ে উন্মুক্ত হয়েছে ওটা।'

'চলুন,' তাড়া দিল গ্রে।

ছুট লাগানোর আগে শেষবারের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়ার দিকে নজর দিল শেইচান।

চাইনিজরা বড্ড বাড় বেড়েছে।

সন্ধ্যা ৭:৩১

পিয়াজা নাভোনার অদূরে রঁদেভু পয়েন্টে, গর্জাতে থাকা মোটরসাইকেলে বসে আছে ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট শু ওয়েই। ডুবতে থাকা সূর্যের লালচে আলো পড়ে যেন দ্যুতি ছড়াচ্ছে সামনের স্কয়ারটা। পর্যটকরা গিজগিজ করছে আশেপাশে, তবে কেউ বিশেষ নজর দিচ্ছে না তার উপর।

ফোনটা কানে ঠেকাল ওয়েই, বেইজিং-এ রিপোর্ট করতে হবে।

কল রিসিভ হলো সাথে সাথে। 'বলো।'

মেজর জেনারেলের গম্ভীর কণ্ঠ কানে আসতেই পিঠ সোজা করে বসল ওয়েই, যেন জাঁদরেল খালা তার সামনেই আছে। 'টার্গেট পালিয়েছে। মেইন গেটে পাহারায় থাকা লোকগুলো কাউকে হাতে পায়নি।'

'খবরটা শুনে খুশি হতে পারলাম না।'

জিয়াইং-এর কণ্ঠে ফুটে ওঠা রাগের আভাস অনুভব করতে পারছে ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট। অ্যামবুশটা ঠিক জুতসই হয়নি। আসলে ভালোমতো পরিকল্পনা করার মতো তেমন সময় বা সুযোগ কোনওটাই পায়নি ও। তারই সুযোগ নিয়েছে প্রতিপক্ষ।

স্যাংচুয়ারি থেকে পালিয়ে আসার সময় ওয়েই দেখতে পায়, পার্কিং লটে একটাই মাত্র গাড়ি দাঁড়ানো। বাহনটাতে করে কারা এসেছে, বুঝতে বিন্দুমাত্র সময় লাগেনি ওর। তাই পালানোর আগে গাড়িটায় একটা ট্র্যাকার ছেড়ে এসেছিল। এভাবেই শত্রুদের তাড়া করে রোমে এসে হাজির হয় সে।

হলে একজন নানকে খুঁজে পেতে অজ্ঞান করে ফেলে তাকে, খুলে নেয় মহিলার পোশাক। তারপর ছদ্মবেশ ধরে অপেক্ষা করতে থাকে ওই ভবনেই। এক সময় দেখতে পায়, লাইব্রেরীর দিকে এগোচ্ছে লিনার সঙ্গী ক্রোয়েশিয়ান ওই যাজক। ওখানেই লোকটাকে শুইয়ে ফেলার পরিকল্পনা করে। কিন্তু খাপ থেকে ছুরি খুলে আনতে আনতেই লাইব্রেরীর সংরক্ষিত অংশে ঢুকে পড়ে ব্যাটা। ওখানে আবার সর্ব-সাধারনের প্রবেশের অনুমতি নেই।

ফ্রন্ট ডেস্কে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে, লোকটা নাকি সতেরো শতকের এক যাজকের সম্পর্কে অনুসন্ধান করছে। স্যাংচুয়ারির নানও একই কথা বলেছিল।

যাজক লাইব্রেরীতে কাজ করার সময় মেজর জেনারেলকে রিপোর্ট করে ওয়েই। মেরে ফেলার পরিকল্পনা বাতিল করে লোকটাকে চোখে চোখে রাখার আদেশ দেন তিনি। ওরা কী নিয়ে অনুসন্ধান চালাচ্ছে, সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে বলেন।

তাই পুরো দলটাকে খোলা জায়গায় বের করে আনার পরিকল্পনা করে ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট। ঘরে ছুঁড়ে দেয় স্মোক গ্রেনেড। সেই সাথে মেইন গেটে পাহারায় রাখে নিজের লোকজনকে। তবে স্বীকার করতেই হবে, শিকারের মাথায় বেশ বুদ্ধি আছে। বিকল্প পথ ব্যবহার করে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে সবাই।

'ব্যর্থ হয়েছ তুমি,' ফোনে আবারও মেজর জেনারেলের গলা শোনা গেল। 'আর কোনও ব্যর্থতার খবর আমি বরদাশত করব না।'

'আর এমন কিছু হবে না,' তাকে আশ্বস্ত করল ওয়েই।

'এতখানি নিশ্চিত হচ্ছো কীভাবে?'

হাতে ধরে রাখা জিনিসটার উপর চোখ বুলালো ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট। গ্রেনেড হামলার পর উপরে উঠেছিল সে। তখনই ঘরে পড়ে থাকা অবস্থায় পায় এটা... ক্রোয়েশিয়ান যাজকের আইপ্যাড।

সুইচ টিপে ডিভাইসটা চালু করল ওয়েই। বের করে আনল মানচিত্র আঁকা একটা পৃষ্ঠার ছবি। মুচকি হাসি খেলছে তার ঠোঁটে।

'কারণ ওদের গন্তব্য সম্পর্কে জেনে গেছি আমি।'

তৃতীয় অংশ

Σ

হারানো শহর

অধ্যায় সতেরো
১ মে, সকাল ৮:০৪
বেইজিং, চীন

আর যাই করো না কেন, নড়ো না।

নিজের বিছানায় শুয়ে আছে কোয়ালস্কি, কিছুক্ষণ আগে উঠেছে ঘুম থেকে। উঠে দেখে এক হাত চাপা পড়ে আছে গরিলাটার নিচে। নাক ডাকছে বাকো, গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে গোল হয়ে। মাথা রেখেছে তার আরেক হাতে। মারিয়া শুয়ে আছে বাকোর অন্য পাশে। প্রানিটার সাথে একই স্লিপ-ব্যাগ ভাগাভাগি করে নিয়েছে ও। মেয়েটার এক হাত বাকোর কাঁধে, অন্য হাত কোয়ালস্কির গালে।

নড়ল না সিগমা এজেন্ট, পাছে ওদের ঘুম ভেঙে যায়। জানে, সামনে ভয়ঙ্কর একটা দিন অপেক্ষা করছে দুজনের জন্যই। ক'টা বাজে বোঝা যাচ্ছে না, তবে সকাল হয়েছে। মেজর জেনারেল লাও-এর সময়সূচী অনুযায়ী, খুব শীঘ্রই বাকোকে অপারেশনের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে। অত্যাচারিত শিম্পাঞ্জিটার কথা মনে পড়ল ওর- হাত পা বাঁধা, উন্মুক্ত মস্তিষ্ক, তার দিয়ে মনিটরিং ডিভাইসের সাথে সংযুক্ত।

জাহান্নামের কীট....

ছোট নিষ্পাপ চেহারাটার দিকে তাকাল কোয়ালস্কি, চোখের পাপড়িতে কাঁপন নজরে পড়ছে। সম্ভবত স্বপ্ন দেখছে বাকো। গরিলাটার ওপাশে শুয়ে আছে মারিয়া, গভীর নিঃশ্বাসে বুক উঠানামা করছে। ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে মেয়েটার, ঘুমন্ত অবস্থায় আরও কম দেখাচ্ছে বয়স। বন্ধ চোখের পাতায় স্থির হলো ওর নজর।

ওদেরকে নিরাপদে রাখতে চায় সিগমা এজেন্ট, কিন্তু আপাতত ঘুমানোর সুযোগ দেয়া ছাড়া ওর পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব না। শেষ মুহূর্তটুকু ভালোভাবে কাটাচ্ছে একসাথে...এই তো আর কিছুক্ষণ।

সিলিং-এ লাগানো ক্যামেরাটার দিকে তাকালো কোয়ালস্কি, চোখ পড়ল খাঁচার সারির শেষে স্টিলের দরজাটার উপর। টকটকে লাল চিহ্ন জ্বলজ্বল করছে ওটার ওপর, ভালোভাবে লক্ষ করল লেখাগুলো।

方舟

চাইনিজ ভাষা জানা নেই কোয়ালস্কির, তবে এই অক্ষরগুলো আগেই দেখেছে ল্যাবে। সংকর গরিলার চেম্বারের জানালার ওপর শব্দটা সাঁটানো ছিল। গতকাল, হোঁৎকা জন্তুগুলোকে দেখার সময়, নিচতলায় একটা স্টিলের দরজাও দেখেছিল ও। চেম্বার আর দরজাটাকে আলাদা করেছে স্টিলের মোটা বারওয়ালা খাঁচা।

এটাই তাহলে সেই দরজা।

আবারও খাঁচার বাইরে নজর দিল কোয়ালস্কি। এখন বুঝতে পারছে, সেলগুলোর মেঝেতে ভারী বাটালি রাখা হয়েছে কেন। কেন-ই বা ছাদ থেকে ঝুলে আছে হাতকড়া।

এখানেই জন্তুগুলোর উপর গবেষণা করা হয়।

সাদাটে লোমের বিশাল গরিলাটার কথা মনে পড়ে গেল ওর, কীভাবে রক্তাক্ত হাতটা ছুড়ে মেরেছিল জানালার দিকে। চোখদুটোতে আগুন জ্বলছিল যেন, প্রতিহিংসায় গর্জে উঠছিল বারবার। পশুগুলো স্বাভাবিকভাবেই বন্য, তৈরি করার সময়ও বজায় রাখা হয়েছে হিংস্রতা। কিন্তু একটা বিষয় জানে কোয়ালস্কি।

এরা এদের সৃষ্টিকর্তাকে ঘৃণা করে।

অবশ্য উপযুক্ত কারণও আছে।

কোয়ালস্কির চিন্তাধারার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতেই যেন, দরজার ওপাশ থেকে গর্জে উঠল একটা গরিলা।

আওয়াজ শুনে নড়ে উঠল মারিয়া, ঝটকা দিয়ে খুলে গেল চোখ। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে বোঝার চেষ্টা করল, কী হচ্ছে আশেপাশে। বাকোও জেগে গিয়েছে, সতর্ক নজর বোলাতে শুরু করেছে চারদিকে।

'সব ঠিক আছে।' দুজনকেই বলল কোয়ালস্কি।

জানে, কথাটা মিথ্যা। কিন্তু এছাড়া আর কী-ই বা বলার আছে ওর!

কয়েকবার দম নিয়ে ধাতস্থ হলো মারিয়া, বাকোর গায়ে হাত রেখে বলল, 'শান্ত হও, আমি আছি তো।'

কাতর আওয়াজ করে উঠে বসল বাকো। বড় বড় খয়েরি চোখ মেলে তাকাচ্ছে স্টিলের দরজার দিকে। লোমশ হাঁটু জড়িয়ে ধরল এক হাতে, মারিয়ার দিকে ঝুঁকে আসছে।

ভয়ার্ত প্রাণীটাকে কাছে টেনে নিল প্রজননবিদ।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো কোয়ালস্কি, নড়াচড়া করে নিচ্ছে আড়ষ্ট হাত-পা।

'কয়টা বাজে?' জিজ্ঞেস করল মারিয়া।

শ্রাগ করল সে, 'সকাল হয়েছে, শুধু এটাই জানি।'

শুকনো ঠোঁটজোড়া একবার চেটে নিল মেয়েটা, তাকাল সেল-ব্লকের অন্যপাশে। ভূগর্ভস্থ ফ্যাসিলিটির ওপাশে দরজাটা খোলা, চোখে শঙ্কা জাগছে ওর। বাকোকে টেনে নিল আরও কাছে, প্রানিটার কোনও ক্ষতি হতে দিতে চাইয়া না। ওর আলিঙ্গনের ভেতর একেবারে সেঁধিয়ে গেল বাকো, মায়ের মনের ভয় তার ভেতরেও সংক্রমিত হয়েছে।

কোয়ালস্কির দিকে ফিরল প্রজননবিদ। 'কী করব আমরা এখন?'

'সহযোগিতা করবো।' সরাসরি জবাব দিল কোয়ালস্কি, এই পরিস্থিতিতে রাখঢাক রাখতে চায় না। 'বাধা দিতে চাইলে মারাও পড়তে পারেন আপনি। তবে যাই হোক না কেন, বাকোকে ছুরির নিচে যেতেই হবে। পরিস্থিতি যত খারাপ দিকেই মোড় নিক না কেন, বেঁচে থাকলে অন্তত ওর সাহায্যে আসতে পারবেন।'

কথায় খুব একটা লাভ হলো না, মারিয়ার আতঙ্ক একবিন্দু কাটেনি। অবশ্য সে তেমন কিছু আশাও করেনি। কথাগুলো বলেছে যারা ক্যামেরার মাধ্যমে আড়ি পেতে আছে, তাদের উদ্দেশে।

ভাবতে থাকুক, ওদের কথামতোই চলবে সব।

ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরল কোয়ালস্কি, মারিয়ার দিকে হাত বাড়াল। ভাবখানা এমন, চাইছে মেয়েটাকে কিছুটা হলেও ভরসা দিতে। তবে ক্যামেরার আড়ালে আঙুল দিয়ে তিনটি ইংরেজি অক্ষর দেখাল ও।

[জি পি এস]

প্রশ্নবোধক দৃষ্টি ফুটে উঠল মেয়েটার চোখে, কথাটার অর্থ বোঝার চেষ্টা করছে। মনে মনে ভাবছে, বাকোর হাতের জিপিএস ইউনিটটা গেল কোথায়। এখনও চুপ করে আছে কোয়ালস্কি, খোলাসা করে বলছে না কিছু। সম্ভবত ভয় পাচ্ছে সিগমা এজেন্ট, পাছে কেউ টের পেয়ে যায়!

কোনায় জমে থাকা মলগুলোর দিকে তাকালো কোয়ালস্কি। কপাল ভালো, এসব ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কারের দিকে চাইনিজরা খুব একটা মনোযোগী নয়। অবশ্য খুঁজলেই বা কী আর পেত, কিছু চিবানো রাবারের টুকরো।

গতকাল, বাকো আর ওর মাঝে হওয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধের পুরোটাই ছিল সাজানো। ওই সময় হাতে থাকা রাবারের ব্যান্ডে গরিলাটাকে দিয়ে কামড় দেওয়ায় সিগমা এজেন্ট, যাতে জিপিএস ট্র্যাকারটা সহজেই বের করে নিতে পারে। ইলেকট্রিক যন্ত্রটা আকারে একটা ছোট পয়সার মতো। আসল জিনিসটা বের করে নিয়ে প্লাস্টিক রাবারের অবশিষ্টাংশ ফেলে দিয়েছে বাকোর পায়খানার ভেতর। এরপর সুযোগ বুঝে ট্র্যাকারটা চালান করে দেয় এমন জায়গায়, যাতে সহজেই মাটির উপর ওঠে আবারও সংকেত পাঠাতে পারে ওটা।

মুখের ব্যান্ডেজটায় হাত বোলালো কোয়ালস্কি, বাকোর ভুয়া আক্রমণ যেন এখনও চোখে ভাসছে। খাঁচা থেকে বের হওয়ার জন্য কাকুতি-মিনতি করছিলো ও গরিলাটার রুদ্রমুর্তি দেখে খাঁচা খুলে দিতে দেরি হয়নি গার্ডের। সেই সুযোগে তার পকেটেই চালান করে দিয়েছে জিপিএস ডিভাইসটা। ভাগ্য ভালো থাকলে লোকটা অবশ্যই ডিউটি শেষে উপরে উঠে যাবে। কেউ যদি এখনও ট্র্যাকারটার উপর লক্ষ রেখে থাকে, তবে খুঁজে পাবে গার্ডকে।

শরীরের আড়ালে হাত ঢেকে আরও তিনটি অক্ষর দেখালো কোয়ালস্কি, গার্ডটার নাম।

[G A O]

গাও...

সকাল ৮:২৩

'ট্র্যাকিং ব্যান্ডটার সিগন্যাল পাওয়া গেছে।' হড়বড় করে বলে উঠল ক্যাট, কণ্ঠে সতর্কতা।

'কোথায়?' জানতে চাইল মঙ্ক।

'লোকেশনটা পাঠাচ্ছি তোমার ফোনে।'

অপেক্ষা করতে করতে মঙ্ক জানালা দিয়ে একবার বাইরে তাকাল। চিড়িয়াখানাটা এখান থেকে আধ মাইল দূরে। রুম নিয়েছে হোটেলের সবচেয়ে উপরের তলায়, যাতে এখান থেকেই নজর রাখতে পারে পার্কের উত্তর দিকের গেটে। গতকাল রাতে ও আর কিম্বারলি পালাক্রমে নজর রেখেছে পথের উপর। বাইনোকুলার দিয়ে লক্ষ্য করেছে নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর তৎপরতা।

সঙ্গীর ফোনের কথোপকথন শুনেই জ্যাকেট গায়ে তুলে নিয়েছে কিম্বারলি। কিছুক্ষণ আগে, ভার্জিনিয়ায় স্বামীর সাথে কথা বলেছে ও। কণ্ঠে উষ্ণতা, মুখে চাপা হাসি। মঙ্ক বুঝতে পেরেছে, তিন বছরের বাচ্চা মেয়ের সাথেও কথা হয়েছে কিম্বারলির, কারণ গলাটা তখন আরও আদুরে হয়ে উঠেছিল। তার নিজেরও দুটো সন্তান আছে, তাই সহজেই বুঝতে পারে সব।

'তথ্যগুলো চলে গেছে তোমার কাছে।' নীরবতা ভাঙল ক্যাট।

মঙ্কের সাথে যোগ দিল কিম্বারলি, কাঁধের উপর দিয়ে চোখ রাখল ফোনের পর্দায়। বেইজিংয়ের ম্যাপে নীল বিন্দুর মাধ্যমে ট্র্যাকারের সিগন্যাল দেখানো হচ্ছে।

'অদ্ভুত!' বিড়বিড় করে বলল মেয়েটা।

ঘাড় ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকালো মঙ্ক।

'প্রথমবার চিড়িয়াখানা থেকে আরও এক মাইল দক্ষিণ-পূর্বে পাওয়া গিয়েছিল সিগন্যাল।' ল্যাপটপ বের করল ও, আঙুল উড়ে চলল কিছুক্ষণ কিবোর্ডে। বেশ কিছু স্যাটেলাইট ম্যাপে দেখানোর পর অবশেষে স্থির হলো একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে।

'কী এটা?' জানতে চাইল সে।

'ওখানে আগে একটা রেস্তোরাঁ ছিল, দু'হাজার বারো সালে বন্ধ হয়ে যায়। এরপর আর কখনও খোলা হয়নি।' ল্যাপটপ বন্ধ করল কিম্বারলি, দরজার দিকে চোখ। 'যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নাও। বেরোতে হবে এখনই।'

তাড়াহুড়োর কারণটা সহজেই অনুমেয়। সিগন্যাল উধাও হওয়ার আগেই ওখানে পৌঁছাতে হবে।

ব্যাগ গুছিয়ে দরজায় এসে দাঁড়াল মঙ্ক, মেয়েটাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সাথে সাথে। ট্যাক্সিতে উঠে আবারও তথ্য ঘাঁটতে শুরু করল কিম্বারলি। 'সিগন্যালটা চিড়িয়াখানার এতো দূর থেকে আসছে, মানে একটাই- রেস্টুরেন্টটা সম্ভবত পাতাল শহর ডিজিয়া চেং-এর প্রবেশদ্বার।'

স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সময়, মাটির নিচে প্রায় শত বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে শেল্টারটা তৈরি করা হয়েছিল। শহরের বড় বড় সব স্থাপনার সাথেই সংযোগ ছিলো ওটার।

'কোয়ালস্কি এবং মারিয়াকে এই টানেলগুলো দিয়েই সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে ভাবছ?'

'এটাই হয়েছে। আগেও বেশ অনেকবার চাইনিজ আর্মির গোপনে এই পথ ব্যবহারের খবর পাওয়া গেছে। উনিশশো উননব্বই সালে, টিয়েনেনমেন স্কয়ারের বিপর্যয়ের সময় এই টানেল ব্যবহার করেই গোটা বিশ্বের চোখে সৈন্যদের চলাচলের খবর লুকিয়ে রেখেছে ওরা।' জবাব দিল কিম্বারলি। 'আর প্যাসেজগুলো এতো বড় যে, সহজেই কনস্ট্রাকশনের সাজ-সরঞ্জাম বহন করা যায়। এভাবেই কারও চোখে না পড়ে পাতালপুরী তৈরি করে নিয়েছে চাইনিজরা। কিছু কিছু টানেলের প্রস্থ তো চার লেনের রাস্তার সমান, ট্যাঙ্কওয়ালা ব্যাটেলিয়ন পার হতে পারবে ওখান দিয়ে।'

ট্যাক্সিটা মোড় নিতেই দূরত্ব মেপে নিল মঙ্ক। 'সোয়া মাইল দূরে আছি আর।'

ঝুঁকে ট্যাক্সি ড্রাইভারের সাথে কথা বলল কিম্বারলি, ম্যান্ডারিন ভাষায় বলে দিল গন্তব্য। 'আবাসিক অঞ্চলে ঢুকতে হবে মনে হচ্ছে, ঐতিহ্যবাহী হুতং সমাজে।'

'হুতং সমাজ?'

'চীনের সংকীর্ণ অলিগলি আর ঘন বসতিপূর্ণ সমাজব্যবস্থাগুলোর একটা। গলি-ঘুপচির মাধ্যমে একটা আরেকটার সাথে সম্পর্কযুক্ত। পুরনো ধাঁচের বসতবাড়িগুলো পথের দুই ধারে দাঁড়ানো। ড্রাইভারকে যতটুকু সম্ভব কাছে পৌঁছে দিতে বলেছি। বাকিটুকু হেঁটে যেতে হবে।'

ভ্রূকুটি করল মঙ্ক। 'কোয়ালস্কি আর মারিয়াকে এমন জনবহুল অঞ্চলে নিয়ে গে
কেন ওরা? সাথে আবার বাকোও আছে!'

'জানি না, তবে সতর্ক থাকতে হবে।' বলতে বলতে ওর দিকে ফিরল মেয়েট
তাকালো উপর থেকে নিচে। 'কেউ তোমাকে দেখে ফেললে সমস্যা হবে।'

নড করল মঙ্ক, জানে ও চীনা মানুষের ভিড়ে ঠিক খাপ খায় না। আর অপরিচি
আগন্তুকদের ভালো চোখে দেখে না স্থানীয় মানুষজন।

'অপেক্ষা করো।' ব্যাক-প্যাক ঘাটতে শুরু করেছে কিম্বারলি। সামনের অং
চাইনিজ অক্ষর ছাপা একটা ক্যাপ বের করে আনল ব্যাগ থেকে। এক জোড়া কালে
রোদচশমা এবং নীল মাস্কও নিল। 'এগুলো পরে নাও।'

মাস্কটা হাতে নিল মঙ্ক, স্থানীয়রা বেইজিংয়ের দুষিত বায়ু থেকে বাঁচতে এগুলে
পরে। ক্যাপ, রোদচশমা এবং মাস্ক ওর চেহারা ঢাকতে সাহায্য করবে। আর মাথ
নিচু করে থাকতে পারলে কোনও সমস্যাই নেই।

মাথায় ক্যাপ চড়াতে চড়াতে ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল কিম্বারলি, দেখি
দিল রাস্তা। গন্তব্যের কাছাকাছি চলে এসেছে প্রায়।

তারপর উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'এখন থেকে সব কথাবার্তা আমি
বলবো। স্থানীয়রা অপরিচিত লোকদের অপছন্দ করে, বিশেষ করে বিদেশিদের।'

ট্যাক্সি থামতে ভাড়া পরিশোধ করে বেরিয়ে এল দু'জন। সতর্ক নজর বোলাচে
চারদিকে। রাস্তার ওপাশে বেইজিংয়ের ব্যস্ত অঞ্চল। বড় বড় হোটেল, শপিং মলে
ছড়াছড়ি।

সীমানাঘেরা একটা গলিতে ঢুকে পড়ল মঙ্ক আর কিম্বারলি। গলিটা এতোই সর
যে, একসাথে দু'জন হাঁটতে গেলে কাঁধে কাঁধ ঠেকে যায়। ভেতরে অগ্রসর হতেই
মনে হলো যেন অতীত যুগে ফিরে যাচ্ছে ওরা। ছোট ছোট দোকানে তামাকজাত
দ্রব্য, অ্যান্টিক আর উজ্জ্বল রংয়ের চকলেট বিক্রি হচ্ছে। আরেকটু সামনে সারি সারি
চায়ের দোকান, কাছাকাছি মন্দির থেকে আসা ধূপের গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

'আরেকটু সামনে।' ফিসফিসিয়ে বলল কিম্বারলি, লুকিয়ে ফোনের পর্দায় মানচিত্র
দেখছে।

হুতং-এর আরও গভীরে প্রবেশ করছে ওরা, চোখে পড়ছে আশেপাশে বাড়ির
উঠানগুলো। ভেতরে ছোট ছোট বাগান, এখানে-সেখানে উড়ছে একটা-দুটো
কবুতর। কাপড়চোপড়ে ভারী হয়ে আছে উঠানো ঝোলানো তার।

ফোনের পর্দায় নজর মঙ্কের, আরেকটু সামনে কোনও জায়গা থেকে আসছে
সিগন্যাল। আশেপাশে নজর বুলাল সে, কিম্বারলিকে দেখালো ফোন। খুঁজতে
খুঁজতে মেয়েটা অবশেষে গিয়ে দাঁড়ালো একটা আর্ট-শপের সামনে। দোকানট

এতোটাই ছোট যে, দুজনেরই আঁটাআঁটি অবস্থা। ভেতরে নানান ধরণের ব্রাশ, কাগজের স্তূপ, কালি আর পাথরে ভর্তি।

দোকানের মালিক ছোটখাটো বয়স্ক এক মহিলা। বয়স ষাট থেকে একশোর মধ্যে যেকোনও সংখ্যা হতে পারে। হাসছেন তিনি, মুখে একটাও দাঁত নেই।

বয়স্কা নারীর সাথে কথা শ্রদ্ধাভরে কথা বলতে লাগল কিম্বারলি। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ফোনের পর্দায় চোখ রাখছে মঙ্ক, একই সাথে দরজার দিকেও খেয়াল রাখছে।

অবশেষে নীল বিন্দু চলে এসেছে ওদের কাছে, অতিক্রম করে চলেও গেল এক মুহূর্ত পর! একই সাথে পিএলএ-র ইউনিফর্ম পরা এক লোক দরজা পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে গলির দিকে।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল মঙ্ক, সৈনিকের আশেপাশে খুঁজছে কোয়ালস্কি আর মারিয়াকে। কিন্তু লোকটার সাথে আর কেউ নেই। পেছনে মানুষজন বলতে শুধু স্কুল পড়ুয়া একটা বাচ্চা।

মেয়েটার দিকে তাকালো মঙ্ক, ইশারায় অনুসরণ করতে বলল। ইশারায় দেখাল, সংকীর্ণ গলিতে মোড় নিচ্ছে সৈনিক।

'ওই লোকটার কাছ থেকেই সিগন্যাল আসছে।' ফিসফিস করে বলল সিগমা এজেন্ট, হাঁটছে বাচ্চাটার পেছন পেছন।

পিছনে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে কিম্বারলি, 'তোমার কী ধারণা?' মঙ্কের সতর্কতার কারণ বুঝতে পারছে ও। এমনও হতে পারে, লোকটাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে ওদেরকে টেনে আনা হয়েছে এখানে।

টার্গেটকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিল মঙ্ক। সবচেয়ে ভালো হতো যাচাই করার দ্বিতীয় সুযোগ পেলে। কিন্তু প্রায় একটা দিন অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ও, তাই চেষ্টা করেও নিজের উত্তেজনা চাপা দিতে পারছে না। জানে, অপহৃত কাউকে উদ্ধারের জন্য প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রাইমেট সেন্টারের বাগানে পড়ে থাকা কীপারের লাশটার কথা ভাবল ও।

এই সৈনিক সেই খুনিদেরই একজন, হয়তো খুনটা সে নিজেই করেছে।

'কিছু বলো?' জোর দিল কিম্বারলি।

চলার দ্রুততা বজায় রাখল মঙ্ক, সব প্রশ্নের একটাই উত্তর।

'লোকটাকে জীবিত ধরতে চাই।'

সকাল ৯:০২

দরজা খোলার আওয়াজে আঁতকে উঠল মারিয়া। খুলে গেছে হলের দরজা, একটা ফোর্ক-লিফট ঠেলে আনা হচ্ছে। গতকাল বাকোকে আনার কাজেও এটাই ব্যবহৃত হয়েছিল।

'সময় শেষ দেখা যাচ্ছে।' বিড়বিড় করল কোয়ালস্কি, রাগে কালো হয়ে গেছে চেহারা।

চারজন সৈনিকের একটা দল আসছে ফোর্ক-লিফটের সাথে, একজনের হাতে ইলেকট্রিক ক্যাটল প্রড, বাকিদের হাতে রাইফেল।

বৈদ্যুতিক দন্ডটা দেখেই মারিয়ার পা আঁকড়ে ধরেছে বাকো, গতবারের যন্ত্রণা এখনও ভোলেনি। নিরাপত্তার আশায় কোয়ালস্কির দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে এক হাত। হাতটা ধরল কোয়ালস্কি, মুখোমুখি হলো সৈন্যদলের। এগিয়ে এসেছে সবাই, লিফটে রাখা খাঁচা নিচু করতে চেঁচিয়ে নির্দেশ দিচ্ছে ড্রাইভারকে।

চ্যাং সানকে চিনতে পারলো মারিয়া, লোকটার পরনে পরিপাটি ইউনিফর্ম। কালো চকচকে চুল দেখে বোঝা যাচ্ছে সবেমাত্র গোসল সেরে এসেছে। গাও-এর বদলে তার বড় ভাইকে দেখে অবাক হলো প্রজননবিদ। লোকটার শক্ত গোমড়া মুখ দেখে আন্দাজ করা যাচ্ছে, বাকোকে বন্দি করার মতো মামুলি কাজের ভার পেয়ে নাখোশ হয়েছে।

চেঁচিয়ে খাঁচা খুলতে বলল লোকটা, ধমকে উঠল ক্যাটল প্রড ধরা সৈনিকের দিকে। খোলা হলো দরজা, সবগুলো অস্ত্রের মুখ ঘুরে গেল ওদের দিকে। ইলেকট্রিক প্রডে দেখা দিয়েছে নীল স্ফুলিঙ্গ।

ভয়ে কাঁপছে বাকো, শক্ত করে ধরে রেখেছে কোয়ালস্কির হাত। আতঙ্কে এতো জোরে চাপ প্রয়োগ করেছে যে, বেশ ব্যথা পাচ্ছে সিগমা এজেন্ট। সরাসরি চ্যাং-এর মুখোমুখি দাঁড়াল তারপর।

'ওই খাঁচায় আর ফিরে যাচ্ছে না ও,' বলল কোয়ালস্কি। 'আমাদের সাথে থাকবে।'

ভ্রুকুটি করল লেফটেন্যান্ট কর্নেল।

ততক্ষণে মারিয়াও সিগমা এজেন্টের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। 'যদি আজ সকালে বাকোর সার্জারি হয়, তবে জোরাজুরি করলে পরিস্থিতির খারাপ হতে পারে। ও এখনও এসবের জন্য তৈরি নয়। যদি মেজর জেনারেল লাও-'

কথাটা বলেই বুঝতে পারলো ভুল করে ফেলেছে। চ্যাং-এর সামনে জাঁদরেল মহিলার কথা তোলা উচিত হয়নি। আগেই খেয়াল করেছে, দুজনের মাঝে সম্পর্ক বেশ তিক্ত।

সাথে সাথে অস্ত্র বের করল চ্যাং, এক পলক দেখেই কোয়ালস্কি বুঝতে পারল- ওটা ট্রাংকুলাইজার গান। প্রতিবাদ করার আগেই লোকটা পিস্তল তাক করে টিপে দিল ট্রিগার।

বাকোর কাঁধে ডার্ট বিঁধতেই চেঁচিয়ে উঠল সে। হাত দিয়ে টেনে সাথে সাথেই খুলে ফেলল জিনিসটা, কিন্তু ততক্ষণে ওষুধের প্রভাব শুরু হয়ে গেছে। ভয়ে কাঁপতে লাগলো বাকো, সেঁধিয়ে যাচ্ছে সেলের কোনের দিকে।

পেছন পেছন গেল মারিয়া। কোয়ালস্কিও ওকে অনুসরণ করল, মনে মনে চৌদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করছে চ্যাংয়ের।

হাঁটু গেড়ে প্রাণীটার পাশে বসল প্রজননবিদ। গুটিসুটি মেরে আছে বাকো, চোখে নিখাদ আতংক। মারিয়া জড়িয়ে ধরল ওকে, অভয় দেওয়ার চেষ্টা করছে।

কোয়ালস্কিও যোগ দিল সাথে। 'কিচ্ছু হয়নি, ছোট্ট বন্ধু।'

বাকো ঘুরে তাকাল ওর দিকে, কাঁপতে কাঁপতে একটা হাত উঁচু করল। আঙুল নাড়িয়ে একটা চিহ্ন দেখাচ্ছে।

[একসাথে]

'কখনওই তোমাকে ফেলে যাব না আমি।' কথা দিল সিগমা এজেন্ট। 'একই দলের সদস্য আমরা।'

'একদম ঠিক,' সম্মতি জানাল মারিয়া, যদিও জানে না ঠিক কতোটুকু বুঝেছে বাকো।

ওদের দু'জনের দিকে নিবদ্ধ হলো গরিলার নজর, চেতনানাশকের প্রভাবে দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গেছে। খুব সম্ভবত এম-৯৯ পুশ করা হয়েছে। চিড়িয়াখানায় পশুদের উপর সাধারণত এই চেতনানাশকই ব্যবহৃত হয়।

নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে বাকো। হাত তুলে আরও কয়েকটা অক্ষর দেখালো সে, ঝাপসা চোখে তাকিয়ে আছে কোয়ালস্কির দিকে। প্রাণিটা ওর কথা সংশোধন করে দিচ্ছে, দল-এর বদলে ব্যবহার করেছে পরিবার কথাটা।

[আমরা একই পরিবারের সদস্য]

'ঠিক ধরেছ তুমি, ছোট্ট বন্ধু,' নম্রস্বরে বলল কোয়ালস্কি।

তার কথা বুঝতে পেরেছে নিশ্চিত হয়ে চোখ বন্ধ করল বাকো, মাথাটা হেলে পড়েছে একপাশে।

পায়ের আওয়াজ কাছে চলে এসেছে। কাঁধের উপর দিয়ে চ্যাং-কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল মারিয়া।

'শান্ত হয়েছে?' লোকটার কণ্ঠে ঘৃণা। 'এখন তৈরি সে।'

লাফিয়ে উঠল কোয়ালস্কি, তবে ঠিক সময়ে সরে দাঁড়াল অফিসার। হাতের অস্ত্র তাক করেছে বিশালদেহী লোকটার বুকে। বাঁধা হয়ে দাঁড়াল মারিয়া, অনুরোধ করল

ওকে রেহাই দেওয়ার জন্য। এম-৯৯ মানবদেহে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখায়। অল্প কয়েক ফোঁটাই একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষকে খুন করার জন্য যথেষ্ট।

মারিয়ার উপর নিবদ্ধ হলো চ্যাং-এর নজর, 'আপনিও আমাদের সাথে আসছেন।' বলে অস্ত্র দোলাল কোয়ালস্কির দিকে। 'ও এখানেই থাকবে।'

'কখনওই না,' দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল সিগমা এজেন্ট।

কাঁপতে কাঁপতে ওর হাতটা স্পর্শ করল মারিয়া, জানে এই অসম যুদ্ধে জেতার কোনও উপায় নেই। 'সমস্যা নেই। আমি একাই বাকোর খেয়াল রাখতে পারবো।'

রেগে যাচ্ছে কোয়ালস্কি, এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো প্রতিবাদ করবে। কিন্তু অবশেষে মেনে নিল ও, জানে হাতে আর কোন উপায় নেই। রাগত স্বরে বলল 'ঠিক আছে।'

সিদ্ধান্ত নেয়া হতেই তিনজন সৈনিক এগিয়ে এল, ফোর্ক-লিফটে তুলে নিল বাকোর অচেতন শরীর। মারিয়াও পেছন পেছন এগোল। খেয়াল রাখছে, যেন গরিলাটার শরীরের কোনও অংশ দেয়ালে আঘাত না লাগে। যদিও জানে সামনে প্রখর যন্ত্রণা অপেক্ষা করছে ওর জন্য।

গতকাল দেখা অত্যাচারিত শিপাঞ্জিটার কথা মনে করল প্রজনবিদ। এ লজ্জা ঢাকবে কী করে? সে নিজেও কি বাকোর সাথে খুব ভালো ব্যবহার করছিলো? খাঁচায় বন্দী করে রাখতো সবসময়। কদাচিৎ বের হতে দিত, তাও পরীক্ষার জন্য।

বাকোর দেখানো শেষ ইশারাটা ওর মনে পড়ল।

[আমরা একই পরিবারের সদস্য]

চোখ দিয়ে পানি ঝরে পড়া অনুভব করছে মারিয়া। অচেতন গরিলার দেহটা খাঁচায় পোরা হয়ে গেছে। এক হাত প্রানিটার কপালে রাখল, চাইছে আশ্বস্ত করতে।

তোমাকে অবশ্যই মুক্ত করব আমি।

খাঁচার কাছ থেকে এক সৈনিক সরিয়ে দিল মারিয়াকে, ফোর্ক-লিফটের সাথে সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সবাই। কোয়ালস্কির দিকে ফিরে তাকালো প্রজনবিদ, লোকটা একা একা দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টি সরাসরি ওর দিকে নিবদ্ধ, ফিরে তাকাতে দেখে বাকোর চিহ্নটাই আবার দেখালো ও।

[পরিবার]

মাথা নেড়ে সায় দিল মারিয়া, মন থেকে মেনে নিয়েছে কথাটা। তবে ল্যাবের দিকে যত এগোচ্ছে, ততই ভয় জেঁকে বসছে মনে।

এই বিপদ থেকে রক্ষা পাবে কীভাবে? আদৌ পাবে তো?

সকাল ৯:০৭

এক ব্লক দূর থেকে নজর রাখছে মঙ্ক, টার্গেটি রাস্তা পার হচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে, গন্তব্য সামনের ওই পাঁচতলা ভবন।

বাড়ি ফিরছে লোকটা, নিরাপদ দূরত্বে থেকে অনুসরণ করে যাচ্ছে দুই এজেন্ট। চায় না কোনওভাবে চোখের আড়াল হোক টার্গেটি। জিপিএস সিগন্যালটা যে কোনও মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তখন এই গোলকধাঁধায় ওকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে।

সকালের গাড়ির ভিড় ঠেলে অনুসরণ চলছে। ছোট একটা উঠোনের সামনে থেমে গেল ইউনিফর্ম পরা সৈনিক। এমন কিছু আশা করেনি মঙ্ক, লোকটার চোখে না পড়ার জন্য হাঁটা অব্যাহত রাখল ওরা। সামনে এগিয়ে ভবনটার পাশের বাসস্টপে গিয়ে দাঁড়াল। এখান থেকে সহজেই নজর রাখা যাবে। মুখের সার্জিক্যাল মাস্কটা আরও টেনে নিল সিগমা এজেন্ট, এমনভাবে কিম্বারলির হাত ধরে আছে যাতে দেখে মনে হয়, কাজের উদ্দেশে বেড়িয়েছে সুখী দম্পতি।

পার্ক করে রাখা এক গাড়ির জানালায় লোকটার প্রতিবিম্ব দেখছে মঙ্ক। সিগারেট জ্বাললো সে, দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে- তিরিক্ষে হয়ে আছে মেজাজ। সিগারেটে লম্বা কয়েকটা টান দিল সৈনিক, হাতে বেরিয়ে এসেছে ফোন।

এখান থেকেও লোকটার কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে ওরা দু'জন। রেগে আছে সে, কারও চৌদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করছে ফোনে।

কোয়ালস্কির কথা মনে করল মঙ্ক। এতক্ষণে ব্যাপারটা মাথায় ঢুকেছে। বিশালদেহী লোকটাকে এমনিতে বেশ বিরক্তিকর মনে হলেও, ঘটে বেশ বুদ্ধি ধরে। এই সৈনিকের কাছে সম্ভবত সে-ই জিপিএস ডিভাইসটা পাচার করেছে, যাতে মাটির ওপর উঠে সিগন্যাল পাঠাতে পারে।

এখন সুযোগটা কাজে লাগানোর পালা।

মঙ্কের কাঁধে মাথা রাখল কিম্বারলি। কানে কানে বলল, 'ওর ভাইয়ের সাথে কথা বলছে। একটা তদন্তের জন্য যেতে হয়েছিল ওকে। বলছে, মিনিস্ট্রি অফ স্টেট সিকিউরিটি নাকি কয়েক ঘণ্টা জোর জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।'

থামল ও, আরও কিছু শোনার চেষ্টা করছে। গাড়ির কাঁচে তাকিয়ে আছে মঙ্ক, সিগারেট ফেলে গোড়ালির নিচে পিষতে দেখলো লোকটাকে। কথা শেষ করে ফোন রেখে দিল সৈনিক, রওনা দিল সামনের বিল্ডিংয়ের দিকে।

লোকটা চোখের আড়াল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল দু'জন।

'লাও নামধারী কারও উপর রেগে আছে ও। ফোনে অপর প্রান্তে থাকা ভাইয়েরও একই দশা। মহিলা সম্ভবত ওদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা।'

তথ্যটা মনে মনে টুকে রাখল মঙ্ক, ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।

'ইন্টেলিজেন্স সোর্সের মাধ্যমে খোঁজ করা সম্ভব,' কিম্বারলি বলল। 'মহিলার পরিচয় বের করতে পারলে, আশা করি কোনও না কোনও সূত্র পাবো।'

'আগের কাজ আগে,' বিড়বিড় করে বলল মঙ্ক।

আবার শুরু হলো অনুসরণ। সামনে এগিয়ে এক বিল্ডিংয়ের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে সৈনিক। নিরাপদ দূরত্বে থেকে নজর রাখছে ওরা দু'জন, বাইরে থেকেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে লোকটার গতিবিধি। অবশেষে দ্বিতীয় তলার সপ্তম দরজার সামনে গিয়ে থামল ও। চাবির গোছা পকেট থেকে বের করতেই পকেট থেকে গোলাকার পয়সার মতো কিছু একটা ছিটকে পড়ল। দূর থেকে রূপালি ঝিলিক নজর এড়াল না মঙ্কের।

নিচু হয়ে জিনিসটা হাতে তুলে নিল সৈনিক, উল্টেপাল্টে দেখছে। দূর থেকেও জিপিএস ডিভাইসটা চিনতে পারল ওরা দু'জন।

দৃষ্টি বিনিময় করল মঙ্ক আর কিম্বারলি, একই সাথে একই কথা ভাবছে দুই এজেন্ট।

লুকোচুরি খেলার সময় শেষ।

সকাল ৯:১০

অসহায়ের মতো বাকোকে খাঁচা থেকে স্ট্রেচারে নামাতে দেখল মারিয়া, অচেতন প্রাণীটাকে ল্যাবের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সাথে সাথে এগোচ্ছে ও, ভয়ে দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন। মনে মনে ভাবছে, অপারেশন টেবিলে মরে গেলেই হয়তো সার্জারির পরের কষ্ট থেকে বেঁচে যাবে অবুঝ প্রাণীটা। চোখে পানি চলে এসেছে, কিন্তু দমেনি একটুও।

ভিভিসেকশন ল্যাব আগের চেয়েও বেশি ব্যস্ত এখন, স্টিলের টেবিল ঘিরে প্রস্তুতিমূলক কাজ সারছে নীল মাস্ক পরা একদল সার্জন। আরও একটা বস্তু নজর কাড়ল মারিয়ার, সিল করা প্লাস্টিক ব্যাগে রাখা একটা যন্ত্র।

ব্যাটারিচালিত হাড় কাটার করাত।

যন্ত্রটা দেখে দূর্বল হয়ে এল মারিয়ার হাঁটু।

দু'জন নার্স এসে সৈনিকদের কাছ থেকে নিয়ে গেল বাকোকে, গন্তব্য- অপারেশন টেবিল। দ্রুত পা চালানোর প্রয়াস পেল মারিয়া, ভাবছে আবার না তাড়িয়ে দেওয়া হয় ওকে। একজন নার্স এগিয়ে এসে ক্যাপ আর সার্জিক্যাল মাস্ক দিয়ে গেল। বুঝতে পারছে, বাকোর অপারেশন ওর চোখের সামনেই করা হবে। সম্ভবত প্রজননবিদের মনে ফুটে ওঠা ভয় আর শঙ্কা টের পেয়েছে নার্স, হাত ধরে সান্ত্বনা দিল নিজের কাজে ফিরে যাওয়ার আগে।

ক্যাপ আর মাস্ক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মারিয়া, মন বলছে এখান থেকে পালিয়ে যেতে। এই ভীতিকর দৃশ্য তার সহ্য হবে না। কিন্তু না, পিঠ ঘুরিয়ে নেয়ার সময় না এটা। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সার্জিক্যাল মাস্ক আর ক্যাপটা পড়ে নিল ও।

আমি তোমাকে একা রেখে যাচ্ছি না, বাকো।

অপারেশন টেবিলে তোলা হলো গরিলাটাকে, টেবিলের সাথে বাঁধা হলো হাত-পা। দৃশ্যটা ভালো লাগছে না মারিয়ার, এগিয়ে গিয়ে প্রাণীটার নরম হাতে নিজের হাত রাখল ও। মনে পড়ল, বাকোর ছোটবেলার স্মৃতি। এই হাত দুটো কতো ধরেছে ও, শিখিয়েছে কীভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে হয়।

মা ডাকতে শিখিয়েছিল সে এই প্রাণীটাকে।

গাল বেয়ে অশ্রু ঝড়ছে, অনেক চেষ্টা করেও চোখের পানি আটকাতে পারছে না মারিয়া। এমনকি চোখের পানি মুছতেও চেষ্টা করছে না, দু হাত দিয়ে ধরে রেখেছে বাকোর হাত।

এ আমি কী করলাম?

হৈচৈ শুনে প্রজননবিদের সম্বিত ফিরল। ল্যাবের লম্বা দরজা পেরিয়ে এগিয়ে আসছেন মেজর জেনারেল জিয়াইং লাও, জীবাশ্মবিদ ডেইন আরনডও আছেন তার সাথে। কালি পড়েছে ফ্রেঞ্চ লোকটার চোখের নিচে, উদ্ভ্রান্তের মতো লাগছে দেখতে। হাঁটতে হাঁটতে লাও-এর কোনও একটা কথায় মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন তিনি।

মেজর জেনারেলকে পরিপাটি দেখাচ্ছে, মুখটা হাস্যোজ্জ্বল। কাছে এসে সার্জিক্যাল মাস্ক পরা লম্বা লোকটার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি, এখানকার হেড সার্জন সম্ভবত। কয়েকটা টুকিটাকি কথা বলে নড করলেন জিয়াইং, লোকটা আবার ফিরে গেল নিজ কাজে।

কথা শেষ করে মারিয়ার দিকে ফিরে তাকাল জেনারেল মহিলা, 'সময়সীমা অনুযায়ীই হচ্ছে সবকিছু। আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।'

সহযোগিতা?

মহিলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে মারিয়ার, চোখটা গেলে দিতে পারলে সুখ পেত হয়তো। কিন্তু কোনওটাই করল না ও, বদলে আরনডের দিকে ফিরে তাকাল শুধু। নিজের মনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল যেন লোকটার চোখে।

ওর মনের অবস্থা বুঝতে পারছেন জিয়াইং, কিন্তু দৃষ্টিতে শুধু অবজ্ঞা। 'এই মুহূর্তে আপনার আরও একটু সহযোগিতা চাই আমি।'

'বাকোকে ছেড়ে যাব না আমি,' দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল মারিয়া।

'সেটা চাইছি না আমি, ড. ক্রেন্ডাল। সার্জিক্যাল টিমের ধারণা, একমাত্র আপনিই এখন আমাদের সাহায্য করতে পারেন।'

'কীভাবে?' ভ্রুকুটি করল প্রজননবিদ।

'আগের কাজগুলোর থেকে আজকের অপারেশনটা একটু ব্যতিক্রমভাবে সারবে ওরা। খুলির অংশ আলাদা করার প্রক্রিয়া এবং ইলেকট্রোড স্থাপন রোগীকে জাগ্রত রেখেই করা হবে।'

'কী?' মারিয়ার কণ্ঠে তীব্র ঘৃণা।

হাত তুলে তাকে থামালেন জিয়াইং, 'প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং ব্যথামুক্ত।' বলে প্রধান সার্জনের দিকে ইশারা করলেন তিনি। 'ট্রাংকুলাইজারের প্রভাব দূর করার জন্য ওষুধ দেবে ড. হান, এরপর মাথার অংশটা অবশ করার জন্য ব্যবহার করা হবে লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া। মস্তিষ্ক পুরোপুরি উন্মুক্ত করার সাথে সাথে রোগীকে পুরোপুরি সজাগ করা হবে। আর ঠিক তখনই প্রয়োজন হবে আপনাকে।'

'কেন?'

'প্রাণীটার সাথে কথা বলার জন্য।'

নৃশংসতা প্রক্রিয়াটাতে ওর ভূমিকাটা কী, তা বুঝতে পেরেছে মারিয়া। 'আপনারা চান, বৈদ্যুতিক তরঙ্গের মাধ্যমে ওর মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ উত্তেজিত করে তোলার সময় যেন আমি প্রশ্ন করে ওকে ব্যস্ত রাখি।'

মাথা নেড়ে সায় দিল মহিলা, 'এর ফলে পুরো মস্তিষ্কের গঠনের নিখুঁত ম্যাপ বানানো সম্ভব হবে। রিসার্চ টিম বুঝতে পারবে ঠিক কোথায় কোথায় লাগাতে হবে ইলেকট্রোডগুলো।'

ঢোক গিলল মারিয়া, পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে এখন। কল্পনায় দেখল দৃশ্যটা, বাকো সজাগ, মাথার উপরিভাগ সম্পূর্ণ কাটা!

এজন্যই ওর হাত-পা বাঁধা হয়েছে। কারণ নিশ্চিতভাবেই আতঙ্কে পাগল হয়ে উঠবে বেচারা। মায়ের দিকে তাকাবে স্বস্তি আর সান্ত্বনার আশায়, কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না মারিয়ার।

যে চোখে আমার জন্য অগাধ বিশ্বাস এবং ভালোবাসা! যন্ত্রণাক্লিষ্ট সেই চোখদুটোর দিকে তখন কীভাবে তাকাব আমি!

প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করতে চায় সে। কিন্তু জানে, বাকোর জন্য হলেও থাকতে হবে এখানে। তবুও আর্জি বেরিয়ে এল মুখ থেকে, 'দয়া করে এটা করবেন না।'

'আমি আপনার মতামতকে সম্মান করি, ড. ক্রেন্ডাল। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন- বিজ্ঞান আবেগহীন। আর আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য আছে।' বলতে বলতে ফ্রেঞ্চ জীবাশ্মবিদের দিকে আঙুল তাক করলেন মেজর জেনারেল। 'ড. আরনড আজ সকালে ক্রোয়েশিয়ায় খুঁজে পাওয়া হাইব্রিড অর্থাৎ সংকর নিয়ানডারথালের অবশিষ্টাংশ পর্যবেক্ষণ করবেন। এখানের কাজ শেষ

হতেই, আমি চাই আপনি ওনার সাথে কাজে যোগ দিন। ওই হাড়গুলো থেকে যতটুকু সম্ভব ডিএনএ সংগ্রহ করতে হবে।'

মেজর জেনারেলের কথার তাৎপর্য ধরতে পেরেছে মারিয়া। বাকোর যাই হোক না কেন, কিছুই যায় আসে না তার।

হঠাৎ ওর কাঁধ খামছে ধরলেন জিয়াইং, এমনভাবে ঝাঁকি মারলেন যেন ঘুম থেকে জাগাতে চাইছেন। 'আপনার সহযোগিতা নিশ্চিত করতে'

'মানে? কী বলতে চাইছেন আপনি?'

'বলতে চাইছি, ব্যর্থতার জন্য মাশুল গুণতে হয়। আপনিও এর ব্যতিক্রম নন। আশা করি মুখে বলার চেয়ে চোখে দেখালেই বেশি ভালো হবে।'

হাত ধরে টেনে মারিয়াকে বাঁকা জানালাটার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। নিচে তাকিয়ে সংকর গরিলাগুলোর কোনওটাকে দেখতে পেল না ও, সম্ভবত দেয়াল ঘিরে থাকা গুহায় শুয়ে আছে সবগুলো। কিন্তু মেঝেতে পড়ে আছে চকচকে হাড়গোড়ের স্তূপ। চেটেপুটে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে সব। মারিয়ার মনে আছে, কীভাবে হতভাগ্য মানুষটার ছেঁড়া একটা হাত জানালার দিকে ছুড়ে দেওয়া হয়েছিল গতকাল। শুকিয়ে যাওয়া রক্ত এখনও লেগে আছে বাঁকা কাচে।

দরজার সামনে খাঁচার ভিতরে নড়াচড়া নজরে পড়ল ওর। লম্বা একটা মানুষ ওখানে বন্দি। দূর থেকে চেহারাটা দেখা যাচ্ছে না অবশ্য। উপরদিকে নড়াচড়ার আভাস পেয়ে অবশেষে জানালার দিকে তাকাল লোকটা।

কোয়ালস্কি!

'অপারেশনের পর বাকোর দেখভালের জন্য অতিরিক্ত কোনও লোক দরকার হবে না।' বলে উঠলেন জিয়াইং। 'আপনি যদি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে না দেন, তাহলে'

বাক্যটা শেষ না করলেও অর্থ বুঝতে মারিয়ার বাকি নেই। আরেকবার তাকালো সে হাড়ের স্তূপের দিকে।

আমি সাহায্য না করলে, এরা কোয়ালস্কিকে মেরে ফেলবে!

ছোট একটা আওয়াজে সচকিত হলো ও, বাকো নড়ে উঠেছে। হাত-পা বাঁধা দেখে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল প্রানিটা। চেতনানাশকের প্রভাব কেটে যাচ্ছে তার, জেগে উঠছে ঘুম থেকে। নার্সরা ঘুম ভাঙানোর জন্য ওষুধ দিয়েছে নিশ্চয়।

একই দিকে তাকিয়ে আছেন মেজর জেনারেল, 'কাজে নামার সময় হয়েছে, ড ক্রেন্ডাল।'

সকাল ৯:১৯

যা করার এখনই করতে হবে।

সৈনিককে জিপিএস ডিভাইসটা নড়াচড়া করতে দেখছে মঙ্ক, সময় দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে ওদের। তবে সুযোগ আছে এখনও।

সিঁড়ির দিকে ছুট লাগাতেই বাধা দিল কিম্বারলি। 'আমি আগে যাই, তুমি পেছনে এসো।'

তাই করল মঙ্ক, দ্রুত হাঁটছে দু'জন। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ রেখেছে নিজেদের উপর, যাতে সন্দেহের উদ্রেক না ঘটে। কাছাকাছি পৌঁছে রাগী কণ্ঠে ম্যান্ডারিন ভাষায় কিছু বলে উঠল মেয়েটা। সিগমা এজেন্ট বুঝতে পারল, অভিনয়টা চালাতে হলে চুপ করে ভুয়া স্ত্রীর ঝাড়ি খেয়ে যেতে হবে ওকে। তবে স্বীকার করতেই হবে, এসপিওনাজে দক্ষতার পাশাপাশি কিম্বারলির জিভেও বেশ ধার আছে।

যে কেউ এখন ওদের দু'জনকে দেখলে ভাববে, ঝগড়ারত স্বামী-স্ত্রী। কয়েকজন হয়তো স্বামী বেচারার দুরাবস্থা দেখে মনে মনে আফসোসও করতে পারে!

বিগত কয়েক বছরে ক্যাটের সাথে সংসার করে মঙ্ক অন্তত এটা বুঝেছে যে-হোক যত অপরাধ, স্ত্রী-রা সবসময়ই সঠিক। আর এই ভুয়া স্ত্রীর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

নির্দিষ্ট তলায় পৌঁছে গেছে ওরা, রাগে গজরাতে গজরাতে সৈনিকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কিম্বারলি। হাতের জিপিএস ডিভাইসটা পরীক্ষা করে দেখছিল লোকটা।

মাথা নিচু রেখেই আশেপাশে নজর বোলাল মঙ্ক। আশেপাশের বাসা-বাড়ির বারান্দায় লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিচের উঠানে মনের আনন্দে খেলছে বাচ্চারা। বুঝতে পারলো, আরেকটু হলেই বিরাট বড় ভুল করে ফেলত। ওকে দৌড়ে আসতে দেখলে সন্দেহের কোনও অবকাশই থাকতো না সৈনিকের, সহজেই পালিয়ে যেতে পারতো সে। আর এই অপরিচিত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় তাকে তাড়া করার ফলাফল সহজেই অনুমেয়।

হাতে ফোন তুলে নিয়েছে সৈনিক, আকস্মিক আবিষ্কারের কথা জানাতে চলেছে কাউকে।

খুব খারাপ ব্যাপার!

কিম্বারলির চলার পথে বাধা হয়ে থাকায়, ধমক দিয়ে ওকে সরে দাঁড়াতে বলল মুখরা রমণী।

মেয়েটার রুদ্রমূর্তি দেখে আর ঘাঁটাতে সাহস পেল না লোকটা, দুঃখ প্রকাশ করে কতে চাইল ঘরের ভেতর। সাথে সাথে ধাক্কা মেরে ওকে মেঝেতে ফেলে দিল ফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট, নিজেও ঢুকল ঘরে।

অনুসরণ করল মঙ্কও।

'দরজাটা বন্ধ করো,' নির্দেশ দিল কিম্বারলি। ঘটনার আকস্মিকতায় বোকা বনে াছে লোকটা। কিছু বুঝে উঠার আগেই কপালে জুটল এক রাম লাথি। মেয়েটার তোর আগায় স্টিলের পাত লাগানো। বিন্দুমাত্র শব্দ না করে অজ্ঞান হয়ে গেল ানিক। সাথে সাথে আবারও নির্দেশ এলো, 'তল্লাশি করো ওকে।'

নিজের হোলস্টার থেকে গ্লক পিস্তলটা বের করে নিয়ে ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টের তরটা একবার ঘুরে নিল কিম্বারলি। অন্যদিকে বন্দীর শরীর তল্লাশি করছে মঙ্ক। ান্ডার হোলস্টার থেকে সরিয়ে নেয়া হলো তার অস্ত্র। তারপর দু'জন মিলে ধরে ভিং রুমে নিয়ে এলো লোকটাকে। মৃদু গোঙানি শুনে বুঝতে পারল, জ্ঞান ফিরে াতে শুরু করেছে।

'রোগীর ঘুম ভাঙছে।' মঙ্ক বলল।

ডাক্ট টেপের একটা রোল ওর দিকে বাড়িয়ে দিল কিম্বারলি। জিনিসটা কী থানেই ছিল, নাকি নিজেই সাথে করে এনেছে, তা নিয়ে মঙ্কের সন্দেহ আছে। বকিছুর জন্যই প্রস্তুত থাকে এই মেয়ে।

এত চিন্তা করে কাজ নেই। লোকটার মুখে টেপ মেরে দিল মঙ্ক, হাত-পা ও ধে নিল আচ্ছামতো। এক ফাঁকে সৈনিকের পকেটের সবকিছু বের করে নিয়েছে ম্বারলি- একটা মানচিত্র, ইলেকট্রিক কি-কার্ড, আর মানিব্যাগ। তারপর পরিচয়পত্র কে জেনে নিল নামটা।

'মি. গাও সান-এর সাথে পরিচিত হও। পদবী অনুযায়ী, লোকটা চাইনিজ আর্মির র্স্ট লেফটেন্যান্ট।'

লোকটার চেতন ফিরে এসেছে, চোখ মেলে তাকিয়ে আছে ওদের দুজনের দিকে।

'এখন কী?' জিজ্ঞেস করল মঙ্ক। 'যদিও এই কাজ আজ প্রথম করছি না, কিন্তু ম এই দেশটাকে আমার চাইতে ভালো করে চেনো।'

বন্দীর দিকে তাকালো কিম্বারলি। 'গুরুত্বপূর্ণ কোনও তথ্য ও দেবে না। ায়েশিয়ার ঘটনা থেকে জানতে পেরেছি, ধরা পড়ার আগেই আত্মহত্যা করেছিল ইনিজ অ্যাসল্ট টিম।'

'তো, কী করবো এখন ওকে নিয়ে?'

হাতের অস্ত্র নাচিয়ে সোফা থেকে একটা বালিশ তুলে নিল ডিআইএ এজেন্ট, কে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব না।'

অবাক হলো মঙ্ক, সত্যিই কী মেয়েটা ঠাণ্ডা মাথায় লোকটাকে খুন করবে নাকি!

'দাঁড়াও,' সতর্ক করল ও।

ধাক্কা খেয়ে লোকটার হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল ফোন। এগিয়ে গিয়ে জিনিস নিয়ে এল মঙ্ক, তবে লক করা আছে।

ফোনটা নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল কিম্বারলি, 'দেখি তো।' ডিভাইসটা হা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল সে, 'লক করতে আঙুলের ছাপ ব্যবহার করা হয়েছে।'

মঙ্কের সাহায্যে বন্দির আঙুলের ছাপ নিয়ে ফোনটা খুলল সে, কয়েকবার স্ক্রি টাচ করে মাথা নেড়ে সায় দিল। 'পাসওয়ার্ড পাল্টে দিয়েছি, এখন নিজে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করা যাবে।'

'বাহ!'

মঙ্ককে ফোনটা ফিরিয়ে দিল সে। 'কী করবে এটা দিয়ে?'

'ইনস্যুরেন্স করাবো।' বলেই ফোন দিয়ে হাত-পা বাঁধা বন্দির কয়েকটা ছ উঠাল সিগমা এজেন্ট।

'কী করছো?'

'সর্বশেষ কলটা ও তার ভাইকে করেছিল। কথা শুনে তো মনে হয় এ জায়গায় কাজ করে দু'জন। মৃত গাও থেকে জীবিত গাও আমাদের বেশি কা আসবে।'

'তোমার ধারণা ঠিকই আছে,' বলে টেবিল পাশ থেকে একটা ছবির ফ্রেম হা তুলে নিল কিম্বারলি। 'এই যে, দেখ।'

ছবিতে দু'টো মানুষ দেখা যাচ্ছে। একজনের কাঁধে আরেকজনের হাত, মু হাসি। দুজনের পরনে একই রকম ইউনিফর্ম। একজন গাও। 'অন্যজন নিশ্চিত ত ভাই।' মঙ্ক বলল।

নড করে ছবিটা পকেটে ঢোকাল কিম্বারলি, 'এখন কোথায় যাবে?'

পকেট থেকে স্যাটেলাইট ফোন বের করল সিগমা এজেন্ট, 'পেইন্টারের পাঠা সেনাবাহিনী জাগিয়ে তোলার সময় হয়েছে। এখানে গাও-এর উপর লক্ষ্য রাখ কেউ একজন, আর আমরা বেড়াতে যাব পাতাল শহরে।'

'ওটা তো পুরোটাই গোলকধাঁধা।'

'গন্তব্য তো জানাই আছে- সরাসরি চিড়িয়াখানা।'

'প্রার্থনা করো, তাই যেন হয়।'

মনে মনে কর্মপন্থা ভেবে রাখছে মঙ্ক। একটা চাওয়া এখন, খুব বেশি দেরী হয়ে না যায়।

অপেক্ষা করো, কোয়ালস্কি... আমরা আসছি।

কাল ৯:২৮

টলের দরজার গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে কোয়ালস্কি, ভেতরে পচা মাংসের গন্ধ। সেই সাথে জন্তুগুলোর গায়ের বোটকা গন্ধ তো আছেই। সব মিলিয়ে অবস্থা রাপ হয়ে যাওয়ার যোগাড় একেবারে।

ব্যাপারটা ওকে পুরনো এক স্মৃতি মনে করিয়ে দিচ্ছে। সিগমায় আসার আগে াড়তি কিছু টাকার জন্য একবার আস্তাবলে কাজ করেছিল ও। তখন এক বুড়ি মাদি ঘাড়া মারা গিয়েছিল গ্রীষ্মের রোদে। সেখানেও এমন গন্ধ পেয়েছিল ও।

কিন্তু আমার মৃত্যুর জন্য শুধুমাত্র এই দুর্গন্ধ দায়ী হবে না।

দরজা আর খাঁচার বারের মাঝখানে থাকা পাথরের গায়ে হাত রাখল সিগমা এজেন্ট। গতকালই উপরের জানালা দিয়ে দেখেছে এই চেম্বারটা। জানে কী বাস করে এখানে।

কিছুক্ষণ আগে, জানালায় মারিয়াকে দেখেছে ও। মেজর জেনারেল লাও মেয়েটাকে টেনে এনেছিল জানালার কাছে। কোয়ালস্কি নিশ্চিত, ওকে ব্যবহার করে প্রজননবিদকে দিয়ে স্বার্থ উদ্ধার করে নিতে চাইছে চাইনিজরা।

খাঁচার গরাদগুলো প্রায় হাতের কব্জির মতো মোটা, জানে মারিয়া সহযোগিতা না করলে কী হবে ওর সাথে।

হঠাৎ দেখল, দশ গজ সামনের গুহাটা থেকে বেরিয়ে এসেছে বিশালাকায় এক গরিলা। গায়ের লোম কুচকুচে কালো, বিশাল দেহ, ওজন হবে কম করে হলেও সাতশো পাউন্ড। বাতাস শুঁকতে শুঁকতে কালো চোখজোড়া একসময় স্থির হলো ওর উপর।

গরিলাটার গলায় একটা উজ্জ্বল ধাতব ব্যান্ড আটকানো, সম্ভবত নিয়ন্ত্রণের জন্য শক দেয়া হয় ওটার মাধ্যমে।

গরাদ ছেড়ে এক পা পিছিয়ে এল কোয়ালস্কি, গরিলাগুলোর হিংস্রতার নমুনা আগেও দেখেছে সে। জানে জন্তুটা যদি একবার ওর নাগাল পায়, তাহলে আর পৃথিবীর আলো দেখা হবে না।

সামান্য নড়াচড়াতেই বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া দেখাল প্রাণীটা, তেড়ে এল কোয়ালস্কির দিকে। খাঁচার দেয়ালে ধাক্কা মারলে জোরে। আঁতকে উঠল সিগমা এজেন্ট, লোহার গরাদ না আবার ভেঙে যায়!

কয়েকবার ধাক্কাধাক্কি করে ক্ষান্ত দিল প্রাণীটা, সরে গিয়ে বসল কাছেই।

খাঁচাটার দিকে মুখ করে রেখেছে হিংস্র গরিলা, নিশ্বাসের হাওয়া লাগছে কোয়ালস্কির গায়ে। হাই তুলল ওটা, আস্ত ফুটবল কামড় বসাতে পারবে অনায়াসেই। গর্জনে মুহুর্মুহু কেঁপে উঠছে গোটা চেম্বার।

বীভৎসতার মাত্রা সহ্য করতে না পেরে কানে হাত চাপা দিল কোয়ালস্কি।

আরেকটা অবয়ব পাশে চলে আসতেই, আগের গরিলাটা উঠে জায়গা ছেড়ে দিল। নতুন এই গরিলাটা আকারে আগেরটার প্রায় দেড়গুণ, ওজন হবে এক হাজার পাউন্ডের উপরে। নতুন আসা প্রাণীটাকে চিনতে পারল কোয়ালস্কি, পিঠে সাদাটে লোম। গতকাল এটাই হাত ছুঁড়ে মেরেছিল উপরের জানালা লক্ষ্য করে।

দূর থেকে বুকে থাবা মারতে মারতে গর্জন করতে লাগলো আগের গরিলাটা, একবার ওদিকে তাকিয়ে হুংকার ছাড়ল বড় গরিলা। সাথে সাথেই চার হাত-পায়ে নেমে এল জন্তুটা, ঘুরে চলে গেল অন্ধকার কোনায়।

আবারও কোয়ালস্কির দিকে ফিরে বসল দলনেতা, সরাসরি তাকিয়ে আছে ওর চোখে। দৃষ্টিতে কোনও হিংস্রতা নেই, ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে না একদম। শুধু তাকিয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে। দূর থেকেও ধূর্ত প্রাণীটার চোখে বুদ্ধির ঝিলিক সিগমা এজেন্টের নজর এড়াল না।

স্টিলের দরজায় পিঠ দিয়ে বসে আছে কোয়ালস্কি, তাকিয়ে আছে বিশালাকায় গরিলার দিকে। স্থির হয়ে বসে আছে ওটা, শুধু শ্বাস নেওয়ার সময় ওঠানামা করছে বুক। কল্পনা করতে কষ্ট হচ্ছে, এই আধ-টনি দানবটাকে আরও বুদ্ধিমান করতে তুলতে চাইছে চাইনিজরা!

পশুটার চোখের ভাষা স্পষ্ট, মতলবও সহজেই অনুমেয়।

অপেক্ষা করছে, কখন বাজবে খাবারের ঘণ্টা!

অধ্যায় আঠারো
৩০ এপ্রিল, রাত ৮:৪৫
ইকুয়েডরের আকাশপথে

'আর আধ ঘণ্টার মাঝে কোয়েঙ্কা পৌঁছবো আমরা,' ঘোষণা করল গালফস্ট্রিম জি-৬৫০ এর পাইলট।

রাতের আকাশে ঝুলে আছে চাঁদ। হাতঘড়ির দিকে নজর দিল গ্রে, নয় ঘণ্টা ধরে উড়ছে বিমান। যদিও সময়ের মান পরিবর্তনের ফলে রোম থেকে রওনা দেওয়ার সময় থেকে মাত্র এক ঘণ্টা পরই গন্তব্য পৌঁছানো যাবে।

বড় কেবিনটায় অনায়াসে এক ডজন মানুষ আঁটবে, কিন্তু এখন ওরা আছে মাত্র চারজন। পেছনদিকে একগাদা বই নিয়ে মেতে আছে রোল্যান্ড, বেশিরভাগ সময় মুখ গুঁজে আছে কার্কারের জার্নালে। রিসার্চের কাজে লিনা সাহায্য করছে ওকে, একটু পর পর মাথা নিচু করে কথা বলছে দু'জন।

পুরোটা সময় গ্রে-র কাছ থেকে দূরে, উল্টোদিকের সারিতে বসে ছিল শেইচান। পাইলটের কথায় বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করল মেয়েটা।

সাবেক আততায়ীর অবসন্নতার কারণ উপলব্ধি করতে পারছে সিগমা কমান্ডার। নিজে অবশ্য ঘন্টা চারেক ঘুমিয়ে নিয়েছে, জানে মাটিতে নেমেই আবার ছুট লাগাতে হবে। কোয়েঙ্কা প্রত্যন্ত শহর, আন্দেজের অনেক উপরে অবস্থিত।

পেইন্টারের সাথে কথা হয়েছে একটু আগে, কোয়ালস্কি আর লিনার বোনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। তবে মঙ্ক আছে ওখানে, তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আর এদিকে তারা চলেছে ফাদার কার্কারের সেই হারানো শহর খুঁজতে।

তার জার্নাল এবং মানচিত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে নিকোলাস স্টেনো গিয়েছিলেন দক্ষিণ আমেরিকায়, খোঁজ নিয়ে এসেছিলেন হারানো শহরের সম্ভাব্য অবস্থান সম্পর্কে। কার্কারের বিশ্বাস অনুযায়ী, ওটাই আদি শিক্ষকদের আবাসস্থল। কিন্তু গ্রে'র সন্দেহ এখনও কাটেনি। তাই এলাকাটার ব্যাপারে নিজেও টুকটাক ঘাটাঘাটি করেছে।

হাতে একটা বই নিয়ে এগিয়ে এল লিনা, 'নামার আগে রোল্যান্ড তোমাদের কিছু দেখাতে চায়।'

একসাথে বসল সবাই। হাতের বইটা নিয়ে টেবিলে রাখল প্রজননবিদ, একটা পাথরে খোদাই করা গোলকধাঁধার ছবি বের করে দেখাল। কার্কারের জার্নালেও এই একই গোলকধাঁধা আছে, ঠিক যেরকমটা দেখা যায় বিভিন্ন জাতির আদি নিদর্শনগুলোর মাঝে।

'পালিশ করা ডাইওরাইট পাথরের ছবি,' পরিচয় করিয়ে দিল লিনা। 'কোয়েঙ্কার জঙ্গলে পাওয়া গিয়েছিল, আমাদের গন্তব্যের খুব কাছে।'

সামনে ঝুঁকল গ্রে, এখানেও তাহলে গোলকধাঁধাটার অস্তিত্ব আছে!

'এক স্থানীয় আদিবাসী ফাদার ক্রেসপিকে উপহার হিসেবে দেয় ওটা।'

'সেই মিশনারি লোকটা?' মুখ তুলে তাকাল সিগমা কমান্ডার। 'অ্যাথেনাসিয়াস কার্কারের ব্যাপারে ব্যক্তিগত আগ্রহের কারণে যে এসেছিল এখানে?'

মাথা নেড়ে সায় দিল লিনা। 'চার্চ অফ মারিয়া অক্সিলিয়াডোরা-তে অবস্থিত তার সেই মিশন। কার্কার যেখানে ইভের হাড় লুকিয়েছিলেন, সেই স্যাংচুয়ারির মতো এই স্থাপনাটাও মাতা মেরির উদ্দেশ্যে নিবেদিত।' কথার মাঝখানে এক মুহূর্ত বিরতি নিল প্রজননবিদ। তারপর আবার শুরু করল, 'নব্বই বছর বয়সে মারা যাওয়ার আগে ফাদার ক্রেসপি প্রায় পঞ্চাশ বছর ছিলেন ওখানে। স্থানীয় শুয়ার গোত্রের লোকজন এমন প্রচুর আর্টিফ্যাক্ট দিয়েছে তাকে, সংখ্যা প্রায় সত্তর হাজারের মতো হবে।'

'এগুলো এলো কোথা থেকে?'

'স্থানীয় আদিবাসীরা বলে, বিশাল গুহা আছে জঙ্গলের নিচে, সেখান থেকেই আনা হয়েছে সব। রোল্যান্ডের বিশ্বাস, শুধু শুধু ফাদার ক্রেসপির কাছে আসেনি এই আর্টিফ্যাক্ট, তিনি আদিবাসীদের কাছে জঙ্গলের এমন কোনও জায়গার ব্যাপারে খোঁজ করছিলেন।'

'কিন্তু আমাদের মতো তার কাছে তো নির্দিষ্ট কোন কো-অর্ডিনেট ছিলো না।'

'ছিল না। তবে ফাদার কার্কার সম্পর্কিত অনুসন্ধানই তাকে এই এলাকায় আসার মতো তথ্য সরবরাহ করে।'

'কিন্তু তাই বলে একেবারে ওই শহরের দোরগোড়ায় আসার মতো তো নয়,' বলে বইটার দিকে ইঙ্গিত করল গ্রে। 'আর কী কী দেয়া হয়েছিল তাকে?'

পৃষ্ঠা উল্টিয়ে আরও কিছু জিনিসের ছবি বের করল লিনা- সাত ফুটি মিশরীয় মমি রাখার কফিন, ইনকাদের বর্ম, তাক ভর্তি ইকুয়েডরিয়ান তৈজসপত্র, গোল করে গুটানো সোনা আর রূপার পাত ইত্যাদি। 'গবেষণাকারী আর্কিওলজিস্টদের মতে অ্যাসাইরিয়ান, ব্যাবিলনিয়ান, মিশরীয় জিনিসে ভর্তি ছিল এই মিশনারির সংগ্রহ।'

বইটা নিজের দিকে টেনে নিল গ্রে। পাতায় পাতায় বহুমূল্য নিদর্শনের ছবিতে বোঝাই। একটা ছবিতে তো দেখা যাচ্ছে- সোনার পাতে একজন লোকের ছবি খোদাই করা, পেছন ফিরে বসে পাখির পালকের কলম দিয়ে লিখছেন কিছু একটা।

মাথা নাড়ল সিগমা কমান্ডার। 'কিছু কিছু ভুয়া জিনিসও ছিল অবশ্য।'

শ্রাগ করল লিনা। 'ফাদার ক্রেসপি নিজেও স্বীকার করেছেন, তাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে নিজেদের হাতে খোদাই করা নিদর্শনও দিয়েছিল স্থানীয়রা। কিন্তু কথা হচ্ছে, বুড়ো এক যাজককে কেন খুশি করার এতো প্রয়োজন পড়ল ওদের?'

'কে জানে!' জবাব দিল গ্রে। 'তারপর এই সংগ্রহের পরিণতি কী হলো?'

'এটাও এক রহস্য। উনিশশো বিরাশি সালে ফাদার মারা যাওয়ার পর, এসবের বেশিরভাগই জাদুঘরে তালা মেরে রাখে ইকুয়েডর সরকার। বিশেষ অনুমতি ছাড়া জিনিসগুলোতে চোখ বুলানোর উপায় নেই। অবশিষ্টাংশের জায়গা হয় জঙ্গলের গভীরে অবস্থিত কায়াম্বে-র মিলিটারি বেসে।'

মিলিটারি বেস?

বিমানের কেবিনের পুরোটাতে একবার নজর বুলিয়ে আনল লিনা। 'রোল্যান্ডের মতে, কিছু জিনিসপত্র নাকি ভ্যাটিকানেও আনা হয়েছিল।'

সিটে হেলান দিল সিগমা কমান্ডার। 'এই কথাটা সত্যি হলে, ফাদার কার্কারই একমাত্র লোক নন যিনি কিছু একটা লুকাতে চেয়েছিলেন।'

প্রশ্ন হচ্ছে, এমন কী সেই জিনিস যেটা লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন সবাই?

'বিস্তারিত জানতে হলে,' লিনার কণ্ঠে অনিশ্চয়তা। 'গোলকধাঁধা চিহ্নিত কার্কারের মানচিত্রের ওই গুহা খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।'

আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল শেইচান, ঝিমাচ্ছিল এতক্ষণ। 'সব মিলিয়ে আমার কাছে এগুলো রূপকথার গল্পের চাইতে বেশি কিছু বলে হচ্ছে না।'

'সম্ভবত তাই,' সায় দিল গ্রে।

তার দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি করল সাবেক আততায়ী। গত কয়েক ঘন্টা জায়গাটার অস্তিত্বের ব্যাপারে ঘাঁটাঘাঁটি করেছে সিগমা কমান্ডার।

'কাগজপত্রে অবশ্য আন্দেজের নিচে বিশাল গুহা থাকার কথা উল্লেখিত আছে,' গ্রে বলল। 'যদিও পুরোটা মাপজোখ করা সম্ভব হয়নি। তবে উনিশশো ছিয়াত্তর সালে, একটা ব্রিটিশ-ইকুয়েডরিয়ান রিসার্চ টিম এর বেশ অনেকখানি অংশের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে।'

'নিল আর্মস্ট্রং-এর সেই দলটা,' যোগ করল লিনা।

'তিনিই ছিলেন ওই অভিযানের দলনেতা। তবে তখন ওই গুহায় কোন হারানো শহর কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায়নি। শুধু বেশ কিছু বিলুপ্তপ্রায় গাছগাছড়া আর কীটপতঙ্গের খোঁজ মিলেছিল। আর ছিল আদিবাসীদের প্রাচীন কবর।'

মাথা নাড়ল শেইচান। 'দেখলে, হারানো কোনও শহর কিন্তু পাওয়া যায়নি। যা বলছিলাম, পুরোটাই বানোয়াট গপ্প ছাড়া কিছু না।'

'এতটা নিশ্চত হওয়া ঠিক হচ্ছে না। কথিত আছে, ধাতব পাত আর ক্রিস্টাল ট্যাবলেটের বিশাল এক সংগ্রহ নাকি রক্ষিত আছে ওখানে। পেট্রোনিও জারামিলো নামের এক ব্যক্তির বক্তব্য থেকে পাওয়া যায়, তরুণ বয়সে শুয়ার গোত্রের এক আদিবাসী তাকে ওই সুপ্রাচীন লাইব্রেরীতে নিয়ে গিয়েছিল। উনিশশো ছেচল্লিশ সাথে কথা এটা। তারপর লুটতরাজের ভয়ে বেশ অনেক বছর জায়গাটার কথা গোপন রাখে সে। অবশেষে লোকটা আবারও ওই লাইব্রেরী পুনরাবিস্কার করতে রাজী হয়, সেই সাথে জুড়ে দেয় অদ্ভুত এক শর্ত- নিল আর্মস্ট্রংকেও ওই অভিযানে শরীক হতে হবে। তারপর উনিশশো আটানব্বই সালে, অভিযান শুরু করার আগেই গুপ্তঘাতকের হাতে মারা যায় সে।'

'খুন?' লিনার কণ্ঠে অবিশ্বাস।

'হ্যা। সম্ভবত জায়গাটার ব্যাপারে মুখ খুলতে রাজি হওয়াই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। যাই হোক, তার মৃত্যুর সাথে সাথে হারিয়ে যায় ওই লাইব্রেরীর ঠিকানা।'

টেবিল থেকে বইটা হাতে তুলে নিল লিনা। 'তোমার কী ধারণা, ফাদার ক্রেসপির ওই জিনিসগুলোও একই জায়গা থেকে এসেছিল?'

'সম্ভবত। তা না হলেও হয়তো ওই সুড়ঙ্গের সাথে লাইব্রেরীটার গোপন সংযোগ ছিল।'

সোজা হয়ে বসল শেইচান। 'তো ওই জারামিলো লোকটা আর্মস্ট্রংকেই অভিযানে চেয়েছিল কেন?'

শ্রাগ করল গ্রে। 'হয়তো শুধু তার জনপ্রিয়তার জন্য। কিংবা আরও কোনও কারণ থাকাও বিচিত্র না। আমার কাছে এখনও খটকা লাগছে, কেনই বা ওই অভিযানে যেতে সম্মত হয়েছিলেন আর্মস্ট্রং, তিনি তো আর্কিওলজিস্ট ছিলেন না। আর চাঁদে পদার্পন, অর্থাৎ অ্যাপোলো-১১ মিশন শেষে বেশ প্রচারবিমুখ হয়ে পড়েন তিনি। হাতেগোণা কয়েকটা সাক্ষাৎকার ছাড়া গণমাধ্যমের সামনেও আসতেন না। তাহলে হঠাৎ মত পরিবর্তনের কারণ কী?'

'উত্তরটা সম্ভবত আমার জানা আছে,' পেছন থেকে বলে উঠল রোল্যান্ড। কার্কারের জার্নালটা বুকে চেপে ধরে, জানালা দিয়ে বাইরে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে তরুণ যাজক।

'কী সেই উত্তর?'

'চাঁদ... আমরা যা দেখছি, এটা আসলে ঠিক তা না।'

রাত ৯:০২

কার্কারের জার্নালে পাওয়া কথাগুলো ঠিক কীভাবে ব্যাখ্যা করবে, তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না রোল্যান্ড। রেভারেন্ড ফাদার যে যুগান্তকারী কথাগুলো সেসময় গোপন করেছিলেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

ইভের হাড় খুঁজে পাওয়ার মাত্র চল্লিশ বছর আগেই বিজ্ঞানী গ্যালিলিও-কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু নয়- এটা বলাই ছিল তার অপরাধ। তাই তৎকালীন সময়ে ব্যাপারটা প্রকাশ করলে ফাদার কার্কারের ভাগ্যেও হয়তো এমন কিছু হত।

'আমরা যা দেখি, চাঁদ আসলে তা নয়?' গ্রে-র কণ্ঠে বিস্ময়। 'তাহলে কী এটা?'

কার্কারের জার্নালটা দেখাল রোল্যান্ড। 'রেভারেন্ড ফাদারের স্বীকার্য অনুযায়ী, চাঁদ প্রাকৃতিক কোনও জিনিস নয়।' জবাবে কেউ কিছু বলার আগেই আবারও মুখ খুলল যাজক। 'আর আমিও তার কথার সাথে একমত।'

সিট ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠল শেইচান, জানালার বাইরে নজর। পূর্ণচাঁদ ঝুলে আছে আকাশে। 'ওটা প্রাকৃতিক নয়?'

সিটে হেলান দিয়ে বসল রোল্যান্ড। 'সারারাত কার্কারের জার্নালে পাওয়া তথ্যগুলো সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছি আমি। চেয়েছি, তার যুক্তিগুলোকে মিথ্যা প্রমাণ করতে। কিন্তু যা পেয়েছি, তা শুধুই সমর্থন।'

'খুলে বলুন,' গ্রে-র আর তর সইছে না যেন।

'কথাগুলো শুধু এই জার্নালের না,' বলে চাঁদের দিকে ইঙ্গিত করল যাজক। 'কখনও ভেবেছেন, কেন গ্রহণ লাগলে চাঁদের ছায়া একেবারে খাপে খাপ সূর্যের উপর বসে যায়? ব্যাপারটা কি নিখুঁতভাবে জ্যামিতিক নয়?'

জবাব দিল না কেউ। কথা সত্যি।

উত্তরটা রোল্যান্ডই দিল। 'কারণ চাঁদের আকৃতি সূর্যের চাইতে চারশো গুণ ছোট। সেই সাথে এটার অবস্থান পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের চারশো ভাগের এক ভাগে। আর শুধু তাই নয়। শীতকালে অস্ত যাওয়ার সময় সূর্যের অবস্থান দিগন্তের যেখানে থাকে, গ্রীষ্মের পূর্ণচাঁদকেও একেবারে সেই জায়গাটাতেই দেখা যায়। এসব কী একটু বেশি মাত্রায় কাকতাল নয়?'

'কিন্তু তাই বলে চাঁদকে ভুয়া জিনিস বলে রায় দেয়া যাচ্ছে না,' মৃদুকণ্ঠে মন্তব্য করল লিনা।

হার মানতে রাজি নয় রোল্যান্ড। 'চাঁদের জন্ম সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনও নিশ্চিত নন। এ ব্যাপারে বিগ ওয়্যাক মতবাদকে বর্তমানে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে ধরা

হয়। এই মতবাদ অনুযায়ী- পৃথিবীর সাথে মঙ্গলগ্রহের সংঘর্ষের ফলে চাঁদের উৎপত্তি।'

'তো এতে সমস্যা কোথায়?' গ্রে-র কণ্ঠে অসহিষ্ণুতা।

'সমস্যা দুটো। এক- জ্যোতির্বিদদের মতে, এরকম একটা সংঘর্ষ ঘটলে পৃথিবী আজ যতটা দ্রুত ঘুরছে, তার চাইতে অনেক বেশি জোরে ঘুরত। তাই বিগ ওয়্যাক মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে বিপরীত দিক থেকে আরেকটা দ্বিতীয় সংঘর্ষের কথা কল্পনা করা হয়।'

'যা অতিরিক্ত ঘূর্ণন থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে,' যোগ করল গ্রে।

মাথা নেড়ে সায় দিল রোল্যান্ড। 'কিন্তু জ্যোতির্বিদরা এমন কোনও ঘটনার প্রমাণ আজ পর্যন্ত দিতে পারেনি। এবার আসি দ্বিতীয় সমস্যায়। এটা পৃথিবী থেকে ছিটকে যাওয়ার পর, চাঁদে পরিণত হওয়া অদ্ভুত পদার্থ সম্পর্কিত।'

'কেন অদ্ভূত?'

'কারণ ধূলিকণা সরে যাওয়ার পর দেখা যায়, পৃথিবীর আকার দাঁড়িয়েছে চাঁদের চাইতে ৩৬৬ গুণ বড়। অনুপাতটা কী একটু অদ্ভুত ঠেকছে না?'

'৩৬৬...' বিড়বিড় করল লিনা। 'বছরে দিনের সংখ্যার সমান।'

'হ্যাঁ। তাছাড়া, সূর্যের চারদিকে এক চক্কর দিতে দিতে পৃথিবী নিজ অক্ষে ৩৬৬ বার আবর্তিত হয়।' বলতে বলতে কোলের উপর রাখা কার্কারের জার্নালের প্রচ্ছদে আঁকা গোলকধাঁধার উপর হাত বুলাল রোল্যান্ড। 'এজন্যই ক্রিটের জ্যোতির্বিদরা এই বৃত্তটাকে ৩৬৬ ডিগ্রী কোণে বাঁকিয়ে দিয়েছেন। সুমেরীয়রাও একই কাজ করেছে। সেই সাথে প্রতি ডিগ্রীকে ভাগ করেছে ৬০ মিনিটে, প্রতি মিনিটকে ভাগ করেছে ৬০ সেকেন্ডে।'

'আজও মাপজোখের ক্ষেত্রে আমরা তাই করি,' যোগ করল লিনা।

'তবে ব্যাপারটাকে ৩৬০ ডিগ্রীতে এনে স্থির করেছি আমরা,' একটু সংশোধন করল তরুণ যাজক। 'যা বলছিলাম, চাঁদের চমক কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। কেন এটার ভর অনুমানের চাইতে অনেক হালকা? কেন অঞ্চলভেদে এর মাধ্যাকর্ষণে বিভিন্নতা? কেন এর কেন্দ্র এতটা ছোট? তবে এটা সত্যি, এই অদ্ভুত চাঁদ না থাকলে আজ পৃথিবীতে আমাদেরও অস্তিত্ব থাকত না।'

ভ্রূকুটি করল লিনা। 'মানে?'

'জীববিজ্ঞানীদের মতে, চাঁদের আকর্ষণেই জোয়ার-ভাটা হয়। অতীতে সাগর থেকে উঠে জীবের মাটিতে আশ্রয় নেয়ার পেছনে এই কারণটাই দায়ী। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, নভোপদার্থবিদ্যা বলে- পৃথিবীকে নিজ অক্ষে ধরে রাখার পেছনে চাঁদের আবর্তনের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। চাঁদ না থাকলে পৃথিবীর

মাধ্যাকর্ষণ ও তাপমাত্রা বহুগুণে পরিবর্তীত হয়ে যেত, জীবনের বিকাশের পক্ষে যা অনুপযুক্ত।'

'অর্থাৎ, চাঁদ না থাকলে আমরাও থাকতাম না।' শেইচান বলল। 'তবে আপনি যা বললেন, উপকারের পাশাপাশি যথেষ্ট বিতর্কের সূত্রপাতও করেছে আমাদের এই উপগ্রহ।'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রোল্যান্ড। 'এজন্যই সম্ভবত এসবের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন নিল আর্মস্ট্রং। হয়তো চাঁদের পৃষ্ঠে তিনি এমন কিছু দেখেন, যার ফলে এই তদন্ত মনে আগ্রহ জাগিয়েছিল।'

ভ্রু কুঁচকে জানালা দিয়ে চাঁদের দিকে তাকাল গ্রে। 'নাসা-র সেই বিতর্কিত দুই মিনিটের কথা বলছেন?'

সবার দৃষ্টি স্থির হলো সিগমা কমান্ডারের উপর।

'মানে?'

রাত ৯:০৭

নিল আর্মস্ট্রং-এর কথায় অ্যাপোলো-১১ অভিযান সংক্রান্ত গ্রে-র বেশ বিতর্কিত একটা ব্যাপার মনে পড়ে গেছে।

'এক সহকর্মীর কাছ থেকে ব্যাপারটা জানতে পারি আমি,' ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছে সিগমা কমান্ডার। 'লোকটা আগে নাসায় চাকরি করত। চাঁদে সর্বপ্রথম মানুষের পা পড়ার অনুষ্ঠানটা সরাসরি সম্প্রচার করছিল নাসা। তবে অভিযাত্রীদের অবতরণের একটু পরেই দুই মিনিটের জন্য সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। কর্তৃপক্ষ জানায়, ক্যামেরা মাত্রাতিরিক্ত গরম হয়ে যাওয়ার কারণে এই অচলাবস্থার সৃষ্টি। কিন্তু ধারণা করা হয়, ওই সময়টুকু অভিযাত্রীরা কিছু একটা লুকানোর কাজে ব্যয় করেছিল। এজন্যই ইচ্ছাকৃতভাবে বন্ধ রাখা হয় সরাসরি সম্প্রচার। ব্যাপারটা পরবর্তীতে নাসার এক কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার স্বীকারও করে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বরাবর কথাটা অস্বীকার করে আসছে।'

'অ্যাঁ!' লিনার কণ্ঠে অবিশ্বাস।

'হ্যাঁ,' সায় দিল গ্রে। 'গুজব আছে, চাঁদের কোনও একটা রহস্যকেই ধামাচাপা দেয়া দেয় অভিযাত্রীরা।'

'সম্ভবত তাই,' রোল্যান্ড বলল। 'ফাদার কার্কারও মনে করতেন, চাঁদের সাথে বিশেষ কোনও রহস্য জড়িয়ে আছে। এই ব্যাপারে জার্নালে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা খরচ করেছেন তিনি।'

'আর কী লেখা আছে ওতে?' জানতে চাইল গ্রে।

দু'হাতে জার্নালটা উঁচু করে ধরল যাজক। 'বেশিরভাগই পৃথিবীর সাথে চাঁদের তুলনাসংক্রান্ত। উদাহরণস্বরূপ- আন্দাজ করতে পারেন, প্রতি দশ হাজার দিনে চাঁদ পৃথিবীকে কতবার আবর্তন করে?'

নিজেই জবাবটা দিল সে। '৩৬৬ বার। বলা যায়, আমাদের গ্রহের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এই সংখ্যাটা।'

'কীভাবে?'

'ইভের কঙ্কালের সাথে পাওয়া হাড়ের দন্ডটার কথা মনে আছে?' পাল্টা প্রশ্ন করল রোল্যান্ড। তারপর ফোন বের করে পর্দায় ফুটিয়ে তুলল ছবিটা। 'ফাদার এটাকে ডে কস্টা ইভ, অর্থাৎ ইভের পাঁজর নামে অভিহিত করেছেন। ভালোভাবে তাকালে দন্ডটার গায়ে আঁকা চিহ্নগুলোও দেখতে পাবেন।' বলে ছবিটা জুম করল সে।

'কী এগুলো?' জানতে চাইল গ্রে।

'জিনিসটা একটা প্রাচীন মাপদন্ড।'

'কী মাপা হত এটা দিয়ে?' এবারের প্রশ্নটা শেইচানের মুখ থেকে এসেছে।

'সবকিছু।'

ভ্রুকুটি করল গ্রে। তবে পাত্তা না দিয়ে বলে চলেছে রোল্যান্ড, 'ইতালির চ্যাপেলে আমি দন্ডটা মেপে দেখেছিলাম। ওটা ৮৩ সেন্টিমিটার লম্বা।'

'এক গজের সামান্য কম,' মন্তব্য করল গ্রে।

'হ্যাঁ। কিন্তু...'

কথার মাঝখানে চেঁচিয়ে উঠল লিনা। 'এটা...এটা সাধারণ গজের মাপ না। এটাকে বলা হয় মেগালিথিক গজ!'

মাথা নেড়ে সায় দিল রোল্যান্ড। 'ঠিক তাই। আমিও এটাই বলতে চাইছিলাম।'

'মেগালিথিক গজ আবার কী?' প্রশ্ন করল গ্রে।

'উনিশশো ত্রিশ সালের সেই স্কটিশ ইঞ্জিনিয়ারটা,' ব্যাখ্যা করতে লাগল লিনা। 'কী যেন নামটা?'

'আলেক্সান্ডার থম,' শূন্যস্থান পূরণ করল রোল্যান্ড।

'হ্যাঁ... আলেক্সান্ডার থম। যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্সের নিওলিথিক সাইটগুলো পরিদর্শন করে এই ইঞ্জিনিয়ার আবিষ্কার করেন, এসব ঐতিহাসিক স্থাপনার বিশাল বিশাল পাথরগুলো একটা বিশেষ মাপ অনুসারে সাজানো।'

'ওটাই মেগালিথিক গজ হিসেবে পরিচিত,' বাকি অংশটা শেষ করল রোল্যান্ড। 'ইভের দন্ডটার ওই দৈর্ঘ্য যুগে যুগে বিভিন্ন সভ্যতা আর সংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে আছে। স্প্যানিশ ভারা, জাপানের শাকু, প্রাচীন ভারতের হরপ্পা...সবকিছুর পরিমাপেই এই বিশেষ গজের অস্তিত্ব রয়েছে। এমনকি ক্রিটের এক হাজার মাইনোয়ান ফুটের সমতুল্য হচ্ছে ৩৬৬ মেগালিথিক গজ।'

'আবারও সেই সংখ্যাটা!' বিড়বিড় করল গ্রে।

'যতদূর মনে পড়ছে,' লিনা যোগ করল। 'ঐতিহাসিক স্টোনহেঞ্জের চক্রের আকৃতিও হলো এক হাজার মেগালিথিক গজের বর্গের সমান।'

মেয়েটার দিকে ঘুরে তাকাল শেইচান। 'আপনার মতো একজন প্রজননবিদ এসব জানল কীভাবে?'

'গবেষণার স্বার্থেই জানতে হয়েছে। মারিয়া আর আমি প্যালিওলিথিক আমলের বিখ্যাত সব স্থাপনা এবং নিদর্শন সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছি। সবকিছুর মূলে রয়েছে আমাদের সেই মতবাদ- ক্ষুদ্র একটা গোষ্ঠীই গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ডের পেছনে ভূমিকা রেখেছে।'

'রোল্যান্ডের উল্লেখ করা সেই ওয়াচারদের মতো,' গ্রে বলল।

শেইচানের কণ্ঠে অধৈর্য। 'তো তোমরা বলতে চাইছ, বিশেষ সেই জাতিই প্রাচীন বিভিন্ন সভ্যতার মাঝে এই মাপকাঠি ছড়িয়ে দিয়েছিল।'

ফোনের স্ক্রিনে ফুটে থাকা দন্ডটার দিকে চোখ ফেরাল গ্রে। সোজাসুজি যেন তার দিকেই তাকিয়ে আছে আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষ আর নিয়ানডারথাল সেই সংকরের কঙ্কাল।

আমি কি সেই ওয়াচারদের একজনকেই দেখছি? চুপচাপ ভাবছে সিগমা কমান্ডার। অবশেষে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল বাকিদের দিকে। 'কিন্তু এই দৈর্ঘটা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?'

জবাবটা লিনার মুখ থেকে বেরোল, 'কারণ, পৃথিবীর পরিধি থেকে নির্ণয় করা হয়েছে এই মেগালিথিক গজ।'

'ফাদার কার্কারও ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন,' বলে জার্নাল খুলে একটা পৃষ্ঠায় আঁকা গোলাকার পৃথিবীর ছবি বের করল রোল্যান্ড। 'দেখুন, কীভাবে গোটা পৃথিবীকে ৩৬৬ ডিগ্রীতে বিভক্ত করেছিলেন ফাদার। তারপর আবার ডিগ্রীকে ভাগ করেন ৬০ মিনিট, এবং মিনিটকে বিভক্ত করেন ৬০ সেকেন্ডে। আর এই এখানে, একেবারে নিচে আছে সর্বশেষ ফলাফল- পৃথিবীর পরিধির মাপ।'

36.6 Costa Eve

'আবারও সেই ৩৬৬!' মন্তব্য করল গ্রে।

শেইচানও কাগজটার দিকে ঝুঁকে তাকিয়েছে। 'কিন্তু প্রাচীন আমলের সেই মানুষগুলো কীভাবে পৃথিবীর পরিধি হিসাব করল?'

'কৃত্রিমভাবে,' জবাব দিল রোল্যান্ড। 'সুতা, পাথর আর খুঁটির সাহায্যে পরিধি নির্ণয়ের পদ্ধতি ততদিনে আবিষ্কৃত হয়ে গেছে।' বলে একটা পেন্ডুলামের ছবি বের

করল যাজক। 'এই যে দেখুন, ফাদার কার্কার এখানে বিস্তারিত বুঝিয়ে দিয়েছেন। শুক্র গ্রহকে মাপকাঠি হিসেবে কল্পনা করেছেন তিনি।'

'রোল্যান্ড ঠিক বলেছে,' সায় দিল লিনা। 'আমরা সবাই জানি, প্রাচীন গণকরা তারা এবং গ্রহ-নক্ষত্রের নড়াচড়ার ব্যাপারে অবগত ছিল।'

সিটে হেলান দিল গ্রে। 'অর্থাৎ, কেউ পৃথিবীর পরিধি অনুসারে মেগালিথিক গজের পরিমাপ আবিষ্কারের পর মাপটাকে তৎকালীন আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করে।'

'তেমনটাই মনে করতেন ফাদার কার্কার,' রোল্যান্ড বলল। 'তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ওই দন্ড আর চাঁদের পাথুরে প্রতিকৃতি হচ্ছে জ্যোতির্বিদ্যায় তৎকালীন মানুষের উন্নত জ্ঞানের প্রমাণস্বরূপ।'

'আর তারপরই ওদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হন ভদ্রলোক?'

সায় দিল তরুণ যাজক। 'তবে ধার্মিক লোক হিসেবে তিনি ধর্মীয় জ্ঞানকেও এক্ষেত্রে প্রাধান্য দেন। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, সংখ্যাগুলোর ব্যাপারে বাইবেলও রেফারেন্স হিসেবে কাজ করে।'

আঁতকে উঠল গ্রে। 'মানে?'

রাত ৯:০৯

কার্কারের জার্নালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা এখন ব্যাখ্যা করতে চলেছে রোল্যান্ড। 'জিম্যাট্রিয়া সম্পর্কে কতটুকু জানেন?'

না-বোধক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সবাই।

'এটা হচ্ছে ইহুদিদের অনুসরণকৃত একটা ব্যাবিলনিয়ান সংখ্যাতত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, প্রতিটা অক্ষরেরই একটা সংখ্যাগত মান রয়েছে। মধ্যযুগে ধারণাটা বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরবর্তীতে খ্রিস্টানরা বাইবেলেও প্রয়োগ করে এই সংখ্যাতত্ত্ব। গণিতশাস্ত্রবিশারদ হিসেবেও ফাদার কার্কারের বেশ সুনাম ছিল। তিনি জার্নালে প্রমাণ করেছেন, বাইবেলেও একটা সংখ্যার বেশ প্রাধান্য ছিল।'

'কোনটা?'

'৩৭... একটা মৌলিক সংখ্যা।' বলে আবারও জার্নালের পৃষ্ঠায় ফিরে গেল রোল্যান্ড। 'প্রথমে ভেবেছিলাম, ফাদার আসলে ৩৬.৬ কেই পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে ৩৭ লিখেছেন। কিন্তু পরে দেখি, ধারণাটা ভুল। লিনা আর আমি ক্রোয়েশিয়ার গুহায়, নিয়ানডারথাল পুরুষটার কবরের উপর হাতের ছাপে তৈরি একটা তারার প্রতিকৃতি আবিষ্কার করি।'

ফোনের স্ক্রিনে একটা ছবি ফুটিয়ে তুলল তরুণ যাজক।
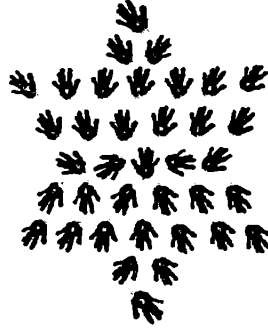
'গুনলে দেখতে পাবেন, এখানে ৩৭ টা হাতের ছাপ রয়েছে। ইভের কবরের উপরেও এরকম একটা প্রতিকৃতি ছিল। তবে ওটাতে ছাপের সংখ্যা আরও বেশি।' বলে লিনার দিকে ফিরল রোল্যান্ড। 'লিনা, ওই ছবিটা আপনার ফোনে তোলা। দেখাবেন একটু?'

পকেট থেকে ফোন বের করে ছবিটা পর্দায় বের করে আনল প্রজননবিদ।
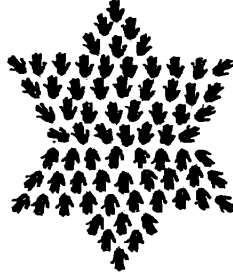
গুনে দেখা গেল, এটাতে ছাপের সংখ্যা ৭৩টা।

সায় দিল রোল্যান্ড। 'জার্নালেও এটাই উল্লেখিত আছে।'

'৩৭ আর ৭৩...' গ্রে বলল। 'দুটোই মৌলিক সংখ্যা এবং একটা আরেকটার ঠিক উল্টো, যাকে বলা হয় মিরর ইমেজ।'

'ফাদার কার্কার সংখ্যা দুটোকে স্টেলা নাম্বার, অর্থাৎ স্টার নাম্বার হিসেবে অভিহিত করেছেন।' বলে জার্নালের দিকে ইশারা করল রোল্যান্ড। 'বাইবেলেও ৩৭ সংখ্যাটা বিশেষ তাৎপর্য রাখে।'

'কীভাবে?' অবাক গলায় জানতে চাইল গ্রে।

'বাইবেলে বিশ্বাস শব্দটা মোট ৩৭ বার উল্লেখ করা হয়েছে। জ্ঞান শব্দটাও আছে মোট ৩৭ বার।' বলে বাকিদের উপর চোখ বুলাল তরুণ যাজক। 'এরকম আরও অনেকগুলো ব্যাপার জার্নালে উল্লেখ করেছেন ফাদার। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, বাইবেলের একেবারে প্রথম লাইনটা- সর্বপ্রথমে স্বর্গ আর নরক তৈরি করেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।'

জার্নালের আরেকটা পৃষ্ঠা বের করে দেখাল রোল্যান্ড। এখানে একই বাক্য হিব্রু ভাষায় লিখেছেন কার্কার। প্রতিটা সংখ্যার নিচে জিম্যাট্রিয়া অর্থাৎ সংখ্যাতত্ব ত

בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ

296 407 395 401 86 203 913

'সবগুলো মান যোগ করলে যোগফলটা আসে ২৭০১।'

ভ্রুকুটি করল গ্রে। 'তো?'

পরের পৃষ্ঠা উল্টাল রোল্যান্ড। এখানে বিস্তারিত হিসাব করা আছে।

2701 = 37 X 73

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল সিগমা কমান্ডার। 'আরে এটা তো দেখছি ওই মৌলিক সংখ্যাদুটোর গুণফল!'

সায় দিল রোল্যান্ড। 'হ্যাঁ। ফাদারের সেই স্টার নাম্বার দুটো। এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে। এই লাইনের প্রতিটা অক্ষরের মানকে যদি আপনি সেই অক্ষরের সংখ্যা দিয়ে গুণ করেন, তারপর প্রাপ্ত ফলাফলকে ভাগ করেন শব্দগুলোর মান দিয়ে...তাহলে যুগান্তকারী আরেকটা সংখ্যা পাওয়া যায়।'

যাজকের কথা অনুযায়ী হিসাবটা করল গ্রে। অবাক হয়ে **3.1415**

'আরে! এটা তো পাই-এর মান!'

'হ্যাঁ। ফাদার কার্কারে আমলে বেশ প্রচলিত ছিল সংখ্যাটা।'

সিটে হেলান দিয়ে বসল লিনা। 'বুদ্ধিমত্তার শিকড় সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে আমাকে পাই সম্পর্কেও গবেষণা করতে হয়েছে। ব্যাপারটা আসলে এসেছে ব্যাবিলনিয়ানদের কাছ থেকে।'

জার্নালটা বন্ধ করল রোল্যান্ড। 'তো দেখতে পাচ্ছি, বাইবেলের প্রথম লাইন শুধু ওই স্টার নাম্বার না, বরং পাইয়ের মানের সাথেও সম্পর্কিত।'

প্রাচীন ডায়েরীটা টেনে নিয়ে আবারও পৃথিবীর ছবি আঁকা পৃষ্ঠাটা বের করল গ্রে। তারপর আঙুল রাখল পৃথিবীর পরিধির হিসাব লেখা লাইনটার উপর- ৩৬.৬ কোস্টা ইভ। 'রোল্যান্ড যা ধারণা করেছিলেন- মানটার দশমিক ভগ্নাংশ বিবেচনা করলে পুর্ণরূপ দাঁড়ায় ৩৭ এ। মনে হচ্ছে- সূর্য, চাঁদ আর পৃথিবীকে এই সংখ্যা দিয়ে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে কেউ।'

'শুধু তাই না,' লিনা বলে উঠল। 'মানুষের জেনেটিক কোডের মাঝেও লুকিয়ে আছে সংখ্যাটা!'

ত ৯:১২

াখ্যা করতে শুরু করেছে প্রজননবিদ। 'অনেকক্ষণ ধরেই মাথার ভেতর খোঁচাচ্ছিল াপারটা, সবেমাত্র মনে পড়ল। দু'হাজার চোদ্দতে একটা অ্যাকাডেমিক জার্নালে থাটা লক্ষ্য করি। সৃষ্টির সব জীবেই একটা জিনিস রয়েছে- ডিএনএ। ডিএনএ-র ১তর আছে জেনেটিক কোড। তবে ওই জেনেটিক কোডেরও একটা কোডিং াছে। ওই কোডিং অনুপাতেই কাজ করে জিন। সংখ্যাটা অনুমান করতে করতে ারেন কেউ? একটা মৌলিক সংখ্যা ওটা।'

'৩৭?' প্রশ্ন করল গ্রে।

সায় দিল লিনা।

ভ্রু কুঁচকাল রোল্যান্ড, তারও একটা কথা মনে পড়েছে। 'জীববিদ্যার সাথে ৩৭ র সম্পর্কে খোঁজার জন্য আসলে অত গভীরে যাওয়ার দরকার নেই। মানুষের দহের স্বাভাবিক তাপমাত্রাও কিন্তু ৩৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস।'

নীরবতা নেমে এল গোটা কেবিনে।

'তাহলে আমরা এমন একটা সংখ্যা নিয়ে কথা বলছি...' গ্রে বলল, 'যেটা ামাদের ডিএনএ থেকে শুরু করে একেবারে চন্দ্র-সূর্য পর্যন্ত বিস্তৃত।'

'কিন্তু এসবের মানে কী?' শেইচানের কণ্ঠে অধৈর্য।

মাথা নাড়ল সিগমা কমান্ডার, জানে না। বাকি সবার ক্ষেত্রেও একই কথা াযোজ্য।

'এর যদি আসলেই কোনও উত্তর থেকে থাকে,' জবাব দিল রোল্যান্ড। 'পাওয়া াবে এই এখানে,' বলে জার্নাল থেকে আগে দেখা ছবিটা বের করল যাজক।
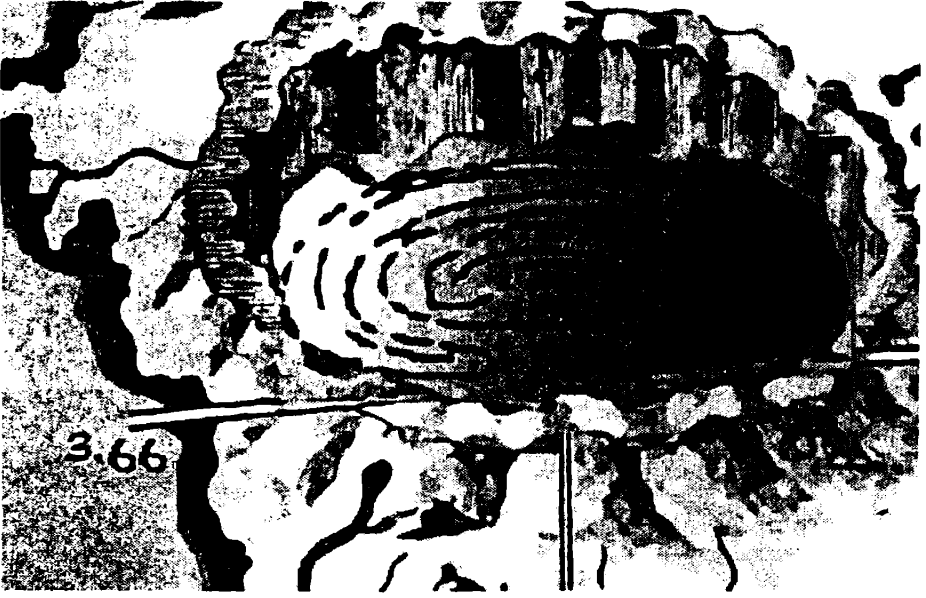
‘এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কীভাবে?’ আবারও জিজ্ঞেস করল সাবেক আততায়ী।

জবাবে হাসল রোল্যান্ড। ‘দেখুন কোথায় যেতে হচ্ছে আমাদের, জায়গাটা ল্যাটিচিউডের মানটার দিকে লক্ষ্য করুন।’

ভালো করে ছবিটার দিকে তাকাল গ্রে। ‘৩.৬৬!’

আবারও হাসল তরুণ যাজক। ‘ব্যাপারটা কী একটু বেশিই কাকতালীয় বলে ম হচ্ছে না?’

এমন সময় পাইলটের কণ্ঠ ভেসে এল রেডিওতে। ‘বাঁধা-ছাদা ছেড়ে নিন বন্ধুর কোয়েঙ্কায় পৌঁছে গেছি। অবতরণ করব একটু পর।’

সিটবেল্ট বেঁধে জানালা দিয়ে নিচে তাকাল লিনা। ঘন জঙ্গলের মাঝে জায়গা জায়গায় মাথাচাড়া দিয়েছে উঁচু পাহাড়শৃঙ্গ। এখানেই কোনও একটা জায়গা লুকানো আছে মানবজাতির ইতিহাসসংক্রান্ত সব প্রশ্নের উত্তর।

রহস্য সমাধানের খুব কাছে চলে এসেছে ওরা। তবুও লিনার মনের একটা অং চাইছে, বিমান ঘুরিয়ে ফিরে যেতে। নির্ঝঞ্ঝাট ল্যাবই ছিল ওর দুনিয়া। এ রক্তপাত, ঝুট-ঝামেলা আর সহ্য হচ্ছে না।

একটু আগে বলা গ্রে-র কথাটা মনে করল প্রজননবিদ- সূর্য, চাঁদ আর পৃথিবীে ৩৭ সংখ্যাটা দিয়ে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে কেউ।

প্রশ্ন হচ্ছে- সেই ‘কেউ’টা কে?

রানওয়েতে ঘষা খাচ্ছে বিমানের চাকা।

উত্তরটা জানার সময় হয়ে এসেছে।

রাত ১০:০৩

কোয়েঙ্কার এয়ারপোর্টের মেইন হ্যাঙ্গারের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট শু ওয়েই। শিকারের কানের নিচ থেকে খুলে আনছে ছুরিটা। প্রাণবায়ু ছাড়ার আগে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠতে চেয়েছিল লোকটা। তবে সজোরে মুখ চেপে ধরে রাখায় হতভাগার শেষ ইচ্ছাটাও পূরণ হয়নি।

ছুরির গায়ে লেগে থাকা রক্তটুকু লাশের গায়ে মুছে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ওয়েই। যা যা জানা দরকার, মরার আগে লোকটা সবই জানিয়ে গেছে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে একটা ভাড়া করা হেলিকপ্টারে চড়ে রওনা দিয়েছে তার শিকার। গন্তব্য-পাহাড়ের গভীরে কোথাও। ওখানে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে স্থানীয় শুয়ার গোত্রের গাইড।

পকেট থেকে রোল্যান্ডের আইপ্যাডটা বের করে আনল ওয়েই। অ্যাথেনাসিয়াস কার্কার সম্পর্কিত ক্রোয়েশিয়ান যাজকের অনুসন্ধান, গন্তব্য ইত্যাদি সবকিছুই ডিভাইসটাতে রক্ষিত আছে। আরও একবার ছবিটা বের করে দেখল সে।
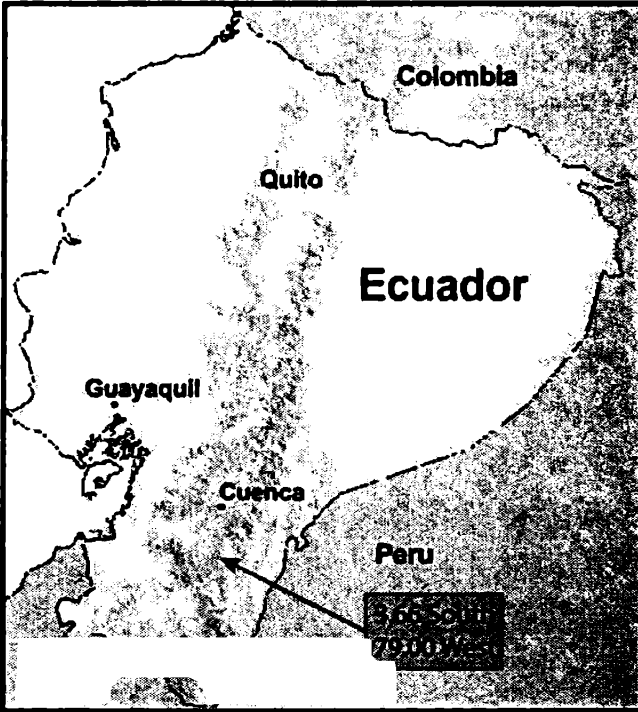
দলটা হেলিকপ্টারযোগে মানচিত্রে চিহ্নিত জায়গাতেই যাচ্ছে।

ভ্রুকুটি করল ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট। আশা করা যায়, সকালের আগে অনুসন্ধান শু
করবে না ওরা। সেক্ষেত্রে আর ভোরের আলো চোখে দেখবে না কেউ
কোয়েঙ্কাতেই হামলা করা হবে, ঘুমানোর সময় নিকেশ করে দেয়া হবে সবাইকে।

হ্যাঙ্গারের দরজায় দাঁড়ানো দশজনের দলটার দিকে তাকাল ওয়েই। ফ্যালক
ইউনিটের সবচেয়ে দক্ষ সৈনিক এরা, অতর্কিত হামলা করে শত্রুকে হকচকিয়ে দি
সিদ্ধহস্ত। এজন্যই ইউনিটের নাম রাখা হয়েছে ফ্যালকন অর্থাৎ বাজপাখি।

এগিয়ে এল গ্রুপের দলনেতা- সার্জেন্ট মেজর কোয়ান। লোকটা ওয়েই-এ
চাইতে এক মাথা সমান লম্বা, হালকা-পাতলা দেহকাঠামোর পুরোটাই পাকা
পেশী, পুরনো কাটা দাগে বোঝাই চেহারা। স্বভাবে হিংস্র হলেও বেশ অনুগত
যাদেরকে খুন করে, তাদের কাছ থেকে একটা না একটা স্মারক অবশ্যই সংগ্র
করবে সে। জিজ্ঞেস করলে বলে, এগুলো নাকি রাখে শিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে
উদ্দেশ্যে।

'হেলিকপ্টারে জ্বালানী ভরা শেষ,' বলে উঠল সার্জেন্ট। 'ইঞ্জিনও গরম হ
এসেছে।'

মাথা নেড়ে সায় দিল ওয়েই।

শিকার তবে শুরু হোক।

অধ্যায় উনিশ
১ মে, সকাল ১১:০৪
বেইজিং, চীন

সব ঠিক আছে...

শক্ত করে বাকোর হাত ধরে আছে মারিয়া। বলা ভালো, আঙুল আঁকড়ে রেখেছে। হাত তো বেডের সাথেই বাঁধা। প্রাণীটার গায়ের তাপমাত্রা বেড়ে গেছে, তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে চোখ। চুপ করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, বোঝার চেষ্টা করছে-ঠিক কী হচ্ছে। অবাক হচ্ছে, মারিয়া এসবে কেন বাধা দিচ্ছে না ভেবে। মাথায় স্টিলের রিং পরানো থাকায় নড়াতে পারছে না খুব একটা। অসহায় গরিলাটাকে এই অবস্থায় দেখে চোখের পানি আটকাতে পারছে না প্রজননবিদ।

ইলেকট্রিক শেভার দিয়ে ইতিমধ্যে বাকোর মাথার লোম চেঁছে ফেলছে একজন নার্স। ল্যাবে ঢোকার প্রায় নব্বই মিনিট হলো। অপারেশনের সব প্রস্তুতি নেওয়া শেষ। প্রাণীটার সম্পূর্ণ শারীরিক পরীক্ষা, কয়েক ধরনের রক্ত পরীক্ষা, এমনকি এমআরআই পর্যন্ত করা হয়েছে। প্রস্তুতি চলাকালীন সময়ে ফ্রেঞ্চ জীবাশ্মবিদকে নিয়ে বিদায় নিয়েছেন মেজর জেনারেল লাও, ক্রোয়েশিয়ার ওই নিয়ানডারথাল হাড়টা নিয়ে গবেষণা শুরু করবেন ভদ্রলোক।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল নিয়ে এল একজন ল্যাব টেকনিশিয়ান। সবকিছু ঠিকঠাক দেখে, সার্জারির জন্য প্রস্তুত হলো ড. হান। হাতে উঠে এসেছে লোকাল অ্যানেস্থেশিয়া ভর্তি সিরিঞ্জ, এর মাধ্যমেই প্রাণীটাকে অজ্ঞান করা হবে। বাকিরাও কাটাছেঁড়ায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলো গোছগাছ করছে।

মারিয়ার দিকে তাকিয়ে কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল বাকো।

'জানি, তুমি ভয় পাচ্ছ,' ফিসফিস করে বলল প্রজননবিদ, ঝুঁকে চুমু খেল গরিলার আঙুলে। তারপর হাত তুলে একটা ইশারা দেখাল।

[আমি তোমাকে ভালোবাসি]

সুইচ টিপে হাড় কাটা করাতটা পরীক্ষা করল এক নার্স। যন্ত্রটার গুঞ্জন যেন বিষ ঢেলে দিচ্ছে মারিয়ার কানে। আবারও ঝুঁকে বাকোর হাতটা আঁকড়ে ধরল সে। প্রাণীটাও আসন্ন বিপদ টের পেয়েছে, নিজেও সজোরে চেপে ধরছে মায়ের হাত।

'বাকো...আমি তোমার পাশে আছি। তাকাও এদিকে।' ফিসফিস করে বলল মারিয়া।

তার মুখের উপর স্থির হলো ভয়ার্ত চোখদুটো।

'এই তো... আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না।'

মারিয়ার ইচ্ছে করছে, গলা ছেড়ে কেঁদে ওঠে। চোখের কোণ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে ইতিমধ্যে। কিন্তু তার পক্ষে কি-ই বা আর করা সম্ভব! ল্যাবের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র গার্ড। কোয়ালস্কির ভাগ্যও এই সহযোগিতার সুতোয় ভর করে ঝুলছে।

আবারও বাকোর চোখের দিকে তাকাল প্রজননবিদ। সেখানে ফুটে ওঠা ভয়কে সংজ্ঞায়িত করার ভাষা তার জানা নেই। কালো চোখের মণি দুটো যেন কিছু একটা বলতে চাইছে।

গভীর করে দম নিল বাকো। মারিয়ার হাতে আরও শক্তভাবে এঁটে বসছে তার আঙুলগুলো। অর্থ খুঁজে পেল কাঁপতে থাকা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা বিচ্ছিন্ন আওয়াজগুলো।

'ম...ম...মা...'

নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না মারিয়া। দুর্বল হয়ে এসেছে পা-জোড়া। এমনকি হতভম্ব হয়ে গেছে সার্জনরাও। গরিলাজাতীয় প্রাণীদের ভোকাল কর্ড কথা বলার জন্য উপযুক্ত নয়। গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে সবার ভেতর।

'মা,' আবারও ডেকে উঠল প্রাণীটা।

নিচু হয়ে গরিলাটার হাতে গাল ঘষতে শুরু করল মারিয়া। চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসছে।

কেউ তো অন্তত সাহায্য করো আমাদের!

সকাল ১১:০৮

ডিজিয়া চেং-এর একেবারে মুখে দাঁড়িয়ে আছে মঙ্ক। খুব বেশিক্ষণ হয়নি, সিঁড়ি বেয়ে ভূগর্ভস্থ শহরে নেমে এসেছে। সবুজ ছত্রাকের আবরণ পড়া নোনাধরা দেয়াল এককালে সাদা রঙেরই ছিল। মেঝেতে হাঁটু সমান কালচে পানি। বাতাসে সোঁদা গন্ধ।

ফোনটা এগিয়ে দিল কিম্বারলি। 'আশা করা যায়, আমরা ঠিক পথেই এগোচ্ছি।'

ক্যাট ওদেরকে এই ভূগর্ভস্থ গলি-ঘুপচির একটা মানচিত্র সরবরাহ করেছে। এই মুহূর্তে ফোনের স্ক্রিনে ভেসে আছে ওটা। ইন্টেলিজেন্স সোর্সের মাধ্যমে জিনিসটা সংগ্রহ করেছে সিগমার সেকেন্ড ইন কমান্ড। কিন্তু ঝামেলা হলো, মানচিত্রটা অনেক

আগের। পরবর্তীতে বেইজিং-এর সাবওয়ে টানেল বেশ ক'বার কাটাকুটি খেলেছে আশি মাইল বিস্তৃতির এই শহরটাকে নিয়ে।

তারপরেও, নাই মামার চাইতে কানা মামা ঢের ভালো।

জিপিএস সিগনালটা একটা পরিত্যক্ত রেস্তোরাঁয় পুনরাবিস্কৃত হয়েছিল। গাও সান-কে ফাঁদে ফেলার পর পেইন্টারের পাঠানো দলটাকে ডেকে নিয়েছে মঙ্ক। একজনের মাধ্যমে লোকটাকে পাহারায় রেখে বাকিদের নিয়ে জানালা টপকে ঢুকে পড়েছে দোকানটাতে। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করতেই দেখা যায়, বেজমেন্ট থেকে সিঁড়ির ধাপ নিচে নেমে এসেছে- ভূগর্ভস্থ শহরে ঢোকার একটা প্রবেশপথ। কিম্বারলির মতে, এরকম আরও শ'খানেক জায়গা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বেইজিং-এ।

তবে সিঁড়ির মুখে একটা ইলেকট্রনিক তালা আটকানো ছিল। গাও সানের কি-কার্ড ব্যবহার করে সেটা খুলতে অবশ্য ঝামেলা হয়নি।

ব্যাটাকে ধরে লাভই হয়েছে বলা চলে। নাম অনুসন্ধান করে পিএলএ-তে কর্মরত ওর ভাইকেও খুঁজে বের করেছে ক্যাট- লেফটেন্যান্ট কর্নেল চ্যাং সান। তাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নাম মেজর জেনারেল জিয়াইং লাও। মহিলার একটা ছবিও পাঠিয়েছে ক্যাট। তার ব্যাপারেই রেগেমেগে ভাইয়ের সাথে ফোনালাপ করেছিল গাও।

এরাই মূলত প্রধান হর্তাকর্তা, ভাবল মঙ্ক। তবে নাগালটা পাব কীভাবে!

ছপছপ আওয়াজ শুনে বাস্তবে ফিরে এল সিগমা এজেন্ট। অন্ধকার কেটে ফিরে আসছে চার কমান্ডোর একজন। জায়গাটা সম্পর্কে ধারণা নিতে পাঠানো হয়েছিল ওদের। আরেকজন তো রয়ে গেছে গাও-এর সাথে।

'সব ঠিক আছে,' রিপোর্ট করল কমান্ডো। 'তবে একটা ব্যাপার আপনার দেখা উচিত।'

মিশনে পাঠানো পাঁচজনকে নিজ হাতে বাছাই করেছেন পেইন্টার ক্রো, প্রত্যেকেই চাইনিজ বংশোদ্ভূত। আশেপাশের লোকজনের সাথে চেহারার পার্থক্য না বোঝার জন্যই এদের পছন্দ করেছেন তিনি। প্রত্যেকের পরনে ভুয়া পিএলএ ইউনিফর্ম, মঙ্ক আর কিম্বারলির ভাগেও একটা করে জুটেছে।

'চলো,' সায় দিল মঙ্ক।

পানি কেটে এগিয়ে চলল জন শিন নামের কমান্ডো, পদমর্যাদায় সার্জেন্ট। পিছু নিয়েছে দু'জন। টানেলের জায়গায় জায়গায় আবর্জনার স্তূপ। এক জায়গায় পড়ে আছে কিছু পুরনো বাইসাইকেলের কঙ্কাল আর লোহালক্কড়। চলতে চলতে পানি পেরিয়ে উঁচু জায়গায় এসে উপস্থিত হলো ওরা। আলোও আছে এখানে।

ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল দলের বাকি সদস্যরা- হেনরি শ আর মাইকেল শ নামের দুই রেঞ্জার, দেখে মনে হয় সবসময় যেন চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু করছে। কং নামে পরিচিত ছোটখাট গড়নের আরেকজন। মঙ্ক বুঝতে পারল না, নামটা পিতৃপ্রদত্ত নাকি আকৃতির জন্য পরবর্তিতে দেয়া।

সরু প্যাসেজওয়েের সামনের দিকে ইঙ্গিত করল কিম্বারলি। বাঁকা ছাদ আর ধূসর রঙের দেয়ালে ঘেরা, উত্তর-দক্ষিণমুখী টানেলটা ট্যাঙ্ক ঢোকার মতো প্রশস্ত। উপরে জ্বলছে সোডিয়াম বাতি।

'ঠিক পথেই এগোচ্ছি আমরা,' ফোনের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল মঙ্ক। 'কপাল ভালো, গাও ব্যাটা একটা বাহনও রেখে গিয়েছে।'

টানেলের মুখে বি-জে-২০২২ মডেলের একটা অফ রোডার আর্মি জিপ দাঁড়িয়ে আছে। সবুজরঙা বাহনটার সামনে লাল পিএলএ লোগো সাঁটা। সম্ভবত এটাতে করেই সুড়ঙ্গে চলাফেরা করত গাও সান।

ড্রাইভিং সিটে চড়ে বসল কিম্বারলি, হাতে বেরিয়ে এসেছে বন্দি সৈনিকের কাছ থেকে নিয়ে আসা চাবির রিং, মুখে মুচকি হাসি। 'কে ভাবতে পেরেছিল, সুড়ঙ্গের ভেতরও লং ড্রাইভ করার আনন্দ মিলবে।'

সামনের প্যাসেঞ্জার সিট দখল করল জন শিন। অবশ্য দলনেতা হিসেবে সিটটা মঙ্কের প্রাপ্য। তবে বিপদে-আপদে কিম্বারলির মিষ্টি হাসি যেমন সহায়তা করবে, তার ক্ষেত্রে হবে পুরোপুরি উল্টোটা। চাইনিজ গার্ডদের সামনে মার্কামারা এই আমেরিকান চেহারার প্রর্দশনীর ফলাফল কী হবে, তা সহজেই অনুমেয়।

তাই পেছনে শ ভাইদের মাঝে গুটিশুটি হয়ে বসে পড়ল মঙ্ক। বাড়তি সতর্কতা হিসেবে ক্যাপটা আরেকটু নামিয়ে দিল। আর মুখের মাস্ক তো আগে থেকেই আছে।

বসার পালা শেষ হলে উত্তরদিকে ইঙ্গিত করল মুখ ঢাকা সিগমা এজেন্ট। 'রওনা দাও।'

সাহে সাথে গর্জে উঠল ইঞ্জিন।

সিটে হেলান দিল মঙ্ক। মনে একটাই চিন্তা উঁকি দিচ্ছে বারবার।

খুব বেশি দেরি যেন না হয়ে যায়...

সকাল ১১:১৪

মাথার উপরের অংশে যেন আগুন ধরে গিয়েছে।

ভয়ে আর ব্যাথায় বাকোর ছুটে পালাতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু হাত-পা স্ট্র্যাপ দিয়ে বেডের সাথে শক্ত করে বাঁধা। মাথার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তাই চোখ ছাড়া শরীরের অন্য কোনও অংশ নড়াচড়া করা ওর পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

লম্বা লোকটাকে সিরিঞ্জ হাতে ঝুঁকে আসতে দেখল বাকো। আগেও সুঁই-এর খোঁচা তাকে খেতে হয়েছে। তবে তখন পরিস্থিতি এমন ছিল না। মাঝে মাঝে খুব আদর করে তাকে খোঁচা দিত মা। পরে অবশ্য পুরস্কারও মিলত- কলা, মধু আরও কত কী!

কিন্তু এখন খুব ব্যথা লাগছে।

মায়ের দিকে তাকাল বাকো। নরম নরম কথা বললেও তার চোখের কোণে পানি। তার এই কান্না যেন ভয় আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। কাঁদছে কেন মা? কী করছে এই লোকগুলো?

তুমি কেঁদ না মা... লক্ষী ছেলে হয়ে থাকব আমি, বাকো ভাবল।

কিন্তু ব্যথা তো থামছে না! বরং সময়ের সাথে সাথে আরও ছড়িয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে যেন আগুন ধরে গিয়েছে মাথায়।

অবশেষে সরে দাঁড়াল সিরিঞ্জ হাতে থাকা লোকটা। সাথে সাথে এগিয়ে এল মা। 'সব ঠিক আছে।'

পরমুহূর্তে মাথার উপরের একটা বিন্দুতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল ঠান্ডা ভাব, আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসছে। অবশ করে দিচ্ছে সব।

অনুভূতিটা বাকোর ভালো লাগছে না। এটা বুঝতে পেরেই হয়তো এগিয়ে এল মা। 'সাহস রাখো...তুমি না কত সাহসী!'

মাথায় মায়ের স্পর্শ অনুভব করতে পারছে না বাকো। ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ।

'ঘুমাও, বাকো। আমি তোমার সাথে আছি।'

অবসাদে ডুবে যেতে যেতে বাড়ির স্মৃতি মনে করল বাকো। মা তার সাথে সুতোয় বাঁধা একটা বেলুন নিয়ে খেলা করত। মাঝে মাঝে হাত থেকে ছুটে যেত সুতো, বেলুনটা উড়াল দিত আকাশে। নিজেকে এখন সেই বেলুনের মতো হালকা লাগছে তার।

ঝাপসা হয়ে আসছে চোখের দৃষ্টি...

ঝাপসা হয়ে আসছে মায়ের মুখ...

ঝাপসা হয়ে আসছে সবকিছু...

শেষবারের মতো কাতরে উঠল বাকো, গল্পটা বলতে চাইল মা-কে।

চিৎকার করে বলতে চাইল- আমাকে ফেলে যেও না, মা...

মনের ইচ্ছা মনেই থেকে গেল। চোখে নেমে আসছে নিকষ আঁধার।

সকাল ১১:২৮

অপারেশন টেবিলের উপর বাকোর শরীরটা স্থির হয়ে আসতেই তার হাতটা ছেড়ে দিল মারিয়া। ওষুধ দেয়ার সময় প্রাণীটার চোখে ফুটে ওঠা ভয় দেখতে পেয়েছে সে। এখন অবশ্য ঘুমিয়ে পড়েছে। মৃদু ওঠা-নামা করছে বুক।

পুরোদমে কাজ শুরু করেছে দুই ডাক্তার আর তিন নার্সে গঠিত সার্জিক্যাল টিম। চামড়া কেটে খুলি আলাদা করা পর্যন্ত বাকোকে অজ্ঞান রাখবে ওরা। মস্তিষ্ক উন্মুক্ত করা হলে আবারও জাগিয়ে তোলা হবে প্রাণীটাকে। বাকোর আসল দুঃস্বপ্ন শুরু হবে তখনই।

দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখা মারিয়ার পক্ষে সম্ভব নয়। পিছিয়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল সে। এখনও সংকর গরিলাগুলোর চেম্বারে আটকে রাখা হয়েছে কোয়ালস্কিকে। তবে তার সাথে একজন সঙ্গীও জুটেছে।

খাঁচার সামনে বসে আছে পিঠে সাদা লোমওয়ালা জন্তুটা। বিশালদেহী শরীরটার বিপরীতে জবুথবু কোয়ালস্কি ঠিক যেন একটা পুতুল।

মারিয়া বুঝতে পারছে না, হিংস্র প্রানিগুলোকে এভাবে রাখা হয়েছে কেন। যে কোনও সময় দেয়াল বেয়ে জানালা পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে ওরা। তখন কি জানালার কাচটা ল্যাবের মানুষজনের নিরাপত্তা দিতে পারবে?

পেছনদিকে নড়াচড়া লক্ষ্য করে তার সম্বিত ফিরল। এগিয়ে এসেছে এক নার্স। আগেও মহিলার চোখে সহানুভূতি খেয়াল করেছিল মারিয়া। জানালার দিকে ইঙ্গিত করল মহিলা, সম্ভবত তার মনের কথা আঁচ করতে পেরেছে।

'ওরা এই পর্যন্ত আসতে পারবে না,' জবাব দিয়ে জানালার নিচে লাগানো একসারি বাক্সের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'জন্তুগুলোর কলারে কোড করা এক ধরনের তরঙ্গ পাঠায় ওগুলো।'

আগেই গরিলাগুলোর গলায় আটকানো কলার মারিয়ার নজরে পড়েছে। 'শক কলার?'

'হ্যাঁ। জানালার নিচের স্তর পর্যন্ত সুরক্ষা আবরণ তৈরি করেছে জিনিসগুলো।'

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে প্রজননবিদ। একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছালেই বৈদ্যুতিক ঝটকা খায় প্রাণীগুলো, আছড়ে পড়ে মেঝেতে।

'আর বিপদ দেখা দিলে...' বামদিকে ইঙ্গিত করল নার্স। ওখানে ক্যাবিনেটে একটা ট্রাঙ্কুলাইজার গান রাখা আছে। 'চিন্তা করবেন না। এটা কখনও ব্যবহার করার দরকার পড়েনি। আপনি এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

কোয়ালস্কির দিকে চোখ ফেরাল মারিয়া। বিশালদেহী লোকটা তার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছে। জবাবে জানালার কাচে এক হাত রাখল প্রজননবিদ, আশ্বস্ত করতে চাইলে তাকে।

পেছন থেকে ড. হান খেঁকিয়ে উঠতেই চমকে পিছু হটল নার্স। মারিয়া ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পেল, বাকোর খুলি আলাদা করার প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। শীতল স্রোত বয়ে গেল তার শিরদাঁড়া বেয়ে।

আসল বিপদ এই শুরু হলো বলে!

সকাল ১১:৩৫

'ব্যাপারটা তো সুবিধার লাগছে না,' পেছনের সিট থেকে বলে উঠল মঙ্ক।

সামনের বাঁকটা পেরোলেই কাঠের তৈরি একটা বাঁধের মতো অংশ। তারপর আবার শুরু হয়েছে টানেল, এবার আরও প্রশস্ত হয়ে। ওপাশে কয়েকটা জিপ আর মোটরসাইকেল পার্ক করে রাখা।

'কী মনে হয়?' গাড়ির গতি কমাতে কমাতে জানতে চাইল কিম্বারলি।

'ওটার উপরই সম্ভবত পার্কের দক্ষিণ দিকের সীমানা,' জবাব দিল মঙ্ক। 'অর্থাৎ, আমরা ঠিক পথেই যাচ্ছি।'

যাত্রাপথের প্রথম অর্ধেক মাইল পুরোটাই ছিল গোলকধাঁধা। পরবর্তীতে জট কমেছে, একটা বা দুটো বড় টানেলে পরিবর্তিত হয়েছে ভূগর্ভস্থ ডিজিয়া চেং। ক্যাটের পাঠানো মানচিত্রটা না থাকলে সঠিক পথ পাওয়া দুস্কর হত।

তবে শেষ রক্ষা হলো কই!

কোমর সমান উঁচু বাঁধের জায়গায় জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে স্টিলের থাম। ছোটখাট গার্ডহাউজের বাইরে পাহারা দিচ্ছে প্রহরী।

ইতস্তত করার ধার ধারেনি কিম্বারলি, সরাসরি এগোল বাঁধ লক্ষ্য করে। গাড়ি দেখে এগিয়ে এল গার্ডও। বাহনটা নিজেদের বলে চিনতে পেরেছে। পিঠের ঝোলানো অস্ত্র তাই রয়ে গেছে পিঠেই। কাছাকাছি এসে ড্রাইভারের জানালায় উঁকি দিল লোকটা।

চেহারা লুকানোর উদ্দেশ্যে ঘাড় নিচু করে ঘুমের ভান করছে মঙ্ক। টের পেল, শক্ত করে অস্ত্র আঁকড়ে ধরেছে কং। 'নড়িস না রে, ব্যাটা!' বিড়বিড় করল সে, তবে মন মনে। ততক্ষণে কাগজপত্র খোঁজার জন্য ব্যাগ হাতড়াতে শুরু করেছে কিম্বারলি। সেই সাথে ম্যান্ডারিন ভাষায় আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে জবাব দিচ্ছে গার্ডের প্রশ্নের।

বাকিদের আরোহীদের উপর চোখ বুলানোর উদ্দেশ্যে জানালা দিয়ে মাথা ঢোকাল লোকটা। সাথে সাথে বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছে কিম্বারলির গায়ে। শরীরের উর্ধ্বাংশ বাঁকিয়ে

এক হাতে গার্ডের ঘাড় আর মুখ চেপে ধরল ডিআইএ এজেন্ট, অন্য হাতে ব্যাগ থেকে বের করে নিয়েছে একটা খালি সিরিঞ্জ।

তড়িঘড়ি করে লোকটার ঘাড়ে সুঁই ঢুকিয়ে সিরিঞ্জের হাতল চাপল কিম্বারলি। রক্তনালীতে কার্বন ডাই অক্সাইড বেশ ভালো চেতনানাশক হিসেবে কাজ করে। কয়েক সেকেন্ড ধ্বস্তাধস্তি করে চুপ হয়ে গেল গার্ড।

কাজ শেষ করে পেছন ফিরে তাকাল কিম্বারলি। 'লোকটা কমপক্ষে এক ঘন্টা অজ্ঞান থাকবে। তবে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে আমাদের। কে জানে, কখন আবার গার্ডকে খুঁজতে চলে আসবে কেউ।'

সার্জেন্ট শিন কিন্তু বসে নেই। ধ্বস্তাধস্তি চলাকালে গার্ডহাউজে ঢুকে পড়েছে সে। প্যানেলের নির্দিষ্ট বোতাম টিপে নামিয়ে দিল বাঁধটা। তারপর গার্ডের অচেতন দেহ নিয়ে লুকিয়ে রাখল আড়ালে।

সামনের পার্কিং লট পেরিয়ে, টানেলটা একটা বিশালাকায় দরজার সামনে এসে থেমেছে। একটা আবর্জনা ফেলার ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। প্রমাণ দিচ্ছে, এটা আসলে একটা লোডিং ডক। সামনে বেড়ে ট্রাকটার ক্যাবে উঁকি দিল শিন, তারপর ইশারা করল বাকিদের উদ্দেশ্যে। 'খালি।'

গাড়ি থামতেই একে একে বেরিয়ে এল সবাই। বড় দরজাটার পাশে একটা ছোট দরজাও আছে। ওদিকে ইঙ্গিত করল কিম্বারলি। দরজাটার গায়ে একটা কি-রিডার আটকানো।

এবারও আহাশত করল না গাও-এর কি-কার্ড। তবে বিড়বিড় করে উঠল মঙ্ক, 'প্রার্থনা করো, হাতের ছাপ কিংবা রেটিনা স্ক্যান করার মতো বাড়তি কোনও নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেন না থাকে।'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল কিম্বারলি। 'ওরকম হলে সহজেই অচেতন গার্ডকে তুলে এনে হাতের কিংবা চোখের ছাপ সংগ্রহ করা যাবে।'

কথা সত্যি। মেয়েটার উপস্থিত বুদ্ধি দেখে বিস্মিত হলো মঙ্ক। অভিযানের জন্য ঠিক মানুষটাকেই বেছেছে ক্যাট।

দরজাটার ওপাশে দাঁড়িয়ে, আবর্জনার ট্রাকের লোগোর মতো লোগো ছাপা পোশাকের এক লোক বেরোনোর তোড়জোড় করছিল। অস্ত্রধারী দলটাকে দেখে আঁতকে উঠে পিছিয়ে গেল সে। বিড়বিড় করে ক্ষমা চাইতে চাইতে সরে গেল সামনে থেকে।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ভেতরে ঢুকল কিম্বারলি। মঙ্ক ওর পিঠে আঠার মতো সেঁটে আছে। আশা করা যায়, লোকটা ওর আমেরিকান চেহারা দেখতে পায়নি। তবে সাবধানের মার নেই।

ওদের দু'জনের পিছু পিছু এগোচ্ছে শিন। কিন্তু সার্জেন্ট লোকটা ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে মঙ্ক খেয়াল করল, সবুজ থেকে লালে পরিণত হয়েছে কি-কার্ডের বাতি। বিপদ আঁচ করতে পেরে ওর বুকটা ধড়াস করে উঠল।

ধুশ শালা...

সাথে সাথে কান ফাটিয়ে বেজে উঠল অ্যালার্ম।

ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল কিম্বারলি। ব্যাপারটা সে-ও ধরতে পেরেছে। হয়তো দরজায় কোন সেন্সর লাগানো আছে। এক কি-কার্ডে এতজন ঢোকার নিয়ম নেই।

ট্রাক ড্রাইভার দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করতেই তাকে ধরে ফেলল শিন, কপালে পিস্তলের বাঁটের এক আঘাতে শুইয়ে ফেলল মেঝেতে।

হাত নেড়ে বাকিদের ইশারা করল কিম্বারলি। 'দ্রুত!'

উপর থেকে একটা ভারী দরজা নেমে আসছে। ফাঁক গলে শ ভাইয়েরা তড়িঘড়ি করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। তবে বিপদে পড়ে গেছে কং, শুয়ে পড়ে দরজা পেরোতে চাইল সে। কিন্তু বিধি বাম, কোমরের বেল্ট আটকে গেছে মেঝেতে।

লাফিয়ে সামনে বাড়ল মঙ্ক। প্রস্থেটিক হাতে উপরদিকে টেনে ধরল দরজার ভারী পাল্লা। জানে, তার পক্ষে এক সেকেন্ডের বেশি এটা আটকে রাখা সম্ভব না। কং-ও ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। কোনওমতে হাঁচড়েপাচড়ে ভেতরে ঢুকল সে। সাথে সাথে মেঝেতে নেমে এল দরজা। এক মুহূর্ত দেরি হলেই চাপা পড়ত পা-জোড়া।

কান ফাটানো আওয়াজে বেজে চলেছে অ্যালার্ম।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মঙ্কের মুখ দিয়ে।

গোড়াতেই গলদ!

সকাল ১১:৪২

ল্যাবের সবার কানেও আঘাত করেছে অ্যালার্মের আওয়াজ। জায়গায় জমে গেছে ড. হানসহ সার্জিক্যাল টিমের বাকিরা। সবেমাত্র বাকোর ন্যাড়া মাথায় ছুরির একটা পোঁচ দিয়েছে সে।

তিন ইঞ্চি লম্বা ক্ষত থেকে বেরোনো রক্তের ধারার দিকে তাকিয়ে আছে মারিয়া। গুঞ্জন উঠেছে সার্জনদের মুখে। বুঝতে পারছে না, এই অবস্থায় অপারেশন চালিয়ে যাবে কি না।

তবে ততক্ষণে মারিয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে। সামনে এগিয়ে হানের পায়ের পেছন দিকে ল্যাং মারল সে। সাথে সাথে মেঝেতে শুয়ে পড়ল প্রধান সার্জন, হাত থেকে ছুটে গেছে সার্জিক্যাল ছুরি।

কেউ প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগেই ছুরিটা হাতে তুলে নিল প্রজননবিদ, ধারালো ব্লেডটা চেপে ধরল একেবারে ড. হানের ক্যারোটিড ধমনীর উপর। তারপর চেঁচিয়ে আদেশ করল বাকিদের উদ্দেশ্যে।

'বাকোকে জাগিয়ে তোল!'

আতঙ্কে নড়ে ওঠার প্রয়াস পেল হান। সাথে সাথে ধারালো ছুরি কামড় বসাল তার চামড়ায়। রক্তের ক্ষীণ একটা ধারা বেরিয়ে আসতে শুরু করল ক্ষত থেকে।

'এখনই!' আবারও চেঁচিয়ে উঠল মারিয়া।

অবশেষে সামনে বাড়ল সেই নার্স, এগিয়ে গিয়ে বন্ধ করে দিল সিডাটিভের প্রবাহ।

'মুক্ত করো ওকে...'

এবারের আদেশে সাড়া দিল না কেউ। হানের গায়ে ছুরিটা আরও শক্তভাবে চেপে বসল। যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'যা বলছে করো!' জানে, মুক্ত করে দিলেও বাকোকে নিয়ে মারিয়া এখান থেকে পালাতে পারবে না।

খুলে দেয়া হলো গরিলাটার বাঁধন। ব্যান্ডেজ করা হলো মাথার লম্বা ক্ষতটাতে। ততক্ষণে থেমে গেছে সাইরেনের কর্কশ আওয়াজ।

আদেশ পালন করা শেষ। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পরবর্তী করণীয় জানার জন্য মারিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে বাকিরা।

চিন্তায় পড়ে গেল প্রজননবিদ।

কী করবে এখন?

সকাল ১১:৪৪

ফ্যাসিলিটির কমিউনিকেশন রুমে দাঁড়িয়ে আছেন মেজর জেনারেল জিয়াইং লাও।

অ্যালার্মের আওয়াজ শুনতে পেয়েই চলে এসেছেন এখানে। ছয় জন লোক ঝুঁকে পড়েছে কন্ট্রোল প্যানেলে। দেয়ালে সারি সারি সাজানো কম্পিউটার মনিটর। সবচেয়ে বড় পর্দাটাতে গোটা ফ্যাসিলিটির ত্রিমাত্রিক ছবি ভাসছে। কমপ্লেক্সের দক্ষিণ দিকের গেট থেকে ঝামেলার সূত্রপাত।

'অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা কত?' চ্যাং সানের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন জিয়াইং।

'এখনও জানা যায়নি,' জবাব এল। 'আশেপাশের ক্যামেরাগুলো থেকে ফিড যোগাড় করার কাজ চলছে।'

অবশেষে হাত তুলে মনিটরের দিকে ইঙ্গিত করল এক টেকনিশিয়ান। 'ওই যে, ওখানে দেখুন।'

চলতে থাকা ভিডিও ফুটেজটা এক জায়গায় থামিয়ে দিল চ্যাং। দৃশ্যটা আসছে লাডিং ডকের দিকে মুখ করা একটা ক্যামেরা থেকে। 'ছয়জন মোট। পাঁচজন পুরুষ, একজন মহিলা।'

লোকগুলোর পরনে থাকা ইউনিফর্মে আটকে গেছে জিয়াইং-এর নজর। 'এরা কি আমাদের লোক নাকি?'

মিনিস্ট্রি অফ স্টেট সিকিউরিটি থেকে বলা হয়েছিল, অচিরেই ফ্যাসিলিটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরখ করার জন্য মহড়ার আয়োজন করা হবে। কিন্তু এদের আচার-আচরণ তো ঠিক মহড়া বলে মনে হচ্ছে না।

স্ক্রিনে সেঁটে আছে চ্যাং-এর চোখ। চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে ফেলেছে একজন। মাস্কে আংশিক ঢেকে রাখা মুখটা মোটেও চাইনিজদের মতো না।

'ওরা আমেরিকান!' চেঁচিয়ে বলল সে। 'আমি এই ব্যাপারে নিশ্চিত।'

রাগ ফুটে উঠেছে মেজর জেনারেলের কণ্ঠে। 'এই মুহূর্তে কোথায় আছে ওরা?'

'লোডিং বে পেরিয়ে এসেছে। তবে খুব বেশিক্ষণ নজরদারির আওতার বাইরে থাকতে পারবে না। ক্যামেরার সামনে না হলেও আমাদের লোকদের মুখোমুখি ওদের হতেই হবে।'

'বর্তমানে কতজন সৈনিক আছে এখানে?'

'একশোরও বেশি,' জবাব দিল চ্যাং। 'বের হওয়ার সব পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। লোকগুলোকে ধরা এখন শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার।'

মাথা নেড়ে সায় দিলেন জিয়াইং। হামলাটার মাধ্যমে অন্তত একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে। আগেই জানতে পেরেছিলেন, তদন্ত করার জন্য আমেরিকা লোক পাঠাচ্ছে। কিন্তু দলটা কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে, সেটা বের করতে পারেননি।

'লেফটেন্যান্ট কর্নেল সান!' দৃষ্টি আকর্ষণ করল এক টেকনিশিয়ান।

একপাশের মনিটরে ল্যাবের দৃশ্য ভেসে উঠেছে। ছুরি হাতে প্রধান সার্জনকে জিম্মি করেছে মারিয়া ক্রেন্ডাল।

হতাশায় মাথা নাড়লেন জিয়াইং।

বিজ্ঞানীদের এতো আবেগ থাকলে পৃথিবীর উন্নতি হবে কীভাবে!

'ল্যাবে সংযোগ দাও,' আদেশ করলেন তিনি।

সাথে সাথে আদেশ প্রতিপালন করল লোকটা। সুইচ টিপে ল্যাবের সাউন্ডবক্সের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করল। 'নিন, কথা বলুন।'

মাইক্রোফোনটা হাতে তুলে নিলেন মেজর জেনারেল। 'ড. ক্রেন্ডাল, শুনতে পাচ্ছেন?'

স্ক্রিনে দেখা গেল, এক পা পিছিয়ে গেল মারিয়া। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সিলিং-এ আটকানো স্পিকারের দিকে।

'অ্যালার্ম শুনে ভয় পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। তবে চিন্তার কিছু নেই, এটা এব মহড়া।' মিষ্টি কথায় মেয়েটাকে শান্ত করার প্রয়াস পেলেন তিনি। 'তারপরও জানিয়ে রাখছি আপনাকে, সবগুলো ঘরে ঢোকার কিংবা বের হবার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

অর্থাৎ, বুঝিয়ে দেয়া হলো- তার কোথাও যাওয়ার উপায় নেই।

'সবকিছু ঠিক আছে ড. ক্রেন্ডাল। নিরাপদে আছেন আপনি এবং আপনার টেস্ট সাবজেক্ট। তবে দুঃখের ব্যাপার, আপনার সেই সঙ্গীর ক্ষেত্রে এই কথাটা প্রযোজ্য নয়।'

ঘাড় ঘুরিয়ে জানালার দিকে তাকাল মারিয়া।

বলে চলেছেন জিয়াইং। 'আগেই সাবধান করেছিলাম আমি।'

এবার কথা না শোনার ফলাফল দেখুন।

সকাল ১১:৫৫

খাঁচায় বসে কোয়ালস্কিও সাইরেনের আওয়াজ শুনেছে। এখানে ঢোকার পর পেরিয়ে গিয়েছে প্রায় তিনটা ঘন্টা। নিজেকে ফাঁদে পড়া ইঁদুর বলে মনে হচ্ছে তার। এখন শুধু শিকারির হাতে প্রাণটা যাওয়ার অপেক্ষা।

অ্যালার্মের আওয়াজে গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছে বাকি গরিলাগুলো। দলনেতার পেছনে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছে এখন। তবে সাদা লোমওয়ালা গরিলাটা শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে উপরের জানালার দিকে তাকানো ছাড়া আর কোনও প্রতিক্রিয়া দেখায়নি।

নিজেও জানালার দিকে তাকিয়ে আছে কোয়ালস্কি। কল্পনা করার চেষ্টা করছে, কী হচ্ছে ওখানে। এতক্ষণে হয়তো বাকো অপারেশন শেষ। মারিয়ার অসহায় মুখটা কল্পনা করল সিগমা এজেন্ট। গরিলাটার জন্যও ভারী হয়ে আছে মন।

খাঁচার বাইরে বসা জন্তুটার নড়াচড়া লক্ষ্য করে কোয়ালস্কির সম্বিত ফিরল। সরাসরি তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে ওটা। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, কিছু একটা আন্দাজ করতে পেরেছে প্রাণীটার হিংস্র আদিম প্রবৃত্তি।

দরজার গায়ে সেঁটে আছে সিগমা এজেন্ট। ইচ্ছা করছে, গলে গিয়ে মিশে যায় ধাতব কাঠামোটাতে। এমন সময় হঠাৎ নড়ে উঠল লোহার গরাদ, আস্তে আস্তে উপরে উঠে যেতে শুরু করেছে।

আঁতকে উঠল কোয়ালস্কি।

হায় ঈশ্বর!

অধ্যায় বিশ
৩০ এপ্রিল, রাত ১১:০২
আন্দেজ পর্বতমালা, ইকুয়েডর

ভাড়া করা হেলিকপ্টারের কো-পাইলট সিটে বসে আছে গ্রে, চোখ নিচের জঙ্গলে। পাহাড়ের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে যান্ত্রিক ফড়িংটা। রাত গভীর হতে খানিকক্ষণ বাকি আছে এখনও। আকাশে ঝুলতে থাকা উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে নিচের ঘন গাছপালা। রূপালি আলোয় ঝিলিক দিচ্ছে কুয়াশার চাদর। মনে হচ্ছে, নিচের জমিনে কখনও মানুষের পা পড়েনি।

হেলিকপ্টারের অল্টিমিটারে চোখ বুলাল গ্রে। মাটি থেকে আশি হাজার ফুট উপরে আছে এখন। আন্দেজ পর্বতে অবস্থিত তাদের গন্তব্য জায়গাটা কোয়েঙ্কা থেকে চল্লিশ মাইল দক্ষিণে, বেশ উঁচুও বলতে হবে।

রেডিওতে শুনতে পেল লিনার কণ্ঠ, ‘এইখানে কেউ শহর বানিয়েছে! বিশ্বাস করা কঠিন।’

‘অসম্ভব তো নয়,’ প্রতিবাদ করল রোল্যান্ড। ‘রিসার্চের সময় ইকুয়েডর নিয়ে চমকপ্রদ কিছু তথ্য পেয়েছি আমি। আগ্নেয়গিরির প্রভাবে এখানকার মাটি যথেষ্ট উর্বর, কৃষিকাজের জন্য যা বিশেষ উপকারী। চারটা মাইগ্রেশন রুট পর্যন্ত গেছে আন্দিজ হয়ে, সংযোগ ঘটিয়েছে আমাজনের রেইন ফরেস্ট আর প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে। আক্ষরিক অর্থেই মহাদেশটার ক্রসরোড বলা যায় এই এলাকাকে। এমনকি ইনকারাও কোয়েঙ্কাকে উত্তরের রাজধানী হিসেবে মানত।’

‘শুনে তো বেশ বিখ্যাত জায়গা মনে হচ্ছে,’ বিদ্রূপ করল শেইচান।

পাত্তা না দিয়ে বলে চলেছে রোল্যান্ড, ‘পৃথিবীতে ইকুয়েডর-ই বালসা কাঠের একমাত্র প্রাপ্তিস্থান।’

‘বালসা?’ জিজ্ঞেস করল লিনা।

‘হালকা এক ধরনের কাঠ, সমুদ্রগামী নৌকা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। যাযাবর গোষ্ঠীগুলোর জন্য তাই আদর্শ স্থান হবে এই ইকুয়েডর।’

চুপচাপ সবার কথা শুনছে গ্রে, কল্পনা করছে সেই হারানো সভ্যতার কথা। লিনার দেখানো বইটাতে ফাদার ক্রেসপির সংগ্রহের ছবি আছে। পৃথিবীর অতীত সভ্যতার নানা নিদর্শন জমা ছিল এখানে।

'সর্বোপরি,' রোল্যান্ড বলল, 'অ্যামেরিন্ডিয়ান ভাষায় প্রাচীন আন্দেজকে বলা হয়-আটল আন্টিস।'

'আটলান্টিস?' সন্দেহের চোখে তাকাল লিনা।

এমনকী গ্রে পর্যন্ত ফিরে তাকালো লোকটার দিকে, রসিকতা করেছে কিন বোঝার চেষ্টা করছে।

শ্রাগ করল যাজক। 'এটাই তো পড়লাম।'

'সামনে ফাঁকা জায়গা আছে, সিনর।' খুনসুটিতে বাদ সাধল পাইলট, ইংরেজিতে কথা বললেও কণ্ঠে স্প্যানিশ টান স্পষ্ট। 'গন্তব্যের এর থেকে বেশি কাছে যাওয় সম্ভব না।'

কুয়াশা ঢাকা জঙ্গলে মনোযোগ গ্রে-র, হেলিকপ্টার অবতরণের মতো জায়গ খোঁজার চেষ্টা করছে। অবশেষে ঘন গাছপালার ভেতর খুব ছোট একটা ফোকড় নজরে পড়ল।

লোকটা কী ওই জায়গাটার কথাই বলছে!

'ওখানে হেলিকপ্টার নামাবে?' অস্বাভাবিকতাটা শেইচানের চোখেও ধরা পড়েছে, কণ্ঠে অবিশ্বাস।

'হ্যাঁ,' সায় দিল পাইলট। 'সমস্যা নেই।'

বলতে বলতে যান্ত্রিক ফড়িং-এর গতি কমিয়ে আনল লোকটা। জায়গাট এমনিতে ফাঁকাই আছে, তবে আকারে বেশ ছোট। চারদিকে ঘন গাছের সারি।

আস্তে আস্তে নেমে আসছে হেলিকপ্টার। প্রাণপণে হ্যান্ডগ্রিপ আঁকড়ে ধরে রেখেছে গ্রে। মনে ভয়, এই বুঝি ডালপালায় লেগে বিধ্বস্ত হয় রোটর। কিন্তু না, নামতে নামতে কয়েক মুহূর্ত পর মাটিতে চুমু দিল স্কিডজোড়া।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সিগমা কমান্ডার। পাইলটের সাহস আছে বলতে হবে, সেই সাথে দক্ষতাও।

খুশিতে লোকটার পিঠ চাপড়ে দিল গ্রে। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে নামতে আদেশ করল সবাইকে। 'আমাদের গাইডরা কিন্তু যে কোনও সময় পৌঁছে যাবে।'

আসার পথে, ভ্যাটিকানে নিজের পরিচিত লোকজনের মাধ্যমে ফাদার পেলহামের সাথে যোগাযোগ করেছে রোল্যান্ড। ফাদার ক্রেসপির পর কোয়েঙ্কার মারিয় অক্সিলিয়াডোরা চার্চের দায়িত্বে আছেন ওই যাজক। ক্রেসপির মতো তাকেও স্থানীয়রা বেশ সম্মানের চোখে দেখে।

গন্তব্যের কাছাকাছি শুয়ার গোত্রের একটা গ্রাম আছে। আয়তনে খুব একটা বড় না অবশ্য, মোটমাট বিশটা পরিবারের মতো হবে লোকসংখ্যা। ওই গ্রাম থেকে একজন গাইড যোগাড় করে দেবেন বলে কথা দিয়েছেন ফাদার পেলহাম। এই এলাকা সম্পর্কে শুয়ার গোত্রের লোকদের চাইতে বেশি কেউ জানে না।

তবে এদের সহযোগিতা পাওয়া বেশ কঠিন। বহিরাগত আগন্তুকদের হুমকি বলে মনে করা হয় এখানে। এদিকের জঙ্গলে প্রচুর মানুষ হারানোর রেকর্ড আছে। তবে সাপের কামড়, চিতাবাঘের হামলা কিংবা রোগবালাইয়ের চাইতে লোকগুলোর বেশি সংখ্যক মৃত্যু ঘটেছে স্থানীয় আদিবাসীদের হাতে। মাথা শিকার এবং নরমাংস ভোজ এদের নিত্যদিনের ঘটনা। আফ্রিকার কালোবাজারে বহুল জনপ্রিয় মানুষের শুকনো কাটা মাথাও এই আদিবাসীদেরই কীর্তি।

পরনের জ্যাকেটটা টেনেটুনে ঠিক করে নিল লিনা। 'বেশ ঠান্ডা।

সায় দিল রোল্যান্ড। 'যেমনটা ভেবেছিলাম, ঠিক তেমন না।'

'উচ্চতার কারণে এমন হচ্ছে,' বলে পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করল গ্রে। 'এতখানি উপরে আবহাওয়া ঠান্ডা থাকাই স্বাভাবিক। বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণও কম।'

খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে আছে শেইচান, জঙ্গলের দিকে নজর। 'পুরোপুরি অন্যরকম এক দুনিয়া যেন।'

বেল্ট থেকে ফ্ল্যাশলাইট খুলে জ্বালাল গ্রে। উঁচু অঞ্চলে অবস্থিত বনগুলো বেশ বৈচিত্র্যময় হয়। এই জায়গাটাও তার ব্যতিক্রম না। গাছের মাঝামাঝি অবস্থিত ডালপালা থেকে শুরু করে গুঁড়ি, এমনকি গোড়ার মাটিতে পর্যন্ত আবরণ তৈরি করেছে মসের দঙ্গল, ঘন সবুজ রঙ সেখানে। জায়গায় জায়গায় বেড় দিয়ে আছে অর্কিডের লতা। প্রতি ডালের জোড়ায় ফার্ন, পাতাতেও শৈবালের ছড়াছড়ি। পাতলা বাতাসে ভর করে আছে আর্দ্রতা। অক্সিজেন স্বল্পতায় নিঃশ্বাস নেয়া এখানে একটু কঠিন।

আসলেই এখানকার পৃথিবীটা একটু অন্যরকম।

হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন বন্ধ করার সাথে সাথে যেন জেগে উঠেছে জঙ্গল। কীটপতঙ্গের ঝিঁ-ঝিঁ, গাছের ডালের নড়াচড়ার খসখস, রাতজাগা পাখির কিচিরমিচির প্রতি মুহূর্তে মনে করিয়ে দিচ্ছে- এখানে শুধু সবুজের রাজত্ব চলে না। জাগুয়ার আর অ্যানাকোন্ডার মতো বিশাল শিকারি যেমন আছে... তেমনি আছে টাপির, স্লথ, পেকারি নামের এক জাতীয় শূকরের মতো শিকার। আর আছে হরেক রকম বানর।

একদিকের বন থেকে উড়ে এল টিয়াপাখির বিশাল একটা ঝাঁক, খোলা জায়গাটা পেরিয়ে হারিয়ে গেল উল্টোদিকে। নবাগত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাল যেন।

'চমৎকার!' লিনার কণ্ঠে মুগ্ধতা।

'সেই সাথে বিপজ্জনকও,' সতর্ক করল শেইচান। 'এই সৌন্দর্যকে আসলে প্রকৃতির একটা ফাঁদ বলতে পার। টোপ ফেলে শিকার করতে চাইছে তোমাকে।'

আঁতকে উঠল প্রজননবিদ।

সাবেক আততায়ীর রসিকতায় হাসি সামলে সামনে বাড়ল গ্রে। 'ভয় দেখিও না। একজন আরেকজনকে সাহায্য করতে হবে আমাদের।'

কাছে ঘেঁসে এল মেয়েটাও, এক হাতে আঁকড়ে ধরেছে প্রেমিকের হাত। 'ভয় কই দেখালাম? আমি তো ওর মাথার উপর ঘাপটি মেরে থাকা সাপটার কথাও বলিনি।'

ঘাড় বাঁকিয়ে উপরে তাকাল সিগমা কমান্ডার। গাছের ডালে লম্বা, সরু, সবুজ রঙের একটা আকৃতি কুণ্ডলী পাকিয়ে ঝুলে আছে। 'বিষাক্ত নাকি?'

মাথা নেড়ে সায় দিল শেইচান। 'তিন কোনা মাথা দেখে মনে হচ্ছে, সম্ভবত কোনও ধরণের পিট ভাইপার।' বলে লিনাকে সরে আসার ইঙ্গিত করল সে। মুখে অবশ্য অন্য কথা, 'চিন্তা করো না। এই ঠান্ডায় সাপ বাবাজী শুধুশুধু লাফঝাঁপ করার চিন্তা মাথায় আনবে না।'

গ্রে'র মনে অন্য চিন্তা খেলতে শুরু করেছে। 'বিপজ্জনক জঙ্গলে রাতে ঘোরাফেরা করা ঠিক হবে না। অনুসন্ধান করার আগে আমরা বরং সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করি।'

না-বোধক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল শেইচান। 'আসার পথে ইতিমধ্যে দশ ঘন্টা কাটিয়ে দিয়েছি আমরা। আর দেরি করা উচিত হবে না। আর ভুলে গেলে চলবে না, আমরা একটা গুহার খোঁজে আছি। রাত হোক বা দিন, সবসময়ই অন্ধকার থাকে ওখানে।'

তবে তার আগে তো জায়গাটা খুঁজে বের করতে হবে...

'কারা যেন আসছে,' সতর্ক করল রোল্যান্ড।

ডানদিকের জঙ্গল থেকে আঁধার ফুঁড়ে কালচে দুটো অবয়ব বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। লম্বা লোকটা খুব সম্ভবত শুয়ারদের দলনেতা গোছের কিছু একটা হবে। খালি গা, সারা মুখে রঙ-বেরঙের জ্যামিতিক কাঠামো ট্যাটু করা, কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা ধূসর চুল। পাশে আলুথালু কালো চুলওয়ালা বারো-তেরো বছরের এক কিশোর। তবে পোশাক পরিচ্ছদে লম্বা লোকটার চাইতে বেশ সভ্য বলতে হবে তাকে। পরনে ঢোলা হাফপ্যান্ট আর সবুজ টি-শার্ট। গ্রে-র দিকে তাকিয়ে হাসল ছেলেটা।

'হ্যালো,' বলে নিজের পরিচয় দিল সিগমা কমান্ডার। 'তুমি কি ইংরেজি বলতে পারো?'

মাথা নেড়ে সায় দিল সে। 'আমার নাম জেম্বে,' বলে বয়স্ক লোকটার দিকে ইঙ্গিত করল। 'ইনি চাকিকুই। উনার দোভাষী হিসেবে কাজ করব আমি।'

'ধন্যবাদ।' শুয়ারদের সাথে ভাব বিনিময় কীভাবে করবে, এটা নিয়ে একটু চিন্তিত ছিল গ্রে। সমস্যাটা কাটানোর উপায় হয়ে গেছে। 'ফাদার পেলহামকে চেন তুমি?'

জবাবে আরও বিস্তৃত হলো ছেলেটার মুখের হাসি। 'তাকে বেশ পছন্দ করি আমি। মিশনের স্কুলে ফাদারই আমাকে ইংরেজি আর স্প্যানিশ শিখিয়েছেন।'

'ফাদার পেলহাম আমাদের জানিয়েছেন, এখানকার কিছু গুহার ব্যাপারে তোমার গছে সাহায্য পাব।'

মাথা নাড়ল জেম্বে। 'গুহা... হ্যাঁ, অনেক গুহা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এদিকে।'

হড়বড় করে ছেলেটাকে কিছু একটা বলল চাকিকুই।

অনুবাদ করল সে। 'আঙ্কল চাকিকুই বলছেন, আপনারা যে গুহাটার খোঁজ স্বরছেন, তা উনি চেনেন।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল গ্রে-র মুখ দিয়ে।

তবে ছেলেটার কথা এখনও শেষ হয়নি। 'কিন্তু আপনাদের ওখানে নিয়ে যাওয়া ;বে না। জোরাজুরি করলে আমাদের গোত্রের লোকেরা আপনাদের খুন করবে।'

বাক্যটা বলা শেষ হতেই ঘুরে দাঁড়াল চাকিকুই। পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে ানের দিকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুসরণ করল জেম্বে, চোখে ক্ষমাপ্রার্থনার দৃষ্টি।

হতভম্ব হয়ে তাদের জঙ্গলে হারিয়ে যেতে দেখল গ্রে।

এ কেমন বিচার!

াত ১১:২২

দাঁড়ান!' তড়িঘড়ি করে সামনে বাড়ল রোল্যান্ড। 'দয়া করে যাবেন না!'

'সাবধানে,' সতর্ক করল গ্রে। 'ওরা সম্ভবত একা আসেনি। জোর করতে গেলে বুকে তীর ঢুকিয়ে দেবে।'

পাত্তা দিল না তরুণ যাজক। 'আমি ফাদার নোভাক বলছি, অনেক দূর থেকে এসেছি। দয়া করুন।' বলতে বলতে জ্যাকেট খুলে ঘাড়ের রোমান কলারটা উঁচু করল সে। জানে, ফাদার পেলহামকে বেশ সম্মান করে এরা। কলারটা দেখতে পেলে হয়তো মনোভাব পাল্টাবে।

অবশেষে আবারও শুকনো পাতার উপর পায়ের শব্দ শোনা গেল। ফিরে আসছে চাকিকুই আর জেম্বে। দলনেতার চোখে সন্দেহের দৃষ্টি।

জেম্বে তার কথাগুলো অনুবাদ করল, 'চাকিকুই বলছেন, উনি আপনার কথা শুনবেন। কারণ যাজকরা আমাদের প্রতি দয়া দেখিয়েছে।'

ছেলেটার মুখ থেকে বেরোনো কথাটা খেয়াল করল রোল্যান্ড, 'যাজকরা'... বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। চাকিকুই সম্ভবত ফাদার ক্রেসপিকেও চিনত।

তুরুপের তাসটা খেলার সিদ্ধান্ত নিল সে। 'আপনি ফাদার কার্লোস ক্রেসপিকে চিনতেন, তাই না? আমরা তার স্মৃতি অনুসন্ধান করতে এসেছি। তার অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার ভার পড়েছে আমাদের উপর।'

নামটা শোনার সাথে সাথে যেন ধ্বক করে জ্বলে উঠেছে লোকটার দু'চোখ 'সোনার লোভেও আসে অনেকে।'

'আমরা ওরকম না,' জোর দিল রোল্যান্ড। 'আমরা এসেছি জ্ঞানের খোঁজে প্রাচীন শিক্ষকদের আবাসস্থলে যেতে চাই।'

ফাদার কার্কারের জার্নালটা পকেট থেকে বের করে প্রচ্ছদের গোলকধাঁধাটা দেখাল সে। খেয়াল করল, কাঠামোটার উপর সেঁটে আছে চাকিকুই-এর নজর চিনতে পেরেছে সম্ভবত।

'আমরা শুনেছি, কোনও একটা গুহায় নাকি এরকম আরও বই আছে,' রোল্যা বলল। ভূগর্ভস্থ লাইব্রেরীর কথা উল্লেখ করেছিল পেট্রোনিও জারামিলো। 'আপনি কি আমাদের ওখানে নিয়ে যাবেন?'

মাথা নাড়তে নাড়তে কিছু বলল লোকটা, জেম্বে অনুবাদ করল। 'চাকিকু বলছেন, অনেক আগে আরেকজনকে নিয়ে গিয়েছিলেন ওখানে। ভুল সিদ্ধান্ত ছি ওটা।'

গ্রে-র সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল রোল্যান্ড। চল্লিশের দশকে এই লোকই কি জারামিলোকে গুহায় নিয়ে গিয়েছিল?

'ওখানে যাওয়া নিষিদ্ধ,' বলে চলেছে জেম্বে। 'এমনকি ফাদার ক্রেসপির প্রতি সম্মান দেখালেও না।' ফাদারের নাম উচ্চারণের সাথে সাথে বুকে ক্রস আক ছেলেটা। 'তার আত্মা শান্তি পাক।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রোল্যান্ড, কীভাবে আদিবাসী লোকটার মন গলাবে বুঝতে পার না। খেয়াল করেছে, জার্নালের প্রচ্ছদের গোলকধাঁধাটাতে স্থির হয়ে আছে তা নজর।

'শত শত বছর আগে, ক্রেসপির মতোই আরেকজন ফাদার এই বই লিখেছিলেন। এটা থেকেই প্রাচীন শিক্ষকদের ব্যাপারে জানতে পারি আমরা বলতে বলতে গোলকধাঁধার চিহ্ন দেয়া দক্ষিণ আমেরিকার মানচিত্রটা বের ক দেখাল রোল্যান্ড। 'তিনিই আমাদের এখানে আসতে বলেছেন।'

হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল চাকিকুই, চোখে আগ্রহ। রোল্যান্ড জার্নালটা তার হা দিতেই পৃষ্ঠা ওল্টাতে লাগল সে। এক সময় অ্যাডাম আর ইভের কবরের উপ আঁকা হাতের ছাপগুলোর উপর স্থির হলো তার দৃষ্টি। জেম্বেকে বলল কিছু একটা।

আগ্রহী ভঙ্গিতে রোল্যান্ডের দিকে এগোল ছেলেটা। 'চাকিকুই জিজ্ঞেজ করছে ওই ফাদারের নাম কী? যিনি এই বইটা লিখেছিলেন, তার নাম বলতে পারলে গুহায় যেতে পারবেন আপনারা।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল রোল্যান্ডের মুখ দিয়ে। 'তার নাম হলো ফাদা অ্যাথেনাসিয়াস কার্কার।' বলে জার্নালটার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'এগুলো তা হাতেই লেখা।'

সাথে সাথে জার্নালটা বন্ধ করে তার কাছে ফিরিয়ে দিল চাকিকুই। আবারও রওনা দিল জঙ্গলের উদ্দেশ্যে। 'ভুল উত্তর।'

আঁতকে উঠল রোল্যান্ড।

ভুল উত্তর? মানে কি?

তরুণ যাজককে ছাড়িয়ে সামনে বাড়ল গ্রে। 'দাঁড়ান... সেই ফাদারের নাম ছিল নিকোলাস স্টেনো।'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল রোল্যান্ড। উত্তেজনার বশে ভুলে গিয়েছিল, ফাদার কার্কার এখানে নিজে আসেননি। অনুসন্ধানের জন্য বন্ধু নিকোলাসকে পাঠিয়েছিলেন।

ঘুরে দাঁড়াল চাকিকুই, জ্বলজ্বল করছে চোখদুটো। 'নিক...লোস... স্টেনো?'

মাথা নেড়ে সায় দিল রোল্যান্ড।

বড় করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল চাকিকুই, যেন কত যুগ ধরে বাতাসটুকু জমিয়ে রেখেছিল বুকের ভেতর।

তার পরবর্তী কথাগুলো অনুবাদ করে শোনাল জেম্বে। 'সেই শিক্ষকদের আবাসে নিয়ে যাওয়া হবে আপনাদের। নিয়ে যাওয়া হবে প্রাচীন আন্দেজ শহরে।'

কথাগুলো রোল্যান্ডের কানে ঢোকেনি। তার কানে বাজছে আদিবাসী লোকটার উচ্চারণ করা শেষ শব্দ দুটো।

প্রাচীন আন্দেজ।

অ্যামেরিন্ডিয়ান ভাষায় যার মানে দাঁড়ায়-আটল আন্টিস।

আটলান্টিস!

বিস্মিত দৃষ্টিতে দলের বাকিদের দিকে তাকাল যাজক। একই কথা ভাবছে সবাই।

আসলেই কি ওটা সেই কিংবদন্তীর আটলান্টিস?

রাত ১১:৫৮

চাকিকুই-এর পেছন পেছন এগোচ্ছে গ্রে আর রোল্যান্ড। তাদের পেছনে লিনা, সবার শেষে শেইচান।

আটলান্টিসের খোঁজে রওনা হওয়ার পর প্রায় চল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। কুয়াশা জমাট বেঁধেছে গাছের ডালে ডালে, থেকে থেকে ঝড়ছে টুপটাপ আওয়াজে। প্রতি নিঃশ্বাসের সাথে অনুভব করা যাচ্ছে বাতাসের আর্দ্রতা। অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকায় কসরত করতে হচ্ছে প্রতিবার বুক ভরার সময়।

ফ্ল্যাশলাইট হাতে হাঁটছে গ্রে। তাই যতটা সম্ভব তার গা ঘেঁষে চলার চেষ্টা করছে লিনা। উল্টোদিকের জঙ্গল ঘন অন্ধকারে ঢাকা। থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠছে নিশাচর পাখপাখালি আর প্রাণীর দল।

হঠাৎ একতা চিৎকার শুনে জায়গায় জমে গেল মেয়েটা। এক মুহূর্ত থেমে আবার চলতে শুরু করেছে চাকিকুই। 'জাগুয়ার... এদিকে প্রচুর আছে। তবে ভয় পাবেন

না। অনেক আওয়াজ করছি আমরা, আর দলেও ভারি। আক্রমণ করার সাহস পাবে না।'

অ্যাঁ? আওয়াজ কোথায় করছি? মনে মনে ভাবল লিনা। রওনা দেয়ার পর আওয়াজ বলতে তো শুধু নিঃশ্বাস পড়া আর মাটিতে বুটের ঘষা খাওয়া।

জেম্বে এক হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল তাকে, সম্ভবত আকৃষ্ট হয়েছে প্রজননবিদের সৌন্দর্য দেখে। 'ভয় পাবেন না। আমি আপনাকে রক্ষা করব। নামের মতোই চটপটে আমি। জেম্বে শব্দের অর্থ হামবার্ড।'

মুচকি হাসল লিয়া। 'হামিংবার্ড?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' বলে পাল্টা হাসল ছেলেটা। হাত দিয়ে পাখি ওড়ার ভঙ্গি করল। 'অনেক দ্রুত।'

চড়াই-উৎরাই পার হয়ে এগিয়ে চলেছে দলটা। এতক্ষণে কয়েক মাইল পাড়ি দিয়ে ফেলার কথা। মাঝখানে আবার দুই জায়গায় নালাও পার হতে হয়েছে। দ্বিতীয়বার পানির উচ্চতা ছিল উরু সমান।

সামনে থেকে মৃদু গর্জনের আওয়াজ ভেসে এল।

আওয়াজের উৎসের কাছে পৌঁছানোর আগেই সবাইকে উঁচু একটা জায়গায় নিয়ে গেল চাকিকুই। কণ্ঠে সতর্কতা। জেম্বে কথাগুলো অনুবাদ করে শোনাল। 'এখান থেকে নিষিদ্ধ এলাকা শুরু, জায়গাটা দানবরা পাহারা দেয়।'

প্রমাণ হিসেবে ঢালের প্রান্তে দাঁড়ানো একটা লম্বা পাথরের দিকে ইঙ্গিত করল চাকিকুই। পাথরের উপরের দিক শ্যাওলায় আবৃত থাকলেও তাদের দিকে মুখ করা অংশটা পরিষ্কার। সেখানে খোদাই করে একটা বিশাল আকারের কাঠামো আঁকা হয়েছে। খোদাইয়ের কাজটা এমনভাবে করা হয়েছে যেন উপরের স্তর উঠে গিয়ে পাথরের নিচের স্তর বেরিয়ে আসে।

'দানবদের একজন,' জেম্বে পরিচয় করিয়ে দিল।

ভালো করে পাথরটার তাকাল লিনা। বিশালাকায় কাঠামোটা পেছনের দু'পায়ে ভর করে দাঁড়ানো। উপরের দিকে তুলে রেখেছে দুই থাবা। হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনে।

'এটা দানব নয়,' বলে উঠল প্রজননবিদ। 'গুহাবাসী ভালুক, ক্রোয়েশিয়ার গুহায় যেমনটা আঁকা দেখেছিলাম।'

মাথা নেড়ে সায় দিল রোল্যান্ড। কথা সত্যি।

তবে লিনার কণ্ঠে উদ্বেগের সুর। 'কিন্তু আর্সাস স্পেলিয়াস অর্থাৎ এই প্রজাতির ভালুক তো দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার কথা না।'

'হয়তো চাক্ষুষ করে নয়, স্মৃতি থেকে কেউ খোদাই করেছে ছবিটা,' মন্তব্য করল তরুণ যাজক।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সামনে তাকাল লিনা। উঁচু জায়গাটা পেরিয়ে, সামনের ঢালে আরও এরকম পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সাপ, পাখি, জাগুয়ার, বানর ইত্যাদি

নানান ধরনের জন্তু-জানোয়ার, জ্যামিতিক আকৃতি, এমনকি প্রাচীন লেখাও খোদাই করা আছে ওগুলোতে। জায়গাটাকে যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত আদিবাসীরা নিষিদ্ধ বলে মনে করবে, তাতে আর আশ্চর্যের কি!

হাত তুলে সামনে দেখাল চাকিকুই। 'ফাদার নিকলোস স্টেনো বলেছিলেন, তার নাম না জানা কেউ যেন কখনও এখানে না আসে।'

'কেন?' জানতে চাইল গ্রে।

জেম্বের মাধ্যমে প্রশ্নটা শুনে নিল চাকিকুই। তারপর জবাব দিল, 'বিপজ্জনক...' বলে নিজের শরীরের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'দেহ আর আত্মার জন্য... পৃথিবীর জন্যও।'

গ্রে-র মুখের দিকে তাকিয়ে আছে আদিবাসী লোকটা। জানতে চাইছে, এত সব সতর্কবার্তা শোনার পরও সে এগোতে চায় কি না।

'বুঝতে পেরেছি,' জবাব দিল সিগমা কমান্ডার। 'চলুন।'

মাথা নেড়ে সায় দিল চাকিকুই। তারপর হাতদুটো মুখের সামনে তুলে, চিকন কণ্ঠে হাঁক ছাড়ল পাখির ডাকের মতো।

কারণ ব্যাখ্যা করল জেম্বে। 'পাহারাদারদের গ্রামে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। এর সামনে আর এগোতে পারবে না কেউ।'

ঘন কালো জঙ্গলের দিকে ফিরে তাকাল লিনা। এতক্ষণ সবাইকে অনুসরণ করা হচ্ছিল। ডাকটা শুনেই যেন পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে কতগুলো অন্ধয়ার ছায়া।

সামনের পাথরের বোল্ডারগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল রোল্যান্ড। 'জারামিলোর বক্তব্য অনুযায়ী, পুরনো লাইব্রেরীটায় যেতে হলে পাথরের গোলকধাঁধা পেরোতে হয়। পথটা তারপর থেমেছে একটা অশান্ত নদীর সামনে।'

আবা শুরু পথচলা। সময়ের সাথে সাথে কমে আসছে উপরের গাছপালার আচ্ছাদন। পাতার ফাঁকফোকর পেরিয়ে উঁকি দিচ্ছে আকাশে ঝুলতে থাকা পূর্ণ চাঁদ।

আকাশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল রোল্যান্ড। 'এখনও বুঝতে পারছি না, কেন ওই অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন নিল আর্মস্ট্রং।'

উত্তরটা হয়তো খুব শীঘ্রই জানা যাবে।

চাঁদের দিকে ইঙ্গিত করল যাজক। 'হয়তো ওখানে অদ্ভুত কিছু একটার খোঁজ পান তিনি। হয়তো ওই ব্যাপারটাই তাকে টেনে আনে এই ঘন জঙ্গলে। জানা গেছে, জারামিলোর পাশাপাশি অভিযানটার উদ্যোক্তা স্ট্যান হল নামের এক ইঞ্জিনিয়ারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন আর্মস্ট্রং। জারামিলোর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় অভিযানটারও আয়োজন এই লোকই করে।'

গর্জনের উৎসের কাছে পৌঁছে গেছে সবাই। নদীর পানি চাঁদের আলো পড়ে একেবারে চকচক করছে। পাথরের খাঁজ-ভাঁজ পেরিয়ে বেসিনের মতো একটা

জায়গায় গন্তব্য খুঁজে নিয়েছে জলস্রোত। সেখান থেকে আবার সামনে এগিয়ে, জলপ্রপাত তৈরি করে হারিয়ে গিয়েছে জঙ্গলে।

নদী তীরে পৌঁছে স্যাটেলাইট ফোনটা পরীক্ষা করল গ্রে। 'অদ্ভুত তো!'

'কী হলো?'

'জিপিএস অনুযায়ী, আমরা ফাদার কার্কারের জার্নালে উল্লেখিত ছবির সেই নির্দিষ্ট ল্যাটিচিউড-লংগিচিউডেই আছি। তবে এখানে...' বলে স্ক্রিনের কোনায় ভেসে থাকা কম্পাসে ইশারা করল সে। 'এটা একটা ম্যাগনেটিক রিডিং। কোনও স্যাটেলাইট থেকে আসছে না।'

লিনা দেখতে পেল, কাঁটাটা একবার ঘড়ির দিকে, আরেকবার উল্টোদিকে বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরছে।

কেউ কিছু বলার আগেই হাঁক ছাড়ল জেম্বে। চাকিকুই এর সাথে প্রশস্ত পুলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা।

বাকিরা এগিয়ে যেতে, নদীর অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করল চাকিকুই।

'গুহাটার প্রবেশপথ ওখানে,' ব্যাখ্যা করল জেম্বে।

ভালো করে দেখার জন্য ঝুঁকে পড়ল লিনা। তবে পানি পেরিয়ে খাড়া পাহাড়ের গা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না।

'পানির স্তরের নিচে দেখুন,' হাত তুলে দেখাল রোল্যান্ড। 'আবছাভাবে একটা আকৃতি দেখা যাচ্ছে। টানেলের মুখের একেবারে উপরের অংশ ওটা।'

'তার মানে প্রবেশপথটা পানির নিচে ডুবে আছে,' গ্রে সায় দিল।

শেইচানের মুখে দীর্ঘশ্বাস। 'কী ভেবেছিলে? পানিতে একটু ডুবাডুবি না করেই আটলান্টিসে পৌঁছে যাবে?'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল গ্রে। 'সাঁতার কাটতে হবে মনে হচ্ছে।'

পানিতে নেমে গুহায় ঢুকতে হবে ভেবেই আঁতকে উঠল লিনা। আগেও একবার পানিভর্তি গুহায় আটকে যাবার অভিজ্ঞতা আছে ওর।

রোল্যান্ডও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। মেয়েটাকে অভয় দেয়ার প্রয়াস পেল সে। 'এবার অন্তত আমাদের দিকে কেউ গুলি ছুঁড়বে না।'

রাত ১২:০৪

বাতাস কেটে সাঁই সাঁই করে নামছে ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট শু ওয়েই। কুয়াশার জন্য আশেপাশে দৃষ্টি না চললেও, নাইট ভিশন গগলসে ঠিকই দেখা যাচ্ছে ল্যান্ডিং জোন। নিচে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে লালচে রঙের বিশাল একটা আকৃতি। তার মানে, গ্রে-দের হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন এখনও ঠান্ডা হয়নি।

ফড়িংটার পাশে আরও কয়েকটা ছোট ছোট লালচে দাগ। এরা তারই দলের সদস্য। ইতিমধ্যে নেমে দাঁড়িয়েছে মাটিতে। কয়েক সেকেন্ড পর একটা ফ্লেয়ার জ্বলে উঠল, সার্জেন্ট কোয়ানের কাজ। নামার সংকেত দিচ্ছে।

সন্তুষ্ট হয়ে প্যারাশুটের কর্ড ধরে টান দিল ওয়েই। সাথে সাথে পপ আওয়াজে খুলে গিয়েছে ছোট একটা কাপড়ের টুকরো। এটার টানেই খুলবে প্রধান ক্যানোপি, হলোও তাই। ল্যান্ডিং জোনের উপরে একটা বৃত্ত রচনা করল ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট। তারপর নিরাপদে নেমে এল জঙ্গলের মাঝে ফাঁকা জায়গাটাতে।

হেলিকপ্টারের পাশে শোয়ানো একটা অবয়বের উপর ঝুঁকে আছে কোয়ান। নেতিয়ে থাকা হাতের একটু দূরে একটা শটগান।

সোজা হয়ে দাঁড়াল সার্জেন্ট। 'অস্ত্র হাতে তেড়ে এসেছিল ব্যাটা। বাধ্য হয়ে খুন করতে হলো।'

ভ্রূকুটি করল ওয়েই। তার অবশ্য লোকটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরিকল্পনা ছিল।

'বাকিরা চলে গেছে নাকি?'

মাথা নেড়ে সায় দিল কোয়ান। তারপর মৃত পাইলটের মাথা থেকে একগোছা চুল কেটে পকেটে ঢোকাল... আরও একটা খুনের স্মারক।

দৃশ্যটা দেখেও না দেখার ভান করল ওয়েই। 'কতখানি দূরে ওরা?'

'চল্লিশ মিনিটের মতো।'

বেশ অনেকটা দূরেই বলা যায়...

'ঝু আর ফেং-কে কাজে লাগাও,' আদেশ দিল ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট। এই দু'জন তার ইউনিটের সবচেয়ে দক্ষ ট্র্যাকার।

কান খাড়া করল ওয়েই। শোনা যাচ্ছে বাতাসের শনশন, ঝিঁঝিঁর গুঞ্জন, প্যাঁচার ডাক, কীট-পতঙ্গের আওয়াজসহ হরেক রকম শব্দ। গাছের আড়ালে হয়তো কোথাও ওঁত পেতে আছে হিংস্র জাগুয়ার। তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত।

আমেরিকান লোকগুলোর সবচেয়ে বড় বিপদটা শুরু হবে এখন।

সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে অনুমতি প্রার্থনার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল কোয়ান।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আগে বাড়ল ওয়েই।

খেলা শুরু...

অধ্যায় একুশ
১ মে, দুপুর ১২:০৪
বেইজিং, চীন

কিছু একটা করতে হবে আমাকে...

সংকর গরিলার চেম্বারের উপর থাকা জানালাটার সোজাসুজি দাঁড়িয়ে আছে মারিয়া। একহাতে ছুরি, অন্য হাতে ড. হানের কলার ধরা। চোখের কোনা দিয়ে দেখতে পেল, আস্তে আস্তে উপরে উঠে যাচ্ছে কোয়ালস্কির খাঁচা।

এখনও আগের জায়গাতেই বসে আছে সাদা পিঠওয়ালা গরিলাদের দলপতি। অপেক্ষা করছে, খাবার পুরোপুরি খোলা জায়গায় আসার জন্য।

কেবিনেটে রাখা ট্রাঙ্কুলাইজার রাইফেলটার দিকে মারিয়ার চোখ পড়েছে। হানের গলায় ছুরির চাপ আরেকটু বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'কেসটা খোল কেউ একজন!'

সাথে সাথে সামনে বাড়ল সেই নার্স, যেন আদেশের অপেক্ষাতেই ছিল। কেবিনেটের ইলেকট্রনিক লকে পাসওয়ার্ড দিয়ে খুলে ফেলল কাঁচের পাল্লা।

হানকে একপাশে ধাক্কা মারল মারিয়া, সেই সাথে ছুঁড়ে ফেলেছে ছুরিটাও। মুক্ত দুই হাতে কেস থেকে তুলে নিল ডাবল ব্যারেল ট্রাঙ্কুলাইজার রাইফেল।

গবেষণার খাতিরে আগেই এরকম অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে। ব্যারেল খুলে উঁকি দিয়ে দেখল, ভেতরে সুঁইয়ের মাথা দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ লোড করাই আছে রাইফেলটা। কেবিনেটের নিচের অংশে আরও একজোড়া ডার্টের দেখা মিলল। ছোঁ মেরে জিনিস দুটো পকেটে ঢুকিয়ে নিল প্রজননবিদ।

অস্ত্র আঁকড়ে ধরে সার্জিক্যাল স্টাফদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল লিনা। 'পিছিয়ে যাও! কেউ সামনের দিকে এক পা বাড়ালেই মরেছ।'

অপারেশন টেবিল থেকে ভেসে আসা মৃদু কাতরোক্তি শুনে তার সম্বিত ফিরল। উঠে বসেছে বাকো, তারপর কাঁপতে কাঁপতে মাথায় লাগানো স্টেইনলেস স্টিলের রিংটা সরিয়ে নেমে এল মেঝেতে। সামনে থেকে সরে গিয়ে তাকে জায়গা করে দিল দুই নার্স।

'বাকো,' ডাক দিল মারিয়া। 'এদিকে এসো।'

টলতে টলতে সামনে বাড়ল গরিলাটা। ওষুধের প্রভাব এখনও পুরোপুরি কাটেনি।

এদিকের কাজ শেষ। ঘুরে তাকাল মারিয়া। ল্যাচ ধরে টেনে খুলে আনল জানালার একপাশের কাচ। ততক্ষণে পুরোপুরি উঠে গেছে কোয়ালস্কির খাঁচার গরাদ। আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে হিংস্র জন্তুটা। যেন গর্ত থেকে বেরিয়ে আসা ইঁদুরের উপর হামলে পড়তে চলেছে লোমশ বেড়াল।

এগিয়ে এসে জানালার খোলা অংশ দিয়ে উঁকি মারল বাকো।

কাচটা পুরোপুরি খোলার জন্য কসরত করছে মারিয়া। অবস্থা বুঝে এগিয়ে এল সেই নার্স। ল্যাচে দক্ষ হাতের মোচড়ে কাচটা খুলে এল পুরোটা।

'ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করল প্রজননবিদ, তারপর রাইফেল তুলল নিচের গরিলাটাকে লক্ষ্য করে।

তবে ততক্ষণে খুব দেরি হয়ে গেছে।

খাঁচা ছেড়ে ডানা মেলেছে পাখি।

দুপুর ১২:০৭

মর শালা বাঁদরের বাচ্চা...

দৌড় শুরু করল কোয়ালস্কি। গরাদ উঠে যাওয়ার পরও কয়েক সেকেন্ড জায়গা থেকে নড়েনি সে। পিঠে সাদা লোমওয়ালা গরিলাটার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে অবশেষে তার ধৈর্যের বাঁধ টুটে গিয়েছে। হাত তুলে খাঁচার কাছে এগোনোর উদ্যোগ করতে করতে ততক্ষণে শরীর গড়িয়ে দিয়েছে সিগমা এজেন্ট। বিশাল থামের মতো দুই পায়ের ফাঁক গলে বেরিয়েই ছুট লাগিয়েছে সামনের দিকে।

অন্য গরিলাগুলোও দলনেতার পেছনে জড় হয়েছিল। এখানে ছেড়ে দেয়া শিকারগুলো সাধারণত ছোটাছুটির ধার ধারে না, একটু চিৎকার-চেঁচামেচি করলেও শেষমেশ নিজেদের সঁপে দেয় নিষ্ঠুর নিয়তির হাতে। তাই কোয়ালস্কির এমন বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় একটু অবাক হয়েছে তারা। চমকে উঠলেও জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল সবগুলো। কিংবা কে জানে, তিন ঘন্টা যাবত পাহারা দিয়ে রাখা নেতার শিকারে ভাগ বসানোর মতো সাহস হয়তো কারও নেই।

যাই হোক, কোয়ালস্কির অবশ্য সুবিধাই হয়েছে। দৌড়ে নখ আর দাঁতের দঙ্গল পেরিয়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল সে। মৃদু গড়গড় আওয়াজ করছে গরিলাগুলো। সেদিকে নজর নেই তার। গন্তব্য- চেম্বারের উল্টোদিকে থাকা পাথরের উঁচু বোল্ডার।

একটা পাথরের আড়ালে পৌঁছে পেছন ফিরে তাকাল কোয়ালস্কি। খাঁচার দিক থেকে নতুন একটা গর্জন শোনা যাচ্ছে। অবশেষে উঠে দাঁড়িয়েছেন গরিলা সম্রাট,

পেছনের দু'পায়ে ভর করে থাবা মারছেন বাতাসে। সেই সাথে দাঁত মুখ খিঁচানো চলছে অবিরত। এক মুহূর্ত পর শুরু হলো বুকে দমাদম কিল।

ট্রেনের ইঞ্জিনের মতো ছুটে আসতে শুরু করেছে একটা কালো গরিলা, সাদা পিঠওয়ালার আগে এটাই খাঁচার ভেতর ওকে দেখছিল।

নিজের জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াল কোয়ালস্কি, একেবারে শেষ সময়ে চট করে সরে গেল একপাশে। মূল হামলাটা পাশ কেটে বেরিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। থাবার উল্টোপিঠ যেন বজ্রবর্ষণ করেছে কোয়ালস্কির পাঁজরে। চোখের পলকে শূন্যে উঠে গেল শরীরটা।

মার্শাল আর্টের ট্রেনিং কাজে লাগাল সিগমা এজেন্ট। বাতাসে থেকেই মুচড়ে ঘুরিয়ে নিল শরীর, অক্ষত অংশ দিয়ে আছড়ে পড়ল পাথুরে মেঝেতে।

আজ মনে হয় মরতেই হবে...

দুপুর ১২:০৮

বিস্ফারিত চোখে নিচের দৃশ্য দেখছে মারিয়া। কালো একটা গরিলা হামলে পড়েছে কোয়ালস্কির গায়ে, ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে মেঝেতে। এবার যাচ্ছে চূড়ান্ত আঘাত হানতে।

সাদা পিঠওয়ালার দিকে থেকে রাইফেল সরিয়ে নিল প্রজননবিদ, তাক করল কালো পুরুষ গরিলাটার শরীর বরাবর।

আবারও শেষ মুহূর্তে সরে গিয়ে হামলা এড়িয়েছে কোয়ালস্কি। তবে সাথে সাথে জন্তুটা এক হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরেছে তার কোমর, ঝাঁকাতে শুরু করেছে কাপড়ের পুতুলের মতো।

টেলিস্কোপিক সাইটে চোখ রেখে পরপর দু'বার ট্রিগার টানল মারিয়া। নিশ্চিত না, প্রথম ডার্টটা লক্ষ্যে আঘাত হেনেছে কি না। দ্বিতীয়টার ব্যাপারে অবশ্য অনিশ্চয়তার কিছু নেই। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ঘাড় থেকে বেরিয়ে আছে ডার্টের শেষ মাথায় থাকা পালক।

কোয়ালস্কিকে ছেড়ে পিছিয়ে এল প্রাণীটা। টেনে ঘাড় থেকে খুলে আনল সুঁই। তবে ততক্ষণে সর্বনাশ যা হওয়ার, হয়ে গেছে। মাথা উঁচু করে উপরের দিকে তাকাল গরিলা, ধরতে পেরেছে আক্রমণের উৎস।

উপরদিকে হাত তুলে গর্জে উঠল প্রাণীটা, তারপর টলমল করতে করতে উল্টে পড়ল মেঝেতে। ওষুধের প্রতিক্রিয়া দেখে মারিয়া আন্দাজ করল, আগের ডার্টটাও জায়গামতোই লেগেছে। নইলে এত তাড়াতাড়ি কাজ হওয়ার কথা না।

রাইফেলটা খুলে নিয়ে রিলোড করার প্রয়াস পেল প্রজননবিদ। তবে বেশি তাড়াহুড়া করতে গিয়ে একটা ডার্ট গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। তোলার সময় নেই। আপাতত একটাই ঢুকিয়ে নিল চেম্বারে।

মারিয়া রিলোড করতে করতে নিজের হিংস্ররূপ ফিরে পেয়েছে সাদা পিঠওয়ালা গরিলা, গর্জন করছে গলা ছেড়ে। মেগানথ্রোপাসদের দানবীয় আকারের পাশাপাশি পাশবিকতাও তার মাঝে পূর্ণমাত্রায় বহাল আছে।

থাবা উঁচু করে ছুটে আসছে জন্তুটা। এবার আর কোয়ালস্কির রক্ষা নেই।

রাইফেল তাক করে ট্রিগার টানল মারিয়া। তবে গরিলাটার গতির কাছে হার মেনেছে রাইফেল। ডার্টটা বোল্ডারের ফাঁকে দাঁড়িয়ে থাকা একটা কংক্রিটের নকল গাছে ঠোক্কর খেয়ে মেঝেতে পড়ল।

ধুশ শালা...

হতাশ ভঙ্গিতে পায়ের সামনে পড়ে থাকা অন্য ডার্টের দিকে তাকাল মারিয়া। জানে, সময়মতো রিলোড করা সম্ভব না।

আরও একজন অবশ্য কথাটা ধরতে পেরেছে।

জানালা দিয়ে শরীর গলিয়ে দিয়েছে বাকো। কোনা থেকে ঝুলতে ঝুলতে এক সেকেন্ড পর হাত ছেড়ে দিল প্রাণীটা, তারপর নিচের কংক্রিটের গাছের ডাল ধরে পতন থামাল।

কী হতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে আঁতকে উঠল মারিয়া। 'বাকো! ফিরে এসো!'

কিন্তু না। জীবনে প্রথমবারের মতো মায়ের আদেশ অমান্য করল বাকো।

দুপুর ১২:০৯

খালি অফিস রুমে দাঁড়িয়ে আছে মঙ্ক আর কিম্বারলি। দরজায় পাহারা দিচ্ছে সার্জেন্ট শিন, শ ভাইয়েরা আর কং চোখ রেখেছে হলওয়ের উপর।

'আর কতক্ষণ?' জানতে চাইল সিগমা এজেন্ট।

কীবোর্ডে নেচে বেড়াচ্ছে কিম্বারলির আঙুল, ইতিমধ্যে নিজের স্যাটেলাইট ফোনটা কেবলের মাধ্যমে জুড়ে দিয়েছে কম্পিউটার পোর্টে। 'শেষ...সিকিউরিটি ক্যামেরাগুলোর নিয়ন্ত্রণ পেয়ে গেছি। পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব না এগুলো, তবে নিজের ইচ্ছামতো যে কোনও ভিডিও দেখানো যাবে।'

'তবে তাই হোক।'

ফোনের ভিডিও ফোল্ডার থেকে নির্দিষ্ট একটা ভিডিও চালিয়ে দিল মেয়েটা।

রেডিও হাতে সন্তুষ্ট হওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মঙ্ক। গেটের বাইরে অজ্ঞান গার্ডের দেহ তল্লাশি করে পাওয়া গিয়েছিল জিনিসটা।

'ভিডিওর সাথে চাইলে কোনও তথ্যও সম্প্রচার করা যাবে,' যোগ করল কিম্বারলি। 'তোমার রেডিওর সিকিউরড চ্যানেলের একটা লিস্ট স্ক্রিনের কোনায় তুলে দিচ্ছি আমি।'

'তাই নাকি!' মঙ্কের কণ্ঠে উচ্ছ্বাস। 'খুব ভালো। এখন প্রার্থনা করা যাক, ব্যাপারটা যেন আসল লোকের হাতে পড়ে।'

দুপুর ১২:১০

সবকিছু কি একা আমাকেই সামলাতে হবে?

টেবিলে উবু হয়ে মনিটরে প্রায় নাক ঠেকিয়ে রেখেছেন জিয়াইং লাও। ল্যাবে চলতে থাকা নাটকটা অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করছেন, সম্পূর্ণ মনোযোগ ফ্যাসিলিটিতে ঢুকে পড়া আমেরিকানদের দিকে। ইতিমধ্যে মিনিস্ট্রি অফ স্টেট সিকিউরিটি এবং মিলিটারি সায়েন্স অ্যাকাডেমির ডেপুটি ডিরেক্টরের ফোন এসে পড়েছে। অনুপ্রবেশের খবর পেয়ে গেছেন তারা।

পেছনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে রেডিওতে নিজের লোকদের নির্দেশ দিচ্ছে চ্যাং সান। জিয়াইং জানেন, লোকটা খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী। হামলাকারীদের ঠেকিয়ে দিতে পারলে প্রমোশন আটকায় কে!

ল্যাবের দৃশ্য ভাসতে থাকা মনিটরে নজর দিলেন জিয়াইং। তার ক্যারিয়ারে আরেকটা কালো দাগ পড়তে চলেছে। প্রধান সার্জনকে জিম্মি করে একটা ট্রাঙ্কুলাইজার গান হাতিয়ে নিয়েছে মারিয়া। সময় এলে এর জন্য কঠিন শাস্তি পেতে হবে। তবে আসল ক্ষতিটা করেছে বাকো। জানালা বেয়ে পার্ক-এ নেমে গেছে বেকুব গরিলা। তিনি নিশ্চিত, সংকর গরিলাগুলোর সামনে ওর এক মিনিটও টেকার ক্ষমতা নেই। প্রজেক্টের এই পর্যায়ে এরকম একটা ব্যর্থতা... এটা মেনে নেয়ার চাইতে বরং নিজের মাথায় একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিতে পারলে শান্তি পাবেন জিয়াইং।

টেবিলে চাপড় দিলেন মেজর জেনারেল, নিজের হাতে সামলাতে চান পুরো ঘটনা। চ্যাং-এর উপর ভরসা করে বসে থাকলে চলবে না। কিন্তু মুখে কিছু বলার আগেই মনিটরের নিচে একটা নতুন ভিডিও ভেসে উঠল।

ভ্রূকুটি করলেন জিয়াইং। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে- চেয়ারে বেঁধে রাখা হয়েছে সৈনিকের পোশাক পরা কাউকে। মাথায় পিস্তল তাক করা, তবে পিস্তলধরা হাতের মালিক ক্যামেরার আওতার বাইরে।

'ছবিটা বড় করো,' টেকনিশিয়ানকে আদেশ দিলেন তিনি।

অন্য মনিটরগুলোতেও একই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। গুঞ্জন উঠল পুরো ঘরে।

এগিয়ে এল চ্যাং, চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। 'এসব কী!'

'এসব কী?' খেঁকিয়ে উঠলেন জিয়াইং। 'তুমিই বলো এসব কী? মেশিনপত্রগুলো তা তোমারই আওতায় থাকার কথা।'

'হ্যাক হয়েছে।'

ভিডিওটা জুম করে এনেছে টেকনিশিয়ান। চেয়ারে বাঁধা লোকটার মুখ দেখতে পেয়ে জিয়াইং-এর চোয়াল ঝুলে পড়ল।

'এটা তোমার ভাই না?'

আঁতকে উঠল চ্যাং, একই সাথে দৃশ্যটা সে-ও দেখতে পেয়েছে। 'গাও!'

স্ক্রিনের নিচে ভাসতে থাকা নাম্বারগুলোর দিকে নজর দিলেন জিয়াইং। বন্দির ব্যাপারে কথা বলার জন্য ওই ফ্রিকোয়েন্সিতে কল করতে বলা হয়েছে। কলটা কারা রিসিভ করবে, তা তো জানাই আছে।

ঝামেলাবাজ আমেরিকানগুলো...

'ফ্রিকোয়েন্সিগুলো ট্র্যাক করা যাবে?' জিজ্ঞেস করলেন মেজর জেনারেল।

'হ্যাঁ,' জোর গলায় জবাব দিল চ্যাং। 'তবে মিনিটখানেক সময় লাগবে।'

ততক্ষণ কি এক জায়গায় বসে থাকবে ধূর্ত আমেরিকানরা?

হাত নেড়ে টেকনিশিয়ানকে তথ্য যোগাড় করতে আদেশ দিলেন জিয়াইং, তারপর ফিরে তাকালেন চ্যাং-এর দিকে। 'তোমার ভাই-ই তাহলে যত নষ্টের গোড়া। ওর মাধ্যমেই বাইরে খবর পাচার হয়েছে। স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, সে শত্রুকে ডেকে এনেছে আমাদের দোরগোড়ায়।'

চ্যাং-ও একই কথা ভাবছে।

সোজা হয়ে আঙুল দিয়ে লেফটেন্যান্ট কর্নেলের বুকে স্পর্শ করলেন মেজর জেনারেল। 'ভাইয়ের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করো এখন। যে কোনও মূল্যে খতম করো অনুপ্রবেশকারীদের।' বলে আর্কের দিকে চোখ ফেরালেন তিনি। 'আমি দেখি কীভাবে প্রজেক্টটাকে রক্ষা করা যায়।'

গর্জাতে গর্জাতে ঘরটা থেকে বেরিয়ে এলেন জিয়াইং। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছেন। তবে ঘটনা হাত থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে গেলে কী করবেন, সেটাও কল্পনা করে নিচ্ছেন মনের একাংশ দিয়ে।

ফ্যাসিলিটিটা বানানোর সময় গোপনে বিশেষ কিছু জায়গায় বোমা প্ল্যান্ট করে রাখার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন তিনি। দরকার হলে কাজে লাগাতে হবে ওগুলো, কিন্তু এই ব্যর্থতা কিছুতেই মেনে নেয়া যাবে না।

আমাকে মরতে হলে, বাঁচতে দেব না কাউকে।

দুপুর ১২:১২

বাজতে শুরু করেছে মঙ্কের রেডিও।

খেলা শুরু...

নতুন একটা বাহন কজা করেছে তার দল- খোলা বেডওয়ালা একটা মিলিটা ট্রাক, সবুজ রঙ, বিদ্যুতে চলে। স্টিয়ারিং-এ বসেছে সার্জেন্ট শিন, সামনের সি কিম্বারলি। ড্রাইভারকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে গেছে দুই শ ভাই আর কং।

'সিকিউরড চ্যানেলে কল এসেছে,' কিম্বারলির পাশে উঠে বসতে বসতে মু খুলল মঙ্ক। 'মনে হচ্ছে, একেবারে জায়গামতো আঘাত করেছে তোমার ছোঁ ঢিল।'

কল রিসিভ করে স্পিকার অন করল সিগমা এজেন্ট, যাতে পাশে বসা ডিআই এজেন্ট শুনতে পায় কথাগুলো। প্রয়োজনে অনুবাদও করতে পারবে।

সাথে সাথে ম্যান্ডারিনে কিছু একটা জিজ্ঞেস করল কলার।

ফিসফিসিয়ে অনুবাদ করল কিম্বারলি। 'জানতে চাইছে, তুমি কে।'

রেডিওটা মুখের সামনে ধরল মঙ্ক। কলটা যে করেছে বলে ভাবছে, তার ইংরে জানা থাকার কথা। জবাবও তাই ইংরেজিতেই দিল। 'আমি বা আমরা কে, আশা করি এতক্ষণে বোঝা হয়ে গেছে। আমার ধারণা, আপনি ঝংজিয়াও সা গাও সানের ভাই।' মঙ্ক আশা করল, ম্যান্ডারিন ভাষায় 'লেফটেন্যান্ট কর্নে অনুবাদটা ঠিকঠাকভাবেই উচ্চারণ করতে পেরেছে।

নীরবে কাটল কয়েক সেকেন্ড। ততক্ষণে ট্রাকের খোলা বেড়ে চড়ে বসেছে আর দুই শ ভাই। হাত নেড়ে শিনকে গাড়ি ছাড়তে ইশারা করল মঙ্ক।

অবশেষে জবাব এল। বোঝা গেল, এতক্ষণ অন্য একজন লাইনে ছিল।

'লেফটেন্যান্ট কর্নেল চ্যাং সান বলছি। বাঁচতে চাইলে এখুনি আত্মসমর্পন করু সেই সাথে ছেড়ে দিন আমার ভাইকে।'

কণ্ঠটার ভয়ার্ত ভাব অনুভব করতে পেরেছে মঙ্ক।

সুখবর...

এখানে আসার আগেই ওদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছে কিম্বারলি। চ্যাং বয় বড়, বিবাহিত, একটা বাচ্চা মেয়েও আছে। গাও এখনও বিয়ে করেনি। কৈশো বাবা-মাকে হারানোর পর একসাথে যোগ দেয় সেনাবাহিনীতে। বেশ ভালো সম্প দুই ভাইতে, যাকে বলে একেবারে গলায় গলায় ভাব।

এই ভাবের ফায়দাই লুটতে হবে এখন।

'ভাইকে জীবিত দেখতে চাইলে আমরা যা বলি, কথা না বাড়িয়ে শুনুন।' জব দিল মঙ্ক।

লম্বা একটা হলওয়ে ধরে এগোচ্ছে ট্রাক, দুই পাশে সারি সারি ল্যাব... খাঁচা ইত্যাদি। মূল ফ্যাসিলিটিতে ঢোকার পর খুব একটা মানুষজন চোখে পড়েনি। অ্যালার্মটা সম্ভবত কোনও ধরনের লকডাউন করে রেখেছে।

'আপনাদের চাহিদা কী?' কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে জানতে চাইল চ্যাং।

'সহজ ব্যাপার। আপনি আমাদের সাহায্য করুন, আমি আপনাকে সাহায্য করব।'

আবারও কয়েক সেকেন্ড নীরব থাকার পর মুখ খুলল চাইনিজ, 'কীভাবে?'

'আমাদের সাহায্য করলে আপনার ভাইকে ছেড়ে দেয়া হবে। ফ্যাসিলিটিতে আগে যা হয়েছে এবং এখন যা হচ্ছে, সবকিছুর জন্য দায়ী করা হবে মেজর জেনারেল লাও-কে। লাভবান হব আমি আর আপনি, দুই পক্ষই। বলির পাঁঠা হবে শুধু লাও।'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে শেষ করেছে মঙ্ক। জানে, উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে লেফটেন্যান্ট কর্নেলের সম্পর্ক ভালো না। এখন দেখার বিষয়, কোনদিকে থাকার সিদ্ধান্ত নেয় লোকটা। লোভ, নাকি বিশ্বস্ততা?

'আপনারা যা দাবী করছেন, তা যে করতে পারবেন, সেটা বুঝব কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল চ্যাং।

'আমরা কি আপনাদের ফ্যাসিলিটিতে অনুপ্রবেশ করিনি?' পাল্টা প্রশ্ন করল মঙ্ক। 'এরপর তো আমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকার কথা না।'

'কিন্তু আপনাদের আমি বিশ্বাস করব কেন?'

'কারণ আপনার কাছে এছাড়া আর কোনও উপায় নেই। আমরা যদি সঠিক সময়ে বেইজিং-এ আমাদের সহকর্মীদের রিপোর্ট করতে ব্যর্থ হই, সেক্ষেত্রে আমেরিকান দূতাবাসের সামনে আবিষ্কৃত হবে গাও-এর মৃতদেহ। লাশের সাথে এমন কিছু প্রমাণও পাওয়া যাবে, যাতে মনে হয় আপনাদের পুরো পরিবারই আমেরিকান গুপ্তচর। আপনার তো ভরাডুবি হবেই, স্ত্রী-সন্তানকেও বাঁচাতে পারবেন না।'

এই পর্যন্ত বলে এক মুহূর্ত বিরতি নিল মঙ্ক। তারপর আবার শুরু করল। 'বিপরীত ফলাফলটাও শুনে নিন। আমাদের লক্ষ্য অর্জিত হলে বলির পাঁঠা হবে লাও, যথাযোগ্য মর্যাদা পাবেন আপনি, গাও-ও মুক্তি পাবে। এখন সিদ্ধান্ত নিন, ঝংজিয়াও সান। পরিবার নিয়ে ডুববেন, নাকি বাঁচবেন মাথা উঁচু করে?'

আর কথা বাড়াল না চ্যাং, জবাব দিল সাথে সাথে। 'কী করতে হবে বলুন।'

কিম্বারলির দিকে তাকিয়ে নীরবে হাসল মঙ্ক, বাজি জিতে গেছে। 'অন্যদের অবস্থান জানান, আমাদের নিরাপদে পৌঁছাতে দিন ওদের কাছে।'

স্যাটেলাইট ফোনটা হাতে তুলে নিল কিম্বারলি। কম্পিউটার টার্মিনাল থেকে হ্যাক করে পাওয়া ফ্যাসিলিটিটার একটা মানচিত্র ফুটে আছে পর্দায়। চ্যাং প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো জানিয়ে দিতেই মাথা নাড়ল সে। 'বুঝতে পেরেছি।'

'আর কিছু?' জানতে চাইল লেফটেন্যান্ট কর্নেল।

'আরেকটা ব্যাপার'

'কী?'

কথা শেষ করে লাইন কেটে দিল মঙ্ক।

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল কিম্বারলির মুখ দিয়ে। 'ওকে বিশ্বাস করাটা কি ঠিক হবে?'

সামনের দিকে ইঙ্গিত করল সিগমা এজেন্ট। 'দেখা যাক।'

শুরু হলো চ্যাং-এর নির্দেশিত পথে যাত্রা। সবার মনে ভিড় করছে একটাই চিন্তা।

ইতিমধ্যে দেরি হয়ে যায়নি তো?

দুপুর ১২:১৩

প্রচন্ড গতিতে কোয়ালস্কির দিকে তেড়ে আসছে সাদা লোমওয়ালা গরিলাটা। বিশাল শরীরের ভারে থেকে থেকে কেঁপে উঠছে চেম্বারের মেঝে। মারিয়ার ছোঁড়া ডার্ট বিঁধে অজ্ঞান হয়ে আছে আগের কালো গরিলাটা, গড়িয়ে ওটার আড়ালে চলে গেল সিগমা এজেন্ট।

নাই মামার চেয়ে অন্তত কানা মামা ভালো।

এমন সময় উপর থেকে ভেসে আসা একটা গর্জন শুনে আঁতকে উঠল কোয়ালস্কি।

আবার কোন ঝামেলা!

আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়িয়েছে হামলাকারী গরিলাটাও। এক হাতে মেঝেতে ভর দিয়ে ঘাড় উঁচু করেছে শব্দের উৎস বরাবর।

উপর দিকে তাকাতেই কোয়ালস্কি দেখতে পেল, ল্যাবের জানালা বেয়ে একটা কালো অবয়ব নেমে আসছে। মাথা চাঁছা বাকোকে চিনতে এক সেকেন্ড সময় লাগল তার।

না...

ও এখানে আসছে কী করতে!

নকল গাছের একটা ডালে দোল খেয়ে অবশেষে কোয়ালস্কির পাশে নেমে দাঁড়াল প্রাণীটা, মুখোমুখি হলো কয়েক গজ সামনে দাঁড়ানো মুর্তিমান বিভীষিকার। খোলা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে গর্জন, দু'হাতে বুকে চাপড় দিচ্ছে দমাদম।

'বাকো, ভাগো এখান থেকে!' চেঁচিয়ে উঠল কোয়ালস্কি। মুখে বলার সাথে সাথে হাত উঁচু করতেই অনুভব করল যেন ভাঙা পাঁজরে আগুন জ্বেলে দিয়েছে কেউ। ঘুমন্ত কালো গরিলাটার মৃদু চাপড়েই এই অবস্থা, পুরো থাবা ভাগে জুটলে কী হবে, তা ভাবনারও অতীত।

তবে কথাটা শুনে বাকোর কোনও ভাবান্তর হয়নি।

এতক্ষণ যাবত বড় বড় চোখে ক্ষুদে প্রাণীটার আস্পর্ধা লক্ষ্য করছিল সংকরদের দলনেতা। এখন কৌতূহল সরিয়ে চোখে জায়গা করে নিয়েছে তীব্র জিঘাংসা। এগিয়ে এল হিংস্র গরিলা, মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে থাবা মারল বাকোর অবস্থান লক্ষ্য করে।

তবে সংঘর্ষের আগেই জায়গা থেকে সরে গেছে ছোটখাটো বাকো। লাফিয়ে পার হয়ে গেছে গরিলার মাথা, সফলভাবে অবতরণ করেছে উল্টোদিকে।

চরকির মতো পাঁই করে সেদিকে ফিরল গরিলাটা, আবারও থাবা চালাল শত্রুকে লক্ষ্য করে। আবারও আগের পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করল বাকো। তবে এবার আর শেষরক্ষা করতে পারল না। কোমরে মুগুরের মতো কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে শরীর মেলল বাতাসে।

তবে মেঝেতে পড়ার আগে নিজে সামলে নিতে পারল বাকো। ডিগবাজি খেয়ে শরীরটা গড়িয়ে নিয়ে পতনের ধাক্কাটা একপাশের কাঁধ দিয়ে হজম করল।

শিকারকে বাগে পাওয়া গেছে ভেবে আগে বাড়ল সাদা পিঠওয়ালা। দলনেতার নজর অন্যদিকে লক্ষ্য করে কোয়ালস্কির দিকে এগোবার প্রয়াস পেল বাকি সংকর গরিলাগুলো।

ছুটে গিয়ে একটা বোল্ডারের আড়ালে লুকাল সিগমা এজেন্ট। একহাতে তুলে নিয়েছে মাঝারি আকারের একটা পাথর, অন্য হাতে নকল গাছ থেকে ভেঙে পড়া একটা কংক্রিটের দন্ড। দানবগুলোর মোকাবেলা করার জন্য গুহামানবের বেশ ধরতেও আপত্তি নেই।

পাথরে পিঠ দিয়ে বসতে বসতে কোয়ালস্কি লক্ষ্য করল, আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে আসছে বাকো। সাদা পিঠওয়ালা সংকর গরিলাটাও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। নতুন উদ্যমে ধাওয়া করে চলেছে অসহায় প্রাণীটাকে।

অবস্থা বেগতিক দেখে একেবারে কোয়ালস্কির লুকানোর জায়গার দিকে ছুটে আসতে শুরু করল বাকো।

আড়াল ছেড়ে বের হয়ে, জানালার দিকে ইশারা করে চেঁচিয়ে উঠল সিগমা এজেন্ট। 'ওখানে ফিরে যা ব্যাটা!'

কিন্তু না, টেকো জন্তুটা যেন ওর সাথে কোলাকুলি করবে বলে পণ করেছে। হাত তুলে সোজা এগিয়ে আসছে কোয়ালস্কির দিকেই। তবে কয়েক গজ দূরে থাকতেই লক্ষ্য খুঁজে পেল আরেকটা দানবাকৃতি হাত।

পায়ের গোড়ালি আঁকড়ে ধরে বাকোকে কোয়ালস্কির কাছ থেকে টেনে দূরে সরিয়ে নিল সংকরদের দলপতি।

না!

দুপুর ১২:১৪

ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে বাকোর পায়ে, আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে আসছে দৃষ্টি। তবে মনের গভীরে উপলব্ধি করছে পারছে, হাল ছেড়ে দিলে চলবে না এখন।

গোড়ালি ধরে বাকোকে শূন্যে তুলে ফেলেছে বিশাল জন্তুটা। বাড়িতে থাকতে মা তাকে রূপকথার গল্প শোনাত। হিংস্র দানবটা যেন সেই গল্প থেকে উঠে এসেছে বাস্তবে। পরিকল্পনাটা আন্দাজ করতে পারছে সে। মাথার উপর থেকে তাকে আছড়ে ফেলা হবে শক্ত মেঝেতে। নিরুপায় হয়ে গোড়ালি ধরা হাতটাতে কামড় বসাল বাকো।

গর্জে ওঠে পা ছেড়ে দিল দানবটা।

লাফিয়ে মেঝেতে নামল বাকো। কিন্তু পতনের ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই আবারও এগিয়ে এল দানবীয় হাত, কোমর আঁকড়ে ধরে তুলে ধরল উপরে। এত জোরে চেপে ধরেছে যে, নিঃশ্বাস নিতেও পারছে না সে।

এবার আর রক্ষা নেই। হাঁ করে এগিয়ে আসছে দানবের মুখটা, ঠোঁটের সীমানা ছাড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে ধারালো শ্বদন্ত। কামড় বসাতে চলেছে বাকোর গলায়।

ঝাপসা হয়ে আসা চোখ দুটোর সামনে একটা মুখ ভেসে উঠতে দেখল বাকো। গায়ের সব শক্তি একত্র করে শেষবারের মতো নিঃশ্বাস টানল সে।

বিদায়, মা...

দুপুর ১২:১৪

উপর থেকে দৃশ্যটা দেখছে মারিয়া। কী ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে আঁতকে উঠল সে। সহজাত প্রবৃত্তির বসে আঙুল চেপে ধরল রাইফেলের ট্রিগারে। খালি চেম্বারে পিন আঘাত করার শব্দে সম্বিত ফিরল।

রাইফেলটা খালি। কালো গরিলাটার পেছনে দুটো ডার্ট খরচ হয়ে গেছে। তিন নম্বর ডার্টটা নষ্ট হয়েছে সাদা পিঠওয়ালার দিকে ছোঁড়ার সময়। কোয়ালস্কির দিকে

এগোনোর পাঁয়তারা করছিল আরেকটা মহিলা গরিলা, হাত ফস্কে পড়া চতুর্থ ডার্টটা ওটার গায়ে বিঁধলেও অজ্ঞান করতে পারেনি। তবে প্রানিটাকে ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছে অবশ্য। আর এই আকারের কোনও জন্তুকে ঘুম পাড়ানোর জন্য একটা ডার্ট মোটেও যথেষ্ট নয়।

এখন গুলি ছাড়া রাইফেল হাতে মারিয়া শুধু একটা কাজই পারে- চুপচাপ দাঁড়িয়ে বাকোর মৃত্যু দেখা।

এমন সময় বোল্ডারের আড়াল থেকে ছুটে এসে, একেবারে গরিলাটার দুই চোখের মাঝখানে আঘাত করল মাঝারি আকৃতির একটা পাথরের টুকরো।

বাকোর গলায় কামড় বসাতে যাচ্ছিল সংকরদের দলনেতা, থমকে গেল এমন আকস্মিক হামলায়।

কংক্রিটের মুগুর হাতে পাথরের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসছে কোয়ালস্কি।

'নিজের আকারের কাউকে বেছে নে না, লোমওয়ালা জানোয়ার কোথাকার...'

দুপুর ১২:১৫

বিস্মিত দৃষ্টিতে কোয়ালস্কির দিকে তাকিয়ে আছে জন্তুটা। হতভম্ব হয়ে গেছে হঠাৎ পাথরের ঘা খেয়ে। বাকোর শরীরটা এখনও মুখে সামনে ধরা, তবে সেদিকে নজর নেই এখন।

'আয় এদিকে!' হাতের মুগুরটা দোলাতে দোলাতে চেঁচিয়ে উঠল কোয়ালস্কি। মনে মনে ভাবছে, প্রাণীটাকে উত্তেজিত করতে পারলে হয়তো এ যাত্রা বেঁচে যাবে বেচারা বাকো।

গরিলাটার মাথাতেও একই পরিকল্পনা খেলছে। বাকোকে ছেড়ে দিয়ে সামনে বাড়ল ওটা, তবে কয়েক পা এগিয়েই হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল মেঝেতে। তাল সামলানোর জন্য কংক্রিটের তৈরি একটা নকল গাছে থাবা মারতে, কাঠামোটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল।

এটা কী হলো!

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কোয়ালস্কি। ছোট্ট এক পাথরের ঘা-তে তো এমনটা হওয়ার কথা না।

জায়গায় জমে গেছে বাকি গরিলাগুলো। বুঝতে পারছে না, দলনেতার কী হয়েছে। উঠে দাঁড়ানোর জন্য কসরত শুরু করেছে প্রাণীটা। তখনই ওটার ঘাড়ে বিঁধে থাকা ডার্টের পালকটা দেখতে পেল কোয়ালস্কি।

মারিয়ার দিকে তাকাল সে। অবশেষে জন্তুটাকে ঘায়েল করতে পেরেছে প্রজননবিদ। কিন্তু তাহল ওকে বিস্মিত দেখাচ্ছে কেন?

কোয়ালস্কির উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল মারিয়া। 'দৌড়ান! এদেরকে কাবু করতে একটামাত্র ডার্ট যথেষ্ট নয়।'

দুপুর ১২:১৬

আসল কাহিনী বুঝতে পেরেছে মারিয়া। তিন নাম্বার ডার্টটা পরে আর চেম্বারের মেঝেতে দেখা যায়নি। ওটাই এখন আটকে আছে জন্তুটার ঘাড়ে।

মারামারির এক পর্যায়ে মেঝে থেকে জিনিসটা তুলে নেয় বাকো, তারপর সুযোগমতো ঢুকিয়ে দেয় শত্রুর গায়ে। প্রাইমেট সেন্টারে ট্রাঙ্কুলাইজার গান আর ডার্ট চেনানো হয়েছিল ওকে। বলে দেয়া হয়েছিল, এগুলো কাউকে মারতে পারে না... তবে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। সেই বিদ্যারই যথাযথ প্রয়োগ করেছে প্রাণীটা।

নিচে সিডাটিভের প্রভাবে আগু-পিছু দুলতে শুরু করেছে সংকর গরিলাদের দলনেতা।

সুযোগটা লুফে নিয়েছে কোয়ালস্কি, বাকো নিয়ে ইতিমধ্যে ছুটতে শুরু করেছে স্টিলের দরজাটার দিকে। তবে তাই বলে বিপদ কাটেনি। দলনেতার নির্লিপ্ত ভাব দেখে আবারও নড়াচড়া করতে শুরু করেছে বাকি গরিলাগুলো।

আগে একাধিকবার সাহায্য করা সেই নার্সের দিকে ফিরে তাকাল মারিয়া। 'দরজাটা খুলে দিন।'

ভীত দেখাচ্ছে মহিলাকে। 'পারব না। ওই দরজা খোলার জন্য কাউকে নিচে নামতে হবে। হাতের ছাপ না পেলে খুলবে না বাইরে থাকা ইলেকট্রনিক লক।'

বিষণ্ণ মনে নিচের দিকে চোখ ফেরাল মারিয়া। দরজার দিকে ছুটে চলেছে কোয়ালস্কি আর বাকো, পিছু নিয়েছে হিংস্র গরিলার পাল।

তবে ভুল দিকে যাচ্ছে ওরা...

দুপুর ১২:১৭

খাঁচা লক্ষ্য করে ছুটছে কোয়ালস্কি। পেছনদিকে নিজের নাম শুনতে পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

উপর থেকে চেঁচাচ্ছে মারিয়া। 'এখান থেকে দরজা খোলা সম্ভব না। আপনাদের এদিকে ফিরে আসতে হবে।'

পরমুহূর্তে জানালা গলে নিচে পড়ল প্যাঁচানো কিছু একটা।

প্যাঁচ খুলতেই দেখা গেল, ওটা আসলে মোটা পানির পাইপ- আগুন নেভাতে কাজে লাগে।

এটা বেয়ে ওদের উপরে ওঠার ইঙ্গিত করছে মারিয়া।

কিন্তু গন্তব্য যে অনেক দূর! মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হিংস্র গরিলার পাল।

কোয়ালস্কি জানে, এবার আর বেঁচে ফিরতে পারবে না ও। বাকো কোনওরকমে বেরিয়ে যেতে পারলেও হত। কিন্তু প্রাণীটা কিছুতেই ওকে এই অবস্থায় ফেলে যেতে চাইবে না।

এমন সময় হাত ধরে টেনে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল বাকো। বুড়ো আঙুল আর তর্জনী ব্যবহার করে একটা ইশারা করল তারপর।

[থাকো এখানে]

কোয়ালস্কি কিছু বলার আগেই খাঁচা ছেড়ে বাইরে ছুট লাগাল প্রাণীটা। হিংস্র গরিলার পালের ফাঁকফোকর গলে বেরিয়েও গেল কীভাবে যেন।

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল সিগমা এজেন্টের মুখ দিয়ে।

অন্তত একজন তো বাঁচতে পারবে...

দুপুর ১২:১৮

কাজ সেরেই ছুট লাগাল বাকো।

হাচড়েপাচড়ে গরিলার পাল ঠেলে বেরিয়ে আসার পর, মেঝে থেকে কংক্রিটের মুগুরটা তুলে নেয় সে। ওটা দিয়েই গায়ের সব শক্তি একত্র করে বাড়ি মেরেছে ঝিমাতে থাকা সংকর গরিলাদের দলনেতার মাথায়।

কিছুক্ষণ আগে সুঁইয়ের খোচায় ঘুম পাড়াতে চেয়েছিল জন্তুটাকে, তবে এখন এটাকে জাগিয়ে তোলা খুব দরকার। নইলে শান্ত হবে না দলের বাকি সদস্যগুলো।

বাড়ি খেয়ে গলা ফাটিয়ে গর্জে উঠল হিংস্র গরিলা। পুরোপুরি খুলে গেছে ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখদুটো। গর্জাতে গর্জাতে আগে বাড়ল প্রাণীটা।

কিন্তু তার আগেই দৌড় শুরু করেছে বাকো, তবে মায়ের দিকে না। মা উপরে নিরাপদে আছে। তার গন্তব্য পরিবারের অন্য আরেকজন সদস্যের দিকে।

দুপুর ১২:১৮

কান ফাটানো গর্জন শুনে দুরুদুরু করতে শুরু করেছে কোয়ালস্কির বুক। যার মানে, ঘুম ভেঙে উঠে দাঁড়িয়েছে সাদা লোমওয়ালা দলনেতা।

এমন সময় আবারও ভীড়ের মাঝে বাকোকে দেখা গেল। গরিলাগুলোর পায়ের ফাঁকফোকর গলে এগিয়ে এসে কোয়ালস্কিকে জড়িয়ে ধরল সে।

পেছন পেছন ছুটে আসছে দানবদের সর্দার। তবে প্রচন্ড বেগে দৌড়ে আসায়, শেষ মুহূর্তে থামতে পারল না জন্তুটা। আরও কয়েকটা গরিলাকে সাথে নিয়ে আছড়ে পড়ল ধাতব দরজায় গায়ে।

সুযোগটা লুফে নিল কোয়ালস্কি। বাকোর দিকে তাকিয়ে ইশারা করল ঝুলতে থাকা পানির পাইপের উদ্দেশ্যে। তারপর পাঁজরের ব্যথা অগ্রাহ্য করে নিজেও দৌড় শুরু করল প্রাণপণে।

দেয়ালের সামনে পৌছে প্রাণীটাকে পাইপ বেয়ে ওঠার ইঙ্গিত করল সিগমা এজেন্ট। কিন্তু পেছনদিকে সেঁটে আছে তার নজর।

'যা ব্যাটা...আমি তোর পেছন পেছন আসছি,' বলে কোলে তুলে নিয়ে সে গরিলাটাকে ছুঁড়ে দিল উপরদিকে। অবশেষে পাইপ ধরে ঝুলে পড়ল বাকো। কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য কোয়ালস্কি নিজেও প্রায় একই সাথে লাফিয়ে হাতের মুঠোয় ধরল পানির পাইপটা।

তিনতলা সমান উচ্চতা থেকে গলা ফটিয়ে চেঁচাচ্ছে মারিয়া, 'তাড়াতাড়ি! ওরা আসছে!'

নিচে তাকানোর সময় নেই এখন। বিদ্যুৎগতিতে হাত-পা চালাচ্ছে কোয়ালস্কি। যা হওয়ার হবে। তরতর করে উঠে যাচ্ছে বাকো, প্রায় পৌছে গেছে।

শ্বাসরুদ্ধকর কয়েক মুহূর্ত পর জানালা গলে ঢুকে পড়ল গরিলাটা। মারিয়ার উদ্বিগ্ন মুখ দেখা যাচ্ছে কাঁচের ফাঁকে।

তাড়াতাড়ি...

দুপুর ১২:১৯

মারিয়া দেখতে পেল, ছুটে আসছে কয়েকটা হিংস্র গরিলা। তাদের দলনেতাও সামলে নিয়েছে এতক্ষণে, সমানে তেড়ে আসছে ওটাও। বাকোর বাড়ি খেয়ে কেটে গেছে সিডাটিভের প্রভাব।

সাদা লোমওয়ালার সাথে দরজায় ধাক্কা খাওয়ার পর ক্ষেপে উঠেছে দলের কয়েকটা সদস্য। খামচাখামচি শুরু করেছে নিজেদের ভেতর।

প্রাণপণে পাইপ বেয়ে উঠছে কোয়ালস্কি। অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যে, তবে এটুকু দূরত্ব যথেষ্ট নয়।

জানালার দিকে লাগানো স্টিলের বাক্সগুলোর দিকে তাকাল মারিয়া। নার্সের কাছ থেকে শুনেছে, এগুলো থেকে সংকেত পাঠানো হয় গরিলাগুলোর ঘাড়ে আটকানো কলারে, যাতে তারা কখনও উপরে উঠে আসতে না পারে।

কোয়ালস্কির উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল প্রজননবিদ। 'তাড়াতাড়ি করুন। এই স্তরটা পার হতে হবে আপনাকে।'

ভ্রূকুটি করল সিগমা এজেন্ট। কথা বুঝতে পারেনি সম্ভবত।

'উঠতে থাকুন!'

দম নেয়ার জন্য এক মুহূর্ত থামল কোয়ালস্কি। ততক্ষণে একটা গরিলা পৌঁছে গেছে নিচে। তার পা লক্ষ্য করে লাফিয়ে উঠল জন্তুটা।

ভাগ্য ভালো, এটা দলের সবচাইতে ছোট গরিলা। উচ্চতায় সাত ফুটের মতো। তারপরেও আঘাতের ধাক্কায় ফুটখানেক পিছলে গেল কোয়ালস্কির হাত।

এগিয়ে আসছে বড় গরিলাগুলো।

কিছুতেই সময়মতো জানালা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না ও।

পাশ থেকে নড়াচড়া লক্ষ্য করে মারিয়ার সম্বিত ফিরল। এক হাতে পাইপটা আঁকড়ে ধরেছে বাকো, টানতে শুরু করেছে উপরের দিকে।

আমার মাথায় এই বুদ্ধিটা এলো না কেন!

মারিয়াও যোগ দিল গরিলাটার সাথে। দেখাদেখি সামনে বাড়ল সেই নার্সও। তিনজোড়া হাতের টানে বেশ খানিকটা উপরে উঠে এল পাইপ, সাথে করে তুলে আনছে ঝুলতে থাকা কোয়ালস্কিকেও।

এবার এগিয়ে এল সার্জিক্যাল টিমের বাকি সদস্যরা। এতক্ষণ দম আটকে নিচে চলতে থাকা নাটকটা দেখছিল সবাই। মারিয়ারা হিসাবে তাদের প্রতিপক্ষ হলেও এখন যুদ্ধ চলছে মানুষ আর পশুতে। জন্তু-জানোয়ারের কাছে তো আর মানুষকে হারতে দেয়া যায় না।

সবার সম্মিলিত চেষ্টায় উপরে উঠে আসছে কোয়ালস্কি।

জানালার প্রান্তে পৌঁছে একহাতে ফ্রেমের কোনা আঁকড়ে ধরল সে। নিজে নিজে ওঠার মতো শক্তি শরীরে অবশিষ্ট নেই। পাইপ ছেড়ে তার হাত ধরল মারিয়া, তারপর টেনে নিল ভেতরে।

মেঝেতে ক্লান্ত শরীর গড়িয়ে দিল সিগমা এজেন্ট। হাঁপানোর ফাঁকে বলল, 'কোন স্তরের ব্যাপারে কী যেন বলছিলেন?'

এমন সময় বাইরে থেকে পপ করে একটা আওয়াজ ভেসে এল। পরমুহূর্তেই শোনা গেল যন্ত্রণাকাতর চিৎকার। মারিয়া উঁকি দিয়ে দেখল, চেম্বারের মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে একটা গরিলা। গলার কলার থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। পাইপ বেয়ে উঠছিল আরও দুটো জন্তু, সঙ্গীর অবস্থা দেখে নেমে গেল ওগুলো।

'বাদ দিন,' জবাব দিল প্রজননবিদ, তারপর নিচু হয়ে হাত ধরে টেনে সোজা হতে সাহায্য করল কোয়ালস্কিকে।

এগিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল বাকো।

'বাকোকে নিরাপদে রাখার জন্য ধন্যবাদ,' মারিয়া বলল।

প্রাণীটার কাঁধে আলতো চাপড় দিল সিগমা এজেন্ট। 'আমার তো মনে হয়, ব্যাপারটা পুরোপুরি উল্টো।' বলে সার্জিক্যাল টিমের সদস্যদের দিকে তাকাল সে। 'আমাদের এখানে আরও আটকে রাখতে চান নাকি কেউ?'

একযোগে না-বোধক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সবাই।

'এখানে আটকা পড়েছি আমরা,' মারিয়া ব্যাখ্যা করল। 'সাইরেন বাজার পর থেকেই।'

'তার মানে, এখানেই বসে থাকতে হবে এখন!'

জানালার দিকে ইঙ্গিত করল প্রজননবিদ। 'অন্তত ওই ঝামেলার হাত থেকে তো...'

হঠাৎ নিচে গেল ল্যাবের সবগুলো বাতি।

পিছিয়ে গিয়ে মায়ের হাত আঁকড়ে ধরল বাকো। অন্ধকার ভয় পায় ও।

কয়েক সেকেন্ড পর টিমটিমে লাল রঙের ইমারজেন্সি লাইট জ্বলে উঠেতে দেখা গেল অবশ্য।

স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল মারিয়ার মুখ দিয়ে।

'পাওয়ার বন্ধ হয়ে গেলে তো সম্ভবত এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারব আমরা,' প্রস্তাব দিল কোয়ালস্কি। তারপর এগিয়ে গিয়ে ধাক্কা মারতে লাগল ভারী দরজায়। তবে কাজের কাজ কিছু হলো না।

বাকোর দৃষ্টি অনুসরণ করে ঝুলন্ত পাইপের দিকে স্থির হলো মারিয়ার নজর।

নড়ছে ওটা।

কিছু বলার আগেই লোমশ একটা হাত জানালার ফ্রেম আঁকড়ে ধরল।

পাওয়ার বন্ধ হয়ে যাওয়াতে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে চেম্বারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

আতঙ্কে বাকিদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল মারিয়া। 'ওরা আসছে!'

অধ্যায় বাইশ
১ মে, রাত ১২:৩২
আন্দেজ পর্বতমালা, ইকুয়েডর

পায়ে পায়ে হিমশীতল পানিতে নেমে যাচ্ছে গ্রে, অনুসরণ করছে বাকি তিনজন। তবে চাকিকুই আর জেম্বে এখনও দাঁড়িয়ে আছে নদীর পাড়ে। ভেতরে ঢুকবে না ওরা।

গুহার প্রবেশপথটা পানিতে ডুবে থাকলেও, ভেতর দিকের ছাদ একটু উঁচু। পায়ের নিচে মাটি অনুভব করতে পারছে সিগমা কমান্ডার। গুহামুখ পার হয়ে হাতের ফ্ল্যাশলাইটটা উঁচু করল সে, জিনিসটা পানিরোধী। ভেতরকার পানির উপরিতল থেকে ছাদ প্রায় এক ফুট উঁচু।

'সামনের দিকে মেঝে আরও ঢালু,' সতর্ক করল গ্রে।

'ঢোকা যাবে?' লিনার কণ্ঠে উদ্বেগ।

'নিঃশ্বাস নেয়া যাবে কি না বুঝতে পারছি না। সাঁতার কাটার ফাঁকে এয়ার পকেট অর্থাৎ বায়ুকুঠুরির খোঁজ করতে হবে।'

মুখের ভাব দেখে মনে হলো, প্রস্তাবটা পছন্দ হয়নি মেয়েটার।

আর কোনও উপায়ও তো নেই।

গ্রে-র পাশে চলে এল রোল্যান্ড। 'পেট্রোনিও জারামিল্লোর বক্তব্য থেকে জানা গেছে, লাইব্রেরীতে পৌঁছানোর জন্য তাকে পানির নিচ দিয়ে সাঁতার কাটতে হয়েছিল।'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল শেইচান। 'অনেক বকবক হয়েছে। এগিয়ে দেখা ছাড়া আর কোনও পথ নেই এখন।'

কথা সত্যি।

আগে বাড়ল গ্রে। পানি কেটে ফ্ল্যাশলাইটের আলো খুব একটা এগোতে পারছে না। তবে যেটুকু দেখা যাচ্ছে, সেটুকুর পানি কাঁচের মতো স্বচ্ছ। অনুসরণ করল বাকিরা, শেইচান সবার পেছনে।

'দেয়ালগুলো দেখুন,' রোল্যান্ডের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল লিনা। 'প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হলে এতটা মসৃণ হওয়ার কথা না কিন্তু।'

হাত তুলে ছাদ স্পর্শ করল গ্রে। মেয়েটা ঠিকই বলেছে। আর প্যাসেজটাও এগিয়েছে একেবারে সোজাসুজি সামনের দিকে।

অর্ধেক হেঁটে, অর্ধেক সাঁতরে চুপচাপ এগোচ্ছে দলটা। কিছুক্ষণ পরই একেবারে নাক পর্যন্ত উঠে এল পানির স্তর। গ্রে-র হাঁসফাঁস লাগতে শুরু করেছে। বাকিদের অবস্থাও খুব একটা সুবিধার না।

হঠাৎ করে এমন সময় পায়ের নিচ থেকে সরে গেল মেঝে। তাল সামলাতে না পেরে পানিতে একটা ডুব দিয়ে আবার ভেসে উঠল সিগমা কমান্ডার। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখা গেল- একটা সিঁড়ি শুরু হয়েছে এখানে থেকে, নিচের দিকে আড়াআড়িভাবে এগিয়েছে সামনে।

'সিঁড়ি... সবাই এখানেই দাঁড়াও। আমি দেখে আসি, নিচে আদৌ কোনও পথ আছে কি না।'

'সাবধানে যাবেন,' সতর্ক করল লিনা।

দরকার হলে কোয়েঙ্কা থেকে ডাইভিং গিয়ার কিনে আনতে হবে, ভাবল গ্রে। পরক্ষণেই মনে পড়ল, এই জায়গায় ওরকম আধুনিক জিনিসের দেখা মিলবে তো? না মিললেও অবশ্য সমস্যা নেই। লাগলে একদিনের ভেতর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আবার ফিরে আসা যাবে।

আপাতত দেখা যাক, কী আছে সামনে। বড় করে একটা দম নিয়ে পানিতে ডুব দিল গ্রে। ফ্ল্যাশলাইট তাক করে সোজাসুজি নামতে লাগল সিঁড়ি বরাবর। একেবারে নিচে পৌঁছে দেখা গেল, ওখানে আরেকটা লম্বা প্যাসেজ আছে।

এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল সিগমা কমান্ডার। ভাবছে, ফিরে যাবে নাকি ঝুঁকি নিয়ে সামনে এগোবে।

কৌতুহলের জয় হয়েছে। সিঁড়ির গোড়ায় পা দিয়ে ধাক্কা মেরে সামনে বাড়ল সে, সাঁতরাতে লাগল প্রাণপণে। দুইপাশের দেয়ালে শ্যাওলা জমে আছে, কিন্তু শ্বাস নেয়ার মতো একবিন্দু বাতাস নেই কোথাও।

অবশেষে প্যাসেজের শেষ মাথায় গিয়ে থামল গ্রে। এখানে আরেকটা সিঁড়ি, সাপের মতো পাক খেতে খেতে উঠে গেছে সরাসরি উপরে।

সিঁড়িটার ভেতরদিকে আলো ফেলল সিগমা কমান্ডার। এখনও বুকে খানিকটা বাতাস রয়ে গেছে। সম্ভাব্য করণীয় কাজ দুটো- ফিরে গিয়ে বাকিদের সাথে যোগ দেয়া, অথবা সামনে এগোনো। তবে দ্বিতীয় ব্যাপারটার ক্ষেত্রে ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে। হতে পারে, সামনে কোথাও শ্বাস নেয়ার মতো জায়গা নেই, পুরোটাই ডুবে আছে পানিতে। সেক্ষেত্রে খোয়াতে হবে পৈত্রিক প্রাণটা।

রোল্যান্ডের মুখ থেকে শোনা জারামিলোর কথা মনে করল গ্রে। অনেক অনেক বছর আগে এখানে এসেছিল লোকটা। তারপর গুহার ভেতর পানি বেড়েছে না কমেছে, সেটা কেউ জানে না।

মাথা থেকে উদ্ভট চিন্তাগুলো ঝেড়ে ফেলল গ্রে। একটু আগে শেইচানের বলা কথাটা কানে বাজছে।

এগিয়ে দেখতে হবে...

রাত ১২:৫৪

রোল্যান্ড আর লিনাকে পাশ কাটাল শেইচান, ফ্ল্যাশলাইট তাক করেছে পানির গভীরে। তবে নিচের দিকে শুধুই নির্জন সিঁড়ি।

অনেকক্ষণ হলো, রওনা দিয়েছে গ্রে। এতো সময় কেন লাগছে?

গত কয়েক বছর ধরে একসাথে নানা অভিযানে গেছে দু'জন। জানে, ভীষণ বিপদে পড়লেও একেবারে শেষ মুহূর্তে কীভাবে যেন রক্ষা পেয়ে যায় ছেলেটা। তবে এবারও তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে কি না, সেটা বুঝতে পারছে না।

গ্রে ফিরে না এলে অবশ্য অবাক হবে না শেইচান। জানে, এত সুখে থাকা আসলে তার ভাগ্যে সইবে না। মুক্ত পাখির মতো জীবন ছিল তার। হামলা, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, রক্তপাত ইত্যাদি দেখে বেশ কাটছিল সময়। কিন্তু তারপরই যেন ভালোবাসার বাঁধন হাতে আবির্ভূত হলো গ্রে, তাকে বেঁধে ফেলল মায়ার সুতোয়।

আবারও ডুবে থাকা সিঁড়ির দিকে তাকাল সাবেক আততায়ী।

আমাকে ছেড়ে যেতে পারো না তুমি, গ্রে... ফিরে এসো।

তার প্রার্থনায় সাড়া দিয়েই যেন কয়েক সেকেন্ড পর ছলকে উঠল পানি। ছায়ার মতো একটা অবয়ব ভেসে উঠেছে।

পিছিয়ে গিয়ে জায়গা করে দিল শেইচান।

মুখ হাঁ করে খাবি খেতে লাগল গ্রে, যেন পৃথিবীর সব বাতাস টেনে নেবে বুকে।

এগিয়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল সাবেক আততায়ী, ওষ্ঠ ছোঁয়াল শীতল হয়ে যাওয়া ঠোঁটজোড়ায়। দম আটকে মরুক না ব্যাটা, তার কি! তাই বলে ভালবাসা প্রকাশে তো ছাড় দেয়া যাবে না।

ঝটকা খেল গ্রে, কোনওমতে প্রাণ নিয়ে ফেরার পর এরকম অভ্যর্থনা আশা করেনি। তবে ধাতস্থ হয়ে পরমুহূর্তেই পাল্টা জড়িয়ে ধরল প্রেমিকাকে।

রোম্যান্সপর্ব শেষ হলে মুখ খুলল সিগমা কমান্ডার। 'চিন্তা হচ্ছিল নাকি?'

কপট রাগের ভান করে আলতো হাতে তাকে ধাক্কা মারল মেয়েটা, চোখে খেল করছে দুষ্টুমি। 'নিঃশ্বাস আটকে রাখার ব্যাপারে তোমার দক্ষতার কথা জানা আছে চিন্তা হচ্ছিল ওখানে কী পেলে, তা ভেবে।'

'পেয়েছেন কিছু?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল লিনা।

জবাবে মুচকি হাসল গ্রে। 'সেটা দেখার জন্য সবাইকে সাঁতার কাটতে হবে।'

রাত ১:০৮

আর কত দূর!

অন্ধের মতো রোল্যান্ডের পা লক্ষ্য করে সাঁতরে চলেছে লিনা। বাতাসের অভাে যেন ফেটে যাবে ফুসফুস। ফ্ল্যাশলাইট হাতে সবার সামনে পথ দেখাচ্ছে গ্রে প্যাসেজটা একটা প্যাঁচানো সিঁড়ির মাথায় গিয়ে থেমেছে।

অবশেষে উপরে উঠতে লাগল যাজকের পা-দুটো। লিনারও দম ফুরিয়ে এসেে প্রায়। বিদ্যুৎবেগে উপরদিকে মাথা তুলল ও, পানি ছেড়ে বেরিয়ে এল বাতাসে।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ...

এক সেকেন্ড পর মাথা জাগাল শেইচান। এতখানি পথ সাঁতরে এলেও, চেহারা ক্লান্তির ছাপ প্রায় নেই বললেই চলে।

কয়েকবার দম নিয়ে ধাতস্থ হয়ে চারপাশে চোখ বুলানোর প্রয়াস পেল লিনা।

পাথরের তৈরি একটা চেম্বারে এসে উপস্থিত হয়েছে ওরা। মসৃণ সিলিংটা মাথ থেকে প্রায় এক হাত উপরে। পানি ছেড়ে উপরে উঠে গেছে প্রশস্ত সিঁড়ি।

ফ্ল্যাশলাইট হাতে ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করল গ্রে। বাকিরাও পিছু নিল।

'বাইরের তুলনায় এখানে বেশ গরম,' রোল্যান্ড বলল।

লিনাও ব্যাপারটা খেয়াল করেছে। সেই সাথে বাতাসে মৃদু সালফারের গন্ধ।

'ভূ-তাপীয় ব্যাপার আর কি,' বলতে বলতে তরুণ যাজকের দিকে তাকাল গ্রে 'আগেই তো বলেছিলেন, এই অঞ্চলটা অস্বাভাবিক আগ্নেয়গিরি-সংক্রান্ত বৈশিষ্ট ধারণ করে।'

'হ্যাঁ। এজন্যই এদিকের মাটি এতো উর্বর।'

'টানেলগুলো নির্মাণের জন্য এই জায়গা বেছে নেয়ার কারণও এটা,' গা ঝাড়তে ঝাড়তে বলে উঠল শেইচান। 'বাইরের ঠান্ডা থেকে বাঁচার প্রাকৃতিক সুব্যবস্থা।'

সামনের দিকে ইঙ্গিত করল লিনা। 'কী আছে ওখানে?'

'চলুন দেখা যাক,' হাঁটতে হাঁটতেই জবাব দিল গ্রে। 'সিঁড়ির ওপাশে যাই আমি।'

নিজের ফ্ল্যাশলাইটটাও জ্বেলে নিল রোল্যান্ড। প্রশস্ত একটা ল্যান্ডিং-এ এসে ফুরিয়েছে সিঁড়ির ধাপ। উপরে উঠে দাঁড়াতেই সবার চোখ ধাঁধিয়ে গেল একেবারে।

হাঁ করে আছে অর্ধবৃত্তাকার সিলিং-ওয়ালা একটা লম্বা হল। অবাক ব্যাপার হলো, বাঁকা সিলিংটা পুরোটাই সোনার তৈরি। হাড়গোড় আর মাথার খুলির প্রতিকৃতি খোদাই করা ওখানে। সময়ের সাথে সাথে আর্দ্রতা আর সালফার খাঁজগুলোর ভেতরদিকে গাঢ় একটা আবরণ ফেলেছে, তবে নিজদর্পে বহাল রয়েছে সোনার স্তর। আলো পড়ে চকচক করছে।

'অসাধারণ!' আপন মনে বলে উঠল রোল্যান্ড।

সেই সাথে ভয়ঙ্করও, মনে মনে ভাবল লিনা। স্থানীয় আদিবাসীরা যে জায়গাটাকে ভয় পায়, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

কথা না বাড়িয়ে আগে বাড়ল গ্রে। পাথর কেটে বানানো হলওয়েটা বেশ প্রশস্তই বলতে হবে।

'দেয়ালের দিকে দেখুন,' বলে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ছাদ থেকে একপাশে নামিয়ে আনল রোল্যান্ড। 'ওগুলো প্রাচীন লিপিতে বোঝাই।'

এগিয়ে গেল লিনা। একের পর এক সারিতে সুমেরীয়, মিশরীয় হায়ারোগ্লিফ, মায়ান লিপি, গ্রীক অক্ষর খোদাই করা দেয়ালে, একেবারে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত।

'সেইন্ট ইউস্টাসের চ্যাপেলেও তো এমনটাই ছিল,' রোল্যান্ড বলল।

চ্যাপেলের দেয়ালে ফাদার কার্কারের খোদাই করা লাইনগুলোর কথা মনে করল লিনা। তবে এখানকার লেখাগুলো তার চাইতেও পুরনো। সবার নিচের সারিটার দিকে ঝুঁকল প্রজননবিদ, বেশ পুরনো মনে হচ্ছে এটা। গুহার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা পাথরগুলোর গায়েও এরকম অক্ষর দেখা গেছে। নিচু হয়ে লেখাগুলোর উপর হাত বুলাল সে।

এগুলোই কী বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন অক্ষর?

সোজা হয়ে দাঁড়াল মেয়েটা। 'এগুলো সম্ভবত আদিম ভাষার বিবর্তনকে নির্দেশ করছে।'

সায় দিল রোল্যান্ড। 'হতে পারে। আর আমার মতে, এই জায়গা থেকেই চ্যাপেলের দেয়ালে লেখা খোদাই করে রাখার ধারণা পেয়েছিলেন ফাদার কার্কার। নিকোলাস স্টেনো তাকে এখানকার ব্যাপারে বিস্তারিত বলেছিলেন।'

বাকিদের মতো গ্রে-ও দেয়ালগুলোতে লেখা বিভিন্ন ভাষার অক্ষরগুলোর উপর চোখ বুলাচ্ছে। 'অবশেষে ফাদার ক্রেসপির ব্যাপারটা সমর্থন করার মতো কিছু চাক্ষুষ করতে পারলাম। এই জায়গার নির্মাতাদের সাথে যে বাইরের দুনিয়ার আরও অনেক জাতির যোগাযোগ ছিল, তা এখন নিশ্চিত।'

সামনের দিকে তাকাল লিনা। কল্পনা করার চেষ্টা করছে, আর কী আছে হলের ওপাশে। আন্দেজের গভীরে লুকানো বিশাল আকৃতির গুহার কথা জানা আছে তার মনে হচ্ছে, এই জায়গাটা আসলে সবে শুরু। স্থানীয়রাও বলেছে, ফাদার ক্রেসপির আর্টিফ্যাক্টগুলো বেশ বড় একটা এলাকা থেকে এসেছে।

হাত তুলে ইশারা করল শেইচান। 'টানেলটা ওদিকে শেষ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

সামনে এগোতেই আরও একটা প্যাঁচানো সিঁড়ি চোখে পড়ল, এটা অবশ্য মোচড় খেতে খেতে নিচের দিকে নেমেছে।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রোল্যান্ড। 'প্রার্থনা করুন, আবার যেন সাঁতার না কাটতে হয়।'

'গিয়ে দেখা যাক,' বলে ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করল গ্রে, পিছু নিল বাকিরা।

উত্তেজনায় লিনার দম আটকে আসছে যেন। দুশ্চিন্তা হচ্ছে, এই বুঝি নিচ থেকে উঁকি দেবে কালো পানির স্তর। কিন্তু না, এক ফোঁটা পানির দেখা পাওয়া গেল না কোথাও।

'এতক্ষণে পানির স্তরের নিচে পৌঁছে গেছি আমরা,' রোল্যান্ড বলল।

মাথা নেড়ে সায় দিল গ্রে। কথা সত্যি। তারপর হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল একপাশের দেয়াল। 'জায়গাটা কোনওভাবে বাইরে জমে থাকা পানি থেকে সিল করা।'

বিশালাকায় একটা ঘরে এসে থেমেছে সিঁড়ির ধাপ। জায়গাটার ছাদ আগে দেখা হলের মতোই উঁচু, আর এতটাই প্রশস্ত যে, অপর প্রান্ত পর্যন্ত বলতে গেলে পৌঁছাচ্ছে না ওদের ফ্ল্যাশলাইটের আলো।

শেইচানের চোখে তীক্ষ্ণ নজর। 'মনে হচ্ছে, ওখানে আরো একটা সিঁড়ি আছে... নিচের দিকে।'

তবে কথাটা লিনার কানে ঢোকেনি। বিস্মিত চোখে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে সে। রোল্যান্ডের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

দেয়ালে শত শত কুলুঙ্গি খোদাই করা। ছোট থেকে বড়- নানা আকারের, নানা জাতের জীবজন্তুর প্রতিকৃতি সংরক্ষিত আছে ওখানে।

'ক্রোয়েশিয়ার গুহার মতোই অনেকটা,' রোল্যান্ড বলল।

মাথা নেড়ে সায় দিল লিনা। 'শুধু আকারের দিক থেকে কিছুটা ভিন্নতা আছে।'

অদম্য কৌতূহল চেপে রাখতে পারছে না মেয়েটা, কুলুঙ্গিগুলো দেখতে দেখতে আগে বাড়ছে মন্ত্রমুগ্ধের মতো। কী নেই ওখানে? স্ফটিকের স্বচ্ছ আবরণ দেয়া গুবরে পোকা থেকে শুরু করে আধ-হাত সমান লম্বা শতপদী কীট, সবুজ পান্নার আবরণে ঢাকা কুমির থেকে দস্তার প্রলেপ দেয়া বানর, আইভরির শিং বাগিয়ে

দাঁড়িয়ে থাকা হরিণ আর বাইসন, লোহার পাতে আটকানো কাঁকড়া-বিছে... প্রাণের এক অভূতপূর্ব সমারোহ যেন।

সবার উপরের তাকগুলোতে হরেক রকম পাখি- চড়ুই, হামিংবার্ডের মতো ক্ষুদ্র থেকে শুরু করে বাজ, ঈগলের মতো বিশাল আকার পর্যন্ত। কিছু বসে আছে বাসা কিংবা গাছের ডালে, বাকিরা ডানা মেলে ঝুলছে কুলুঙ্গির মধ্যভাগে।

নিচের ধাপে সাগর আর মাটির গভীরে বাস করা জীবজন্তু- চীনামাটির তৈরি মাছ, পিঁপড়ার সারি, বিশাল আকারের চকচকে লবস্টার... আরও কত কি!

'জীবজগতের প্রাচীন এক সংগ্রহশালা এটা,' রোল্যান্ড মন্তব্য করল, চেষ্টা করেও থামাতে পারছে না কণ্ঠের কাঁপন। বলতে বলতে সোনার তৈরি একটা জলহস্তির দিকে ইঙ্গিত করল সে। প্রাণীটার চোখের জায়গায় দুষ্প্রাপ্য কালো হিরা বসানো। এমনকি এই মহাদেশের বাইরে যেগুলো বাস করত, সেগুলোও।'

'শিল্পের সংগ্রহশালাও বলা যায়,' যোগ করল লিনা। 'ভেবে দেখুন- রত্নপাথর, স্ফটিক, ধাতু ইত্যাদির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে প্রতিকৃতিগুলো। কতই না জটিল প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছে সবকিছুকে।' বলতে বলতে আগের টানেলের সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটা। 'আর লেখাগুলোর কথাও মনে রাখতে হবে। সর্বোপরি জায়গাটা হচ্ছে এক প্রাচীন জ্ঞানের আধার।'

আবার শুরু হলো সিঁড়ি বাওয়া। শেইচান যেমনটা বলেছিল, ধাপগুলো পাক খেয়ে সরাসরি নিচের দিকে নেমে গেছে। ফ্ল্যাশলাইট তাক করতেই দেখা গেল নিচে যা আছে, তার এক ঝলক।

'আরও সোনা!' বিড়বিড় করে বলল গ্রে।

কৌতূহলই যেন চালিত করছে দলটাকে। সিঁড়িটা বেশ প্রশস্ত বলতে হবে। পাশাপাশ হাঁটতে পারছে সবাই। শেষ ধাপে পৌঁছাতেই উত্তেজনায় ওদের দম আটকে গেল।

বুকে ক্রস এঁকে লিনার হাত আঁকড়ে ধরল রোল্যান্ড। 'এগুলো তো আগেও দেখেছি আমরা।'

রাত ১:৩৩

সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে ফ্ল্যাশলাইট ধরে তাকিয়ে আছে তরুণ যাজক, চোখে বিস্মিত দৃষ্টি।

এই চেম্বারের আকৃতিও উপরে দেখা গ্যালারির মতোই, তবে প্রতিটা দেয়াল সোনা দিয়ে মোড়ানো। সৌন্দর্যটা আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে জায়গায় জায়গায় লাগানো স্ফটিকের টালি।

মধ্যযুগীয় পান্ডুলিপিতে আঁকা কোনও দৃশ্যে যেন বাস্তব হয়ে ধরা দিয়েছে চোখে সামনে। তবে দেয়ালে খোদাই করা মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা ইত্যাদি আকৃতিগুলো একটু অদ্ভুত বলতে হবে।

তবে রোল্যান্ড আর লিনার কাছে দৃশ্যটা নতুন নয়।

'মনে হচ্ছে, ক্রোয়েশিয়ার গুহাচিত্রগুলোকে সোনায় মুড়িয়ে এখানকার দেয়ালে ঝুলিয়ে দিয়েছে কেউ।' লিনা মন্তব্য করল।

মাথা নেড়ে সায় দিল তরুণ যাজক, তারপর সামনে এগিয়ে যোগ দিল বাকিদের সাথে।

সিংহ, বাইসন, হরিণের ঝাঁক... কী নেই এখানে? একপাশে পেছনের দু'পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে হিংস্র গুহাবাসী ভালুক। তবে ক্রোয়েশিয়ার গুহার চাইতে এখানকার দৃশ্যপট খানিকটা ভিন্ন। প্রাণিগুলোর মাঝে মানুষের দেখাও পাওয়া যাচ্ছে।

এগিয়ে গিয়ে একটা প্রতিকৃতি স্পর্শ করল রোল্যান্ড। আকৃতিটা আকারে আঙুলের নখের চাইতে বড় হবে না। ভ্রু কুঁচকে লিনার দিকে তাকাল সে।

'সম্ভবত কার্কারের ইভের মতোই নিয়ানডারথাল সংকরদের প্রতিনিধিত্ব করছে ছবিগুলো,' জবাব দিল প্রজননবিদ। 'দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি দেখে তো মনে হচ্ছে যেন, ওরা প্রানিগুলোকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। তবে ব্যাপারটা সম্ভবত রূপক অর্থে ব্যবহৃত।'

'মানে?' এগিয়ে এল গ্রে।

'আমার ধারণা, লোকগুলো আসলে প্রাণীর রূপ ধরে থাকা জীবনের ধারাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে... ভবিষ্যতের অভিভাবক হিসেবে।'

বুঝতে পেরেছে রোল্যান্ড। 'প্রাচীন লিপিতে উল্লেখিত সেই ওয়াচারদের মতো।'

মাথা নাড়ল লিনা। 'অথবা প্লেটোর আটলান্টিসবাসীদের মতো।'

'ওদের কিন্তু আরও অনেক নামেই আখ্যায়িত করা হয়েছে,' যোগ করল যাজক। 'ইকুয়েডরের প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কিত ফাদার ক্রেসপির বক্তব্য অনুসন্ধানের সময়, উনিশ শতকের একটা সোসাইটির ব্যাপারে জানতে পারি। ওরা বিশ্বাস করত- প্রাচীন পৃথিবীতে ছোট্ট একটা দল ছিল, যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংরক্ষণে নিজেদের নিয়োজিত করে। ভবিষ্যৎ মানবজাতির জন্য পৃথিবীকে উন্নত করে তোলাই ছিল ব্রাদারহুড অফ সেইন্টস নামের সেই দলটার লক্ষ্য।' বলে লিনার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'এটা কিন্তু আপনার নিয়ানডারথাল সংকর তত্ত্বকে সমর্থন করে।'

একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ছিল শেইচান। প্রথমবারের মতো মুখ খুলল এবার। 'ওয়াচার, আটলান্টিসবাসী, সেইন্ট... যাই বলুন না কেন, ওরা যদি আসলেই

ভবিষ্যতের অভিভাবক হয়ে থাকে, তাহলে জীবনের ধারাকে ওরা কী থেকে রক্ষা করছিল, তা সহজেই অনুমেয়।'

রোল্যান্ডও ধরতে পেরেছে ব্যাপারটা। মানুষ আর জীবজন্তুর অদূরে, তুলনামূলক বড় আকারের আরও কিছু আকৃতি দেখা যাচ্ছে। ক্রোয়েশিয়ার গুহায়, স্ট্যালাগমাইটের আলোতে ছায়ার মতো দেখাচ্ছিল ওগুলো। তবে এখানে ছবিগুলো আরও বিস্তারিতভাবে আঁকা হয়েছে।

ভালোভাবে দেখার জন্য হাতের ফ্ল্যাশলাইট উঁচু করে ধরল তরুণ যাজক- রোমশ মাথা, শরীরের গঠন একটু স্থূল। এবড়োখেবড়ো ভ্রুর নিচে চোখদুটোতে যেন আগুন জ্বলছে। মুগুর আর বর্শা দিয়ে প্রানিগুলোকে আক্রমণ করছে ওরা। তবে সবচেয়ে বীভৎস দৃশ্যটা আবিষ্কার করল শেইচান- একটা বাচ্চার দুই পা আঁকড়ে ধরেছে দুই দানব, ছিঁড়ে দুই টুকরো করে ফেলছে ছোট্ট শরীরটাকে।

'এরা কারা!' গ্রে-র কণ্ঠে বিস্ময়।

'কে জানে,' ভ্রুকুটি করল রোল্যান্ড। 'হয়তো এগুলোও রূপক। জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি অবহেলাকেই দানবের রূপ দিয়েছে প্রাগৈতিহাসিক শিল্পীরা।'

মাথা নাড়ল লিনা। 'না। দানবগুলোর শারীরিক কাঠামো লক্ষ্য করুন- নিখুঁত মুখের আদল, পাকানো শরীর। দৃশ্যগুলো চোখের সামনে দেখে তারপরই আঁকা হয়েছে। এদের অস্তিত্ব ছিল পৃথিবীতে।'

গ্রে-কে আতঙ্কিত দেখাচ্ছে। 'তাহলে কারা এরা?'

'তৎকালীন মানুষেরই কোনও গোত্র হতে পারে। আমাদের তো জানাই আছে, নিয়ানডারথালদের পাশাপাশি প্রাচীন মানুষের আরও কিছু প্রকারভেদ ছিল তখন।'

'কিন্তু এত বড় আকারের?' জানতে চাইল শেইচান।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল লিনা। 'হোমো ইরেক্টাস প্রজাতির একটা অপভ্রংশ আছে, মেগানথ্রোপাস নামে ডাকা হয় ওদের, আকারে বিশাল।' বলে ছবিটার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'আমার ধারণা, নিয়ানডারথাল সংকরদের সাথে ওরকমই কোনও গোত্রের যুদ্ধের দৃশ্য এটা। লড়াইটা মস্তিষ্ক আর পেশিশক্তির, এবং সেই সাথে বুদ্ধিমত্তা আর নৃশংসতার।'

দেয়ালের দিকে এক পা এগিয়ে গেল গ্রে। 'যদি আপনার ধারণা সত্যি হয়, তাহলে এই শত্রুর প্রতি ভয়ই নিয়ানডারথাল সংকরদের একত্র করেছিল। ওরকম একটা হুমকি না থাকলে কিছুতেই একসাথে জড়ো হত না প্রাচীন শিক্ষকরা।'

মাথা নেড়ে সায় দিল লিনা। 'হ্যাঁ। সম্ভবত এ কারণেই নিজেদের একটা স্থায়ী বাসস্থানের প্রয়োজন অনুভব করেছিল তারা, যেখানে শান্তিতে জ্ঞান অর্জন আর তা সংরক্ষণ করে রাখা যাবে। এবং সময়মতো মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া যাবে অল্প অল্প করে।'

চেম্বারের অন্য প্রান্তে থাকা সিঁড়ির দিকে তাকাল রোল্যান্ড। 'কিন্তু তারপর কী হলো? কোথায় গেল ওরা?'

উত্তরটা হয়তো কখনোই জানা যাবে না। আর জানতে পারলেও সম্ভবত খুব নিষ্ঠুর হবে সেই সত্যি।

পাতাল অভিমুখে যাত্রা শুরু হলো আবার।

রাত ১:৪৭

সবাইকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামছে গ্রে। পথ যেন আর ফুরাবে না বলে পণ করেছে। সে মনে মনে হিসাব করল, সব মিলিয়ে এতক্ষণে মাটি থেকে প্রায় পনেরো-বিশ তলা সমান নিচে নামা হয়ে গেছে। ব্যাপারটা এমন, চারদিকে পানি ঘিরে রাখা শুকনো একটা কুয়ার ভেতরে নামছে সবাই।

আর কতদূর?

কপাল থেকে ঘাম মুছল সিগমা কমান্ডার। নিচে নামার সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গরম, সেই সাথে সালফারের গন্ধে ভারী হয়ে আসছে বাতাস।

অবশেষে শেষ হলো সিঁড়ির ধাপ। উপর থেকে চকচকে ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যেন, নিচে কোনও ধরণের আলোর উৎস আছে। তবে নামার পর দেখা গেল, ওটা ছিল তাদের ফ্ল্যাশলাইটেরই আলোর প্রতিফলন।

'অসাধারণ!' বিড়বিড় করল রোল্যান্ড।

এই ঘরটাও আকারে উপরের চেম্বারের মতো। তবে সোনার পরিবর্তে প্রতিটা দেয়াল ঢেকে রাখা হয়েছে স্ফটিকের আবরণে, সেই সাথে জায়গায় জায়গায় মূল্যবান রঙিন পাথর। ছাদে আঁকা রয়েছে তারাভরা আকাশের প্রতিকৃতি। ভারসাম্য রাখার জন্য আছে কয়েকটা পিলার, এগুলোও স্ফটিকের, একটার সাথে আরেকটার সংযোগ দেয়া হয়েছে ধনুকাকৃতি খিলানের মাধ্যমে।

খিলানগুলোর নিচে বৃত্তাকারে সাজানো কতগুলো দরজা, কালো রঙের তৈলাক্ত পদার্থ দিয়ে সিল করা। তবে দুই প্রান্তে দুটো অবশ্য খোলাই আছে।

সামনে এগোল সবাই। দরজার ভেতর রাখা আছে ঘরের মূল আকর্ষণ।

'এটা একটা লাইব্রেরী,' বিড়বিড় করে বলল রোল্যান্ড। ঘরের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার ফ্ল্যাশলাইটের আলো। 'একশোরও বেশি বুককেস আছে এখানে, সব সোনার প্রলেপ দেয়া, বই যে কতগুলো তার তো হিসাবই নেই।' বলতে বলতে মেঝেতে স্থির হলো তার নজর। 'এখানে একটা আছে। মনে হচ্ছে, তাক থেকে নামিয়েছিল কেউ। পরে আর তোলেনি বা তোলার সময় পায়নি। সম্ভবত, জারামিলোর কাজ।'

অপর প্রান্ত থেকে ফ্ল্যাশলাইট নাড়ল লিনা। 'এদিকেও আছে সোনালি বুককেস। শুধু এই ঘরটাই না, আরও আছে এরপর।'

মেঝেতে পড়ে থাকা বইটা পরীক্ষা করল রোল্যান্ড। 'এখন বুঝতে পারছি, কেন আবার জিনিসটা তাকে তুলে রাখেনি জারামিলো। প্রায় বিশ কেজি হবে এর ওজন। প্রচ্ছদটা কালচে রঙের কোনও ধাতুর তৈরি, আর ভেতরের পৃষ্ঠাগুলো হলো তামার পাত। লেখার হরফগুলো অচেনা, তবে গুহার বাইরে পাথরে আর উপরের চেম্বারের দেয়ালের সর্বশেষ সারিতে এগুলোই দেখেছি আমি।'

'এদিকের বইগুলো,' অপর প্রান্ত থেকে লিনা বলল। 'কোনও ধরনের স্ফটিকের পাতে তৈরি, আর ভেতরে জ্যামিতিক আকৃতি ছাপা। সম্ভবত গাণিতিক সূত্রাবলি।'

বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখছিল দু'জন, গ্রে-র ডাকে সম্বিত ফিরল। 'এদিকে আসুন সবাই।'

ঘরের একেবারে মাঝে স্ফটিকের স্তম্ভ কুঁদে বের করা হয়েছে একটা বেদি। স্বচ্ছ বেদিটার উপরে সোনার তৈরি একটা মানবকঙ্কাল রাখা, হাড়গুলো নিখুঁতভাবে জোড়া লেগে আছে একে অন্যের সাথে। কঙ্কালটার হাতে ধরা সোনালি একটা দন্ড।

'এটা কী?' জিজ্ঞেস করল সিগমা কমান্ডার।

'এটা ফাদার কার্কারের চ্যাপেলে দেখা সেই ইভের পাঁজর, ওখানে অবশ্য জিনিসটা হাড়ের তৈরি ছিল।' জিনিসটার উপর নাচছে রোল্যান্ডের ফ্ল্যাশলাইটের আলো। 'বুক অফ রিভিলেশনের ২১ নম্বর অধ্যায়ের ১৫ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে- "আমার সাথে কথা বলা দেবদূতের হাতে একটা সোনার তৈরি মাপদন্ড ছিল... ওটা দিয়ে পুরো শহর, প্রবেশপথ আর দেয়ালের মাপ নির্ণয় করা হত।" এটাই কি সেই মাপকাঠি নাকি?'

কেউ উত্তর দিল না।

তবে লিনার মাথায় হামলা করেছে অন্য কোনও চিন্তা। 'আজব তো!'

'মানে?' খুলির আকার দেখে গ্রে বুঝতে পারছে, এটা একটা নিয়ানডারথাল সংকর।

মাথা নাড়ল প্রজননবিদ। 'প্রতিকৃতিটার শারীরিক গঠন বেশ চমৎকার। তবে একটা খুঁত আছে।'

'কী?'

'মেরুদন্ডের গোড়ার দিকটা দেখুন,' বলে সেদিকে আলো ফেলল লিনা। 'একদিক থেকে বোঝা যাচ্ছে কঙ্কালটা মহিলার। তবে অন্যদিকে প্রকাশিত হচ্ছে পুরুষ বৈশিষ্ট্য।'

ভ্রূকুটি করল গ্রে। অদ্ভুত তো ব্যাপারটা!

বেদির উপরে কোমর সমান উঁচু কলামের দিকে ইঙ্গিত করল শেইচান। 'এর মানে কী?'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সিগমা কমান্ডার। কলামের উপরিতলে একটা কোনার মতো অংশ খোদাই করা। ছোট ছোট বল দিয়ে একটা চিহ্ন তৈরি করা আছে ওখানে। আকৃতিটা অবশ্য ওরা আগেই কয়েকবার দেখেছে।
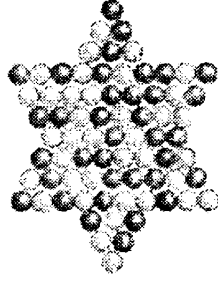
'ইভের কবরে দেখা সেই চিহ্নটার মতো,' মন্তব্য করল লিনা। 'তবে হাতের ছাপের বদলে ধাতু আর মার্বেলের তৈরি ৭৩টা বল ব্যবহার করা হয়েছে শুধু।'

'এগুলো এখানে কী করছে?' জিজ্ঞেস করল রোল্যান্ড।

'কে জানে!' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল লিনা। 'তবে অবস্থানটা কোনও গুরুত্ব বহন করছে।'

একই ভঙ্গি করল শেইচান। 'আর নয়তো চাইনিজ চেকার খেলছিল কেউ।'

কৌতুহলবশত খোঁড়ল থেকে ধাতুর তৈরি একটা বল হাতে তুলে নিল গ্রে, কাছ থেকে দেখতে চায়। কিন্তু সাথে সাথে যেন বিশাল একটা ঘন্টা বেজে উঠল কোথাও।

ঢং...

হঠাৎ শব্দটা শুনে জায়গায় জমে গিয়েছে সবাই।

'রেখে দিন জিনিসটা,' লিনা বলল।

সায় দিয়ে বলটা আবারও ফোকরে ঢুকিয়ে দিল গ্রে। দম আটকে অপেক্ষা করছে সবাই, কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবারও ফিরে এল ঘন্টাধ্বনি।

ঢং...

'কাজ হবে না,' হাঁটু গেড়ে বসে বেদিটা পরীক্ষা করল শেইচান। 'স্বয়ংক্রিয় কোনও একটা মেকানিজম সক্রিয় করে দিয়েছ তুমি। এখন আর পিছিয়ে আসার পথ নেই।'

গুহার চারদিকে জমে থাকা পানির কথা ভাবল গ্রে। অজান্তে কী সক্রিয় করে ফেলেছে সে? কোনও ধরনের ফাঁদ না তো?

ঢং...

বেদির একেবারে গোড়ার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল শেইচান। 'এদিকে দেখ। ফাঁক দিয়ে তামা আর সোনার তৈরি কয়েকটা সরু তার আগ-পিছ করতে দেখা যাচ্ছে। মেঝের গভীরে হারিয়ে গিয়েছে তারের অপর প্রান্ত।'

গ্রে নিজেও হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। 'কথা সত্যি। আসলেই কোনও একটা মেকানিজম চালু হয়েছে।' বলে উপরের তারার আকৃতিটার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'আর এটা বন্ধ করার উপায় সম্ভবত ওই বলগুলো।'

'কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল লিনা। 'কী মনে হয় আপনার, কোনও ধরনের পরীক্ষা এটা?'

'সম্ভবত তাই।'

'বুঝতে পেরেছি,' মাথা ঝাঁকাল প্রজননবিদ। 'বুদ্ধি অথবা জ্ঞানের পরীক্ষা, পাজলের মতো অনেকটা।'

সায় দিল গ্রে। 'এখান থেকে সামনে এগোনোর জন্য, প্রাচীন নির্মাতাদের কাছে নিজেকে যোগ্য বলে প্রমাণ করতে হবে আমাদের।'

কথাটার সত্যতা প্রমাণের জন্যই যেন আবারও বেজে উঠল ঘন্টা, এবার আরও জোরে।

'মনে হচ্ছে... মনে হচ্ছে যেন, আস্তে আস্তে শব্দটার মাঝের বিরতি কমে আসছে,' মন্তব্য করল রোল্যান্ড।

ঘরের চারদিকে চোখ বুলাল গ্রে। 'তাই হয়ে থাকলে তো...'

'...টাইমার হিসেবে কাজ করছে শব্দটা' বাক্যটা শেষ করল তরুণ যাজক।

সবগুলো চোখের নজর সেঁটে আছে তার দিকে। বড় করে একটা নিঃশ্বাস টানল সিগমা কমান্ডার। জানে, সমস্যাটার সমাধান তাকেই করতে হবে। কথা না বাড়িয়ে তারার প্রতিকৃতির দিকে নজর দিল সে, একটু আগে চাইনিজ চেকার সম্পর্কে শেইচানের বলা কথাটা ভাবছে।

কিন্তু এই খেলার নিয়ম কী?

আবারও ধাতব বলটা হাতে তুলে নিল গ্রে, ওজনটা পরখ করে দেখছে। তারপর ফিরল রোল্যান্ডের দিকে। 'আপনি তো বলেছিলেন, লাইব্রেরীর বইগুলোর প্রচ্ছদ কালো রঙের কোনও ধাতুতে তৈরি। ওই জিনিসই নাকি এটা?'

কাছ থেকে বলটা দেখে মাথা নাড়ল যাজক। 'সেরকমই মনে হচ্ছে।'

এবার স্ফটিকের তৈরি আরেকটা বল তুলে নিল গ্রে, বাড়িয়ে ধরল লিনার দিকে। 'আর এগুলো লাইব্রেরীর অন্য অংশের বইগুলোর মতো?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল প্রজননবিদ। 'কিন্তু এতে কী প্রমাণ হয়?'

দুই হাতে দুটো বল উঁচু করে ধরল গ্রে। 'একটা অনুপাত আছে এখানে। জিনিসদুটো একে অন্যের বিপরীত... স্বচ্ছ আর অস্বচ্ছ... স্ফটিক আর ধাতু।' বলে কঙ্কালটার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'পুরুষ এবং মহিলা।'

বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার। ধরি ধরি করেও পুরোপুরি ধরতে পারছে না কিছু একটা। গ্রে জানে, তাকে সিগমায় নিয়োগ দেয়ার একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে- বিপরীতধর্মী জিনিসের মাঝে মিল বা অমিলগুলো সহজেই বুঝতে পারার অসাধারণ ক্ষমতা।

হয়তো সময়ের সাথে সাথে হারিয়ে গেছে ক্ষমতাটা।

'বিপরীত...' বিড়বিড় করে বলল সিগমা কমান্ডার।

ধাতু আর স্ফটিক...

স্বচ্ছ আর অস্বচ্ছ...

ভারী আর হালকা...

পুরুষ আর মহিলা...

খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে বলে মনে হচ্ছে। আরও একটা ধাতব বল তুলে আগেরটার কাছেকাছি আনতেই দেখা গেল, পরস্পর আকর্ষণ করছে জিনিসদুটো।

'এগুলো চুম্বকীয়!' বলে উঠল গ্রে, কণ্ঠে বিস্ময়।

তবে স্ফটিকের বলগুলো তা নয়...

আরও একটা পার্থক্য।

চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগল সিগমা কমান্ডার।

করণীয় কাজটা কী...

এমন সময় আবারও বেজে উঠল ঘণ্টাধ্বনি। ঢং...

গত দু'দিন ধরে দেখা সবগুলো দৃশ্য যেন একের পর এক চোখে ভাসছে।

তারপরই পাওয়া গেল উত্তর।

চোখ খুলে বেদিতে রাখা কঙ্কালটার দিকে তাকাল গ্রে। একই সাথে পুরুষ এবং মহিলা ওটা, একই মুদ্রার দুটো পিঠ।

'এরা একে অপরের প্রতিবিম্ব,' বলতে বলতে অন্যদের দিকে ফিরল সে। 'সম্ভবত বুঝতে পেরেছি, কী করতে হবে।'

আতঙ্কিত দেখাচ্ছে শেইচানকে, বাকি দু'জনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য 'যা করার, সাবধানে কোরো।'

আবারও বেজে উঠল অদৃশ্য ঘন্টা, এবার আরও জোরে, আরও দ্রুত।

দম আটকে বেদির দিকে এগোল গ্রে।

সিদ্ধান্তটা ভুল হয়নি তো?

জানার উপায় একটাই...

রাত ১:৫৮

'ওরা কোথায়?' ছেলেটার মুখের উপর ঝুঁকে আছে ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট শু ওয়েই, সরাসরি মাথায় তাক করে রেখেছে পিস্তল।

বুড়ো আদিবাসী লোকটার সাথেও একই কাজ করেছে সার্জেন্ট কোয়ান। পিস্তল ধরে নদীর পাড়ে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে তাকে।

টার্গেটের ট্র্যাক অনুসরণ করতে বলতে গেলে কোনও সমস্যাই হয়নি। ভেজা মাটিতে সহজেই বোঝা গেছে পায়ের ছাপ।

নদীর ধারে এসে ফুরিয়েছে ছাপগুলো। সেখানেই পাওয়া যায় এই দুই আদিবাসীকে। তবে এখনও পাখি গান গায়নি। ওয়েই ইতিমধ্যে বুঝে গেছে, বুড়ো লোকটা ইংরেজি বলতে পারে না। তাই কিশোর ছেলেটার উপর স্থির হয়েছে তার নজর।

কাঁদছে ছেলেটা, চোখে ভয়ের ছাপ। বুটের খাপ থেকে একটা ছুরি বের করে তার গালে চেপে ধরল ওয়েই। 'নিষ্ঠুর হতে বাধ্য করো না আমাকে।'

হড়বড় করে কিছু একটা বলল বুড়ো, গলায় কর্তৃত্বের সুর। সাথে সাথে উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব দিল ছেলেটা। পরমুহূর্তে চুপ হয়ে গেল আবার বুড়োর ধমক খেয়ে।

কয়েকবার চোখ পিটপিট করার পর নদীর অপর পাড়ের দিকে ইঙ্গিত করল ছেলেটা। 'ওরা ওখানে, নিষিদ্ধ জায়গায়।'

তবে ইশারাকৃত জায়গায় খাড়া পাহাড় ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না ওয়েই। 'কোনও চাল না তো এটা?'

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ছেলেটার মুখ দিয়ে। 'পাহাড়ের নিচে একটা গুহা আছে।'

ভালো করে তাকাতে, পানির স্তরের নিচে একটা খোলা মুখের মতো অংশ দেখতে পেল ওয়েই। 'ওটার ভেতর ঢুকেছে?'

মাথা নেড়ে সায় দিল ছেলেটা।

হাত তুলে তাকে পানির দিকে টানল ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট। 'চলো, তুমি আমাদের পথ দেখাবে।'

হাত ঝাড়া দিয়ে মুক্ত হলো সে। 'বিপজ্জনক...'

'চলো, নইলে এই ছুরি দিয়ে জ্যান্ত বুড়ো লোকটার চামড়া ছাড়াব আমি।'

কথাটা শুনে আঁতকে উঠেছে ছেলেটা।

এবার গলা আরেকটু নরম করল ওয়েই। ‘তোমাদের কারও ক্ষতি করার উদ্দেশ্য নেই আমার। জায়গাটা দেখিয়ে দাও, সাথে সাথে ছেড়ে দেয়া হবে দু'জনকে। কিন্তু কথা না শুনলেই বিপদ ঘনিয়ে আসবে।’

বড় করে নিঃশ্বাস নিল ছেলেটা। ‘ঠিক আছে। নিয়ে যাব আপনাদের।’

কোয়ানের দিকে ফিরল ওয়েই। ‘ঝু-কে বুড়োর সাথে পাহারায় রাখো,’ বলে নদীর দিকে ফিরল আবার। ‘আমরা গিয়ে গর্ত থেকে ইঁদুরগুলোকে বের করছি।’

মাথা নেড়ে সায় দিল সার্জেন্ট।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ফার্স্ট লেফটেন্যান্টের মুখ দিয়ে। মেজর জেনারেল লাও বলে দিয়েছেন- কাউকে ছাড়ার আগে তার কাছ থেকে সব জেনে নিতে।

সেভাবেই এগোতে হবে কাজটা।

অধ্যায় তেইশ
১ মে, দুপুর ১২:২২
বেইজিং, চীন

কথামতোই কাজ করেছে চ্যাং সান।

প্রায়ান্ধকার হলওয়ে ধরে এগোচ্ছে মঙ্কদের ট্রাক। সিলিং থেকে জ্বলছে টিমটিমে ইমারজেন্সি বাতি।

চাইনিজরা তাদের বন্দীদের কোথায় রেখেছে জানার পর, চ্যাং-কে ফ্যাসিলিটির পাওয়ার বন্ধ করে দিতে বলে মঙ্ক। এতে অন্ধকারে তাদের চলাফেরা সুবিধা হবে। সেই সাথে, যাত্রাপথে যেন কোনও বাধা না আসে সেই ব্যবস্থাও নিতে বলা হয় লেফটেন্যান্ট কর্নেলকে।

তারপরও, লোকটাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি মঙ্ক। ট্রাকের প্যাসেঞ্জার সিটে বসে সামনের দিকে কড়া নজর রাখছে সে। বেড়ে থাকা শ ভাই আর কং-এর দায়িত্বে বাকি তিনটা দিক।

'প্রায় পৌঁছে গেছি,' কিম্বারলি বলল। স্যাটেলাইট ফোন হাতে শিনকে পথ দেখাচ্ছে সে। পর্দায় ভেসে আছে ফ্যাসিলিটির সম্পূর্ণ মানচিত্র।

মাথে নেড়ে সায় দিল সার্জেন্ট শিন, তারপর এগিয়ে আসা বাঁকটা ঘুরে সর্বশক্তিতে চেপে ধরল গ্যাস পেডাল। তীক্ষ্ম মোচড় খেয়ে আরও সরু হয়েছে টানেলটা।

'সামনের র‍্যাম্প ধরে নামলেই নিচের লেভেলে পৌঁছে যাব, ওখানেই রাখা হয়েছে ড. ক্রেন্ডাল আর বাকোকে,' সবাইকে জানিয়ে দিল কিম্বারলি। 'তবে কোয়ালস্কিকে রাখা হয়েছে আর্ক নামক একটা চেম্বারে, ওটা এখনও খানিকটা দূরে।'

সামনের দিকে ইঙ্গিত করল মঙ্ক। 'আগে মারিয়াকে তুলে নিই, তারপর কোয়ালস্কি।'

ট্রাকের গতি আরও বাড়াল শিন, অনুভব করতে পারছে মঙ্কের দুশ্চিন্তা।

আশা করি, সময়মতো পৌঁছাতে পারব...

সামনের দিক থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এল, বদ্ধ জায়গায় কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে একেবারে। মাকড়শার জালের মতো চৌচির হয়ে গেছে উইন্ডশিল্ডের

কাঁচ। নিজে নিচু হওয়ার পাশাপাশি কিম্বারলিকেও কাঁধ ধরে টেনে নিল মঙ্ক। গতি কমিয়ে আনছে শিন, তবে এখন কাজটা ঠিক হবে না।

'গতি বাড়াও!' গর্জে উঠল সিগমা এজেন্ট। 'থামা যাবে না।'

ট্রাকের বেড থেকে পাল্টা গুলি ছুঁড়ল কেউ একজন। নিচু হয়ে থাকা অবস্থাতেই জানালা দিয়ে পিস্তলধরা হাত বের করে দিল মঙ্ক, অন্ধের মতো ট্রিগার টিপল কয়েকবার। লক্ষ্যে আঘাত না করলেও শত্রুকে ঘাবড়ে দেবে পাল্টা গুলির আওয়াজ। এখনও বুঝতে পারছে না, এটা কি চ্যাং-এরই কোনও ফাঁদ নাকি কাকতালীয়ভাবেই কোনও সার্চ পার্টির সামনে পড়ে গেছে ওরা।

যেটাই ঘটে থাকুক না কেন, একটা ব্যাপার নিশ্চিত।

লড়তে হবে এখন।

বন্ধুদের উদ্ধার করার আগে বাঁচতে হবে নিজেদের।

দুপুর ১২:২৪

ল্যাবের দরজার হ্যান্ডেল ধরে প্রাণপণে টানছে কোয়ালস্কি। তবে স্টিলের ভারী পাল্লাগুলো যেন নড়বে না বলে পণ করেছে। পরমুহূর্তে পেছন দিক থেকে কাচ আর ধাতু ভাঙার বিকট আওয়াজ শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে।

জানালার ফ্রেমের কোনা আঁকড়ে রেখেছে একটা লোমশ কালো হাত, চেষ্টা করছে ফোকরটা আরও বড় করার। অ্যালুমিনিয়ামের ফ্রেমে জোর একটা টানের সাথে পেছনদিকে হেলে পড়ল গরিলাটা, উল্টে পড়ে যাচ্ছে আবার আর্কের ভেতর। কিন্তু কাজের কাজ হয়ে গেছে, নিজের সাথে জানালার বেশ অনেকটা অংশ ছিঁড়ে নিয়েছে ওটা। এবার বাকিরা সহজেই উঠে আসতে পারবে উপরে।

দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে আছে মারিয়া, এক হাতে আঁকড়ে রেখেছে বাকোর হাত। সার্জিক্যাল টিমের সদস্যরাও আছে ওপাশে।

আবারও নড়ে উঠল পানির হোসপাইপ। অর্থাৎ, আরেকটা গরিলা ঝুলতে ঝুলতে উঠে আসছে।

নিরাপত্তার খোঁজে চারদিকে চোখ বুলাল কোয়ালস্কি। ল্যাবের একপাশে কয়েকটা খাঁচা আছে বটে, তবে হিংস্র প্রানিগুলোর থাবার সামনে এক সেকেন্ডও টিকতে পারবে না ওগুলো।

জানালা দিয়ে একটা গর্জন ভেসে এল।

শিউরে উঠল মারিয়া।

'এখানেই থাকুন,' বলে সামনের দিকে দৌড় শুরু করল কোয়ালস্কি। গন্তব্য সরাসরি জানালার দিকে। মাঝখানে অপারেশন টেবিলের সামনে একবার থেমে,

হাতে তুলে নিল ইলেকট্রনিক হাড় কাটা করাতটা। সুইচ টিপতেই কর্কশ শব্দে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে ধারালো ব্লেড।

কোনওদিকে না তাকিয়ে সোজা পাইপ বরাবর করাত চালাল সিগমা এজেন্ট। পাঁচ লাগলে না লাগতেই আলাদা হয়ে গেল রাবার আর ক্যানভাসের তৈরি পানির পাইপ। ঝুলতে থাকা জন্তুগুলোকে নিয়ে খসে পড়ল আর্কে।

এক সেকেন্ড পর, জানালার ওপাশে ধুপ শব্দের সাথে সাথে কয়েকটা কণ্ঠের চিৎকার শুনে হাসি ফিরে এল কোয়ালস্কির মুখে। তবে ভালো করেই জানে, বিপদ কাটেনি। এবরোখেবড়ো দেয়াল বেয়ে সহজেই আবার উঠে আসতে পারবে প্রাণীগুলো।

অপেক্ষা করতে হলো না। কয়েক মুহূর্ত পরই আবার একটা লোমশ হাত আঁকড়ে ধরল জানালার কোনা। এবারের হাতের উল্টোপিঠের লোমগুলো সাদা রঙের।

সংকরদের দলনেতা!

ধুশ শালা...

দুপুর ১২:২৮

আতঙ্কে মারিয়ার দম আটকে আসছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সামনের দৃশ্যটা দেখল সে-ইলেকট্রিক করাতটা উঠিয়ে জানালা আঁকড়ে ধরা হাতের উল্টোপিঠে বসিয়ে দিচ্ছে কোয়ালস্কি।

গর্জে উঠল দানবটা। সাথে সাথে ঝটকা মেরে জানালার ফ্রেম থেকে সরিয়ে নিয়েছে রক্তাক্ত হাত, তবে তার আগে অন্য হাত বাড়িয়ে অবলম্বন রক্ষা করতে ভোলেনি। এবার হাতের সাথে সাথে মাথাটাও উঁকি দিল ফোকর দিয়ে। দেখা গেল-নিচে থাকতে যতটা মনে হয়েছিল, চেহারাটা তার চাইতেও বিশাল আর ভয়ঙ্কর।

আহত হাতটা দিয়ে কিছু ধরতে পারবে না দানব। তবে মুগুর হিসেবে ব্যবহার করতে তো মানা নেই। সেটাই করল জন্তুটা, বুকে বেদম ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে পিঠ দিয়ে উল্টে পড়ল কোয়ালস্কি। তবে হাত থেকে করাতটা ছাড়েনি এখনও, অন্ধের মতো বাতাসে দোলাল ওটা।

বন্ধুর দুরবস্থা দেখে সামলে বাড়ল বাকো, মারিয়াও পিছু নিল।

কোয়ালস্কির কলার ধরে টেনে নিরাপদ দূরত্বে টেনে আনার প্রয়াস পেল বাকো। ততক্ষণে জানালায় শরীরের উপরের অংশ আটকে ফেলেছে দানব, অক্ষত হাতে আঁকড়ে ধরল সিগমা এজেন্টের এক পা। টেনে নিতে চাইছে নিজের সাম্রাজ্যে।

আবারও করাত চালাল কোয়ালস্কি। তবে থেমে গেছে মোটরের গুঞ্জন। উল্টে পড়ার সময় ব্যাটারি প্যাকটাই আলাদা হয়ে গেছে যে!

মেঝে থেকে জিনিসটা তুলে নিয়ে, চেঁচিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল মারিয়া 'কোয়ালস্কি... ব্যাটারি খুলে গেছে!'

বুঝতে পেরেছে সিগমা এজেন্ট। তবে তার পক্ষে গরিলার হাত এড়িয়ে মেয়েটার কাছে আসা সম্ভব নয়, তাই করাতটাই ওর দিকে গড়িয়ে দিল। পুরোটা সময় কোয়ালস্কির হাত ধরে টেনে তাকে দানবের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করছে বাকো।

করাত তুলে নিয়ে ব্যাটারি প্যাকটা জায়গামতো বসিয়ে নিল মারিয়া, তারপর সুইচ অন করে ব্লেডটা ঠেসে ধরল সাদা লোমওয়ালা গরিলাটার হাতে।

ফরফর আওয়াজ তুলে মাংস কেটে হাড়ে ঘষা খাচ্ছে ইলেকট্রনিক ব্লেড। কাতরে উঠে হাত ঝটকা মারল দানব। নাড়া খেয়ে মারিয়ার থেকে ছুটে গেল করাতটা গড়িয়ে চলে গেল একটা খাঁচার নিচে।

মুক্তি পেয়ে উঠে দাঁড়াল কোয়ালস্কি, এক হাতে জড়িয়ে ধরেছে বাকোকে। পায়ে পায়ে পিছিয়ে আসতে লাগল দরজার দিকে। মারিয়াও পিছু নিল।

জানালার ফাঁক দিয়ে অর্ধেক শরীর গলিয়ে দিয়েছে হিংস্র গরিলা। ওই অবস্থাতেই মুখ হাঁ করে চেঁচাচ্ছে নিদারুণ আক্রোশে। ঠোঁটের আবরণ ছাড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে হলদেটে শ্বদন্ত। চেষ্টা করছে শরীর মুচড়ে ল্যাবে ঢুকে যেতে।

এমন সময় হঠাৎ নড়ে উঠল ভারী স্টিলের দরজা। ট্র্যাকের উপর ভর করে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

মারিয়াকে দরজার দিকে ঠেলে দিল কোয়ালস্কি। 'যান!'

সায় দিয়ে সামনে বাড়ল প্রজননবিদ। তবে তার আগেই নড়ে উঠেছে সার্জিক্যাল স্টাফরা। প্রতিযোগিতায় নেমেছে যেন, কে কার আগে দরজার কাছে পৌঁছাবে হঠাৎ গুলির শব্দ শুনে চমকে উঠল সবাই।

মুখে হাত চেপে টলতে টলতে পিছিয়ে আসতে শুরু করেছে ড. হান, চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টি। আঙুলের ফাঁক গলে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসছে রক্তের স্রোত এক মুহূর্ত পর মুখ থুবড়ে পড়ল মেঝেতে।

ঝড়ের বেগে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল চাইনিজ সৈন্যদের একটা ঝাঁক। সবার পেছনে মেজর জেনারেল জিয়াইং লাও, সাথে ড. আরনডও আছেন। জাঁদরেল মহিলার হাতে ধরা পিস্তল থেকে ধোঁয়া উড়ছে। অর্থাৎ ড. হানকে গুলিটা তিনিই করেছেন।

পুরোপুরি ল্যাবের ভেতর ঢুকে গেছে সাদা পশমওয়ালা দানব, রক্ত ঝরছে দুই হাতের ক্ষত থেকে। পেছনে আরও কয়েকটা গরিলাকে জানালায় উঁকি মারতে দেখা গেল।

চিৎকার করে সৈন্যদের গুলি ছোঁড়ার আদেশ দিলেন জিয়াইং। সাথে সাথে অস্ত্রের গার চেপে ধরেছে কয়েকজন। বাকিরা হাত ধরে টেনে মারিয়া আর সার্জিক্যাল মের সদস্যদের সরিয়ে নিয়ে এল বাইরে।

বাকোকে নিয়ে তাদের পিছু নিল কোয়ালস্কি।

গুলি চলছে সমানে, সেই সাথে পাল্লা দিয়ে চলছে গরিলাদের আর্তনাদ। মারিয়া ঝতে পারল, সৈন্যদের সাথে সবগুলো প্রাণীকে আটকানোর মতো যথেষ্ট গালাবারুদ নেই। জিয়াইংও ব্যাপারটা ধরতে পেরেছেন। তাই বেরিয়ে আসা ন্যদের আরেকটা নির্দেশ দিলেন তিনি। বন্ধ করে দেয়া হলো ল্যাবের দরজা। য়েকজন হতভাগা সৈনিক ভেতরেই রয়ে গেল।

আদেশ পালন হয়েছে লক্ষ্য করে, হল ধরে হাঁটতে শুরু করলেন মেজর জনারেল। গন্তব্য- খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মিলিটারি জীপ। তাড়াতাড়ি করো।'

হাত ধরে মারিয়াকে একপাশে টেনে নিলেন ড. আরনড। 'এখানে আপনার সাথে বোঝাপড়া করতে আসার পথে আমাকে তুলে এনেছে লাও।'

'বোঝাপড়া?'

কোয়ালস্কির দিকে ইঙ্গিত করলেন ফ্রেঞ্চ জীবাশ্মবিদ। 'লোকটাকে মুক্ত করার ন্য আপনি যা যা করেছেন, সবই লাও দেখেছে।'

গাড়ির কাছে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়ালেন মেজর জেনারেল, হাতের পিস্তল কোয়ালস্কির কে তাক করা। 'ড. ক্রেন্ডাল, আপনার গরিলাটাকে নিয়ে জীপে উঠুন।'

আঁতকে উঠল মারিয়া।

'যা বলছে করুন,' সতর্ক করলেন আরনড।

বাকোকে তার দিকে এগিয়ে দিল কোয়ালস্কি। 'নিয়ে যান ওকে।'

জবাবে মারিয়া কিছু বলার আগেই, উল্টোদিক থেকে কিছু একটা আছড়ে পড়ায় কেঁপে উঠল ল্যাবের দরজা। চাপ সহ্য করতে না পেরে খানিকটা বেঁকে গেছে পরের ট্র্যাক।

বুমম...

'যান বলছি,' জোর করল কোয়ালস্কি।

কেউ বলে না দিলেও দু'জনেই পরবর্তী ঘটনা আন্দাজ করতে পেরেছে। সিগমা জেন্টকে গুলি করতে চলেছে মেজর জেনারেল জিয়াইং লাও।

'যান,' আবারও বলল কোয়ালস্কি, এবার শান্ত স্বরে।

কনুই ধরে মেয়েটাকে সাহস দেয়ার প্রয়াস পেলেন ফ্রেঞ্চ জীবাশ্মবিদ।

মারিয়া বুঝতে পারছে, জিয়াইং-এর কথামতো না চললে তার ফল বাকো আর আরনডকে ভোগ করতে হবে। তাই বড় করে একটা দম নিয়ে আগে বাড়ল সে।

সৈন্যরা এগিয়ে এলেও পেছনে রয়ে গেছেন জিয়াইং।

সরাসরি মারিয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে কোয়ালস্কি। পেছনে আবারও কেঁপে উঠল দরজার পাল্লা, এবার আরও জোরে। বেশ অনেকটা বেঁকে গেছে স্টিলের ট্র্যাক। আর বেশিক্ষণ জন্তুগুলোকে আটকে রাখতে পারবে না ওটা।

পিস্তল উঁচু করলেন জিয়াইং। ট্রিগারে আস্তে আস্তে চেপে বসছে আঙুল, এমন সময় আবারও...

বুম...

এবার শব্দটা এসেছে মারিয়ার পেছনদিক থেকে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে।

পার্ক করে রাখা জীপে ধাক্কা মেরেছে একটা মিলিটারি ট্রাক, নতুন আসা বাহনটার বেড়ে অস্ত্র বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন চাইনিজ সৈন্য। তবে সবাইকে অবাক করে দিয়ে মারিয়াকে ঘিরে রাখা সৈন্যদের দিকে গুলি শুরু করল তারা।

বাকোকে নিয়ে মেঝেতে বসে পড়ল মারিয়া।

গুলি খেয়ে সৈন্যরাও একে একে লুটিয়ে পড়ছে। এমনকি জিয়াইং-এর কাঁধে আঘাত হেনেছে একটা বুলেট। কাতরে উঠে মেঝেতে উল্টে পড়লেন তিনি, তবে ওই অবস্থাতেও অন্য হাতে টিপে দিয়েছেন পিস্তলের ট্রিগার। লক্ষ্য অবশ্য হামলাকারীদের কেউ নয়।

আকস্মিক ধাক্কায় বড় হয়ে পিংপং বলের আকার ধারণ করেছে ড. আরনডের চোখদুটো। গলার ফুটো দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে আসছে রক্তের ধারা। শেষ মুহূর্তে কিছু একটা বলতে চাইলেন ভদ্রলোক, কিন্তু মুখ দিয়ে রক্তের লালচে ফেনা ছাড়া আর কিছু বেরোল না।

লোকটার মাথা নিজের কোলে তুলে নিল মারিয়া।

আরও কয়েক সেকেন্ড ঝাঁকি খেতে খেতে অবশেষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ফ্রেঞ্চ জীবাশ্মবিদ।

না...

হাত ধরে টেনে মারিয়াকে সরিয়ে নিল কোয়ালস্কি।

ট্রাক থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল। 'তাড়াতাড়ি... হাতে সময় খুব কম!'

প্যাসেঞ্জার সিটের জানালা দিয়ে মাথা বের করে রেখেছে কণ্ঠটার মালিক। লোকটাকে চিনতে মারিয়ার এক মুহূর্ত সময় লাগল। শেষবার প্রাইমেট সেন্টারে দেখেছিল চেহারাটা।

কোয়ালস্কির বন্ধু... মঙ্ক!

বিস্ময়ের রেশ কাটতে না কাটতে আবারও শোনা গেল গুলির আওয়াজ, এবার হলের উল্টোদিক থেকে।

আরও সৈন্য আসছে।

ট্রাক পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই ল্যাবের দরজায় আবারও বাড়ির শব্দ, এবার আরও জোরে। ঘাড় ঘোরাতেই দেখা গেল, কজা থেকে খুলে এসেছে একটা পাল্লা। কালো কয়েকটা অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে ভেতরদিকে।

মেয়েটার হাত ধরে টানল কোয়ালস্কি। 'তাড়াতাড়ি! পালাতে হবে!'

কয়েক পা দৌড়ে ট্রাকের পেছনের বেডে উঠে পড়ল সবাই। সাথে সাথে পেছাতে শুরু করল বাহনটা, গতি বাড়িয়ে উঠে পড়ল একটা র‍্যাম্পে। একেবারে শেষমাথায় উঠে ঘুরিয়ে নিল মুখ। উপরের লেভেলে উঠে পৌঁছে গেছে। এবার সরাসরি এগোল সামনের দিকে।

পেছনে দুর্বল হয়ে আসছে গুলির আওয়াজ।

ট্রাকের বেডে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে মারিয়া, বাকো আর কোয়ালস্কিও সাথেই আছে।

আবারও একসাথে হয়েছে পরিবারটা... কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই শান্তি বজায় থাকবে কতক্ষণ?

দুপুর ১২:৩৪

জীপে উঠে বাম হাতে স্টিয়ারিং হুইল আঁকড়ে ধরলেন জিয়াইং। ডান কাঁধ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে একটা বুলেট, রক্ত ঝরে ভিজিয়ে দিচ্ছে ইউনিফর্ম। বিন্দুমাত্র জোর পাওয়া যাচ্ছে না ওই হাতে।

তারপরও জীবিত তো আছি, ভাবলেন তিনি।

আমেরিকানদের ট্রাকটা চলে যাবার পর, মনোবলের প্রতিটা বিন্দু কাজে লাগিয়ে ভাঙাচোরা জীপটাতে চড়ে বসেন মেজর জেনারেল। চাবির মোচড়ে ইঞ্জিন চালু করার পর দেখা যায়, সংঘর্ষে বাহনটার তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি। মুখ সোজা করে নিয়ে গিয়ার দিয়ে এক্সেলারেটর চেপে ধরলেন তিনি।

ল্যাবের দরজা খুলে হলে বেরিয়ে আসছে দানবের দল। গতি বাড়াতে লাগলেন জিয়াইং, পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়ার আগে প্রাথমিক চিকিৎসা নিতে হবে। আর এজন্য কোথায় যেতে হবে, তা খুব ভালো করেই জানা আছে তার।

সিকিউরিটি সেন্টারের দরজাটা খোলাই আছে। ব্রেক কষে গাড়ি থামালেন জিয়াইং, প্রতি মুহূর্তে রক্তক্ষরণ দুর্বল করে দিচ্ছে তাকে। শেষ কয়েকটা পা ফেলার সময় মনে হলো যেন, অনন্তকাল ধরে হাঁটছেন, তারপরও দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারছেন না।

অন্ধকার ঘরটার একেবারে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে লেফটেন্যান্ট কর্নেল চ্যাং সান। মেঝেতে লুটাচ্ছে টেকনিশিয়ানদের নিষ্প্রাণ দেহ। দেয়ালে আটকানো

মনিটরের কাচে প্রতিফলিত হচ্ছে ইমারজেন্সি লাইটের লালচে আলো। ব্যথা আ এই আলো-আঁধারি, সব মিলিয়ে জায়গাটাকে নরকের মতো দেখাল জিয়াইং-এ চোখে।

'এই তো চলে এসেছেন আপনি,' ঘুরে দাঁড়াল চ্যাং, হাতে পিস্তল ধরা। 'আমি তো ভাবছিলাম, আপনাকে খুঁজে বের করে শিকার করতে হবে।

অস্ত্রের খোঁজে নিজের হোলস্টারের দিকে তাকালেন জিয়াইং, তবে ওটা খালি তাড়াহুড়ো করে পালানো সময় ল্যাবের বাইরেই ফেলে এলেছেন পিস্তলটা।

তবে পরমুহূর্তেই লক্ষ্য করলেন, চ্যাং-এর পিস্তলের স্লাইড খোলা। গুলি শেষ টেকনিশিয়ানদের মারতেই সবগুলো বুলেট খরচ করে ফেলেছে লোকটা। খালি পিস্তল হাতেই এক পা এগিয়ে এল সে।

সম্ভাব্য পরিণতি আঁচ করতে পারছেন জিয়াইং। তবে পেছালেন না তিনি, মরতে হলেও সম্মানের সাথে মরবেন। পিছিয়ে গিয়ে আত্মসম্মানে চিড় ধরানোর মানুষ তিনি না।

শরীরের আড়াল থেকে অন্য হাতটা বের করে আনল চ্যাং, লম্বা একটা ছুরি ধরে রেখেছে। তারপর ধারালো অস্ত্রটা সরাসরি ঢুকিয়ে দিল মেজর জেনারেলের পেটে। তীব্র একটা ব্যথার ধাক্কা অনুভব করলেন জিয়াইং। আস্তে আস্তে ফলাটা টেনে আরও উপরে উঠিয়ে আনছে লেফটেন্যান্ট কর্নেল, ফুটো করে ফেলতে চাইছে তার হৃৎপিণ্ড। যন্ত্রণাকর কয়েকটা সেকেন্ড পর অবশেষে গন্তব্য খুঁজে পেল ধারালো ফলা।

তীক্ষ্ম এক মোচড়ে জাঁদরেল মহিলার হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুস দুটোই ফুটো করে দিল চ্যাং। তারপর টেনে বের করে আনল ছুরিটা। কুৎসিত জিঘাংসায় বিকৃত করে রেখেছে চোখ-মুখ, যেন কতকালের ইচ্ছাপূরণ হলো তার।

খাবি খেতে খেতে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন মেজর জেনারেল। প্রতিটা নিঃশ্বাসের সাথে সাথে আগুন জ্বলছে বুকের ভেতর।

জিয়াইং-এর ইউনিফর্মে ছুরিটা মুছে নিল চ্যাং, তারপর স্লাইড টেনে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনল অন্য হাতে ধরা পিস্তল। মহিলার কাঁপতে থাকা ডানহাতের আঙুলের ফাঁকে অস্ত্রটা ঢুকিয়ে দিল সে। এবার যে কেউ দেখলেই ভাববে, টেকনিশিয়ানদের খুন করার কাজটা মেজর জেনারেলের। এখানকার কর্মচারীদের খুন করে, আমেরিকান লোকগুলোকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন তিনি। ইতিহাসের পাতায় বিশ্বাসঘাতক হিসেবে লেখা থাকবে তার নাম।

এগিয়ে গিয়ে কন্ট্রোল প্যানেল থেকে নির্দিষ্ট কয়েকটা লিভার টানল চ্যাং। সাথে সাথে পাওয়ার ফিরে এল পুরো ফ্যাসিলিটিতে।

জিয়াইং বুঝতে পারছেন না, লোকটা কী করতে চাইছে।

তার মনের কথা বুঝতে পেরেই সম্ভবত ঘুরে দাঁড়াল চ্যাং। 'সেনাবাহিনী জড়ো করা হচ্ছে। আমেরিকানদের প্রয়োজন শেষ। এখন আপনার সাথে একই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়া হবে সবাইকে। ওদের মৃত্যুর সাথে সাথে জাতীয় বীর হিসেবে সমাদৃত হব আমি। হয়তো পরবর্তীতে আমাকে খুন করার জন্য হামলা চালাবে আমেরিকানরা, তবে তাতে কিছু আসে যায় না।'

কথাগুলো শুনে মহিলার মুখে ফুটে ওঠা বিস্ময়টুকু পুরোমাত্রায় অনুভব করছে চ্যাং।

'সাহায্য না করলে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে নাটক সাজানোর হুমকি দিয়েছিল শুয়োরের বাচ্চারা। সেই সাথে এটাও বলেছিল, আপনার বিরুদ্ধে গেলে আমার জন্য অপেক্ষা করছে সীমাহীন সম্মান। তবে ওদের এই প্রস্তাবটাকে নিজের স্বার্থেই ব্যবহার করেছি আমি। অর্জন করতে চলেছি এমন এক মর্যাদা, যেটা যুগের পর যুগ পেরিয়ে গেলেও অমলিন হবে না। আমার পর আমার সন্তান, তাদের সন্তানরাও উপভোগ করবে সেই সম্মান।'

উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোকটাকে কতটুকু ছোট করে দেখেছিলেন, ভেবে আফসোস হলো জিয়াইং-এর। তবে এখন সেই ভুল শুধরানোর সুযোগ আর নেই।

মাথা থেকে চিন্তাটা ঠেলে সরিয়ে দিলেন মেজর জেনারেল। চ্যাং যা বলল, সেটাই সত্যি হবে যদি না...যদি না, নিজেই হাল ছেড়ে দেন তিনি। আর জিয়াইং-এর অভিধানে হাল ছাড়া বলতে কোনও শব্দ নেই।

নিজের শেষ কয়েকটা নিঃশ্বাস ব্যয় করে পকেটে একটা হাত ঢোকালেন মেজর জেনারেল। মোবাইলের পেছনে একটা লুকানো চেম্বার আছে। বোতাম টিপে চেম্বারটা খুললে পাওয়া যাবে ফিংগারপ্রিন্ট সেন্সর। একে একে দশটা সেকেন্ড সেই সেন্সরে বুড়ো আঙুল চেপে রাখলেন জিয়াইং। দশ সেকেন্ডের এই ব্যাপারটা রাখা হয়েছিল যাতে, দুর্ঘটনাবশত কোনও কারণে আঙুল ছোঁয়ালেই ফ্যাসিলিটির ভেতর লুকানো বোমাগুলো সক্রিয় না হয়।

অন্ধকার হয়ে আসছে পৃথিবী। কাঁধ-বুক আঁকড়ে ধরেছে সীমাহীন ব্যথা। তবে শেষমুহূর্তে একটা বিপ আওয়াজ যেন জিয়াইং-এর কানে মধু ঢেলে দিল।

মুখে মৃদু হাসি নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন মেজর জেনারেল জিয়াইং লাও।

দুপুর ১২:৪৫

হলওয়েতে আলো ফিরে আসতেই আঁতকে উঠল মঙ্ক।

এমন তো হওয়ার কথা ছিল না!

অর্থাৎ, সাহায্য করার সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলেছে লেফটেন্যান্ট কর্নেল চ্যাং সান
অবশ্য মঙ্ক আগেই ব্যাপারটা মাথায় রেখেছিল। তাই কিম্বারলিকে বিকল্প একটা
পালানোর পথ বের করে রাখতে বলেছিল সে। যেদিক দিয়ে ঢুকেছে, সেই লোডি
বে-তে এখন অবশ্যই নিজের সৈন্য পাঠাবে বিশ্বাসঘাতক চ্যাং।

সামনের দিকে ইঙ্গিত করল কিম্বারলি। 'হলের অপর প্রান্তে একটা এলিভেট
থাকার কথা, ওটা দিয়ে চিড়িয়াখানার ভেতর অবস্থিত একটা পুরনো প্রাসাদে বে
হওয়া যায়। ভবনটা উনিশ শতকে তৈরি, নাম- শ্যাংগুয়ানলাও।'

'ঠিকই বলেছেন আপনি,' সায় দিল মারিয়া। 'ওই ভবনে মেজর জেনারেল লাও
এর একটা ব্যক্তিগত অফিস আছে।'

মঙ্কের দিকে ফিরল কিম্বারলি। 'এতক্ষণে সম্ভবত খালি করে ফেলা হয়েছে পুরো
চিড়িয়াখানা। তবে উপরে যাওয়ার পর সতর্ক...'

বিকট বিস্ফোরণের শব্দে চাপা পড়ে গেল বাকি কথাটুকু।

ট্রাকটা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টায় হিমশিম খাচ্ছে সার্জেন্ট শিন। সামনে রাখ
বায়োহ্যাজার্ড চিহ্ন দেয়া কয়েকটা ড্রামে আগুন ধরে গেছে, ধোঁয়ায় অন্ধকার পুরো
হল। সাথে সাথে নিভে গেছে আলো, আবারও অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে ফ্যাসিলিটি।

ট্রাকের হেডলাইট জ্বালিয়ে দিল শিন। ধোঁয়ার রেখা পেরিয়ে দেখা যাচ্ছে, হলে
অপর প্রান্তে ছাদ ধ্বসে পড়েছে। পেছন থেকেও শোনা যাচ্ছে গুড়গুড় আওয়াজ।

'এসব কী!' বিড়বিড় করল মঙ্ক।

হয়াতশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিম্বারলি। 'ফ্যাসিলিটি ধ্বংস করে দিতে চাচে
কেউ।'

'কে? চ্যাং?'

ভ্রুকুটি করল ডিআইএ এজেন্ট। 'কি জানি!'

ট্রাকের পেছন থেকে মুখ খুলল কোয়ালস্কি। 'যার যা খুশি করুক, আমরা বেরিয়ে
যেতে পারলেই হলো।'

স্যাটেলাইট ফোন উঁচু করল কিম্বারলি। 'চেষ্টা করে দেখি, কিন্তু...'

'কিন্তু কী?'

'বিকল্প পথে যেতে হলে সেই ল্যাবটা পার হতে হবে, ওখানে তো এখন
গিজগিজ করছে হিংস্র গরিলা।'

সিটে হেলান দিয়ে বসল মঙ্ক। 'বাহ! কিন্তু এছাড়া তো আর কোনও উপায়ও
নেই।'

সায় দিয়ে শিনকে রাস্তা বাতলে দিল কিম্বারলি।

ধোঁয়া আর ধ্বংসস্তূপ পেরিয়ে যেদিক দিয়ে এসেছিল, সেদিকেই এগিয়ে চলেছে ট্রাক। স্যাটেলাইট ফোন হাতে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছে কিম্বারলি, তবে প্রায়ই শাখা টানেল ব্যবহার করতে হচ্ছে ওকে। ছাদ ধ্বসে বন্ধ হয়ে গেছে প্রধান অনেক পথ।

ঘর ছেড়ে হলওয়েতে বেরিয়ে আসছে মানুষজন... বেশিরভাগের পরনে ল্যাব কোট। মাঝে অবশ্য একবার কিছু সৈন্যও চোখে পড়ল, তবে হর্ণ বাজিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিল শিন।

একটা শাখা টানেলে দেখা গেল- ধ্বসে পড়েছে উপরের ছাদ, ভেতরে ঢুকছে মধ্যদুপুরের উজ্জ্বল সূর্যের আলো। থামতে ইঙ্গিত করল মঙ্ক। তবে ছিদ্রটা বেশ সরু, বেয়ে ওঠার পক্ষে জায়গাটাও উপযুক্ত না।

একটা বাঁকের সামনে আসতেই চোখে পড়ল, দৌড়ে পালাচ্ছে কালচে কয়েকটা অবয়ব।

'নেকড়ে নাকি?' মঙ্কের গলায় বিস্ময়।

উপরদিকে ইশারা করল কিম্বারলি। 'চিড়িয়াখানা হয়তো খালি করে ফেলা হয়েছে, তবে জন্তুগুলো তো খাঁচাতেই আছে।'

মঙ্ক বুঝতে পারল, উপরের ছাদ ভেঙে পড়ে প্রানিগুলোকে টানেলে ঢোকার জায়গা করে দিচ্ছে। সামনে এগোতে এগোতে এরকম আরও কিছু নমুনা চোখে পড়ল। এক জায়গায় তো দেখা গেল, ল্যাবকোট পরা এক টেকনিশিয়ানকে তাড়া করেছে একজোড়া সিংহ।

গতি বাড়াচ্ছে শিন।

'পরের র‍্যাম্প বেয়ে ওঠ,' ইঙ্গিত করল কিম্বারলি।

সায় দিয়ে দক্ষতার সাথে র‍্যাম্প বেয়ে গাড়িটাকে নিচের লেভেলে নামিয়ে আনল সার্জেন্ট। এখানকার অবস্থা আরও খারাপ। ট্রাকের মুখ সোজা করতে করতেই কোথাও বিকট আওয়াজে গ্যাস ট্যাঙ্ক ফাটল। কেঁপে উঠল যেন পুরো টানেলটা।

'যেতে পারব তো?' মঙ্কের গলায় সন্দেহ।

'পালানোর জন্য বাকি থাকা এটাই একমাত্র পথ,' জবাব দিল কিম্বারলি।

বিস্মিত দৃষ্টিতে চারপাশে চোখ বুলাচ্ছে সিগমা এজেন্ট। জানে, আর কয়েক মুহূর্ত পর টানেলগুলো চলাচলের উপযুক্ত থাকবে না। যা করার, তাড়াতাড়ি করতে হবে।

ধ্বংসস্তূপ পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে ট্রাক। এমন সময় আবারও খুব কাছ থেকে ভেসে এল রক্ত হিম করা গর্জন।

শিউরে উঠল কোয়ালস্কি।

'ওরা আসছে!'

অধ্যায় চব্বিশ
১ মে, রাত ২:১৩
আন্দেজ পর্বতমালা, ইকুয়েডর

কলামের সামনে দাঁড়িয়ে আছে গ্রে, ভাবছে কাজটা করা ঠিক হবে কি না। ঘরময় অস্থিরভাবে পায়চারি করছে রোল্যান্ড। শেইচান আর লিনাও গ্রে-র পাশেই আছে। এমন সময় আবারও বেজে উঠল ঘণ্টাধ্বনি।

ঢং...

গত কয়েক মিনিটে আকৃতিটা মাথার ভেতর গেঁথে নিয়েছে সিগমা কমান্ডার। কার্কারের জার্নালেও চোখ বুলিয়েছে বারদুয়েক, জিনিসটা একটা ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগে করে নিয়ে এসেছিল রোল্যান্ড। গণিতশাস্ত্র এবং সংখ্যাতত্ত্ব, বিশেষ করে মৌলিক সংখ্যাগুলোর প্রতি আকর্ষণ ছিল ফাদার কার্কারের। পাজলটার সমাধানও এই সংক্রান্তই কিছু হবে।

আবারও ব্যাপারগুলো সাজিয়ে নিল গ্রে।

অন্ধকার আর আলো...

হালকা আর ভারী...

কালো আর সাদা...

ধাতু আর স্ফটিক...

সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে সে। প্রতিটা বৈশিষ্ট্য একে অপরের বিপরীত।

'ওটাই আসল ব্যাপার,' বিড়বিড় করে বলল গ্রে। 'প্রতিবিম্ব।'

'মানে?' জিজ্ঞেস করল লিনা। 'আমাদেরও খুলে বলুন। হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারব আমরা।'

ঢং... আবারও ঘণ্টাধ্বনি।

ভ্রুকুটি করল শেইচান। 'প্রতিবার এক সেকেন্ড করে কমে আসছে শব্দের ব্যবধান। আগেরবারের থেকে এবারের আওয়াজটার পার্থক্য মাত্র দশ সেকেন্ড। অর্থাৎ, আর মাত্র মিনিটখানেক সময় বাকি।'

জায়গাটার চারদিকে ঘিরে রাখা নদীটার কথা ভাবল গ্রে। পানির পুরোটা চাপ যেন তার মাথায় সরাসরি আঘাত করছে।

'বলো আমাদের,' জোর করল শেইচান। 'একা নও তুমি।'

মাথা নেড়ে সায় দিল সিগমা কমান্ডার। তারপর ইঙ্গিত করল ষড়ভূজ আকৃতির তারাটার দিকে।
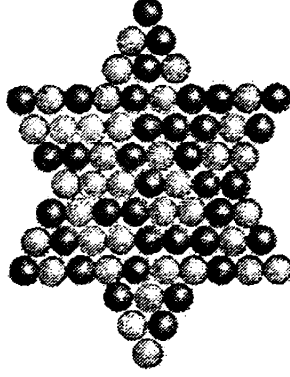
'ধাঁধাটার উত্তর লুকিয়ে আছে প্রতিবিম্বের ভেতর। আকৃতিটা দেখ, এখানে দুই ধরনের বল আছে- কালো ধাতু আর স্বচ্ছ স্ফটিক।' বলে দুইপাশের দরজার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'লাইব্রেরিগুলোর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা লক্ষ্যনীয়। একদিকে আছে ধাতুর তৈরি বই, আরেকদিকে স্ফটিকের পাতের। আরও একটা ব্যাপার হলো, স্ফটিকের বইগুলো গণিত সম্পর্কিত। আর ফাদার কার্কারের মৌলিক সংখ্যার প্রতি আসক্তি তো জানাই আছে আমাদের।'

বোর্ডের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল রোল্যান্ড। 'পাজলেও ৭৩টা বল আছে। মৌলিক সংখ্যা এটা।'

'আর আমরা জানি- এর বিপরীত মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে ৩৭, যেটার তাৎপর্য আমাদের ডিএনএ থেকে শুরু করে চাঁদের আবর্তন পর্যন্ত বিস্তৃত।'

মুখ খুলল শেইচান। 'তবে এই পাজলের সাথে ৩৭-এর কী সম্পর্ক?'

'কারণ হচ্ছে-' বেদিতে রাখা কঙ্কালের দিকে ইঙ্গিত করল গ্রে। '-এই কাঠামোতেও একটা প্রতিবিম্ব লুকানো আছে- অর্ধেক পুরুষ, অর্ধেক মহিলা। ধাঁধার সমাধানও এটাই।'

আবারও বেজে উঠল ঘন্টা, এবার আরও জোরে।

সময় ফুরিয়ে আসছে...

লিনা আর রোল্যান্ডকে উদ্বিগ্ন দেখালেও নির্ভরতার দৃষ্টিতে গ্রে-র দিকে তাকিয়ে আছে শেইচান। প্রেমিকের সিদ্ধান্তের উপর পূর্ণ আস্থা আছে তার।

আবারও মুখ খুলল সিগমা কমান্ডার। 'ক্রোয়েশিয়ার গুহায়, ইভার কবরও তো ৭৩টা হাতের ছাপের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছিল।'

সায় দিল লিনা। 'আর সেই নিয়ানডারথাল সংকর পুরুষ... অ্যাডাম, তার কবরে হাপের সংখ্যা ছিল ৩৭টা।'

হাত তুলে কলামের দিকে ইশারা করল গ্রে। 'ইভের সেই তারার আকৃতিটা তো এখানে পরিষ্কার,' বলে বাকিদের দিকে তাকাল সে। 'কিন্তু অ্যাডামের সেই ৩৭ ছাপের ছোট তারাটা কোথায়?'

উত্তরটা নিজেই দিল। 'এখানেই আছে, শুধু প্রকাশের অপেক্ষা। অপেক্ষা প্রতিরূপ হিসেবে আবির্ভাবের।'

আবারও ঘন্টার আওয়াজে কেঁপে উঠল গোটা ঘর।

'দেখাও, গ্রে!' চেঁচিয়ে বলল শেইচান। 'এখনই সময়।'

কাজ শুরু করল সিগমা কমান্ডার, যথাস্থানে নিয়ে আসতে লাগল ধাতু আর স্ফটিকের তৈরি বলগুলো। আস্তে আস্তে বোঝা যাচ্ছে তারাটার আসল আকৃতি।

লিনার কণ্ঠে বিস্ময়। 'তারা দুটো... দুটোই আছে এখানে!'

বিদ্যুতের বেগে চলছে গ্রে-র হাত। কাজ শেষ হওয়ার আগেই আবারোও বেজে উঠল ঘন্টা, তবে এবার আর থামেনি। এক নাগাড়ে বেজেই চলেছে। সময় শেষ।

দম আটকে শেষ বলটা জায়গামতো বসিয়ে দিল গ্রে। সাথে সাথে থেমে গেল ঘণ্টাধ্বনি।

'তুমি পেরেছ!' লিনার কণ্ঠে উচ্ছ্বাস।

চূড়ান্ত কাঠামোটার দিকে তাকিয়ে আছে সবাই।
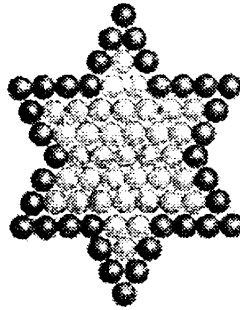
৩৭টা স্ফটিকের বলকে তারার আকারে সাজিয়েছে গ্রে, বাইরের দিকে আরেকট স্তর গঠন করেছে ধাতব বলগুলো। অর্থাৎ, অ্যাডামের তারাকে ঘিরে আছে ইভে তারা।

'একটার ভেতর আরেকটা,' বলে উঠল রোল্যান্ড। 'নারীর ভেতর পুরুষ... আমা মনে হয় শুধু প্রতিবিম্ব না, বরং অনাগত জীবনেরও অর্থ বহন করছে চিহ্নটা।'

আকৃতিটা সম্পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে বেদির তলায় কোনও ধরনের মেকানিজ সচল হয়েছে। আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে দুটো স্ফটিকের প্লেট, খুলে দিচ্ছে নতু

একটা প্যাসেজের মুখ। ফাঁকটা বড় হতেই দেখা গেল, একটা সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে।

ঘটনার আকস্মিকতায় থমকে গেল সবাই।

তবে চমক এখানেই শেষ নয়। সিঁড়ির নিচ থেকে ঘড়ির মতো টিক-টিক আওয়াজও শোনা যাচ্ছে।

নীরবতা ভঙ্গ করল শেইচান। 'আশা করি এই আওয়াজটাও কোনও ধরনের কাউন্টডাউন নয়।'

কথা না বাড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল গ্রে, বাকিরাও পিছু নিল। হারানো শহরের এই অবস্থানে এসে, পুরোটা না দেখে ফিরে যেতে রাজি নয় কেউ।

পথ যেন ফুরাবে না বলে পণ করেছে। গ্রে-র মনে হতে লাগল যেন, অনন্তকাল ধরে নেমে চলেছে তারা। তবে নিচে নামার সাথে সাথে অদ্ভুত একটা ঘটনা লক্ষ্য করল সবাই- বাতাসে যেন এক ধরনের তেজস্ক্রিয়তা ভেসে বেড়াচ্ছে। বিনা কারণে রি-রি করে উঠছে গা, দাঁড়িয়ে যাচ্ছে শরীরের পশম।

অবশেষে ফুরিয়ে এল সিঁড়ি। শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে গ্রে দেখতে পেল, তাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল একটা চেম্বার।

দৃশ্যটা দেখে আঁতকে উঠল বাকিরাও।

'হে ঈশ্বর!'

রাত ২:২১

থেমে গেছে ঘণ্টাধ্বনি।

হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত মন্দিরগুলোতে এরকম ঘণ্টার আওয়াজ শুনেছে ওয়েই। যাই হোক, শব্দের ব্যাপারটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট। আসন্ন শিকারের দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে এখন। তবে শিকারটা একতরফা হবে বলেই মনে হচ্ছে তার। আর হবেই বা না কেন? চার শত্রুর বিপক্ষে তারা নয়জন। আর সেই সাথে অতর্কিত হামলার সুবিধা তো থাকছেই।

জয় সম্পর্কে নিশ্চিত থাকা সত্ত্বেও, নিজের লোকদের যথাসম্ভব নিঃশব্দে পথ চলতে আদেশ করেছে সে, সেই সাথে প্রয়োজন না হলে আলোও জ্বালছে না। নাইট ভিশন গগলস থাকার পরও, এরকম জায়গায় অল্প হলেও আলোর দরকার আছে।

একটু আগে, নানা ধরনের জীবজন্তুর প্রতিকৃতি রাখা একটা চেম্বার পেরিয়ে এসেছে তারা। ওয়েই-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সোনার তৈরি একটা চিতাবাঘ। মুর্তিটার চোখের জায়গায় আবার সবুজ পান্না বসানো। কাজ হাসিল করে ফেরার সময় এখানে একটু দাঁড়াতে হবে, ভাবল সে।

কোয়ানের মতো ট্রফি নিয়ে বাড়ি ফেরার অধিকার তারও আছে।

ঘাড় ঘুরিয়ে লোকটার দিকে তাকাল ওয়েই। আদিবাসী ছেলেটার কাঁধ আঁকড়ে ধরে রেখেছে সার্জেন্ট কোয়ান, মহামূল্যবান নিদর্শনগুলোর দিকে একবার ফিরে পর্যন্ত তাকায়নি। সে নিজের শিকারের কাছ থেকে পাওয়া জিনিসেই খুশি।

ঘণ্টার আওয়াজটা বেশ উপভোগ করছিল সবাই। এখন শব্দ বন্ধ হতেই যেন একটা ছন্দপতন হয়েছে। আবারও সিঁড়ির দিকে হাঁটা শুরু করার ইঙ্গিত দিল ওয়েই। শব্দ থাক বা না থাক, তাতে তার কিছু যায় আসে না।

এমন সময় হঠাৎ নড়ে উঠল আদিবাসী ছেলেটা, ঝটকা মেরে কোয়ানের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড় শুরু করল সিঁড়ি ধরে। সাথে সাথে পিস্তল বের করল সার্জেন্ট। তবে ছেলেটা ততক্ষণে হাওয়া হয়ে গিয়েছে।

একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলেও তা প্রকাশ করল না ওয়েই। জানে, নিজের ব্যর্থতা মেনে নেয়ার লোক কোয়ান নয়। অন্য কোনওভাবে ঠিকই এটা পুষিয়ে দেবে সে। তাছাড়া, ছেলেটা পালানোতে এমন কোনও মহাভারত অশুদ্ধ হয়নি। বড়জোর শত্রুরা সতর্ক হতে যাবে, আর কিছু না। চারটা লোককে এই অন্ধকার গুহায় নিকেষ করার মতো যথেষ্ট গোলাবারুদ তাদের হাতে আছে।

'চলতে থাকো,' আদেশ করল ওয়েই। 'তবে সাবধানে।'

সতর্ক হয়ে গেছে শত্রুরা। এই অবস্থায় খানিকটা সতর্ক থাকা জরুরি।

যে কোনও মুহূর্তে শুরু হবে শিকারের অন্তিম পর্ব।

রাত ২:২৩

অবাক চোখে সামনের দৃশ্যটা দেখছে রোল্যান্ড। মনে হচ্ছে যেন, খোদ ঈশ্বরের হাতে তৈরি একটা ঘড়ি এটা।

গুহার মতো জায়গাটার দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে টিক-টিক আওয়াজ। ধনুকাকৃতি ছাদ উঁচু হতে হতে পৌঁছে গেছে অনেক উপরে, নিঃসন্দেহে গুহার একেবারে উপরের স্তর পর্যন্ত হবে। মেঝেও সিঁড়ির বেশ নিচে অবস্থিত। দুটো তলই নিরেট সোনার।

আর এই দুই তলের মাঝে ঘুর্ণিপাক খাচ্ছে বাতাসের একটা গোলক।

বদ্ধ জায়গাটাতে কোনও ধরনের তেজস্ক্রিয়তা জমে আছে। নিজের চামড়ায়, চুলে সেই তেজস্ক্রিয়তার ঝাঁজ অনুভব করতে পারছে রোল্যান্ড। থেকে থেকে গোলকের ভেতর ছুটে বেড়াচ্ছে নীলচে বিদ্যুৎতরঙ্গ।

তবে ঘরটার মূল আকর্ষণ একেবারে মাঝখানে। নীলচে স্ফুলিঙ্গগুলোর ভেতর আরেকটা গোলক ঝুলছে, আকারে গোটা ঘরের প্রায় এক চতুর্থাংশ পরিমাণ হবে।

দুই ধরনের পদার্থে তৈরি গোলকটার একপাশ কালো রঙের, সম্ভবত লাইব্রেরীতে দেখা বইয়ের প্রচ্ছদে যেই ধাতু ব্যবহার করা হয়েছিল, ওগুলো। অন্য দিকটা অর্ধস্বচ্ছ স্ফটিকের, উল্টোদিকের লাইব্রেরীর বইতে যেমনটা দেখা গিয়েছিল। চেম্বারের দেয়ালের মতো গোলকটার তল কিন্তু মসৃণ নয়, এবড়োখেবড়ো জমিনে ফুটে আছে গিরিখাদ, ছোট ছোট পাহাড় ইত্যাদি।

'এটা তো চাঁদের প্রতিকৃতি!' মন্তব্য করল লিনা।

মনে মনে সায় দিল রোল্যান্ড, নড়তে সাহস পাচ্ছে না। যেন চোখের সামনে যা দেখছে সবই মায়া, একটু নড়লেই উধাও হয়ে যাবে।

সিঁড়ির সামনেই দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে একটা তাকের মতো অংশ, গোটা চেম্বারটাকেই প্রদক্ষিণ করেছে গোল হয়ে। সেখান থেকে নিচে নেমে গেছে একের পর এক ধাপ। তবে বেয়ে নামার সাহস করল না কেউ। মনের গভীরে উপলব্ধি করতে পারছে- ওদিকে এমন কিছু আছে, যেটা দেখার জন্য এখনও তৈরি হয়নি মানুষ।

চাঁদের বিশাল প্রতিকৃতিটার দিকে নজর দিল রোল্যান্ড। জিনিসটা ঘরের একেবারে মাঝখানে, কোনও অবলম্বন ছাড়াই ঝুলে আছে। সম্ভবত কোনও ধরনের চুম্বকীয় আকর্ষণ শক্তি হবে, ভাবল সে।

তবে তাকে সবচেয়ে অবাক করছে চাঁদের গায়ে নিখুঁতভাবে খোদাই করা উঁচু-নিচু অংশগুলো- খানাখন্দ, পাহাড়, উপত্যকা, গিরিখাত ইত্যাদি। আর শুধু স্ফটিকের সাদা অংশটুকুই না, বরং কালো অংশের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু পৃথিবীর আকর্ষণ বলের কারণে মানুষ সবসময় শুধুমাত্র চাঁদের একটা অংশই দেখতে পায়, অন্য অংশটা থেকে যায় পুরোপুরি আঁধারে।

বিস্ময়ে বড় হতে হতে পিংপং বলের আকার ধারণ করেছে লিনার চোখদুটো। 'এটা কীভাবে সম্ভব? প্রাচীন নির্মাতারা চাঁদের অন্ধকার অংশে কী আছে, তা জানল কীভাবে?'

গ্রে-র চোখে আরও একটা চমকপ্রদ ব্যাপার ধরা পড়েছে। 'এটা নড়ছে... গোলকটা... আস্তে আস্তে ঘুরছে এটা!'

রোল্যান্ডের চোখেও ব্যাপারটা ধরা পড়েছে। চাঁদের প্রতিকৃতিটা শুধু অবলম্বন ছাড়া ঝুলছেই না, ঘুরছেও। সেই সাথে ঘড়ির মতো টিক-টিক আওয়াজ তো আছেই। কিছু একটা যেন মনে পড়তে পড়তেও পড়ছে না তার।

'সিক মান্ডাস পেন্ডে ইন নালো পনিট ভেস্টিজিয়া ফান্ডো,' বিড়বিড় করে বলল সে।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল লিনা, ল্যাটিন ভাষায় বলা কথাগুলো বুঝতে পারেনি।

অনুবাদ করল তরুণ যাজক। 'সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন এই পৃথিবী, কোনও অবলম্বন ছাড়া ঝুলে আছে মহাশূন্যে- এই কথাগুলো নিজের উদ্ভাবিত চুম্বকীয় একটা ঘড়ির গায়ে লিখে রেখেছিলেন ফাদার কার্কার। একটা কাচের গোলকের ভেতরটা খনিজ তেল দিয়ে পূর্ণ করেন তিনি, তাতে ডুবিয়ে রাখেন তামার একটা বল। ওই বল নিজ থেকেই ঘুরতে ঘুরতে সময় নির্দেশ করত। এভাবেই তৈরি হয়েছিল ঘড়িটা।'

'আপনার ধারণা, এখান থেকেই ওরকম ঘড়ি তৈরির ধারণা পেয়েছিলেন ফাদার?' প্রশ্ন করল লিনা।

'জানি না,' মাথা নাড়ল রোল্যান্ড। 'তবে এটা নিশ্চিত, নিকোলাস স্টেনো এই দৃশ্য দেখে ফিরে গিয়ে তার কাছে বর্ণনা করেছিলেন সবকিছু।'

সোনায় মোড়া গুহার নিচের দিকে তামার তৈরি বিশাল একটা গোলকধাঁধা, দেয়ালগুলো নিঃসন্দেহে এক মানুষ সমান উঁচু হবে। পুরোটা কাঠামো এক ধরনের কালচে তৈলাক্ত পদার্থে টইটম্বুর, একেবারে দেয়ালের উপরের মাথা পর্যন্ত।

'কার্কারের জার্নালের সেই গোলকধাঁধার মতোই,' গ্রে বলল।

মাথা নেড়ে সায় দিল রোল্যান্ড। 'ইতিহাস আর বিশ্বকে এক সুতোয় বেঁধে রাখা একটা প্রতীক। তবে এখানকার গোলকধাঁধাটা আকারে আরও বড়, আরও জটিল, আরও বিস্তারিত।' বলতে বলতে পকেট থেকে জার্নালটা বের করল সে, মিলিয়ে দেখতে চায়।
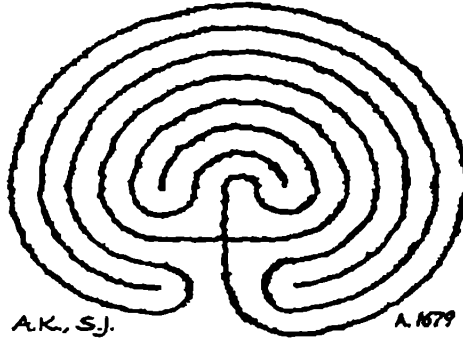
উজ্জ্বল হয়ে আসা লিনার মুখের দিকে তাকাল রোল্যান্ড, কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে স্পর্শ করল মেয়েটার হাত। 'আপনি ঠিকই বলেছিলেন।'

রাত ২:২৬

ক্রোয়েশিয়ার গুহায় পাওয়া, ফাদার কার্কারের নষ্ট হয়ে জার্নালের প্রচ্ছদেও এই ছবিটা ছিল। তখনই লিনা মন্তব্য করে, জিনিসটা মস্তিষ্কের লম্বচ্ছেদের মতো দেখতে।

আবারও কথাটা পুনরাবৃত্তি করল প্রজননবিদ। 'মস্তিষ্কের লম্বচ্ছেদ।'

মাথা নেড়ে সায় দিল রোল্যান্ড।

গুহার মেঝেতে দাঁড়িয়ে থাকা আকৃতিটাতে সাদৃশ্যগুলো আরও প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে। দেয়ালের বাঁকগুলো নিখুঁতভাবে প্রকাশ করছে মানব মস্তিষ্কের কর্টেক্স, সেরেব্রামসহ অন্যান্য খাঁজ-ভাঁজ।

'মস্তিষ্কের লম্বচ্ছেদই এটা,' বিড়বিড় করে বলল রোল্যান্ড। 'ডুবে আছে প্রাচীন শক্তিধারার ভেতর।'

তামার দেয়ালগুলোর উপরের তলে আঁকা লালচে রেখার দিকে নজর দিল লিনা। দেয়ালে আবদ্ধ কালচে তরল, আবার উপরে লাল রেখা... সব মিলিয়ে কোনও ব্যাটারি বলে মনে হচ্ছে জিনিসটা।

সম্ভবত তাই...

'কিন্তু এসবের মানে কী?' জানতে চাইল গ্রে। 'মানব মস্তিষ্কের একটা লম্বচ্ছেদ কীভাবে চাঁদের অবলম্বন হতে পারে?'

চাঁদের অস্বাভবিকতা নিয়ে করা রোল্যান্ডের পূর্ববর্তী মন্তব্যগুলো মনে করল লিনা। পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহের ঘনত্ব আর ওজন আজও বিজ্ঞানীদের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ। যে গোলকটার কারণে টিকে আছে জীবজগৎ, যে গোলকের অদ্ভুত ভর আর আকর্ষণ বলের কারণে নিজ অক্ষে টিকে আছে পৃথিবী, যে গোলকের আকর্ষণে জোয়ার-ভাটায় পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করছে সাগরের অসীম জলধারা... আজও শত রহস্যে মোড়া সেই চাঁদ।

লিনার চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে। জানে, গ্রে-র প্রশ্নের উত্তর সে দিতে পারবে না। তবে মনের গহীনে অনুভব করছে নিষ্ঠুর এক সত্যি।

রোল্যান্ডও সত্যিটা অনুধাবন করতে পারছে। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেল সে। 'সম্ভবত, ঈশ্বরের অত্যাশ্চর্য এক সৃষ্টিকে অনুকরণ করার মাধ্যমে গুঢ় রহস্যটা বুঝতে চেয়েছিল প্রাচীন নির্মাতারা। আর আজ তাদের সেই প্রচেষ্টার সাক্ষী হলাম আমরা।'

তবে লিনা জানে, রোল্যান্ডের ধারণা সত্যের খুব কাছাকাছি হলেও পুরোপুরি সত্যি নয়। কিংবা লোকটা মনের কথা পুরোপুরি বোঝানোর মতো ভাষা খুঁজে পাচ্ছে

না। প্রাচীন সেই নির্মাতাদের পক্ষে আর যাই হোক, চাঁদের অন্ধকার দিকের নিখুঁত প্রতিকৃতি খোদাই করা অসম্ভব।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রোল্যান্ড। 'হয়তো বা...' বলে চেম্বারের অন্যদিকে লুকানো অদৃশ্য অংশের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'হয়তো বা, এটা আমাদের সাথে যোগাযোগের জন্য অন্য কোনও প্রাচীন বুদ্ধিমান জাতির প্রচেষ্টা। আমাদের জন্য একটা বার্তা রেখে গেছেন তারা, যাতে আমরা উন্মোচন করি আমাদের ডিএনএ, চাঁদ-সূর্য আর পৃথিবীর গতিপথে লুকিয়ে থাকা সেই রহস্য।'

'কিন্তু সেই বার্তাটা কী!' জিজ্ঞেস করল লিনা।

একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চাইছে গ্রে। 'পদার্থবিদরা বরাবরই বিস্মিত হয়েছেন, কত নিখুঁতভাবে মহাবিশ্বকে প্রাণের উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে এটা ভেবে। তড়িৎচুম্বকীয় শক্তির ব্যাপারটা ধরুন... নক্ষত্রের ভেতর থেকে জীবনের সূত্রক-কার্বন নিঃসরণের জন্য একটা বিশেষ পর্যায়ের শক্তির প্রয়োজন ছিল। আসুন আণবিক শক্তির দিকে... পরমাণুকে একে অন্যের সাথে জোড়া লাগিয়ে রাখতে বিশেষ ধরনের আন্ত-আণবিক শক্তি দরকার, যা আমরা পেয়েছি। এই শক্তির মান বিন্দুমাত্র বেশি হলেই মহাবিশ্ব জুড়ে হাইড্রোজেন গ্যাস ছাড়া আর কিছু থাকত না। আর চুল পরিমাণ কম হলে থাকত না হাইড্রোজেন নামক কোনও গ্যাসের অস্তিত্ব। এখন সেই শক্তিটা একেবারে মাপমতো পাচ্ছি বলেই তৈরি হয়েছে প্রয়োজনমাফিক হাইড্রোজেন গ্যাস।'

সায় দিল লিনা। 'বুঝতে পেরেছি। এরকম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুপাতগুলো ছিল বলেই প্রাণের উৎপত্তি।' বলে গ্রে-র দিকে ফিরল সে। 'কিন্তু এই ব্যাপারটার সাথে আমরা এখানে যা দেখছি, তার মিল কোথায়?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সিগমা কমান্ডার। 'সেটা তো নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না। তবে আমার ধারণা, প্রাচীন নির্মাতারা এই মডেলটা তৈরি করেছেন এটা প্রমাণ করার জন্য যে- জীবন আসলে প্রাকৃতিক নিয়মেই সৃষ্টি। আর আমাদের কাজ হচ্ছে, নিজেদের ডিএনএ-র সাথে প্রাকৃতিক আশ্চর্যগুলোর অনুপাত অনুসন্ধান করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।'

'সেটা কী?' রোল্যান্ড জানতে চাইল।

'আমরা, অর্থাৎ মানুষরা হেলাফেলার জিনিস না। আমরা অবশ্যই বিশেষ কিছু।' বলে নিচের গোলকধাঁধার দিকে ইঙ্গিত করল সিগমা কমান্ডার। 'দেখুন, মানব মস্তিষ্ককে অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে আছে চাঁদ। এই মডেলের মানে সম্ভবত, বুদ্ধিমান প্রাণীদের ঘিরেই তৈরি হয়েছে এই মহাবিশ্ব। আমরাই প্রকৃতির সব সৃষ্টির মূল। এই চাঁদ, সূর্য, পৃথিবী সৃষ্টির আসল উপলক্ষ হচ্ছে মানুষ।'

নীরবতা নেমে এল বাকিদের ভেতর, অমোঘ সত্যিটা মাথায় ঢুকিয়ে নিচ্ছে বাই।

বেশ খানিকক্ষণ পর মুখ খুলল রোল্যান্ড। 'এজন্যই ফাদার কার্কার কথাটা তখন কাশ করেননি।'

'পৃথিবী সত্যিটা মেনে নেয়ার জন্য তৈরি ছিল না,' যোগ করল লিনা।

সম্ভবত এখনও তৈরি নয়...

নিচের গোলকধাঁধার দিকে ইঙ্গিত করল রোল্যান্ড। 'এই অভিযান থেকে ফেরার র, জীবাশ্মবিদ্যার দিকে ঝুঁকে পড়েন নিকোলাস স্টেনো।' বলে বাকিদের দিকে ফরল সে। 'আন্দাজ করতে পারেন, জীবনের শেষ বছরগুলো কীসের পেছনে ব্যয় রেছিলেন তিনি?'

সবাই নীরব।

জবাবটা সে নিজেই দিল, 'মানুষের মস্তিষ্কের পেছনে।'

এমন সময় হঠাৎ করেই যেন দ্রুত লয়ে চলতে শুরু করল টিক-টিক আওয়াজ। নার বুঝতে এক মুহূর্ত সময় লাগল, নতুন আওয়াজটা আসলে পায়ের শব্দ। পছন থেকে দৌড়ে আসছে কেউ।

ঘাড় ঘোরাতেই দেখা গেল, খাটো একটা অবয়ব ছুটে আসছে।

'জেম্বে?'

াত ২:২৮

জম্বের এভাবে ছুটে আসা দেখেই গ্রে বুঝতে পারল, কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে।

এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে ছেলেটাকে থামাল শেইচান। নইলে তাল সামলাতে না পরে উল্টে পড়ত নিচের গোলকধাঁধায়।

অবশেষে দৌড় থামিয়ে চেম্বারের চারদিকে চোখ বুলাল ছেলেটা, হাঁপাতে াপাতে দম ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে।

'তুমি এখানে কী করছ?' জিজ্ঞেস করল গ্রে।

জবাবে হাঁপাতে হাঁপাতে পেছনদিকে ইঙ্গিত করল জেম্বে। 'খারাপ লোক... পছনে... চাকিকুইকে আটকে... রেখেছে...'

আঁতকে উঠল গ্রে।

চাইনিজরা এই পর্যন্তও পৌঁছে গেছে!

একই কথা ভাবছে শেইচান। 'শালারা নিশ্চয় আমাদের অনুসরণ করেছে।'

কিন্তু কীভাবে?

আপাতত ওসব না ভাবলেও চলবে। জেম্বের দিকে ফিরল গ্রে। 'কয়জন?'

দুই হাতের সবগুলো আঙুল খাড়া করে দেখাল ছেলেটা। 'একজন রয়ে গে
চাকিকুই-এর সাথে।'

সাথে সাথে পিস্তল হাতে তুলে নিল সিগমা কমান্ডার। একই কাজ করে
শেইচানও।

দশজনের একটা সশস্ত্র দলের বিপক্ষে মাত্র দুটো পিস্তল? এ কেমন বিচার!

'এখানে থাকা যাবে না,' বলে সবাইকে নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল গ্রে
একইসাথে জেম্বেকেও টেনে আনছে। 'জায়গাটা বেশ খোলামেলা।'

'লাইব্রেরীতে লুকানো যায়,' প্রস্তাব দিল লিনা। 'একের পর এক ছড়িয়ে আ
ঘরগুলো, সম্ভবত বৃত্তাকারে সাজানো।'

মাথা নেড়ে সায় দিল রোল্যান্ড।

শেইচানেরও কথাটা পছন্দ হয়েছে। 'ওখানেই যাওয়া যাক। বাকিদের নিরাপ
রেখে আমরাও বইয়ের তাকের আড়ালে অতিথিদের সাথে লুকোচুরি খেল
পারব।'

সিঁড়ির উপরের ধাপে পৌঁছে লাইব্রেরীর দিকে ইঙ্গিত করল সিগমা কমাণ্ডার
বইগুলো সব ধাতু আর পাথরের তৈরি। আশা করা যায়, এখানে সবাই গুলির হা
থেকে নিরাপদে থাকবে। তবে সে আর শেইচান, দু'জনেই পাল্টা হামলা কর
গেলে যদি শত্রুরা উল্টোদিক দিয়ে ভেতরে ঢুকে যায়... ব্যাপারটা ঝুঁকিপূর্ণ হ
যাবে। তাই হাতের ফ্ল্যাশলাইটটা প্রেমিকার হাতে ধরিয়ে দিল সে। 'ওদের নি
যাও।'

'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'আসছি পেছনেই।'

সায় দিয়ে বাকি তিনজনকে নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গে
শেইচান।

বেদির উপর তারার চিহ্নটার দিকে এগোল গ্রে। আগেরবার নিকোলাস স্টে
ফেরার পথে নিচের চেম্বারের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তারও পারার কথা।

হাত দিয়ে একটা ধাতব বল সরিয়ে দিল সিগমা কমাণ্ডার। ভেঙে গেছে তার
আকৃতি। সাথে সাথে বন্ধ হয়ে আসতে শুরু করল সিঁড়ির উপরের প্লেট দুটো, ত
গতি বেশ ধীর।

উপর থেকে একটা ফ্ল্যাশলাইটের আলোর আভা দেখা যাচ্ছে। শত্রুরা পৌঁ
যাওয়ার আগে সিঁড়ির ফোঁকর বন্ধ না হলে বিপদ হবে। পিস্তল উঁচু করে সিঁ
দিকে দু'বার ট্রিগার চাপল গ্রে। কাজ হয়েছে, পিছিয়ে গেছে আলোর রেশ।

কয়েক সেকেন্ড পর পুরোপুরি বন্ধ হলো দরজাটা। আবারও খেলার জন্য তৈরি হয়ে গেছে পাজলের মেকানিজম। ঝুঁকে পড়ে সকেট থেকে একটা ধাতব বল খুলে নিল গ্রে। সাথে সাথে শোনা গেল আগের মতো ঘণ্টাধ্বনি।

ঢং...

নিচু হয়ে দরজার দিকে দৌড় শুরু করল সিগমা কমান্ডার। আশা করছে, কারও চোখে না পড়েই লাইব্রেরীতে ঢুকে যেতে পারবে। সিঁড়ির গোড়া থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এল।

তবে ততক্ষণে গন্তব্যে পৌঁছে গেছে গ্রে, ওকে এগিয়ে নেয়ার অপেক্ষায় ছিল শেইচান। একসাথে দৌড়ে কাছাকাছি বুককেসের পেছনে চলে গেল দু'জন। দরজা আর ওদের মাঝে আড়াল তৈরি করেছে সোনালি তাকগুলো।

'বাকিরা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল গ্রে।

'বামদিকে, দুটো ঘরের পরে। বুককেসের আড়াল নিয়ে, সাবধানে এক ঘর থেকে অন্য ঘরের দিকে এগোতে বলে দিয়েছি।'

আবার বেজে উঠল ঘন্টা। ঢং...

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে প্রেমিকের দিকে তাকাল শেইচান। 'আবারও?'

দুই আঙুলের ফাঁকে ধরা ধাতব বলটা দেখাল গ্রে। 'যে কোনও সময় টাইমারটা রিসেট করতে পারব আমি। আর অবস্থা বেগতিক হলে, এটা দেখিয়ে শত্রুদের সাথে দর কষাকষিও করা যাবে।'

সামনের ঘর থেকে ধাতব কিছু গড়িয়ে আসার আওয়াজ শোনা গেল।

এক সেকেন্ড পর দৃশ্যমান হলো কালো রঙের সিলিন্ডারের মতো দেখতে জিনিসটা।

গ্রেনেড!

আঁতকে উঠে দৌড় শুরু করল শেইচান আর গ্রে।

রাত ২:৩১

হঠাৎ বিস্ফোরণের আওয়াজটা লিনাকে একেবারে জায়গায় জমিয়ে দিল। দুই ঘর পেছনে থাকা সত্ত্বেও, এই পর্যন্ত পৌঁছে গেছে চোখ ধাঁধানো আলো।

জেম্বেকে নিয়ে একটা বুককেসের পেছনে হামাগুড়ি দিচ্ছে সে। হাতে পেনলাইট নিয়ে তাদের অনুসরণ করছে রোল্যান্ড। এমন সময় আদিবাসী ছেলেটা হাত নেড়ে প্রজনবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'মিস লিনা?'

লিনা বুঝতে পারল, ছেলেটা ভয় পাচ্ছে। এক হাত বাড়িয়ে তাকে আশস্ত করার প্রয়াস পেল সে। 'সব ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তা কর না।'

'আরেকটা কথা,' জোর দিল ছেলেটা।

'কী?'

কথাটা শোনার পর লিনার হাত আঁকড়ে ধরল রোল্যান্ড। 'উঠুন, বাকিদের সতর্ক করতে হবে।'

রাত ২:৩২

মেঝেতে শুয়ে আছে শেইচান। জিনিসটা ফ্লাশব্যাং ছিল, কোনও সাধারণ স্প্লিন্টার গ্রেনেড নয়। তারপরেও আকস্মিক চোখ ধাঁধানো আলো আর কান ফাটানো আওয়াজে শত্রুকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। দু'হাত দিয়ে কান চেপে রাখার পরও তার মনে হচ্ছে যেন, বিশাল হাতে একসাথে দুই কানের পর্দায় চাপড় মেরেছে কোনও দানব।

তবে গ্রে অতটা কাবু হয়নি, পিস্তল হাতে হামাগুড়ি দিচ্ছে সে।

পরবর্তী ঘরে পিছিয়ে এল দু'জন। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে লক্ষ্য করল, আগের ঘরে কয়েকটা ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ট্রিগার চাপল গ্রে। সাথে সাথে ভেসে এল কাতরোক্তি। জখমটা মারাত্মক না হলেও, ভয় পাইয়ে দেয়ার মতো যথেষ্ট।

জেম্মের কাছ থেকে শুনেছে, শত্রুদের কাছে নাইট ভিশন গগলস আছে। বেল্ট থেকে একটা ছোট পেনলাইট খুলে আনল শেইচান, সুইচ টিপে তাক করল সামনের দিকে। জিনিসটা ফ্লাশব্যাং-এর মতো মারাত্মক না, তবে নাইট ভিশন গগলসে এই অল্প আলোই বড়সড় ধাক্কা মারতে সক্ষম।

'বাহ,' বিড়বিড়িয়ে বুদ্ধিটার তারিফ করল গ্রে।

আলো জ্বলে উঠতেই একজোড়া চাইনিজ নজরে এল। একজনের উরুতে গুলি করল শেইচান, ভারসাম্য হারিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল লোকটা। ততক্ষণে আরেকজনের খুলি উড়িয়ে দিয়েছে গ্রে।

এই গেল একজন...

তবে গুলির আওয়াজে সতর্ক হয়ে গেছে বাকিরা, চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে সবাই। শেইচান বুঝতে পারল, এই অবস্থায় হামলা করতে যাওয়া বোকামি হবে। তাই ফিরে গিয়ে বাকিদের সাথে মিলিত হওয়ার প্রয়াস পেল সে।

কিন্তু পুরোপুরি শরীর ঘোরাবার আগেই, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল আলোর বন্যা। রাইফেলের ট্রিগার চাপতে চাপতে উপর থেকে নামছে কেউ।

এক মুহূর্ত পর নজরে এল আগন্তুক, গুলি ছোঁড়ার সাথে সাথে চেঁচাচ্ছে সমানতালে। চিৎকারে একইসাথে ব্যথা আর আক্রোশ। শেইচান লক্ষ্য করল,

লোকটার গলা ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে লম্বা তীরের ফলা। মেঝেতে উল্টে পড়ল আগন্তুক, ট্রিগার থেকে ছুটে গেছে আঙুল, মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে।

বিষাক্ত তীর...

পেছন থেকে পায়ের আওয়াজ শুনে ঘাড় ঘুড়িয়ে তাকাল সাবেক আততায়ী।

'রোল্যান্ড আর লিনা,' সতর্ক করল গ্রে। ছেলেটাও তাদের পেছনে আছে।

সবাইকে একপাশে সরে আসার ইঙ্গিত করল সিগমা কমান্ডার।

'ওরা... ওরা জেম্বের আদিবাসী গোত্র,' হাঁপাতে হাঁপাতে লিনা বলল।

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে জেম্বের দিকে তাকাল শেইচান। মাথা নেড়ে সায় দিল সে। 'চাকিকুই খারাপ লোকগুলোকে এখানে নিয়ে আসার জন্য আমাকে বলেছিলেন, একইসাথে সাহায্য চান নিজের গোত্রের কাছে। ভাষা জানা না থাকায় খারাপ লোকগুলো কথাটা বুঝতে পারেনি।'

আবারও ভেসে এল ঘণ্টাধ্বনি, এবার আরও জোরে। মাঝখানের বিরতিও আস্তে আস্তে কমে আসছে।

কমে এসেছে চাইনিজদের গুলিবর্ষণ। রাইফেলের শব্দ ছাপিয়ে লাইব্রেরীর ঘরগুলো থেকে শোনা যাচ্ছে তীর ছোঁড়ার শন-শন শব্দ। তাড়িয়ে তাড়িয়ে লোকগুলোকে শিকার করছে আদিবাসীরা।

'এখন কী করব?' জিজ্ঞেস করল রোল্যান্ড।

'লেজ গুটিয়ে ভাগব,' জবাব দিল গ্রে।

'কেন?'

'ধাতব বলটা হারিয়ে ফেলেছি আমি,' শেইচানকে খালি হাত দেখাল সিগমা কমান্ডার। 'ফ্লাশব্যাং বিস্ফোরণের সময় হাত থেকে ছুটে গেছে।'

এখন আর বল খুঁজে টাইমার রিসেট করার সময় নেই। আবারও যেন কথাটা মনে করিয়ে দিল ঘণ্টাধ্বনি।

'পালাতে হবে,' বলে জেম্বের দিকে ফিরল গ্রে। 'তুমি তোমার লোকদের খুঁজে বের করো। বেরিয়ে যেতে বলো সবাইকে।'

সায় দিল ছেলেটা।

আশ্বস্ত হয়ে বাকিদের দিকে তাকাল সিগমা কমান্ডার। 'তৈরি?'

জবাব দিল না কেউ।

তৈরি না হয়ে আর উপায় কী!

রাত ২:৩৭

চলো...'

ছুটে পাশের ঘরে বেরিয়ে এল গ্রে। পেছন পেছন অনুসরণ করছে বাকিরা। মেঝেতে সার দিয়ে পড়ে আছে চাইনিজ কমান্ডোদের লাশ।

লাইব্রেরীর গভীর থেকে এখনও দু-একটা রাইফেলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সন্দেহ নেই, আদিবাসীরা শিকারের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে ঘণ্টার আওয়াজও। এখন প্রতিটা শব্দের ব্যবধান দশ সেকেন্ডেরও কম। অর্থাৎ, হাতে আর এক মিনিটও বাকি নেই।

লাইব্রেরীর শেষ মাথায় চলে এসেছে সবাই। এমন সময় হঠাৎ সিঁড়ি ফুঁড়ে কালো একটা অবয়ব বেরিয়ে এল, হাতে উদ্যত তীর-ধনুক। আঁতকে উঠেছে গ্রে। এখন শুধু হাত থেকে তীরটা ছুটে এসে তার বুকে বেঁধার অপেক্ষা।

সাথে সাথে ঝটকা মেরে আগে বাড়ল জেম্বে। হড়বড় করে নিজেদের ভাষায় ছায়ামূর্তিকে বলল কিছু একটা। সরিয়ে নেয়া হলো বিষাক্ত তীর। কাছে আসতেই দেখা গেল, লোকটা চাকিকুই নিজেই।

দাঁড়িয়ে থাকার সময় নেই। 'দৌড়াও,' আদেশ করল গ্রে। সমানতালে পা চালাতে শুরু করেছে নিজেও। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতেই কানে ভেসে এল শেষ মুহূর্তের ঘণ্টাধ্বনি, বেজে চলেছে এক নাগাড়ে।

কয়েক সেকেন্ড পর, একযোগে কেঁপে উঠল গোটা টানেল। উল্টে পড়তে পড়তে কোনওরকমে স্ফটিকের আবরণে মোড়া চেম্বারটা পেরিয়ে এল সবাই। শেইচান ঘাড় ঘুড়িয়ে লক্ষ্য করল, আদিবাসীরাও লাইব্রেরী ছেড়ে বেরিয়ে আসছে।

সিঁড়ি বেয়ে সবাইকে নিয়ে পরবর্তী চেম্বারে পৌঁছাল গ্রে। ততক্ষণে সোনায় মোড় চেম্বারের ছাদ থেকে ভেঙে পড়তে শুরু করেছে ইয়া মোটা মোটা পাথরের ব্লক পেছন থেকে ধেয়ে আসছে প্রবল গর্জন।

পানির ধারা...

আওয়াজ শুনে গ্রে বুঝতে পারল, নিচের চেম্বারগুলো ইতিমধ্যে হারিয়ে গেছে পানির নিচে। এখন প্রবল স্রোত ধেয়ে আসছে মাঝের এই অবশিষ্ট ফাঁকটুকু পূরণ করার জন্য।

কাউকে ব্যাপারটা বাখ্যা করার দরকার হলো না। প্রাণপণে দৌড়ে চলেছে সবাই

আরও একবার ডুবে যাচ্ছে কিংবদন্তীর আটলান্টিস!

রাত ২:৩৮

'আমাদের যাওয়া উচিত,' শু ওয়েই-কে সতর্ক করল সার্জেন্ট কোয়ান।

একটা বুকশেলফের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট, ইতিমধ্যে বু পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়েছে পানির ধারা। আক্রমণকারী আদিবাসীরাও এতক্ষণে পেছাতে শুরু করেছে।

তার মনের একটা অংশ বলছে, ব্যর্থতার গ্লানি বুকে নিয়ে এখানেই ডুবে মরতে কিন্তু অন্য অংশটা জ্বলছে প্রতিশোধের আগুনে।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সামনে বাড়ল ওয়েই। তবে এক পায়ের হাঁটু মচকে যাওয়ায়, খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারছে না। এগিয়ে এসে তাকে সাহায্য করল কোয়ান, এক হাতে জড়িয়ে ধরল কোমর।

লোকটার উপর নিজের পুরো ভর ছেড়ে দিল ওয়েই। বুঝতে পারছে, এই নির্ভরতা শুধু কর্তব্যের খাতিরে আসেনি। তাছাড়া, শরীরে জমা থাকা বাকি শক্তিটুকু অন্য একটা কাজে ব্যয় করার ইচ্ছা তার।

প্রতিশোধ...

পায়ে পায়ে লাইব্রেরীর দরজার সামনে পৌঁছাল দুই চাইনিজ। পানির স্তর এখন উরু ভিজিয়ে দিচ্ছে। কোয়ান বলতে গেলে প্রায় কোলেই তুলে নিয়েছে ফার্স্ট লেফটেন্যান্টকে। তবে পথ আটকে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে একজন।

চাকিকুই!

ওয়েই বুঝতে পারল, প্রতিশোধের নেশা শুধু তার একার মনেই চেপে বসেনি।

উদ্যত তীর-ধনুক হাতে কোয়ানকেই প্রথম লক্ষ্য বানালো বুড়ো আদিবাসী। ধনুকের ছিলার তীক্ষ্ম আওয়াজের সাথে সাথে একটা তীর ছুটে এল তার পিস্তলধরা হাত বরাবর। ছুটে পানিতে গিয়ে পড়ল অস্ত্রটা। পরমুহূর্তেই আরেকটা তীর এসে চিরে দিল সার্জেন্টের গলা।

খাবি খেতে খেতে পানিভরা মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল কোয়ান। জখমী পায়ে ভারসাম্য সামলাতে না পেরে কাত হয়ে পড়ে গেল ওয়েই-ও।

কোমরসমান পানিতে সোজা হয়ে বসল মেয়েটা। ভিজে আরও ভারী হয়ে গেছে তার কমব্যাট গিয়ার। ইচ্ছা থাকলেও এগিয়ে গিয়ে লড়ার উপায় নেই।

বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আসন্ন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার প্রস্তুতি নিল ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট।

তীর ধরে রাখা হাতটা আলগা করছে বুড়ো।

শান্ত মনে চোখ দুটো বন্ধ করল ওয়েই।

বিদায় পৃথিবী...

রাত ২:৪৩

কল্পনার চোখে এলাকাটাকে পানিতে ডুবে দেখছে গ্রে।

প্রাচীন লেখা খোদাই করা হলওয়ে ধরে ছুটছে সবাই। জায়গায় জায়গায় ইতিমধ্যে ধ্বসে পড়েছে ছাদ, কয়েক স্থানে মেঝেও হারিয়ে গেছে গহীন অতলে। সেই সাথে পাল্লা দিয়ে চলছে পুরো গুহার কাঁপাকাঁপি।

হঠাৎ পিছলে যেতেই লিনাকে ধরে ফেলল সিগমা কমান্ডার। রোল্যান্ডকে একটা ফাঁকা জায়গা পেরোতে সাহায্য করার জন্য শেইচান এগিয়ে যেতেই, তার হাত সরিয়ে দিল যাজক। 'একাই পারব।'

পেছন পেছন ছুটছে আদিবাসীরা। সতর্ক নজর রাখছে, গ্রে-রা নিরাপদে এগোতে পারছে কিনা। চঞ্চল কুকুরছানার মতো ছুটতে পারলেও, জেম্বের চোখে ভয়ের আভাস টের পেল সিগমা কমান্ডার।

অবশেষে পানিতে নেমে যাওয়া সিঁড়ির সামনে পৌঁছাল সবাই। সাবধানে দেয়াল ধরে নামতে শুরু করেছে গ্রে। নিচের দিকের ধাপগুলো শ্যাওলার আবরণে পিচ্ছিল। অনুসরণ করল বাকিরা।

প্রমাদ গুনতে হলো পরমুহূর্তেই, ছাদ ভেঙে পড়তে শুরু করেছে কুমড়োর আকারের বড় বড় পাথরের চাঁই। শ্বাসরুদ্ধকর কয়েকটা সেকেন্ড পর, নিরাপদেই নিচের ধাপে নামতে পারল সবাই। এখান থেকে শুরু হয়েছে পানি।

'একসাথে থাকো সবাই,' চেঁচিয়ে উঠল গ্রে। 'দরকার পড়লে পাশেরজনকে সাহায্য করো।' বলতে বলতে লিনা আর রোল্যান্ডকে সামনে এগিয়ে দিল সে। শেইচান আর জেম্বে তাদের পেছনে।

সাঁতরে বাঁক পেরিয়ে নিচের টানেলে নেমে এল দলটা, একজনের পর আরেকজন মাথা তুলে বাতাস ভরে নিল বুকে। সামনে একেবারে ছাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে পানি। জায়গাটা পেরোতে খুব একটা সমস্যা হলো না। একে একে গুহামুখ পেরিয়ে উন্মুক্ত নদীতে বেরিয়ে এল সবাই।

জেম্বের পাশে ভেসে উঠল গ্রে। 'চাকিকুই কোথায়?'

গুহামুখের দিকে ইঙ্গিত করল ছেলেটা। 'বুড়ো হয়েছেন চাকিকুই।'

গ্রে বুঝতে পারল, বুড়ো দলনেতার জন্য দুঃখপ্রকাশ করছে সে।

তবে জেম্বের কথা এখনও শেষ হয়নি। '-সেই সাথে জ্ঞানীও। গুহা থাকা বেরোনোর আরও পথ তার জানা আছে।'

সাঁতার কাটতে কাটতে সায় দিল রোল্যান্ড। 'ফাদার ক্রেসপিকে বিভিন্ন আর্টিফ্যাক্ট এনে দেয়া আদিবাসীরাও স্বীকার করেছিল, ধন-সম্পদ ভর্তি টানেলটার আরও কিছু প্রবেশপথ আছে।'

গ্রে প্রার্থনা করল, কথাটা যেন সত্যি হয়। তাদের জীবন বাঁচিয়েছে আদিবাসী বুড়ো।

সাঁতরে তীরে এসে উঠল সবাই। তবে স্বস্তির বদলে উদ্বিগ্নতায় ছেয়ে আছে লিনার চেহারা।

কারণটা বুঝতে পারছে গ্রে- মেয়েটা জানে না, তার বোনও তার মতো নিরাপদে আছে কি না।

অধ্যায় পঁচিশ
১ মে, দুপুর ১:০৫
বেইজিং, চীন

টানেল বেয়ে ছুটে চলেছে ট্রাক। মারিয়া উপুড় হয়ে বসে আছে পেছনের বেডে। ধোঁয়ার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য নাকে চেপে রেখেছে পানিতে ভেজানো একটা রুমাল। এতে অবশ্য নিঃশ্বাস নিতে সুবিধা হচ্ছে, কিন্তু জায়গায় জায়গায় জ্বলতে থাকা আগুনের আঁচ থেকে মুক্তি নেই।

হাত বাড়িয়ে বাকোকে জরিয়ে ধরল মারিয়া। ভয়ে কাঁপছে প্রাণীটা। অবস্থা বেগতিক থেকে হাত বাড়িয়ে দিল কোয়ালস্কিও। 'ভয় পেয়ো না, ছোট্ট বন্ধু... এই তো আর অল্প কিছুক্ষণ।'

মারিয়া প্রার্থনা করল, কথাটা যেন সত্যি হয়। ধোঁয়ায় চোখ খোলা যাচ্ছে না। তবে মন্দের ভালো হচ্ছে, এই তাপ আর ধোঁয়াই সংকর গরিলাগুলোকে ছড়িয়ে পড়া আটকে রেখেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে শুনতে পাওয়া গর্জন থেকে এটা পরিস্কার, খুব কাছে চলে এসেছে প্রাণীগুলো।

ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে কিম্বারলিকে চেঁচিয়ে উঠতে শুনল প্রজননবিদ। 'ওপারের র‍্যাম্প পর্যন্ত যাওয়া যাবে না... সামনে একটা সিঁড়ি আছে। ওখানেই থামাবে। বাকি পথটুকু হাঁটতে হবে।'

বেডে থাকা তিন সৈন্যের দিকে তাকাল মারিয়া, কথাটা শুনে তারা বেশ খুশি হয়েছে বলে মনে হলো। কয়েক সেকেন্ড পর ব্রেক কষল ড্রাইভার।

'নামো,' পেছন দিকে ফিরে আদেশ দিল মঙ্ক। 'সিঁড়ির দিকে যাও।'

মারিয়াকে নামতে সাহায্য করল কোয়ালস্কি। বাকোও সাথেই আছে। নড়াচড়ার ফলে গরিলাটার মাথার কাটা জায়গা থেকে ব্যান্ডেজ সরে গেছে, মৃদু রক্তের রেখা দেখা যাচ্ছে ক্ষতের নিচে।

'বাকোকে নিয়ে আমার পেছনে থাকো,' কোয়ালস্কি বলল। ততক্ষণে সিঁড়ির দিকে এগোতে শুরু করেছে মঙ্ক, পেছনে কিম্বারলি।

ভালোভাবে জায়গাটা দেখেই মারিয়া বুঝতে পারল, ওরা ল্যাব থেকে খুব একটা দূরে নেই। পরমুহূর্তেই আঁতকে উঠল বিকট শব্দে। হলওয়ে ধরে খানিকটা সামনে ছাদ ধ্বসে পড়েছে। ফোঁকর দিয়ে দেখা গেল, আগুন জ্বলছে উপরের লেভেলে।

'ধ্বসে পড়ছে সব,' সতর্ক করল কিম্বারলি।

গতি বাড়াল সবাই।

কয়েকটা বাঁক পেরোনোর পর হঠাৎ মারিয়ার হাত ধরে টেনে থামাল বাকো, ইঙ্গিত করল একটা দরজার দিকে। প্রাণীটা কী করতে চাইছে বুঝতে পেরে আর অবহেলা করল না সে। অন্য হাতে ইতিমধ্যে হ্যান্ডেল মুচড়ে দরজাটা খুলে ফেলেছে বাকো।

'কী করছ?' জিজ্ঞেস করল কোয়ালস্কি, সেই সাথে হাত নেড়ে বাকিদের থামতে ইশারা করল।

বাকোর পেছন পেছন ঘরের ভেতর ঢুকতেই দেখা গেল, সার বেঁধে দাঁড় করানো আছে কতগুলো স্টিলের খাঁচা। তিনটা ছাড়া বাকিগুলো খালি। খাঁচা তিনটাতে শিম্পাঞ্জী আটকে রাখা, একটা বয়স্ক মাদী বাদে সবগুলো বাচ্চা। মারিয়ার দিকে ইশারা করে খাঁচার দরজা দেখাল মাদী শিম্পাঞ্জী।

'থামলে চলবে না,' কিম্বারলি সতর্ক করল।

তবে বাকোর ইচ্ছা ভিন্ন। একটা খাঁচার দিকে এগোতে এগোতে, পেছন ফিরে হাত তুলে ইশারা করল সে।

[খুলে দাও... যাব...একসাথে]

'না,' বলে নিজের আর কোয়ালস্কির দিকে ইঙ্গিত করল মারিয়া। 'আমাদের যেতে হবে।'

কিন্তু একা ফিরবে না বলে পণ করেছে বাকো। খাঁচার শিক ধরে ইশারা করল আবার।

'ধুশ শালা... যা বলছে করো,' বলে একটা খাঁচার দরজা খোলায় মন দিল কোয়ালস্কি, কণ্ঠে বিরক্তির সুর। 'ব্যাটা বন্ধুদের ছাড়া যাবে না।'

মারিয়াও হাত লাগাল। বাকিদেরকেও সাহায্য করতে অনুরোধ করল সিগমা এজেন্ট।

সবাই এগিয়ে আসায় দরজাগুলো খুলতে বেশিক্ষণ লাগল না। একটা শিম্পাঞ্জীর বাচ্চাকে কাঁধে বসিয়ে দিল কোয়ালস্কি, অপেক্ষাকৃত বড় আরেকটা বাকোর হাত আঁকড়ে ধরেছে। মাদীটার কোলে জায়গা পেল একেবারে পিচ্চিটা।

কাজ শেষ হতে, দরজার দিকে এগোনোর ইঙ্গিত করল মারিয়া। কিন্তু বাধা দিল বাইরে পাহারায় দাঁড়িয়ে থাকা গার্ড। তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে দরজাটা আটকে ফেলল সে, মুখে হাত চেপে চুপ থাকার ইশারা করল বাকিদের।

জায়গায় জমে গেল সবাই।

আবার কী?

উত্তর এলো সাথে সাথে। বিশাল কিছু একটা দৌড়ে যাচ্ছে হল ধরে, থরথর করে কাঁপছে কংক্রিটের মেঝে... সংকর গরিলাগুলোর একটা। দম আটকে অপেক্ষা করতে লাগল সবাই। পায়ের আওয়াজ পুরোপুরি মিলিয়ে যাওয়ার কয়েক সেকেন্ড পর, সাহস করে বাইরে উঁকি দিল গার্ড। 'খালি...অন্তত এখনকার মতো।'

খানিকটা দূর থেকে ভেসে এল গুলির আওয়াজ, তারপরই মরণ-চিৎকার।

হাঁটা শুরু করল সবাই। বাতাসে এখনও গরিলাটার গায়ের বোটকা গন্ধ। আরেকটা মোচড়ের পরই দেখা গেল, সামনে লম্বা হল। কয়েকটা ল্যাবের দরজা অবশ্য আছে, তবে সবগুলোতে ঝুলছে ভারী ভারী তালা। মারিয়া বুঝতে পারল, বাকো সবাইকে নিয়ে ওই ঘরে না ঢুকলে এখানেই ভবলীলা সাঙ্গ হত আজ। পালানোর কোনও পথ থাকত না।

কোয়ালস্কির মনেও একই চিন্তা। আলতো হাতে গরিলাটার কাঁধ চাপড়ে দিল সে।

দ্রুতপায়ে হলটা পেরোলো সবাই। মঙ্কের দিকে ফিরে কিম্বারলি বলল, 'আর একটা বাঁকের পরই লোডিং বে, জায়গাটা সম্ভবত চ্যাং-এর সৈন্যে গিজগিজ করছে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের সৈনিকদের ইশারা করল সিগমা এজেন্ট। রাইফেল উঠে এল সবার কাঁধে।

নিজের কাঁধে চড়ে বসা বাচ্চা শিম্পাঞ্জীটাকে মারিয়ার কোলে তুলে দিল কোয়ালস্কি, তারপর হাতে তুলে নিল মঙ্কের বাড়িয়ে দেয়া শটগান।

শেষ যুদ্ধের প্রস্তুতি...

দুপুর ১:২২

সবাইকে পথ দেখিয়ে সামনে বাড়ল মঙ্ক। ছোট একটা প্যাসেজ মিলিত হয়েছে বড় হলওয়ের সাথে। দেয়ালের পাশ ঘেঁষে এগোচ্ছে দলটা। থেমে থেমে কানে আসছে গর্জন আর বিস্ফোরণের আওয়াজ।

একটু পর নীরব হয়ে গেল চারপাশ। কিন্তু ধোঁয়ার পাশাপাশি বাতাসে ভাসছে জান্তব, বুনো একটা গন্ধ... দাঁতকপাটি লাগিয়ে দেবে যেন।

অবশেষে লোডিং বে-র কাছাকাছি পৌঁছে উঁকি দিল মঙ্ক। ডকের ভারী দরজাটা এখন অর্ধেক খোলা, যেন কারও তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যাওয়ার সাক্ষী বহন করছে। ভূগর্ভস্থ শহরের আলো দেখা যাচ্ছে ফোঁকর দিয়ে।

একটা কাগজের বাক্স সরিয়ে তাকাতেই আসল দৃশ্য চোখে পড়ল। সাথে সাথে জায়গায় জমে গেল সিগমা এজেন্ট।

হে ঈশ্বর...

ছেঁড়া-ফাড়া ইউনিফর্ম পরা মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে গোটা লোডিং বে-তে। রক্তের পুকুর জমেছে মেঝেতে, দেয়ালেও ছিটে লেগেছে কিছু কিছু। মৃতদেহের সাথেই পড়ে আছে ধোঁয়া ওঠা আগ্নেয়াস্ত্র, শরীর থেকে প্রবল আক্রোশে আলাদা করে ফেলা অস্ত্রধারী হাত।

হত্যাযজ্ঞের একেবারে মাঝখানে, পিঠ উপরে দিয়ে শুয়ে আছে কালো পশমওয়ালা একটা পাহাড়। খুলির অর্ধেক উড়ে গেছে গোলার আঘাতে, সম্ভবত রকেট প্রপেল্ড গ্রেনেড। ইতস্তত তাকাতেই দরজার সাথে একটা কালো লঞ্চার টিউব দেখতে পেল মঙ্ক।

'চ্যাং-এর সৈনিকরা,' বিড়বিড় করে বলল কিম্বারলি, কণ্ঠে বিস্ময়মাখা আতঙ্ক।

মঙ্ক প্রার্থনা করল, ছেঁড়া-ফাড়া মৃতদের মাঝে যেন লেফটেন্যান্ট কর্নেলের শরীরটাও থাকে। তবে নিশ্চিত হওয়ার আগেই একটা দৃশ্য তার মনোযোগ কাড়ল- পলায়নরত সৈনিকরা চাকাওয়ালা যা পেয়েছিল, তাই নিয়েই ভেগেছে। তবে দরজার ওপাশে একাকী দাঁড়িয়ে আছে নীল রঙের একটা ময়লা ফেলার ডাম্প-ট্রাক।

কিম্বারলির দিকে ফিরল সিগমা এজেন্ট, মেয়েটাও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। 'ট্রাকের চাবিটা দরকার।'

ঢোকার সময় শিনের পিস্তলের বাঁটের আঘাতে জ্ঞান হারায় ট্রাকের ড্রাইভার। তারপর অজ্ঞান দেহটা একসারি কাঠের বাক্সের আড়ালে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। চাবিটা তার সাথেই রয়ে গেছে। নইলে হয়তো সৈনিকরা ট্রাকটাও নিয়ে পালাত।

কিন্তু ব্যাটা কি এখনও ওখানেই আছে?

উঁকি দিতেই একজোড়া বুটপরা পা দেখতে পেল মঙ্ক। সাথে সাথে স্বস্তিমাখা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। 'চাবি নিয়ে আসছি আমি। বাকিরা ট্রাকে ওঠো।'

একযোগে দৌড় শুরু করল সবাই। রক্তে পিছলে যেতে যেতে এগোচ্ছে মঙ্ক, বাকিরা খোলা বে পেরিয়ে ছুটছে ট্রাকের উদ্দেশ্যে। কিছু উল্টে পড়ার আওয়াজে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সিগমা এজেন্ট।

সার করে দাঁড় করিয়ে রাখা ক্রেটের পেছন থেকে একটা বিশাল শরীর উঁকি দিচ্ছে। পরমুহূর্তেই প্রবল আক্রোশের এক ঘুষিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল বাক্সগুলো। মৃদু গর্জন ছাড়তে ছাড়তে নিচু হয়ে চার হাত-পায়ে সামনে বাড়ছে প্রাণীটা, যার ফলে পিঠের সাদা লোম দেখা যাচ্ছে। কয়েক সেকেন্ড পরই শুরু হলো বুকে দমাদম কিল, আর সেই সাথে কান ফাটানো হুঙ্কার।

আতঁকে উঠে বাকিদের ইশারা করল মঙ্ক। 'ট্রাকে ওঠো!'

নিজেও দৌড় শুরু করল ড্রাইভার অচেতন দেহটার দিকে। একের পর এক কাঠের বাক্স উড়ে এসে আছড়ে পড়ছে দেয়ালে। ক্রমেই বাড়ছে প্রাণীটার জান্তব চিৎকার।

গন্তব্যে পৌঁছে গেছে মঙ্ক। ড্রাইভারের পা ধরে টেনে খোলা জায়গায় আনতে আনতে টের পেল, চার হাত-পায়ে দৌড় শুরু করেছে দানব। মাথায় বিশাল থাবা এই আছড়ে পড়ল বলে!

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার কাছ থেকে ভেসে এল গমগমে একটা কণ্ঠ। 'বদখত জানোয়ারের কোথাকার... আমাদের বোঝাপড়া এখনও শেষ হয়নি!'

দুপুর ১:২৬

বিশাল শরীরটা নিজের দিকে ঘুরে যেতে দেখল কোয়ালস্কি, কণ্ঠটা চিনতে পেরেছে হয়তো।

রকেট লঞ্চারটা ভালোভাবে কাঁধে আঁকড়ে ধরল সিগমা এজেন্ট। এতক্ষণে মনের মতো জিনিস মিলেছে। ওসব ছোটখাটো বন্দুক-পিস্তলে তার সাজ পুরো হয় না।

আগেই লক্ষ্য করেছিল, দরজার পাশে পড়ে আছে লঞ্চার টিউবটা। কাছাকাছি আসতে দুটো আরপিজি শেলও চোখে পড়েছে।

তাড়াতাড়ি লোড করে অস্ত্রটা দানবের দিকে তাক করল কোয়ালস্কি। প্রাণীটাও ঘুরে তাকিয়েছে তার দিকে। সুযোগটার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল মঙ্ক, চাবি সংগ্রহ করে পায়ে পায়ে এগোতে লাগল ট্রাকের দিকে।

বন্ধুকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে দেখেই ট্রিগার টিপল কোয়ালস্কি। পেছনে ধোঁয়ার রেশ ছাড়তে ছাড়তে বেরিয়ে গেল গ্রেনেড, এই দূরত্বে মিস করার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে সরে গেল দানবটা। স্বজাতিদের একজনকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে আঁচ করে নিয়েছে ঘটনা।

লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে দেয়ালে মাথা কুটল গ্রেনেড। বিস্ফোরণের আওয়াজের সাথে সাথে ধ্বসে পড়ল এক দলা কংক্রিট।

আবারও রক্ষণাত্মক ভঙ্গিমায় ফিরে গেছে গরিলাটা। চার হাত-পায়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে মেঝেতে। দেয়ালের ছিন্নভিন্ন টুকরোগুলোর আঘাত পিঠ দিয়ে হজম করে নিল।

রিলোড করার সময় নেই। তাই মঙ্কের পদাঙ্ক অনুসরণ করল কোয়ালস্কি। ঝেড়ে দৌড় দিল একেবারে।

মঙ্ক ততক্ষণে ট্রাকের ড্রাইভারে সিটে বসে পড়ে, ইঞ্জিন চালু করে দিয়েছে। ডিজেল ইঞ্জিনের টেইল পাইপ থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে কালো ধোঁয়ার রেখা।

সরাসরি ট্রাকের ব্যাক লোডারের দিকে ছুটছে কোয়ালস্কি। সাইডভিউ মিররে চোখে পড়ল বন্ধুর উদ্বিগ্ন মুখ। পেছন থেকে মেঝের কাঁপুনি জানিয়ে দিল, দৌড় শুরু করেছে দানবটাও।

গতি বাড়াল সিগমা এজেন্ট, কাচে সেঁটে আছে দৃষ্টি। আয়নার প্রায় পুরোটা দখল করে নিয়েছে গরিলার বিশাল বপু।

'তাড়াতাড়ি!' চেঁচিয়ে উঠল মঙ্ক। আস্তে আস্তে বাড়াতে শুরু করেছে ট্রাকের গতি।

কোয়ালস্কি বুঝতে পারল, সময়মতো গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে না। প্রতিবার পা ফেলার সাথে সাথে ভাঙা পাঁজরে যেন কিল বসাচ্ছে কেউ।

ট্রাকের বেড থেকে গুলির আওয়াজ শোনা গেল। মঙ্কের দলের সৈনিকরা সাহায্য করার চেষ্টা করছে, কথাটা ভেবে মনে খানিকটা জোর ফিরে পেল কোয়ালস্কি। দৌড়ের গতিও বাড়ল কিছুটা।

অবশেষে ট্রাকের বাম্পার পর্যন্ত পৌঁছেছে তার হাত। প্রাণপণে মইয়ের একটা ধাপ আঁকড়ে ধরল সিগমা এজেন্ট, আরেক হাতে যুঝতে লাগল ভারসাম্য ফিরে পেয়ে শরীর সুস্থির করার উদ্দেশ্যে।

পূর্ণশক্তিতে ছুটে আসছে দানবাকৃতি গরিলা। মোটা চামড়া আর মজবুত হাড়ের কারণে রাইফেলের গুলিকে বিন্দুমাত্র পাত্তা দিচ্ছে না। কাছাকাছি পৌঁছে শিকার ধরার জন্য বাড়িয়ে দিল একটা জখমী হাত। করাতের পোঁচ খেয়ে এখনও রক্ত ঝড়ছে ক্ষত থেকে।

সুযোগ বুঝে ক্ষতস্থানে লঞ্চার টিউব দিয়ে বেদম একটা বাড়ি হাঁকাল কোয়ালস্কি, তারপর ভারী লঞ্চারটা তুলে দিল ট্রাকের বেডে। দম ফুরিয়ে গেছে। অনেক কষ্টে আরেকটু উপরে তুলে আনতে পেরেছে ক্লান্ত শরীরটা, বাম্পারে আটকে দিয়েছে একটা পা।

তবে বাড়ি খেয়ে বিন্দুমাত্র দমেনি দানব। প্রতি মুহূর্তে কমিয়ে আনছে মাঝের দূরত্ব।

এমন সময়ে কেউ একজন কাঁধে তুলে নিল রকেট লঞ্চার, তাক করল পেছনদিকে। ঘাড় সোজা করে মারিয়াকে দেখতে পেল কোয়ালস্কি। অস্ত্র হাতে রণরঙ্গিণী মূর্তি ধারণ করেছে মেয়েটা, কিন্তু বাকি গ্রেনেডটা তো তার পকেটে!

তবে গরিলাটার সেই কথা জানা নেই। বুম করে বিকট একটা আওয়াজ হতেই পিছিয়ে গেল দানব, সতর্ক ভঙ্গিতে শরীর গড়িয়ে দিল একপাশে। মনে করেছে, আবারও গোলা ছোঁড়া হয়েছে তার দিকে।

তবে আসল ঘটনা হলো- রকেট লঞ্চার কাঁধে তুলে নিয়ে, পা দিয়ে ট্রাকের বেডের ধাতব দেয়ালে লাথি কষিয়েছে মারিয়া।

ঘাড় ঘুড়িয়ে পেছনে তাকাল কোয়ালস্কি। পথের একপাশে থমকে দাঁড়িয়েছে দানব। বুঝতে পেরেছে, ধোঁকা দেয়া হয়েছে তাকে।

হাত তুলে প্রানিটাকে স্যালুট করার ভঙ্গি করল সিগমা এজেন্ট।

পরের বার, বন্ধু...

'সাবধানে!' স্টিয়ারিং হুইলের পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলল মঙ্ক।

ঘাড় ফেরাতেই দেখা গেল, টানেলের উল্টোদিক থেকে গায়ে গা মিলিয়ে এগিয়ে আসছে মিলিটারিদের একটা গাড়িবহর।

চাইনিজ সেনাবাহিনী!

দুপুর ১:৩১

ট্রাকের গতি কমাতে কমাতে কিম্বারলির দিকে তাকাল মঙ্ক, জবাবে ভ্রুকুটি করল মেয়েটা। স্যাটেলাইট ফোনের স্ক্রিনে সেঁটে আছে তার নজর। ক্যাটের পাঠানো ভূগর্ভস্থ শহরের মানচিত্র ফুটে আছে পর্দায়।

'আমরা যেদিক দিয়ে ঢুকেছিলাম, সেদিক দিয়েই আসছে সেনাবাহিনী।'

ব্রেক কষল মঙ্ক। 'তার মানে ওই পথে আর বেরোতে পারছি না।'

'না,' বলে পেছনদিকে ঘাড় ঘোরাল ডিআইএ এজেন্ট। 'তবে একশো গজ পেছনে একটা বাঁক আছে।'

ফেলে আসা টানেলটার কথা মনে পড়ল মঙ্কের, এই টানেলের চাইতেও বড় ওটা। 'কিন্তু ওটা কোথায় গেছে?'

'জানি না। ক্যাটের মানচিত্রে গন্তব্য উল্লেখিত নেই।'

'ঠিক আছে। গিয়েই দেখা যাক।'

সাইডভিউ মিররে চোখ রেখে ট্রাক পেছাতে শুরু করল মঙ্ক। তেমাথার প্রায় পঞ্চাশ গজ পেছনে দাঁড়িয়ে আছে দানব। পেছন থেকে আরও কয়েকটা কালো অবয়ব এগিয়ে আসতে দেখা গেল। সামনের মানব সেনাবাহিনী, পেছনে গরিলাবাহিনী। ট্রাকটার অবস্থা একেবারে ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতো।

'তাড়াতাড়ি মোড় নাও!' চেঁচিয়ে বলল কিম্বারলি।

যথাসম্ভব আস্তে আস্তে পেছনে এগোচ্ছে মঙ্ক। চেষ্টা করছে সেনাবাহিনীকে বোঝাতে, ময়লা ফেলার গাড়ি নিয়ে তাদের সামনে থেকে সরে যেতে চাইছে অসহায় পরিচ্ছন্নতাকর্মী।

কিন্তু সামনের দিক থেকে ছুটে আসা বুলেট প্রমাণ করল, কাউকেই ছাড় দেবে না চাইনিজরা। ঝনঝন আওয়াজে উইন্ডশিল্ড ভেঙে পড়লেও ভেতরের কারও কোনও ক্ষতি হলো না।

নিচু হয়ে একটা বাইনোকুলার তুলে নিল কিম্বারলি। চোখে লাগিয়ে সামনে তাকাতেই বুকটা ধড়াস করে উঠল তার। গাড়িবহরের একেবারে সামনেই আছে মূর্তিমান আতঙ্ক।

'কী হল?' জিজ্ঞেস করল মঙ্ক।

'সামনের জীপে... লেফটেন্যান্ট চ্যাং সান।'

'অ্যাঁ?' কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না সিগমা এজেন্ট। এই সুযোগে আবারও মুখ খুলল কিম্বারলি। 'নিশ্চয় গোলমালের সময় বেরিয়ে গিয়েছিল ধূর্ত লোকটা। এখন ফিরে আসছে দলবল নিয়ে।'

গতি বাড়াল মঙ্ক। চ্যাং-এর গুলির জবাবে বেড়ে থাকা সৈনিকরা পাল্টা গুলি করছে। নিচু হয়ে আছে শিম্পাঞ্জী-গরিলাসহ বাকিরা, পেছনে সামান্য স্টিলের পাতলা রেলিং ছাড়া আর কোনও আড়াল নেই।

সাইডভিউ মিররে মঙ্ক দেখতে পেল, দলনেতার সাথে মিলিত হয়েছে বাকি সংকর গরিলাগুলো। সামনের দিক থেকে আসা গুলির আওয়াজে খানিকটা বিভ্রান্ত মনে হচ্ছে জন্তুগুলোকে। তবে জানে, এই অবস্থা চিরকাল থাকবে না। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, ট্রাকের দিকে তাকিয়ে আছে সংকরদের দলনেতা। যে কোনও আক্রমণের জন্য সদা প্রস্তুত। হয়তো বাহনটার আবার তার দিকে এগিয়ে যাওয়া দেখে ভাবছে, হামলা করতে আসছে।

হতাশ করার জন্য দুঃখিত, বন্ধু... ভাবতে ভাবতে সর্বশক্তিতে ব্রেক কষল মঙ্ক। তেমাথার সামনে পৌঁছে গেছে। বনবন করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ট্রাকের মুখ ফিরিয়ে নিল শাখা টানেলের দিকে। গাড়িটা আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়ে পড়ায়, সামনের দিক থেকে কাছে চলে আসা সেনাবাহিনী এখন আর গরিলাগুলোকে দেখতে পাচ্ছে না। একেবারে সামনের ছাদখোলা জীপের প্যাসেঞ্জার সিটে বসে থাকা চ্যাং সানের সাথে চোখাচোখি হলো মঙ্কের। ক্ষুদে ক্ষুদে চোখগুলোতে খেলা করছে শিকারের নেশা।

গোটা বহরের নজর সেঁটে আছে ডাম্প-ট্রাকটার উপর। আর মাত্র একশো গজ...

এমন সময় গিয়ার পাল্টে, সর্বশক্তিতে গ্যাস পেডালে পা দাবাল মঙ্ক। সাথে সাথে শাখা টানেল ধরে ছুট লাগাল ট্রাকটা। হিংস্র গরিলাদের সামনে উন্মুক্ত করে দিল চ্যাং-এর সেনাবাহিনীকে।

সামনে এগোতে এগোতে সাইডভিউ মিররে দুই দলের সংঘর্ষ দেখতে পেল সিগমা এজেন্ট। এখন কে শিকার, কে শিকারি... তা বলা মুশকিল। আপাতত লেজ গুটিয়ে ভাগা যাক।

দুপুর ১:৫৮

বিশ মিনিট ধরে অন্ধকার টানেল বেয়ে এগোনোর পর, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মারিয়া। ট্রাকের বেডে গুটিসুটি মেরে বসে আছে মেয়েটা, চারদিক থেকে তাকে ঘিরে রেখেছে পশমে আবৃত কয়েকটা শরীর।

একপাশে বাকো, কোলে তুলে নিয়েছে একটা বাচ্চা শিম্পাঞ্জীকে। আরেকপাশে আরেকটা বাচ্চা কোলে নিয়ে বসে আছে বয়স্ক মাদীটা।

বাকোর ছেলেবেলার কথা মনে করল মারিয়া।

দেয়ালে হেলান বসে আছে কোয়ালস্কি, সরাসরি তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকেই।

'কী হয়েছে?' বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করল প্রজননবিদ।

কোয়ালস্কিও বিরবিড় করে জবাব দিল, 'তোমাকে সুন্দর দেখাচ্ছে।'

মাথা নিচু করে নিজের বিধ্বস্ত অবস্থার দিকে চোখ ফেরাল মেয়েটা, তারপর ভ্রূকুটি করল সামনের দিকে তাকিয়ে।

কৃত্রিম কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে নিজের মাথায় হাত বুলাল সিগমা এজেন্ট। 'মানে... আমি বলছি না, তোমাকে পরিপাটি লাগছে। কিন্তু... বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে তো সুন্দর অবশ্যই।'

এবার প্রশ্রয়ের হাসি ফিরে এল মেয়েটার ঠোঁটে, কণ্ঠে লজ্জার রেশ। 'কী জানি!'

'সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে,' আবারও বিড়বিড় করতে করতে চোখ বন্ধ করল বিশালদেহী সিগমা এজেন্ট। তবে তার আগে পাল্টা হাসতে ভোলেনি।

মারিয়া জানে, এখন এসব ভেবে পুলকিত হওয়ার সময় নয়। কিন্তু লোকটার কথাও ফেলে দেয়া সম্ভব না তার পক্ষে। লোকটার কাছ থেকে যে সহমর্মিতা, যে যত্ন সে পেয়েছে, তা কি কখনও ভুলে থাকা সম্ভব?

এমন সময় বার কয়েক কেশে উঠল ট্রাকের ইঞ্জিন, কয়েক সেকেন্ড পর একেবারে বন্ধই হয়ে গেল।

ক্যাবের জানালায় মঙ্কের মুখ দেখা গেল। 'জ্বালানী শেষ। সম্ভবত ফুয়েল ট্যাঙ্কে গুলি লেগেছে। তবে কিম্বারলি জায়গাটা চেনে। আধ মাইল সামনে বেরোনোর একটা পথ আছে। বাকি রাস্তাটুকু হাঁটতে হবে।'

কোয়ালস্কির সাহায্য নিয়ে জন্তুগুলোকে নামিয়ে আনল মারিয়া। ফ্ল্যাশলাইট হাতে সবাইকে পথ দেখাচ্ছে মঙ্ক। আবারও শুরু হলো পদব্রজে যাত্রা।

কয়েক মিনিট নীরবে কাটার পর মুখ খুলল কিম্বারলি। 'এক্সিটটা সামনেই। বের হয়ে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের।' বলে প্রানিগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটা। 'আর আমাদের যা জনবল, লোকজনের নজর এড়ানোর জন্য ছাদওয়ালা ভ্যানের বিকল্প নেই। শহর ছাড়িয়ে বেরিয়ে গিয়ে, উদ্ধার পাবার জন্য সংকেত...।'

'চুপ!' কথা মাঝখানে তাকে থামিয়ে দিল মঙ্ক, তারপর একহাতে ঢেকে নিল ফ্ল্যাশলাইটের মুখ।

'আবার কী!' কাতরে উঠল কোয়ালস্কি, পরমুহূর্তে তার নিজের কানেও ঢুকল আওয়াজটা।

ইঞ্জিনের গর্জন। পেছনের টানেল বেয়ে এগিয়ে আসছে একটা গাড়ির হেডলাইট। ধাওয়াকারীরা সম্ভবত তাদের ফেলে আসা ডাম্প-ট্রাকটাকে শনাক্ত করে ফেলেছে।

সবাইকে নিচু হতে ইশারা করল মঙ্ক। কাছাকাছি লুকানোর মতো কোনও জায়গা চোখে পড়ছে না। আর সেরকম কিছু থাকলেও, লুকানোর সময়টুকু তো পেতে হবে!

দশ গজ সামনে এসে থামল ইঞ্জিনের আওয়াজ। মিলিটারি জীপটার উপরে একটা মেশিনগান ফিট করা, নলটা সরাসরি তাদের দিকে ঘোরানো।

মেশিনগানের পেছন থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল। 'এবার আর পালানোর জায়গা নেই, ইঁদুরের দল।'

কণ্ঠটা চিনতে পেরেছে মারিয়া।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল চ্যাং সান।

দুপুর ২:১৬

উঠে বসে গাড়িটার দিকে কয়েকটা গুলি পাঠাল সার্জেন্ট শিন। তবে তাতে বাহন বা আরোহী, কারও গায়ে বিন্দুমাত্র আঁচড়ও লাগল না। এমনকি জীপের উইন্ডশিল্ডটাও বুলেটপ্রুফ কাচের তৈরি। আর সেক্ষেত্রে মেশিনগান মাউন্টের পেছনে বসে থাকা চ্যাং-এর সুরক্ষার কথা তো বলাই বাহুল্য।

কোয়ালস্কি আরপিজি উঁচু করতে করতে মেশিনগানের ট্রিগার টিপল চ্যাং, সবার পায়ের সামনে একটা রেখা তৈরি করল বুলেটের সারি।

'চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো,' সতর্ক করল লেফটেন্যান্ট। 'তাহলে সম্ভবত তোমাদের কয়েকজনকে বাঁচিয়ে রাখব আমি।'

অস্ত্র নামিয়ে নিল কোয়ালস্কি।

'কিন্তু আমার এসব জন্তু-জানোয়ারের কোনও দরকার নেই,' বলে চলেছে চ্যাং। 'আগে বাড়িয়ে দাও সবগুলোকে। এক এক করে টার্গেট প্র্যাকটিস করি।'

নিজের শরীর দিয়ে বাকোকে আড়াল করল মারিয়া। সাথে সাথে তার বুকের উপর স্থির হলো মেশিনগানের মাযল।

'বাঁচতে চাইলে শুয়োরটার কথামতোই কাজ করতে হবে আমাদের,' কোয়ালস্কির কণ্ঠে রাগের রেশ। 'তাছাড়া বাকোর জন্য আবার ল্যাবে ফিরে যাওয়ার চাইতে এখানে মারা যাওয়া অনেক ভালো।'

ভারী হয়ে আসছে মারিয়ার বুক। কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ থাকার পর অবশেষে মাথা নেড়ে সায় দিল সে, নিষ্ঠুর সত্যিটা উপলব্ধি করতে পারছে সে-ও। বাকোর দিকে ফিরে হাতে ইশারা করল প্রজননবিদ।

[আমি তোমাকে ভালবাসি]

এগিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল প্রাণীটা।

'এখনই!' আবারও চেঁচিয়ে উঠল চ্যাং।

ফিরে তাকাল কোয়ালস্কি। 'বিদায়টা তো নিতে দে, শালা পাষণ্ড!'

ততক্ষণে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে মারিয়া, আবারও জড়িয়ে ধরতে চাইছে নিরীহ পশুটাকে। কিন্তু এটাও বুঝতে পারছে, চ্যাং-এর মনে অতটা ধৈর্য নেই। বুকে পাথর চেপে অবশেষে বাকোকে শিম্পাঞ্জীগুলোকে সাথে নিয়ে এগোনোর ইঙ্গিত করল মেয়েটা।

বাচ্চা একটা শিম্পাঞ্জীকে কোলে তুলে নিল বাকো, এক হাতে আঁকড়ে ধরেছে মাদীটার হাত। ওটা আবার কোলে তুলে নিয়েছে আরেকটা বাচ্চাকে।

একসাথে আগে বাড়ল প্রাণীগুলো। জীপের হেডলাইটের আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে ছায়াগুলো, যেন ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে অন্য কোনও দুনিয়ায়।

আস্তে আস্তে ছোট্ট দলটার দিকে নেমে আসছে মেশিনগানের নল।

কোয়ালস্কির বুকে মুখ লুকাল মারিয়া, এই নৃশংসতা চোখের সামনে দেখতে পারবে না। বিড়বিড় করে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে বিশালদেহী সিগমা এজেন্ট।

জীপের দিকে নজর সেঁটে থাকায়, পেছনের দৃশ্য কারও চোখে পড়েনি। টানেল বেয়ে এগিয়ে আসছে কালচে, বিশাল একটা অবয়ব। অর্থাৎ, সেনাবাহিনী আর সংকর গরিলাদের ওই যুদ্ধ থেকে কেবলমাত্র চ্যাং একা জীবিত ফিরে আসেনি।

সন্তর্পণে এগোচ্ছে সংকরদের দলনেতা, পালিয়ে আসা শিকারের দিকে পুর্ণ মনোযোগ। পেছনের মেঝেতে রেখে আসছে রক্তের লম্বা রেখা। ল্যাবে, হাতে

করাতের আঘাতে আগেই রক্তক্ষরণে কাবু হয়ে পড়েছিল। এখন আবার যুদ্ধের সময় হজম করতে হয়েছে নতুন অনেকগুলো বুলেট। সারা গা একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, অকেজো হয়ে শরীরের একপাশে ল্যাগব্যাগ করছে একটা হাত। কিন্তু তীব্র প্রতিশোধস্পৃহা এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে প্রাগৈতিহাসিক জন্তুটাকে।

শিকারি বিড়ালের মতো এগিয়ে আসা জন্তুটাকে সবার আগে খেয়াল করল মঙ্ক, হাত নেড়ে দলের বাকিদের পিছিয়ে আসতে ইঙ্গিত করল সে।

চ্যাং মনে করল, ওরা সম্ভবত বাকো আর শিম্পাঞ্জীগুলোর নির্মম হত্যাযজ্ঞ না দেখার উদ্দেশ্যে পিছিয়ে যাচ্ছে। 'চিন্তা কোরো না,' কৃত্রিম উছ্বাসের ভঙ্গি করল লেফটেন্যান্ট। 'কাজটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলব।'

আসলেই তাড়াতাড়ি শেষ হতে চলেছে সব।

মেশিনগানের মাউন্ট থেকে চ্যাং-কে তুলে নিল লোমশ একজোড়া হাত। থতমত খেয়ে পেছনে ফিরল চাইনিজ, গলা দিয়ে বেরিয়ে এল জান্তব চিৎকার।

ভয় পেয়ে জীপ থেকে বেরিয়ে আসছে ড্রাইভার। এবার অপরপক্ষের টার্গেট প্র্যাকটিস করার পালা। শিনের পিস্তলের দুটো বুলেট কপালে নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল লোকটা।

গুলির আওয়াজকে পাত্তাই দেয়নি সাদা লোমওয়ালা দানব। দুই হাতে চ্যাং-এর শরীরটা উপরে তুলে নিয়েছে সে, এক মুহূর্ত পর কামড় বসালো লেফটেন্যান্টের মাথায়। দুই চোয়াল এক করতেই, হাড় ভাঙার বিশ্রী কড়মড় শব্দ কানে এলো সবার।

চ্যাং-এর চেঁচানো থেমে যেতেই যেন বাকি শরীরটার উপর জন্তুটার আকর্ষণ মিলিয়ে গেছে। ধপাস করে জীপের উপর আছড়ে ফেলা হলো মুণ্ডুহীন মৃতদেহ।

ততক্ষণে কাঁধে রকেট লঞ্চার তুলে নিয়েছে কোয়ালস্কি, লক্ষ্য সোজাসুজি মাথায়। এবার আর মিস করতে চায় না। কিন্তু ট্রিগার টেপার আগমুহূর্তে, লঞ্চারের নল ধাক্কা মেরে উপরে তুলে দিল একটা লোমশ হাত।

বাকো...

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গরিলাটা। তারপর বাকিদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে, তাকাল সংকরদের দলনেতার দিকে। হাত তুলে ইশারা করছে।

[ভাগ]

এক হাতে ভর দিয়ে দাঁড়াল সংকর গরিলা। রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে শরীরের সবগুলো বুলেটের ক্ষত থেকে। দৃষ্টি সরাসরি বাকোর দিকে। দেখেছে একটু আগে কোয়ালস্কিকে কীভাবে থামানো হলো।

আবারও ইশারাটার পুনরাবৃত্তি করল বাকো।

[ভাগ]

নীরবে কেটে গেল কয়েকটা মুহূর্ত। অবশেষে পরাজয় স্বীকার করে নিল াগৈতিহাসিক জন্তুটা, হাঁটা শুরু করল পেছন ফিরে। একটু পরই মিলিয়ে গেল াধারে।

নড়ছে না কেউ। ধারণা করছে, আবারও তেড়ে আসবে মূর্তিমান বিভীষিকা।

খানিকক্ষণ পর এগিয়ে এসে বাকোকে জড়িয়ে ধরল মারিয়া।

চিন্তিত দেখাচ্ছে কোয়ালস্কিকেও। বুঝতে পারছে না, কেন বিনা বাক্যব্যয়ে বাকো াদেশ মেনে নিল প্রাণীটা- নিজের ক্ষতগুলোর জন্য দুর্বল হয়ে পড়েছে বলে, নাকি াকোকে তার জীবন বাঁচাতে দেখে।

কারণটা জানার আর কোনও উপায় নেই। একেবারেই চলে গেছে দানব। হয়তো বিষ্যতে হিমালয়ের ইয়েতির মতো চাইনিজ টানেলের ইয়েতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ রবে ওটা, পরিণত হবে স্থানীয় উপকথায়।

মঙ্কের হাতে লণ্ঠারটা তুলে দিয়ে বাকোর দিকে এগোল কোয়ালস্কি। প্রাণীটার াধ চাপড়ে দিয়ে বলল, ‘আমাদের দলের নতুন একজন দলনেতা হয়েছে দেখতে াচ্ছি।’

জবাবে এক হাত বাড়িয়ে তাকেও জড়িয়ে ধরল বাকো।

‘আহাহা! ভাঙা পাঁজরটা সামলে।’

চিন্তিত ভঙ্গিতে ভ্রুকুটি করল গরিলাটা। বুঝতে পারছে না, তাকে আসলেই ব্যথা ায়ে ফেলেছে কি না।

হাত নেড়ে প্রাণীটাকে আশ্বস্ত করল কোয়ালস্কি। ‘ঠিক আছে। ভুলে যেও না, ামরা একটা...’ বলে আঙুল দিয়ে বাতাসে ইংরেজি এফ অক্ষরটা এঁকে, তার ারদিকে একটা বৃত্ত কাটল।

[ফ্যামিলি]

পরিবার...

মাথা নাড়ল বাকো। তারপর কোয়ালস্কিকে দেখিয়ে পাল্টা ইশারা করল... এবার ারিয়ার উদ্দেশ্যে।

[বাবা]

হেসে উঠল সবাই।

অধ্যায় ছাব্বিশ
৬ মে, রাত ৯:০৫
ওয়াশিংটন ডি.সি.

'তো তাহলে এটাই চীনের অফিশিয়াল কাহিনি?' পেইন্টারে ক্রো-র ডেস্কে উল্টোদিকে বসে প্রশ্ন করল গ্রে। 'গ্যাস লিক?'

চেয়ারে হেলান দিলেন সিগমা ডিরেক্টর, দু'হাতে চিরুনি চালাচ্ছেন মাথার চুলে 'সিএনএন, বিবিসি কিংবা ফক্স নিউজের শিরোনামে বেইজিং চিড়িয়াখানার দুর্ঘটনা কারণ হিসেবে এটাই জানতে পারবে। তবে পেছনের খবর ভিন্ন। চীনকে মুখ রক্ষা সুযোগ দেয়া হচ্ছে, পরিবর্তে তারা শিক্ষাগত দিক দিকে আমেরিকায় গুপ্তচর নিয়ো বন্ধ রাখবে।'

'ওদের কথায় বিশ্বাস করেন আপনি?'

'অবশ্যই না। কিন্তু নাই মামার চাইতে কানা মামা তো ভালো। ধাপটাকে ক্লিনি কর্মসূচীর সূচনা বলা যেতে পারে। সেই সাথে মানব জিনোম সংক্রান্ত গবেষণা বাদ দেবে চীন।'

গ্রে-কে ভ্রুকুটি করতে দেখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন পেইন্টার। 'বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে গিয়েছে। এখন আমাদের কর্তব্য ব্যাপারটাকে যথাসম্ভব সীমিত রাখতে চেষ্ট করা। এমনকি, ক্রেন্ডাল বোনরাও তাদের সংকরজনিত প্রজেক্ট বাতিল করেছে।'

'চীন থেকে আসা অতিথির খবর কী?' জিজ্ঞেস করল সিগমা কমান্ডার।

'গাও সান? কারাগারে পাঠানো হয়েছে তাকে।'

মাথা নেড়ে সায় দিল গ্রে। আসার পথে চাইনিজ লোকটাকে তুলে এনেছে মঙ্ক প্রাইমেট সেন্টারে ইমোরি ইউনিভার্সিটির এক ছাত্রকে খুন করার দায়ে আটক দেখানো হয়েছে তাকে। অবশ্য চিড়িয়াখানাসংক্রান্ত গোলমালে তার দিকে বিশে নজর দেয়নি কেউ। যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়ে লোকটাকে পাঠানো হয়েছে একটা গোপন ডিটেনশন সেন্টারে।

'মুখ খোলা ছাড়া সব ধরনের সহযোগিতাই করছে লোকটা,' আবারও বললে পেইন্টার।

প্রশ্নবোধক দৃষ্টি হানল গ্রে, বুঝতে পারেনি কথাটা।

'আসলে বলা উচিত, সে আপাতত মুখ খোলার মতো অবস্থায় নেই। চ্যাং সানকে নিজ হাতে না সেই ঝাল তার ভাইয়ের উপর মিটিয়েছে কোয়ালস্কি। এক ঘুষিতে উপড়ে নিয়েছে লোকটার সামনের চারটা দাঁত, সেই সাথে ভেঙে দিয়েছে একপাশের চোয়ালটাও। সময়মতো মঙ্ক তাকে না আটকালে আরও কী করত বলা মুশকিল। মুখটা সেলাই-ব্যান্ডেজ দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। আগামী কয়েক সপ্তাহ স্ট্র দিয়ে তরল খাবার খাওয়া ছাড়া বিকল্প কোনও পথ নেই।'

'আর ইকুয়েডরের খবর?'

'কোয়েঙ্কার চার্চ অফ মারিয়া অক্সিলিয়াডোরাতে উদ্ধার অভিযান চালানোর জন্য ভ্যাটিকানের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছেন ফাদার নোভাক। ব্যাপারটা তিনি নিজেই তত্ত্বাবধান করবেন। স্থানীয় শুয়ার গোত্রকে সাথে নিয়ে তাকে সাহায্য করবে জেম্বে নামের ছেলেটা। তিনি নিশ্চিত, আবারও গুহাটা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব।'

সায় দিল গ্রে। যা বোঝা যাচ্ছে, ফাদার ক্রেসপির পদাঙ্কই অনুসরণ করতে চলেছে রোল্যান্ড।

'নিয়ানডারথাল সংকরদের দুটো কঙ্কালই হাতছাড়া হয়ে গেছে, ব্যাপারটা দুঃখজনক,' যোগ করলেন পেইন্টার। 'হাড়গুলো থেকে হয়তো মূল্যবান ডিএনএ সংগ্রহ করা যেত।'

কথাটার সাথে একমত হতে পারল না গ্রে। আবারও তার চোখে ভেসে উঠেছে গুহায় ঘুরতে থাকা চাঁদের প্রতিকৃতিটার ছবি। ওই প্রাচীন নির্মাতাদেরই বা কী হলো? তারা কি মারা গিয়েছিল, নাকি পালিয়ে গিয়ে আবারও বসতি গেড়েছিল অন্য কোথাও? অনেক ভেবেও ব্যাপারটার কোনও কূলকিনারা বের করতে পারেনি সে।

কিছু রহস্য না হয় চিরকাল গোপনই থাকুক।

সংকর নিয়ানডারথালদের হাড়গুলো সিগমা কব্জা করতে পারেনি, ঠিক আছে। কিন্তু রোল্যান্ড ইকুয়েডরে নিজ কাজে সফল হলে জ্ঞানের এক সুবিশাল ভাণ্ডার উন্মুক্ত হবে সবার সামনে। হয়ত জানা যাবে, মহাবিশ্বে মানুষের আবির্ভাবের স্বরূপ... কিংবা তার চাইতেও বিশেষ কিছু।

ততদিন না হয় অপেক্ষাই করা যাক।

পেইন্টারের সাথে আরও কয়েকটা টুকিটাকি আলাপ সেরে রাস্তায় বেরিয়ে এল গ্রে। বাইসাইকেল চালিয়ে রওনা হলো বাড়ির দিকে। মাথার উপর আলো দিচ্ছে পূর্ণ চাঁদ। যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে তার রহস্য উন্মোচন করার জন্য।

অ্যাপার্টমেন্টের সামনে পৌঁছে সাইকেলে তালা মারল গ্রে, তারপর এগোতে লাগল দরজা লক্ষ্য করে। আজ রাতের জন্য সব রহস্যকে ছুটি দেয়া যাক। এখন সময় বিশ্রামের।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারল, আপাতত বিশ্রামকেও ছুটি দিতে হবে। পুরো ফ্ল্যাটে ছড়িয়ে আছে মেয়েলী পারফিউমের মৃদু সুবাস।

মাস্টার বাথরুমের দরজা খুলে দেখা গেল, ধোঁয়া ওঠা বাথটাবে শরীর ডুবিয়ে রেখেছে শেইচান। পানির উপরের স্তর ঢেকে রেখেছে বরফকুচির মতো মিহি ফেনা। সামনের মেঝেতে শ্যাম্পেনের একটা খোলা বোতল। সুবাসিত মোমের আলো, ঘোরলাগা আঁধারিতে যোগ করেছে এক নতুন মাত্রা।

হাসল গ্রে। প্যারিসের একটা হোটেলরুমে এই দৃশ্যটা দেখেছিল শেষবার।

ভ্রুকুটি করল শেইচান, প্রেমিকের মনের কথা পড়তে পারছে। 'আগেরবার মাঝপথে থেমে যেতে হয়েছিল।'

আদিম আকর্ষণে জামাকাপড় খুলতে শুরু করল গ্রে।

বাড়িতেই এই ব্যবস্থা থাকতে প্যারিস যেতে চায় কোন পাগল?

২ জুন, সকাল ১০:০৫
কঙ্গো

এত সময় কেন লাগছে?

সকালের সূর্যের দিকে সোজা হয়ে তাকাল কোয়ালস্কি। ঘন সবুজ জঙ্গলের উপর আছড়ে পড়ছে রোদ। সবুজ অরণ্যের একপাশে কতগুলো তাঁবু খাটিয়ে রাখা, গত তিনদিন ধরে এগুলোই সবার আশ্রয় যুগিয়েছে। দুটো মৃত আগ্নেয়গিরির মাঝে অবস্থিত উপত্যকাটাতে একটা বিশেষ কাজে এসেছে তারা।

'আর কতক্ষণ?' মেয়েদের দিকে ফিরে জানতে চাইল সিগমা এজেন্ট।

বাকোর দুই পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছে লিনা আর মারিয়া, প্রথম দিনের যাত্রার জন্য তৈরি করছে প্রাণীটাকে। যেন চঞ্চল কোন বাচ্চাকে এই প্রথম স্কুলে পাঠাচ্ছে। অবশ্য ভীতসন্ত্রস্ত বাকোও সেরকম বাচ্চার মতোই আচরণ করছে।

খানিকটা তফাতে, ঘাসের উপর বসে আছে ট্যাঙ্গো। গরিলাটাকে শান্ত রাখতে তার পুরনো বন্ধুকেও সাথে এনেছে মারিয়া।

গত মাসে চীনের সব ঝামেলা নিটে যাওয়ার পর মারিয়া সিদ্ধান্ত নেয়, বাকোকে বুনো পরিবেশে ছেড়ে দেয়া হবে। তার নতুন বাড়ি হিসেবে নির্বাচন করা হয় এই ভিরুঙ্গা ন্যাশনাল পার্কের গরিলা অভয়ারণ্যকে। জঙ্গলের সাথে প্রাণীটাকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য, পরবর্তী ছয় মাস কঙ্গোতে থাকার জন্য মনঃস্থির করেছে লিনা আর মারিয়া। স্থানীয় প্রানিবিদদের একটা গ্রুপ তাদের এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। চীন থেকে আনা শিম্পাঞ্জীগুলোর ক্ষেত্রেও একই কাজ করা হবে।

দুই সপ্তাহের ছুটি নিয়ে তাদের সাথে এসেছে কোয়ালস্কি। ইচ্ছা আছে, মারিয়া এখানে থাকার সময়টাতে প্রায়ই আসবে দেখা করতে। গতরাতের দৃশ্যগুলো এখনও যেন তার চোখে ভাসছে। বিয়ারের ক্যান হাতে তাঁবুর বারান্দায় একসাথে কাটিয়ে দেয়া ঘন্টা পর ঘন্টা, রাতের আকাশের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকা, একে অপরের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেয়া... শুধু তাঁবুর বারান্দাই না, বিছানাটাও বেশ আরামদায়ক ছিল।

'শেষ,' জবাব দিল মারিয়া। 'বাকো, তুমি তৈরি তো?'

দুই হাত তুলে কাঁধের সামনে মুঠো করল গরিলাটা।

[সাহসী]

'আমি জানি, তুমি সাহসী।' সায় দিল মারিয়া।

হাত ধরে বাকোকে নিয়ে যাওয়া হলো বনের কিনারায়। ট্যাঙ্গোও সাথে সাথে এগোল। আগে থেকেই ওখানে দাঁড়িয়ে আছে স্থানীয় প্রানিবিদ, ড. জোসেফ কিয়েঙ্গে। তার পেছন থেকে অবাক চোখে সবকিছু দেখছে পাচ-ছয়টা গরিলার ছোট্ট একটা দল।

বাকোকে এগিয়ে যেতে দেখে হুপ-হাপ আওয়াজ শুরু করল সবগুলো।

পরিকল্পনা হচ্ছে, বাকোকে বুন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করবে নতুন একজন, ক্রেন্ডাল বোনদের কেউ না। এতে কাজটা আরও সহজ হবে।

হাঁটু গেড়ে বসে হাত বাড়িয়ে দিল কিয়েঙ্গে। 'এসো, বাকো... এসো।'

মারিয়া হাত ছাড়িয়ে নিতেই এক মুহূর্ত ইতস্তত করল বাকো, ট্যাঙ্গোকেও সাথে নিতে চাইছে।

মাথা নাড়ল প্রজননবিদ। 'না... ট্যাঙ্গো তোমার সাথে যাবে না। এটা তোমার বাড়ি, ওর নয়।'

এক পলক বনের দিকে তাকিয়ে কোয়ালস্কির দিকে ছুটে এল বাকো, জড়িয়ে ধরল তাকে।

কোয়ালস্কিও পাল্টা জড়িয়ে ধরে বিদায় জানাল। 'সব ঠিক আছে,' বলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল মাথায়। নাক দিয়ে ফোঁসফোঁস জাতীয় আওয়াজ কছে প্রাণীটা।

'কী হলো?'

মাথা নেড়ে আগের ইশারাটাই এবার একহাতে দেখাল বাকো।

[সাহস নেই]

কোয়ালস্কির মনে হল, যেন তার বুকটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। দু'হাতে প্রাণীটার মাথার দুই পাশ আঁকড়ে ধরল তারপর। 'আমার দেখা সবচেয়ে সাহসী ছেলে তুমি।' বলে ইঙ্গিত করল জঙ্গলে দাঁড়িয়ে থাকা গরিলাগুলোর দিকে। 'ওরা কেউ যদি তোমাকে কষ্ট দেয়, তাহলে সবগুলোকে দেখে নেব আমি।'

আবারও তাকে জড়িয়ে ধরল বাকো, এবার মাথা রেখেছে কোয়ালস্কির বুকে।

বুক স্পর্শ করে এক হাত মাথার পাশে তুল ধরল বিশালদেহী সিগমা এজেন্ট, আঙুলগুলো তাক করা উপরের দিকে।

[আমি তোমার বাবা]

ছলছল করছে বাকোর চোখ।

এবার কোয়ালস্কি এক হাত রাখল গরিলাটার বুকে, তারপর স্যালুট দেবার ভঙ্গি করে নামিয়ে আনল পেটে।

[তুমি আমার ছেলে]

এবার বিষাদ সরিয়ে চোখে ভর করেছে খুশি। কোয়ালস্কিকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার উপর চড়ে বসল বাকো।

ভাঙা পাঁজরে চাপ খেয়ে কোনওরকমে উঠে বসল সিগমা এজেন্ট। 'ঠিক আছে তবে। যাও এখন, কয়েকটা নতুন বন্ধু জুটিয়ে নাও।'

উঠে দাঁড়াল বাকো, পায়ে পায়ে এগোতে লাগল বনের দিকে... নতুন জীবনের দিকে...

Σ

উপসংহার
দশ বছর পর
১৮ সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যা ৫:৩২
কঙ্গো

'ড. ক্রেন্ডাল, সূর্য ডুবতে আর বেশি দেরি নেই,' চিকন সুরে সতর্ক করল কিয়েঙ্গে। 'আমাকে ফিরতে হবে। আপনার এখানে একা থাকা মোটেও ঠিক হবে না।'

কুকুরটার দিকে এক পলক তাকিয়ে আবারও জঙ্গলের দিকে মন দিল মারিয়া। 'আমি একা নই, ট্যাঙ্গো আছে।'

'তা ঠিক। কিন্তু সে নিজেও অসুস্থ, আর খুব দুর্বল।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মারিয়া। আবারও উপলব্ধি করছে সত্যিটা। দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়েছে ট্যাঙ্গো, আয়ু বড়জোর আর কয়েক সপ্তাহ।

এই সময় তার ভিরুঙ্গা ন্যাশনাল পার্কের গরিলা অভয়ারণ্যে আসার পেছনে এটাও একটা কারণ। চায়, বাকো তার বন্ধুকে শেষ বিদায় জানাক।

গত পাঁচ বছর বাকোর সাথে দেখা হয়নি মারিয়ার। ব্যাপারটা অবশ্য এক দিক থেকে ভালই হয়েছে। বুনো পরিবেশে ভালো আছে গরিলাটা। মারা যে যায়নি, এটা নিশ্চিত। পার্কের রেঞ্জাররা প্রায়ই দেখতে পায় ওকে।

জেগে উঠছে রাতের অরণ্য। আড়মোড়া ভাঙছে নিশাচর প্রাণীরা। ঝপঝপ আওয়াজে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে এদিক সেদিক উড়াউড়ি করছে বাদুরসহ বিভিন্ন রাতজাগা পাখি। শেষবারের মতো ডাক ছাড়তে ছাড়তে বাসার পানে রওনা হয়েছে গেছো বানরের ঝাঁক।

'ড. ক্রেন্ডাল, আমার মনে হয়, আপনার কাল আসা উচিত।'

আবারও দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মারিয়া। সকাল থেকে অপেক্ষা করছে, এটা নিয়ে আজ তৃতীয় দিন। ভেবেছিল, ট্যাঙ্গোর উপস্থিতি বাকোকে জঙ্গল থেকে বাইরে টেনে আনবে। কিন্তু আজও কাজ হয়নি।

'সম্ভবত, আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে,' বিড়বিড় করল প্রজননবিদ, চলে যাওয়ার জন্য উদ্যত।

মেয়েটার হতাশা কিয়েঙ্গেকেও ছুঁয়ে গেছে। 'আমি দুঃখিত।'

কয়েক পা এগোতেই, পেছন থেকে ভেসে এল পরিচিত হুফ-হুফ জাতীয় একটা আওয়াজ।

মুচকি হেসে জঙ্গলের দিকে ইঙ্গিত করল কিয়েঙ্গে।

'বাকো?'

কালচে ডালপালা সরিয়ে একটা বিশাল অবয়ব নজরে এলো, এগোচ্ছে চার হাত-পায়ে। কালো চোখজোড়া সেঁটে আছে মারিয়ার উপর। কপালের উপরের সাদা লোম পূর্ণ যৌবনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

গাল স্পর্শ করল একটা লোমশ হাত।

[মা]

কাতরে উঠে জঙ্গলের দিকে দৌড় করল মারিয়া। বাকোও পেছন পেছন আসছে, তবে গতি শ্লথ।

কুকুরটাকে দেখে মুখ দিয়ে বিজজ... জাতীয় আওয়াজ করতে লাগল বাকো। তার ভাষায় এটা হাসির ইঙ্গিত। পুরনো বন্ধুকে কাছে পেয়ে উত্তেজনায় কোমর দোলাতে শুরু করেছে ট্যাঙ্গো, যেন এখনও সেই ছোট্ট কুকুরছানাটিই আছে।

ছুটে গিয়ে গরিলাটাকে জড়িয়ে ধরল মারিয়া। তবে ঘাড়টা এখন এত মোটা হয়েছে যে, দু'হাতে ঘিরে ধরা ভার। বাকোও ফিরিয়ে দিচ্ছে পাল্টা আদর।

ট্যাঙ্গো যোগ দিল তাদের সাথে, মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে দুর্বোধ্য গাঁইগুই।

মারিয়ার পালা শেষ হতে এবার কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরল বাকো, গলায় দীর্ঘশ্বাস।

কিন্তু অভ্যর্থনা পর্ব তো এখনও পুরো হয়নি। পেছনদিকে উঁকি দিল গরিলাটা, কাউকে খুঁজছে। তারপর হাত তুলে ইশারা করল।

[বাবা]

প্রাণীটাকে কাছে টেনে নিল মারিয়া, বুঝতে পারছে না কী বলবে। আর বললেও কতটা বুঝতে পারবে ও।

[চল একটা গল্প বলি তোমাকে]

পরবর্তী এক ঘন্টায় বাকোকে সত্যিটা জানাল মারিয়া। কিছু কিছু অংশ তার জন্য বেশ বেদনাদায়ক, এমনকি ইশারায় প্রকাশ করার ক্ষেত্রেও। কথা শেষ হতে দেখা গেল, ট্যাঙ্গোর উপর মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়েছে গরিলাটা, দুলছে অল্প অল্প।

তাকে সুস্থির হওয়ার সময় দিয়ে নিজের হাতের দিকে তাকাল মারিয়া। অনামিকায় এখনও জ্বলজ্বল করছে একটা হিরার আংটি। জানে, এখন আর এটা পরে থাকার কোনও মানে নেই। কিন্তু আংটিটা আর এটা উপহার দেয়া মানুষটাকে ঘিরে মনে যে স্মৃতি, যে আবেগ জমা আছে, তা কি কখনও ভোলা সম্ভব?

ডুবে গিয়েছে সূর্য। আকাশে দেখা দিয়েছে পূর্ণ চাঁদ। সেই চাঁদের মায়াবী আলোয় বনের রেখা ধরে হাঁটতে শুরু করল সবাই। কয়েক মুহূর্ত পর, গাছের সারির আড়াল থেকে একটা মাঝারি আকারের মাদী গরিলা বেরিয়ে এল। কোলে ধরে রেখেছে একটা বাচ্চা।

বাকোর দিকে ফিরে নিজের বুকে ইঙ্গিত করল গরিলাটা, তারপর হাতটা মুঠো করে ছোঁয়াল কোলের বাচ্চার শরীরে।

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে এলো মারিয়ার চোখজোড়া।

সঙ্গীকে ইশারার ভাষা শিখিয়েছে বাকো!

আবারও আগের ইশারাটার পুনরাবৃত্তি করল মাদী গরিলা।

[এসো... রাত]

হাসল মারিয়া। রাত হয়ে যাওয়ার পরও, বাইরে থাকার কারণে ঝাড়ি খাচ্ছে বাকো। বাচ্চাটার দিকে স্থির হলো তার দৃষ্টি। ছোট ছোট কুতকুতে চোখ মেলে সে-ও তাকে দেখছে।

বাকোর দিকে ফিরে ইশারা করল প্রজননবিদ।

[বাবা হয়েছ তুমি]

সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এল বাকো। মারিয়ার গালে ঘষতে লাগল নিজের গাল, বিদায় জানাচ্ছে। নিজের পরিবার, নিজের দলের কাছে ফেরার সময় হয়েছে।

পিছিয়ে দাঁড়াল মারিয়া, আটকাতে চায় না তাকে।

বন্ধুর পেছন পেছন এগোতে শুরু করেছে ট্যাঙ্গো।

আবারও মারিয়ার দিকে ফিরল বাকো।

তার মনের কথা বুঝতে পারছে প্রজননবিদ, ইশারা করল হাত তুলে।

[ও খুব অসুস্থ... বয়স্ক]

মাথা নেড়ে পাল্টা ইশারা করল বাকো।

[এটা ওর বাড়ি]

তারপর কুকুরটাকে নিয়ে পায়ে পায়ে হারিয়ে গেল আঁধার জঙ্গলে।

মারিয়ার বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। জানে, আর কখনও ওদের সাথে দেখা হবে না।

বুনো পরিবেশে পুরোপুরি মানিয়ে নিয়েছে বাকো, আর ট্যাঙ্গোও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বন্ধুর সান্নিধ্যে থাকবে।

কথাটা মনে করতেই অদ্ভুত একটা অনুভূতি ভর করল মারিয়ার মনে।

অনুভূতিটা একই সাথে আনন্দ এবং বেদনার।

রাত ৮:০০

জঙ্গলের এই অংশকে নিজেদের আবাসস্থল বানিয়ে নিয়েছে গরিলার দলটা। সবাই ঘুমিয়ে গেলেও জেগে আছে বাকো, এমনকি ট্যাঙ্গোও গুটিসুটি মেরে পড়ে আছে

তার পায়ের কাছে। ভাঁজ করা দু'পায়ের মাঝে শুইয়ে রেখেছে নিজের সন্তানকে। এক হাত তুলে বাতাসে কয়েকটা অক্ষর কাটল তারপর। জানে, বাচ্চাটা এখন কিছু বুঝতে পারবে না। কিন্তু বেড়ে ওঠার সাথে সাথে শিখে যাবে সব।

সন্তানকে এই নামটাই দিয়েছে বাকো......আরেকজন বাবার সম্মানে।

আবারও অক্ষরগুলো পুনরাবৃত্তি করল সে।

[J...O...E]

জো...

অবশেষে ঘুম জড়িয়ে আসছে বাকোর চোখে। বাচ্চাটাকে বুকে আঁকড়ে ধরে, মাটিতে শরীর গড়িয়ে দিল সে। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল ঘিরে থাকা গাছের সম্পর্কে, নড়তে থাকা পাতার সম্পর্কে, আলো দিতে থাকা চাঁদের সম্পর্কে, মিটমিট করতে থাকা তারার সম্পর্কে...

কোত্থেকে এলো এসব?

কে তৈরি করেছে সবকিছু?

ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল বাকো।

শান্তির ঘুম...

লেখকের বক্তব্য–সত্যি নাকি কল্পনা?

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ, আশা করি উপন্যাসটা আপনাদের ভাল লেগেছে। এখন আসি গল্পটার পেছনে লুকিয়ে থাকা সত্যি থেকে কল্পনা আলাদা করার ব্যাপারে। সবার আগে জানিয়ে দিই, কীভাবে এই উপন্যাসের আইডিয়া মাথায় এলো...

লেখাটা শুরুই হয়েছে মানুষের মস্তিষ্কের বিবর্তন দিয়ে। আদিম পৃথিবীতে বিচরণকারী পূর্বপুরুষদের থেকে আমরা কেন আলাদা? উত্তরটা কেউ জানে না। বিজ্ঞানীদের মতে এই রহস্য লুকিয়ে আছে গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ডের কারণের সাথে।

কেন এভাবে অগ্রগতি ঘটল মানব বুদ্ধিমত্তায়? এই প্রশ্নের উত্তরে বেশ কিছু সম্ভাব্য ধারণা প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলা যায়নি কিছুই। সবচেয়ে জনপ্রিয় উত্তরটা হচ্ছে, এই রহস্যের কারণ হলো, আদিম মানুষের আফ্রিকার বাইরে ছড়িয়ে পড়া। বলা হয়ে থাকে, নিত্যনতুন দুনিয়ায় গিয়ে, নিত্যনতুন জিনিসের সাথে পরিচিত হওয়ার মাধ্যমেই বুদ্ধিমত্তার এই বিস্ফোরণ।

কিন্তু যদি ব্যাপারটা তা না হয়? বাইরের দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর আমাদের ডিএনএ-তে অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দেয়। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, ওই একই সময়ে মানুষের পূর্বপুরুষ আর নিয়ানডারথালদের মাঝে সংকরায়নের ঘটনা ঘটে।

জীববিদ্যার অন্যতম একটা স্বীকার্য হলো, দুটো ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মিলনের ফলে জন্মগ্রহণ করা বাচ্চা পিতা-মাতার চাইতে উন্নত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারে। ঠিক যেমনটা আমরা মিউল অর্থাৎ খচ্চরের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। ঘোড়া আর গাধার মিলনের ফলে জন্মানো এই প্রাণী কিন্তু বুদ্ধিতে ঘোড়া এবং গাধা, দুই জাতকেই ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম।

কিন্তু এই সংকরায়ন নীতি কি আমাদের ক্ষেত্রেও খাটবে? নিয়ানডারথাল আর আদিম মানুষের মিলনই কি সবকিছুর উত্তর? জবাবটা কখনোই পাওয়া সম্ভব না। বর্তমানে নিখুঁতভাবে পঞ্চাশ ভাগ সাধারণ মানুষ এবং পঞ্চাশ ভাগ নিয়ানডারথাল জিনের সংকর উৎপাদন করা সম্ভব না। কারণ জন্মগতভাবেই আমরা নিজেদের ডিএনএ-তে কিছু নিয়ানডারথাল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

এই রহস্যের জড় থেকেই উপন্যাসটার উৎপত্তি।

এবার চলুন দেখে নেয়া যাক, বইতে উল্লেখিত ব্যাপারগুলোর ভেতর কোনটা সত্যি আর কোনটা সত্যি নয়।

নিয়ানডারথাল এবং অন্যান্য প্রাচীন জীবগোষ্ঠীঃ গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে নিয়ানডারথাল ছাড়াও আমাদের দেহে ডেনিসোভান নামে একটা গোত্রের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এছাড়াও আরেকটা গোত্রের জিনও আমরা ধারণ করছি, কিন্তু তার নাম

এখনও বিজ্ঞানীরা বের করতে পারেনি। তবে ধারণা করা হয়, ওটা হোমো ইরেক্টাস গোত্রের কোনও অপভ্রংশ হতে পারে।

উপন্যাসে আমি গোত্রটাকে মেগানথ্রোপাস বলে দেখিয়েছি। পুরো ব্যাপারটাতে এই একটা অংশই কাল্পনিক। তবে এদের অস্তিত্বের কথা কিন্তু সত্যি। আর আকারে কিন্তু ওরা বেশ বড় হত, প্রায় নয় ফুটের মতো।

এছাড়া গল্পের প্রয়োজনে টেনে আনা চীনের রেড ডিয়ার কেভ পিপল এবং গাইগান্টোপিথেকাস ব্ল্যাকাই নামের দানব গরিলাদের অস্তিত্ব আসলেই ছিল। আধুনিক মানুষের উৎপত্তির সময়ও পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াত এরা। আর কেউ কেউ তো বলে, এখনও হিমালয়ের গহীন পর্বতশৃঙ্গে এই দানবদের দেখা মেলে। ইয়েতি-র কিংবদন্তীর পেছনেও এরাই দায়ী।

সত্যির সাথে আরেকটু কল্পনার রঙ চড়িয়ে আমি বইটাতে মেগানথ্রোপাস আর গাইগান্টোপিথেকাসদের সংকর বানিয়ে দেখিয়েছি।

নিয়ানডারথাল এবং তৎকালীন আদিম মানুষদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী পাঠকরা এসভান্তে পাবো-র লেখা নিয়ানডারথাল ম্যানঃ ইন সার্চ অফ লস্ট জিনোমস বইটা পোরে দেখতে পারেন।

গরিলা এবং এই সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ উপন্যাসে শিম্পাঞ্জী এবং গরিলাদের মাঝে যে তুলনা দেখানো হয়েছে এবং ইশারার ভাষা ও বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে গরিলাদের যে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে, তা সবই সত্যি। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশগুলো ইতিমধ্যে এই ধরণের স্তন্যপায়ীসংক্রান্ত গবেষণা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তবে আমেরিকা এই ব্যাপারে কোনও বিধি-নিষেধের বালাই রাখেনি।

চীনঃ উপন্যাসটা লেখার সময় বেশ অনেকদিন চীনে থেকেছি আমি। বেইজিং চিড়িয়াখানাসংক্রান্ত যে তথ্যগুলো বইতে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ সত্যি। তবে সরকার গোটা চিড়িয়াখানাকে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় সরিয়ে নেয়ার কথা ভাবছে।

চাইনিজ ছাত্রদের আমেরিকায় আগ্রাসন সম্পর্কে যা যা লিখেছি তাও সব সত্যি।

ফাদার অ্যাথেনাসিয়াস কার্কারঃ উপন্যাসের শুরুতেই বলেছি, এই মহান ব্যক্তিত্বকে তৎকালীন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিরূপে অভিহিত করা হত। তার বই, জাদুঘর, কাজের ধারা ইত্যাদি সম্পর্কে বইতে যা যা উল্লেখ করেছি তার সবই সত্যি। এসবই মিউজিয়াম অফ জুরাসিক টেকনোলজি নামে লস এঞ্জেলসের একটা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। সম্ভব হলে তাকে এবং তার বন্ধু, নিকলাস স্টেনোকে ডিনারের দাওয়াত করতাম আমি।

স্যাংচুয়ারি অফ মেন্টোরেলাতে আসলেই সমাহিত আছে ফাদারের হৃৎপিণ্ড, কাজটা নিকোলাস স্টেনো নিজ হাতে করেছিলেন। ইউস্টাসের চ্যাপেলে খোদাই করা প্রাচীন লিপি এবং এর নিচের গোপন চেম্বারটা প্রমাণ করে স্থপতি হিসেবে তার দক্ষতা। লেখাগুলো তিনি খোদাই করেছিলেন প্রাচীন লিপিগুলোর ইতিহাস সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, আর এই ব্যাপারটাকে উপন্যাসে নিজের ইচ্ছানুযায়ী সাজিয়ে নিয়েছি আমি।'

আটলান্টিস এবং ফাদার কার্লোস ক্রেসপিঃ কার্কার সম্পর্কিত ফাদার ক্রেসপির নেশা এবং তাকে দেয়া আদিবাসীদের সত্তর হাজার আর্টিফ্যাক্টের ব্যাপারগুলো সবই সত্যি। ইকুয়েডরের জঙ্গলে এমন অনেক হারানো সভ্যতার অস্তিত্ব আবিস্কৃত হয়েছে। ধারণা করা হয় আর্টিফ্যাক্টগুলো ছিল ভুয়া। স্থানীয় আদিবাসীরা সুদৃষ্টি লাভের জন্য নিজেরাই এসব বানিয়ে উপহার দিয়েছিল তাকে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, ক্রেসপি কোনও আম-আদমি ছিলেন না। একাধিক ডক্টরেট ডিগ্রি ছিল তার। জঙ্গলবাসীদের সেই ধাপ্পা ধরে ফেলার ক্ষমতা তিনি রাখতেন। এসব সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে পড়তে পারেন রিচার্ড উইংগেট-এর লেখা আটলান্টিস ইন দ্য আমাজনঃ লস্ট টেকনোলজিস অ্যান্ড দ্য সিক্রেটস অফ দ্য ক্রেসপি ট্রেজার বইটা।

ক্রেসপির কাহিনীর সাথে পেট্রোনিও জারামিলো এবং নিল আর্মস্টং-এর সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায় স্ট্যান হল নামের এক ইঞ্জিনিয়ারের লেখা একটা বইতে। বিস্তারিত জানতে ঘেঁটে দেখুন বইটা, টায়োস গোল্ডঃ দ্য আর্কাইভস অফ আটলান্টিস।

হারানো প্রাচীন সভ্যতাঃ এই উপন্যাসে প্রাচীন শিক্ষকদের একটা জাতির সম্ভাব্য অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে... ওয়াচার, আটলান্টিয়ান, ব্রাদারহুড অফ সেইন্টস... অথবা নিছক কিছু প্রাগৈতিহাসিক নির্মাতা। মেগালিথিক গজ এবং পৃথিবীর পরিধির ব্যাপারে তাদের সম্পৃক্ততার ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। আরও জানতে পড়ে দেখুন, অ্যালান বাটলার-এর লেখা সিভিলাইজেশন ওয়ানঃ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ নট অ্যাজ ইউ থট ইট ওয়াজ বইটা।

চাঁদরহস্যঃ বইতে উল্লেখিত চাঁদের ভর, আকৃতি, গ্রহণ, ঘূর্ণন এবং ৩৬৬ সংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কিত সব তথ্যই সঠিক। আরও জানতে পড়তে পারেন অ্যালান বাটলার এবং ক্রিস্টোফার নাইট-এর লেখা হু বিল্ট দ্য মুন বইটা।

৩৭ এবং সংখ্যাতত্ত্বঃ দ্য হিচহাইকারস গাইড টু দ্য গ্যালাক্সি বইতে উল্লেখিত ডাগ অ্যাডামস-এর স্বীকার্য অনুযায়ী- জীবন, মহাবিশ্বসহ সব রহস্যের উত্তর হলো একটামাত্র সংখ্যাঃ ৩৭।

চাঁদ, পৃথিবীর পরিধি, প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন, মানুষের ডিএনএ... ইত্যাদির সাথে ৩৭ এর সাযুজ্যের ব্যাপারে উপন্যাসে যা যা উল্লেখ করা হয়েছে, সবই সত্যি। এমনকি মানুষের গায়ের স্বাভাবিক তাপমাত্রাও হচ্ছে ৩৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস।

বাইবেলের লাইনের সাথেও সম্পর্ক রয়েছে ৩৭ এর।

এসবের মানে কী? এটা কি স্বয়ং ঈশ্বরের কোনও ইঙ্গিত? নাকি শুধুই কাকতাল?

উত্তরটা কেউ জানে না।

বিস্তারিত জানতে পড়ে দেখুন, পল ডেভিস-এর লেখা দ্য গোল্ডিলকস এনিগমা হোয়াই ইজ দ্য ইউনিভার্স জাস্ট রাইট ফর লাইফ? বইটা।

শেষকথা

আমি আসলেই জানি না, আমাদের ডিএনএ-তে লুকিয়ে থাকা অনুপাত এবং গ্রহ-নক্ষত্রের গতিপথের অনুপাতের সাথে আদৌ কোনও মিল রয়েছে কি না। হয়তো এটা সৃষ্টিকর্তারই একটা লীলাখেলা। তিনি চেয়েছেন, আমরা যেন আশ্চর্য ব্যাপারগুলো দেখে বিস্মিত হই।

হয়তো পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য এটা কোনও ইঙ্গিত। যেন আমরা বুঝতে পারি, আমরা নগণ্য কিছু নই। মহাবিশ্বের উৎপত্তি আমাদের জন্যই।

কিংবা নিছক কাকতাল।

এই প্রশ্ন থেকেই এই উপন্যাসের শুরু... এখানেই পরিসমাপ্তি।

সমাপ্ত